# প্রাচীন ভারতে শূদ্র

# প্রাচীন ভারতে শূদ্র

আনুমানিক ৬০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত
নিম্নতর বর্গের সামাজিক ইতিহাস

রামশরণ শর্মা

কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯
কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

অনুবাদ : শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়
সৌমিত্র পালিত
স্নেহোৎপল দত্ত

সম্পাদনা : রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

ISBN 81-7074-052-5

অশোককুমার চৌধুরী কর্তৃক তরু প্রিণ্টিং, ১৭৪ রমেশ দত্ত স্ট্রীট কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত ও কনক বাগচী কর্তৃক কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে প্রকাশিত।

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

১৯৫৮ সালে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর 'মহাভারতে'র প্রামাণিক (ক্রিটি-ক্যাল) সংস্করণের কাজ শেষ হয়েছে এবং 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র'র মূল পাঠ সম্পর্কে দুটি আলোচনা বেরিয়েছে। প্রাগ্‌-ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্বের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে এবং সামাজিক পৃথগ্‌ভবন বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক আলোচনা এবং কয়েকটি প্রাচীন সমাজ বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনায় যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। তার সঙ্গে সঙ্গে, প্রকাশিত অন্যান্য সমালোচনা এবং মন্তব্যের আলোয় কিছু অংশ পরিবর্ধিত হয়েছে। দাসবর্গের সংখ্যা-বিস্তার সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে দুটি পরিশিষ্ট রূপে। অধিকাংশ অধ্যায়ের নামই পরিবর্তিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি অধ্যায় প্রভূত পরিমাণে পরিমার্জিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়টি পুনর্লিখিত এবং গ্রন্থপঞ্জিতে সাম্প্রতিক রচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বইটি বার করার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অনেকদিন ধরেই এটি আর কিনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। আরও বিস্তৃত সংশোধন করতে গেলে বইটির প্রকাশ আরও বিলম্বিত হতো, কিন্তু বস্তুত কোনো উন্নতি হতো না। বর্তমান সংস্করণে যা কিছু করা হয়েছে, তাতে পাঠকের আশা পূরণ না হতেই পারে, কিন্তু একেবারে কিছু না-করার চেয়ে সর্বদাই কিছু করা ভালো।

শব্দসূচি ও গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুতিতে সাহায্যের জন্য আমি ড. মোহনচাঁদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।

রামশরণ শর্মা

# প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিষয়টি নিয়ে আমি পড়াশুনা শুরু করেছিলাম প্রায় বছর দশেক আগে, কিন্তু একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্তব্যের চাপে এবং উপযুক্ত গ্রন্থাগারের অভাবে কাজ খুব একটা এগোয়নি। কাজটির অধিকাংশই করা হয়েছে স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর দুটি শিক্ষাবর্ষে (১৯৫৪-৫৬)। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহৃদয় হয়ে পড়াশুনার জন্য যে-ছুটি দিয়েছিলেন তার ফলেই এ-কাজ সম্ভব হয়েছে। সুতরাং ১৯৫৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য যে গবেষণাপত্রটি অনুমোদিত হয়েছিল, এই বই-এ তারই অনেকটা দেওয়া হলো।

ড. এফ. আর. অলচিন, অধ্যাপক এইচ. ডবলু. বেইলি, ড. টি. এন. ডেভ, ড. জে. ডি. এম. ডেরেট, অধ্যাপক সি. ফন ফুরের-হাইমেনডর্ফ, অধ্যাপক ডি. ডি. কোসম্বী, অধ্যাপক আর. এন. শর্মা, ড. এ. কে. ওয়ার্ডার এবং আরও বহু বন্ধু যাঁদের কাছ থেকে কাজটি করতে গিয়ে বহু সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। মূল্যবান উপদেশ এবং মাঝে-মধ্যেই উৎসাহ দেওয়ার জন্য ড. এল. ডি. বার্নেট-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সম্মানীয় বন্ধু ড. দেবরাজকে কৃতজ্ঞতা জানানো আমার অবশ্যকর্তব্য, প্রুফ সংশোধন তথা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাঁর সাহায্য ছাড়া বইটির প্রকাশ আরও বিলম্বিত হতো। আমার ঋণ স্বীকার্য ড. উপেন্দ্র ঠাকুরের কাছেও। শব্দ-সূচিটি তিনিই তৈরি করেছেন এবং সাহায্য করেছেন প্রুফ দেখায়। সর্বোপরি অধ্যাপক এ. এল. বাশাম-এর সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। তাঁর বিদ্বত্তার সুকঠোর মান ও ছাত্রদের মননগত স্বাধীনতা-প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ নির্দেশ—এ সবই বইটি লেখায় প্রভূত সহায়ক হয়েছে। কিন্তু তথ্য ও বিচারের কোনরকম ভ্রান্তি, বা প্রকরণগত অসঙ্গতি (যা হয়তো নজর এড়িয়ে রয়ে গেছে) তার জন্য আমিই দায়ী। কিছু কিছু ছাপার ভুলের ব্যাপারে অবশ্য আমার কিছুই করার ছিল না। আমার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলো দূর করা গেল না।

রামশরণ শর্মা

# সম্পাদকের নিবেদন

পুরো বইটির প্রথম তর্জমা করেছিলেন শ্রীশিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে সেটির বর্তমান রূপ দিয়েছেন শ্রীসৌমিত্র পালিত ও শ্রীস্নেহোৎপল দত্ত। অনুবাদ সম্পাদনার কাজে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, এর ফলে কার্যত একটি নতুন অনুবাদ তৈরি হয়ে যায়। প্রথম তর্জমার জন্য আমরা শিবেশবাবুর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

বাংলা সংস্করণের প্রেস কপি তৈরি করেছেন শ্রীতরুণ পাইন ও শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায়। শব্দসূচি সংকলন করেছেন শ্রীনীলোৎপল দত্ত ও শ্রীতরুণ বসু। এ ধরনের টাইপে—বিশেষত পাদটীকার ছোট হরফের ক্ষেত্রে—কাজ করার অভিজ্ঞতা না-থাকায় বেশ কিছু ভুল নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। সংযোজন ও সংশোধন-অংশে তার তালিকা দেওয়া আছে। শ্রীতরুণ বসুর একনিষ্ঠ পরিশ্রম ছাড়া এ কাজ সম্ভব হতো না। এছাড়া নানা কাজে সাহায্য করেছেন শ্রীশুভদীপ বসু।

এতজনের সাহায্য সত্ত্বেও আরও যদি ভুল-ত্রুটি থাকে, তার দায়িত্ব একান্তই সম্পাদকের।

এই অনুবাদে ব্যবহৃত কয়েকটি বাংলা প্রতিশব্দ ও তার ইংরিজি রূপ নীচে দেওয়া হলো :

| | |
|---|---|
| অর্থকথা / ভাষ্য | Commentary |
| উপঢৌকন | Tribute |
| কুল | Clan |
| কৃষিজীবিতা | Peasanthood |
| জনগোষ্ঠী | Tribe |
| জাতি | Race |
| জ্যেষ্ঠের প্রাধিকার | Primogeniture |
| দাসভাব/-ভাবাপন্ন | Servility/-vile |
| নৃকুলগত | Ethnic |
| পরিচ্যুত | Dispossessed |
| পরিষেবা | Service |
| প্রতিবাসী | Fellowmen |
| মানবগোষ্ঠী | People |
| বরিষ্ঠ / -তা | Senior / -ity |
| বর্গ | Order |
| বৃত্তিগোষ্ঠী/শ্রেণি | Guild |
| বৈরদেয় | *Wergeld* |
| সমাধিকার-মূলক | Egalitarian |

# সংক্ষেপসূচি

| | |
|---|---|
| অথর্ব | অথর্ববেদ |
| আ. ধ. সূ. | আপস্তম্ব ধর্মসূত্র |
| আনু. | আনুমানিক |
| ইঃ | ইত্যাদি |
| ইন্ড. আল্ট. | ইন্ডিশে আল্টেরটুম্‌স্‌কুন্ডে |
| উ. কা. পা. | উত্তরের কালো পালিশ-করা মৃৎভাণ্ড |
| উ. পা. | উত্তরী পাঠ ( মহাভারত ) |
| উপ. | উপনিষদ্‌ |
| ঋগ্‌ | ঋগ্‌বেদ |
| এপি. ইন্ডিকা | এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা |
| ঐ. ব্রা. | ঐতরেয় ব্রাহ্মণ |
| খৃ. পূ. | খৃস্টপূর্ব |
| গৃ. সূ. | গৃহ্যসূত্র |
| চি ধূ মৃ | চিত্রিত ধূসর মৃৎভাণ্ড |
| জৈ. ব্রা. | জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ |
| টী. | টীকা |
| তু. | তুলনীয় |
| তৈ. আ. | তৈত্তিরীয় আরণ্যক |
| তৈ. ব্রা. | তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ |
| দ. পা. | দক্ষিণী পাঠ ( মহাভারত ) |
| দ্র. | দ্রষ্টব্য |
| দ্রাহ্যা. | দ্রাহ্যায়ণ |
| ধ. সূ. | ধর্মসূত্র |
| নং | নম্বর |
| পঞ্চ. ব্রা. | পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ |
| পৃ | পৃষ্ঠা |
| পৈপ্প., পৈপ্পলাদ | পৈপ্পলাদ সংহিতা |
| বৌ. ধ. সূ. | বৌধায়ন ধর্মসূত্র |
| ব্রা. | ব্রাহ্মণ |
| ম. পু. | মৎস্য পুরাণ |
| মার্ক. পু. | মার্কণ্ডেয় পুরাণ |
| লাট্যা. | লাট্যায়ন |
| ব. ধ. সূ. | বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র |
| বা. পু. | বায়ু পুরাণ |

| | |
|---|---|
| বি. পু. | বিষ্ণু পুরাণ |
| শ. ব্রা. | শতপথ ব্রাহ্মণ |
| শ্রৌ. সূ. | শ্রৌতসূত্র |
| স. শ্রৌ. | সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্র |
| সং | সংস্করণ |
| সম্পা. | সম্পাদিত |
| সাম. ব্রা. | সামবিধান ব্রাহ্মণ |
| *A I* | *Ancient India*, Delhi |
| *A O* | *Archiv Orientalni*, Prague |
| *A Ś* | *Arthaśāstra* of Kauṭilya |
| A S S | Ānandāśrama Sanskrit Series |
| *B I* | *Bibliotheca Indica*, Calcutta |
| *C H I* | *Cambridge History of India*, Vol. I, ed. E. J. Rapson |
| *C I I* | *Corpus Inscriptionum Indicarum* |
| Ed. | Edited by, Edition |
| *E I* | *Epigraphia Indica*, Calcutta and Delhi |
| *G O S* | *Gaikawad Oriental Series* |
| *H O S* | *Harvard Oriental Series* |
| *I C* | *Indian Culture*, Calcutta |
| *I H Q* | *Indian Historical Quarterly*, Calcutta |
| *I H R* | *Indian Historical Review*, New Delhi |
| *J A O S* | *Journal of the American Oriental Society*, Baltimore |
| *J A S B* | *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Calcutta |
| *J B B R A S* | *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, Bombay |
| *J B O R S* | *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, Patna |
| *J B R S* | *Journal of the Bihar Research Society*, Patna |
| *J E S H O* | *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Leiden |
| *J O R* | *Journal of Oriental Research*, Madras |

| | |
|---|---|
| *JRAS* | *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, London |
| *JRASB* | *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*, Calcutta |
| NS | New Series |
| PTS | Pali Text Society |
| *SBB* | *Sacred Books of the Buddhists* |
| *SBE* | *Sacred Books of the East* |
| *ZDMG* | *Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft*, Berlin |
| *ZII* | *Zeitschrift für Indologie und Iranistik*, Leipzig |

এ ছাড়াও *Journal of Indian History* ( Trivandrum ), *Past and Present* ( London ), *Proceedings of the Indian History Congress, Transactions of the Philological Society* ( London ) ও *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* ( London )-ও দেখা হয়েছে।

# সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা [ পাঁচ ]

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা [ ছয় ]

সম্পাদকের নিবেদন [ সাত ]

সংক্ষেপসূচি [ নয় ]

১. **ইতিহাস রচনার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি** ১—৭

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ বিষয়ে পাশ্চাত্য আগ্রহ ১ প্রাচীন সমাজ-বিষয়ক রচনায় শূদ্রের স্থান ৩ প্রশ্ন উত্থাপন ও পদ্ধতি নির্দেশ ৬

২. **উৎপত্তি** ৮—৪৩

'আর্য'' শব্দের জাতিগত তাৎপর্য ৮ দাস ও দস্যুর পার্থক্য ৯ আর্য ও প্রাগ্-আর্য জনগোষ্ঠীর সংঘাত ১০ আর্যদের আন্তঃ-জনগোষ্ঠীয় সংগ্রাম ১৫ পণি ১৮ আর্য ও প্রাগ্-আর্য তাম্র-প্রস্তরযুগীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক বোঝাপড়া ১৯ ঋগ্বেদের যুগে দাসরূপে পরিচিত জনগোষ্ঠী / দাস ২২ আর্যদের গণ-দেশান্তর যাত্রার ভাষাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যও পুরাতত্ত্ব দিয়ে সমর্থিত হয় ২৫ ঋগ্বেদীয় যুগে সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাজনের অভাব ২৭ হস্তশিল্পীদের উচ্চ-মর্যাদা ৩০ ''পুরুষ সূক্ত'' এবং একটি সামাজিক বর্গ রূপে শূদ্র ৩০ জনগোষ্ঠী রূপে শূদ্র ৩৩ আর্য জনগোষ্ঠী রূপে শূদ্র ৩৫ শূদ্ররা কি মূলত ক্ষত্রিয় ছিলেন ? ৩৭ 'শূদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ৪০ উৎপত্তির সময়ে শূদ্র বর্ণের সামাজিক মর্যাদা ৪২

৩. **গোষ্ঠী বনাম বর্ণ ( আনু. খৃ পূ ১০০০—৫০০ )** ৪৪—৮৪

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য এবং চিত্রিত ধূসর মৃৎভাণ্ডের পুরাতত্ত্ব ৪৪ সেবক শ্রেণী রূপে শূদ্র ৪৬ 'ভূমিদাস' ও 'দাস' রূপে শূদ্র ৪৯ শারীরিক কর্মের মর্যাদা ৫১ রাজ-অভিষেকে শূদ্র 'রত্নী' ৫২ রাজসূয় যজ্ঞে শূদ্র ৫৪ অশ্বমেধ যজ্ঞে শূদ্র সৈন্য ৫৬ রাজার চতুর্বর্ণের সকলের সমর্থন প্রার্থনা ৫৮ কয়েকটি অভিষেককালীন আচার-অনুষ্ঠান থেকে শূদ্র বর্জন ৫৯ শূদ্র সম্বন্ধে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর একটি অংশ ৬১ উচ্চতর বর্ণের সঙ্গে শূদ্র / দাস-দের বৈবাহিক সম্পর্ক ৬৫ অনার্য জনগোষ্ঠীগুলির আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার সূচনা ৬৮ শূদ্র ও

'উপনয়ন' ৬৯ শূদ্র ও বৈদিক যজ্ঞ ৭২ কয়েকটি ধর্মীয় আচারে শূদ্রের যোগদান ৭৪ শূদ্র-উপাসিত দেবদেবী ৭৬ বৈদিক যজ্ঞে শূদ্রদের যোগদানের বিপক্ষে আরও নিদর্শন ৭৮ শূদ্রদের অবস্থান বিষয়ে মতবিরোধ ৮২ বস্তুগত সংস্কৃতি এবং শ্রেণী গঠনে প্রতিবন্ধকতা ৮২

৪. দাসভাব ও বাধানিষেধ ( আনু. খৃ পূ ৬০০—৩০০ ) ৮৫—১৪৪

ধর্মসূত্র তথা আদি পালি রচনাদির প্রকৃতি ৮৫ উ. কা. পা. ( উত্তরের কালো পালিশ-করা মৃৎভাণ্ড ) পুরাতত্ত্বে পাওয়া বস্তুগত পশ্চাৎপট ৯০ ভূমি ও শ্রমের আত্মসাৎকরণ ৯১ সেবক শ্রেণী রূপে শূদ্রদের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ৯২ কারুশিল্প ও কারুশিল্পী ৯৩ কৃষিশ্রমিক রূপে শূদ্র ৯৬ উৎপাদনে দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক ৯৭ শূদ্রদের জীবনধারণের অবস্থা ৯৯ দাস, পেসস, কম্মকর ও ভটক ১০২ ধর্মসূত্র অনুযায়ী অর্থনৈতিক বাধানিষেধ ১০৬ প্রাথমিক উৎপাদক রূপে শূদ্র; তাদের জীবনযাত্রার মান ১০৭ গ্রীক দাস ও 'হেলট'দের সঙ্গে তুলনা ১০৮ রাজনৈতিক ও আইনগত অসমতা ১০৯ সামাজিক বাধানিষেধ ১১৬ 'উপনয়ন' অনুষ্ঠান তথা শিক্ষা থেকে শূদ্র বর্জন ১২৩ যাগ-যজ্ঞ থেকে শূদ্র বর্জন ১২৩ কায়িক বৃত্তি সম্পর্কে উচ্চতর বর্ণগুলির ঘৃণা ১২৬ আদি পালি রচনার পাঁচটি ঘৃণ্য জাতি ১২৮ অস্পৃশ্যতার উদ্ভব ১৩৩ শূদ্রদের ধর্মসংস্কার আন্দোলন ১৩৫ শূদ্রদের অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ১৪১ বাধানিষেধ সম্পর্কে শূদ্র প্রতিক্রিয়া ১৪২

৫. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও দাসবর্গ ( আনু. খৃ পূ ৩০০—খৃ পূ ২০০ ) ১৪৫—১৭৪

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল ও প্রামাণিকতা ১৪৫ 'শূদ্র-কর্ষকপ্রায়' শব্দের অর্থ ১৪৯ রাষ্ট্রীয় উৎপাদনে দাস ও কৃষিশ্রমিক ১৫০ কারুশিল্পীদের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ ও বেতন ১৫৩ উচ্চতর তিন বর্ণের জন্য সংরক্ষিত উচ্চপদ ১৫৮ চর তথা সৈনিক রূপে শূদ্র ১৫৯ কৌটিল্যের বর্ণবিধি ১৬০ কৌটিল্যের রচনায় দাসের তুলনায় শূদ্রের অবস্থান ১৬২ দাস ও 'আহিতক' ১৬৩ দাসদের দাসত্বমোচন ও তাঁদের প্রতি আচরণ ১৬৪ মৌর্য সমাজ—দাস-অধিকর্তা সমাজ ১৬৭ অশোকের 'ব্যবহার-সমতা' ও 'দণ্ড-সমতা' ১৬৮ শূদ্রদের বিবাহ রীতি ও সঙ্কর বর্ণ গঠন ১৬৮ শূদ্রদের ধর্মীয় অবস্থা ১৭১ নিম্ন বর্গের সাধারণ আচরণ ১৭৩

৬. প্রাচীন ব্যবস্থার সঙ্কট ( আনু. খৃ.পূ. ২০০—আনু. ৩০০ খৃস্টাব্দ ) ১৭৫—২২১

মৌর্যোত্তর পর্বের আকর ১৭৫ বৈশ্য ও শূদ্রের নৈকট্য বিষয়ে মনুর মত ১৭৬ বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে কারু-শিল্পীরা ১৭৮ হস্তশিল্পীদের বিষয়ে প্রত্নলেখ ও সাহিত্যগত নিদর্শন ১৮১ শূদ্রদের বিরুদ্ধে মনুর আর্থিক বিধিবিধান ১৮৪ শ্রমিকদের বেতন ও জীবনযাত্রার অবস্থা ১৮৬ বিধি-বিধান ও রাষ্ট্রনীতিতে শূদ্রদের প্রতিকূল অবস্থা ১৮৯ উচ্চতর বর্ণের সদস্যদের বিরুদ্ধে শূদ্র-কৃত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি ১৯২ উত্তরাধিকার, ব্যভিচার ও সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ে শূদ্রদের বিরুদ্ধে অসম বিধান ১৯৫ মনুর রচনায় শূদ্র ও দাস ১৯৭ শূদ্র ও ব্রাহ্মণের সামাজিক যোগাযোগ বিষয়ে মনুর নিষেধাজ্ঞা ২০০ বৈশ্য ও শূদ্রদের অনুসৃত বিবাহ-রীতি ২০২ 'মনুস্মৃতি'তে সংকর বর্ণের আকস্মিক সংখ্যা বৃদ্ধি ২০৪ 'মনুস্মৃতি'তে অস্পৃশ্যরা ২০৬ বেদ অধ্যয়ন ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে শূদ্র-বর্জন বিষয়ে মনুর মত ২০৯ শূদ্রদের কয়েকটি ধর্মীয় আচার এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ২১১ সংকটকালে শূদ্রের ভূমিকা—কলিযুগের বর্ণনায় প্রতিফলিত ২১১ মনুর তীব্র শূদ্র-বিরোধী বিধান ২১৪ শূদ্রদের দাসসুলভ অবস্থান শিথিল হওয়ার লক্ষণ ২১৮

৭. কৃষিজীবিতা ও ধর্মীয় অধিকার ( আনু. ৩০০—৬০০ খৃস্টাব্দ ) ২২২—২৮৪

গুপ্ত যুগ বিষয়ক আকর ২২২ বেতনভুক্ রূপে শূদ্র ২২৫ দাস-ব্যবস্থার অশক্ততা ২২৯ শূদ্র-কৃষকের আবির্ভাব ২৩৩ শূদ্র-কৃষিজীবিতার কারণ ২৩৬ হস্তশিল্পীদের অবস্থান ২৩৮ শূদ্র বণিক ২৪২ গুপ্ত যুগের রাজনৈতিক সংগঠনে শূদ্রদের স্থান ২৪৩ বিধি ও বিচার পরিচালন-ব্যবস্থায় বর্ণভেদের ধারাবাহিকতা ২৪৬ অপরাধমূলক বিধি পরিচালনা ও সামরিক নিযুক্তিতে বর্ণভেদ হ্রাস ২৪৮ বিদ্যমান সামাজিক বর্গের বিরুদ্ধে শূদ্রদের বৈরীভাব ২৫৩ শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদার কিছু উন্নতি ২৫৫ ব্রাহ্মণদের শূদ্র খাদ্য বর্জনের অনুবৃত্তি ২৫৭ শূদ্রদের খাদ্যাভ্যাস ২৫৮ শূদ্রদের বিবাহরীতি ২৬০ বিভিন্ন সংকর বর্ণ ২৬২ অস্পৃশ্যদের অবস্থা ২৬৩ শূদ্রদের শিক্ষা ২৬৬ শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মীয় অধিকার ও অনু-ষ্ঠানাদি ২৬৮ শূদ্রদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণ বিষয়ে মধ্যযুগীয় গ্রন্থাদির মত ২৭৬ শূদ্রদের দান করার অধিকার ২৭৭ শূদ্রদের ধর্মীয় উন্নয়নে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের অবদান ২৭৯ শূদ্রদের ধর্মীয় অধিকার প্রসারের তাৎপর্য ২৮৩

৮. **পরিবর্তন ও পরম্পরা** — **২৮৫—২৯৫**

আনু. ৬০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শূদ্রদের অবস্থানের ইতিহাসে কয়েকটি মুখ্য পর্যায় ২৮৫ মূল দাসসুলভ অবস্থান ২৯০ শূদ্রদের অপেক্ষাকৃত শান্তভাবের কারণ ২৯২

পরিশিষ্ট ১

'মনুস্মৃতি'র কাল ( বিশেষত দশম অধ্যায় প্রসঙ্গে ) — ২৯৬—৩০০

পরিশিষ্ট ২

দাসবর্গীয় ও কৃষক জাতির সংখ্যা বিস্তার — ৩০১—৩১৩

গ্রন্থপঞ্জি — ৩১৫—৩৩৬

সংযোজন ও সংশোধন — ৩৩৭—৩৩৯

শব্দসূচি — ৩৪১—৩৫৫

## প্রথম অধ্যায়

# ইতিহাস রচনার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচীন ভারতের সমাজ বিন্যাস নিয়ে আধুনিক চর্চা শুরু হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেষ্টায়। বিদেশীদের প্রথা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান না থাকলে কোম্পানি তাদের শাসন করতে পারত না। প্রথম যে-সব ইংরিজি লেখায় আদি-ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তার একটি হলো 'আ কোড অফ জেণ্টু লজ' (১৭৭৬)। বইটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, "দেশের যে-সমস্ত মৌলিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিজেতাদের আইন বা স্বার্থের ঘোরতর সংঘাত হচ্ছে না, একমাত্র সেগুলি গ্রহণ করলেই ভারতে বাণিজ্যের গুরুত্ব এবং বাংলায় আঞ্চলিক দখলদারির সুযোগ-সুবিধা" বজায় রাখা যেতে পারে।[১] আধুনিক ভারতবিদ্যার জনক স্যার উইলিয়াম জোন্স্ তাঁর অনূদিত 'মনুস্মৃতি'র (১৭৯৪) ভূমিকায় লিখেছেন যে এই নীতি অনুসরণ করা হলে, "লক্ষ লক্ষ হিন্দু প্রজা"র "সুপরিচালিত শ্রমে"র দ্বারা "বৃটেনের সম্পদ প্রভূত বৃদ্ধি পাবে।"[২] চার বছর পরে এই সমস্ত তথ্য-সূত্রের ভিত্তিতে কোলব্রুক একটি প্রবন্ধ লেখেন, "ভারতীয় শ্রেণীসমূহের বিবরণ"।[৩] তাঁর মনে হয়েছিল ভারতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হলো শ্রেণী বিভাজন।[৪] এর কিছুদিন বাদেই, ১৮১৮ সালে মিল তাঁর 'ভারতের ইতিহাস'-এ জাতিভেদ প্রথার বর্ণনা প্রসঙ্গে এইসব তথ্যসূত্র ব্যবহার করেন। শূদ্র সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ নিয়ে আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বর্ণগত অধীনতার কদাচার, অন্য যে-কোনো জনগোষ্ঠীর চেয়ে, হিন্দুদের মধ্যেই আরও মারাত্মক তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়।[৫] তিনি মন্তব্য করেন যে তাঁর সময়েও হিন্দুদের ঘৃণ্য সমাজে এই প্রথা অব্যাহত ছিল। কিন্তু একই তথ্য-সূত্রের ভিত্তিতে এলফিনস্টোন (১৮৪১) সিদ্ধান্ত করেন যে শূদ্রদের অবস্থা

১. 'বিবাদার্ণবসেতু', অনুবাদকের ভূমিকা, পৃ [৯]। ১৭৭৮-এ রচনাটি ইংরিজি থেকে জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়।

২. 'ইন্‌সটিট্যুটস অফ হিন্দু ল', ভূমিকা, পৃ [১৯]। তুলনীয়ঃ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সাধারণ সভায় কোলব্রুকের আলোচনা (১৫ মার্চ, ১৮২৩), 'এসেস্', ১ম খণ্ড, পৃ ১-২।

৩. 'এসেস্', ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৭-৭০।

৪. ঐ, ২য়. পৃ ১৫৭।

৫. 'দ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ২য়, পৃ ১৬৬ ; ১ম. ১৬৬-৯ ; ১৬৯ টী.। মনে হয়, ভারত ইতিহাস প্রসঙ্গে মিল-এর সাধারণীকরণ পরবর্তী বৃটিশ ইতিহাসকারদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

ছিল "কয়েকটি প্রাচীন সাধারণতন্ত্রের দাসদের চেয়ে অনেক ভালো, এবং মধ্যযুগের কৃষিপ্রজা বা অন্যান্য যে-সব দাসসুলভ শ্রেণীর সঙ্গে আমরা পরিচিত তাদের চেয়েও বাস্তবিকই অনেক ভালো।"[৬] তিনি এও দেখেছিলেন যে ঐ ধরনের দাসসুলভ শ্রেণী তাঁর সময়ে আর ছিল না।[৭]

কিন্তু বহু প্রাচীন প্রথা নিঃসন্দেহে উনিশ শতকেও অব্যাহত ছিল। ইংল্যাণ্ডের উদীয়মান শিল্পোন্নত সমাজ এবং ভারতের প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু সমাজ[৮]—এ দু-এর সুস্পষ্ট বিরোধের দিকে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। তাঁদের মধ্যে তখন ছড়িয়ে পড়ছে জাতীয়তাবাদের ভাব। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে সতীদাহ প্রথা, যাবজ্জীবন বৈধব্য, বাল্য-বিবাহ ও সবর্ণ-বিবাহ জাতীয় উন্নতির পক্ষে বিরাট অন্তরায়। তাঁরা এও বুঝলেন, এইসব প্রথাকে যেহেতু ধর্মশাস্ত্র-অনুমোদিত বলে মনে করা হয়, তাই শাস্ত্রসম্মত বলে প্রমাণ করতে পারলে অনেক সহজেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যাবে। এইজন্যেই ১৮১৮ সালে তাঁর প্রথম সতীদাহ-বিরোধী রচনায় রামমোহন রায় দেখানোর চেষ্টা করলেন যে শাস্ত্র অনুযায়ী সতী-প্রথাই নারীর মোক্ষলাভের সর্বোত্তম পন্থা নয়।[৯] ঐ একই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য, স্মৃতিশাস্ত্র তোলপাড় করে খুঁজলেন।[১০] ১৮৭৯ সালে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ বার করলেন 'সত্যার্থপ্রকাশ' নামে মূল সংস্কৃত রচনার এক সংকলন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলঃ বিধবাবিবাহ সমর্থন, জন্মভিত্তিক বর্ণের বিরোধিতা[১১] এবং বৈদিক শিক্ষায় শূদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।[১২] আমরা অবশ্য জানি না, প্রথম যুগের সমাজ-সংস্কারকরা সমসাময়িক ব্রিটিশ পণ্ডিত মিউঅর[১৩] এবং জর্মন পণ্ডিত ভেবার-এর রচনাবলি থেকে কতটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। মিউঅর প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে, চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে কোন আদিপুরুষ থেকে—এই বিশ্বাস প্রাচীনকালে ছিল না।[১৪] আর ভেবার-ই প্রথম 'ব্রাহ্মণ' ও 'সূত্র' গ্রন্থগুলির ভিত্তিতে বর্ণব্যবস্থা বিষয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিচারমূলক নিবন্ধ রচনা করেন।[১৫]

৬. 'দ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ৩৪। ৭. ঐ, ১০৭।

৮. এক প্রধান ভারতীয় লেখক ১৯০২-এ খেদোক্তি করেন যে ইঙ্গ ভারতীয় বণিকদের নীচে ব্রাহ্মণদের স্থান নির্ধারণে বাধ্য করা হয়। জে সি. ঘোষ, 'ব্রাহ্মণিজম অ্যাণ্ড শূদ্র', পৃ ৪৬।

৯. 'দ ইংলিশ ওয়ার্কস্ অফ রামমোহন রায়', ১ম, ভূমিকা, পৃ [১৮]; ২য়, পৃ ১২৩-১৯২।

১০. আর. জি. ভাণ্ডারকর, 'কলেক্টেড ওয়ার্কস্', ২য়, পৃ ৪৯৮।

১১. 'সত্যার্থপ্রকাশ', ৪র্থ সমুল্লাস, পৃ ৮৩-৯২, ১১৩-১২২।

১২. ঐ, ৩য় সমুল্লাস, পৃ ৩৯, ৭৩-৭৪। ১৩. 'অরিজিনাল স্যানস্ক্রিট টেক্সটস', ১ম।

১৪. ঐ, পৃ ১৫৯-৬০।

১৫. 'ইন্ডিশে স্টুডিয়েন', ১০ম, পৃ ১-১৬০।

১৮৯১-এ 'সহবাস আইন' প্রবর্তন উপলক্ষে সংস্কৃত রচনাদি থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়ে সুসংকলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। তিনি এই মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্তা হলে তবেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া উচিত। অন্যদিকে বাল গঙ্গাধর টিলক মনে করতেন বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যে-কোন অস্ত্রই ব্যবহার করা চলে। এই বিলের বিরোধিতা করার জন্য তিনি শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেন।[১৬]

আধুনিক সংস্কারের সপক্ষে প্রাচীন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার এই প্রবণতাকে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর-এর কথায় ( ১৮৯৫ ) সংক্ষেপে এই-ভাবে উপস্থিত করা যায়ঃ "প্রাচীনকালে বয়ঃপ্রাপ্তা হলে তবেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো, এখন তাদের আগে বিয়ে দিতেই হবে। তখন বিধবা-বিবাহের প্রচলন ছিল, এখন তা একেবারেই উঠে গেছে। বিভিন্ন বর্ণের লোকের একত্র আহারে বাধাও ছিল না, এখন অসংখ্য জাত-পাত···সেই ধরনের পারস্পরিক যোগ রাখতে পারে না"।[১৭]

ভারতীয় পণ্ডিতরা, তাঁদের প্রাচীন সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক মনের কাছে আরও গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থিত করার যে-চেষ্টা করছিলেন, তা কিন্তু সবসময় পাশ্চাত্য লেখকদের সমর্থন পায়নি। যেমন সেনার্ট ( ১৮৯৬ ) দেখিয়েছিলেনঃ ইওরোপীয়দের মধ্যে যে সামাজিক পার্থক্য আছে তার সঙ্গে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার তুলনা করেন ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা ; কিন্তু পশ্চিমের সামাজিক শ্রেণীগুলোর সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুবই কম।[১৮] একইভাবে হপকিন্স (১৮৮১) দেখান যে শূদ্রদের অবস্থা ১৮৬০-এর আগে মার্কিন গৃহদাসদের চেয়ে আলাদা কিছু ছিল না।[১৯] হপকিন্স-এর এই সাধারণীকৃত মন্তব্যের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে হিল্লেব্রাণ্ট ( ১৮৯৬ ) বলেন যে প্রাচীন জগতের দাসদের অবস্থার সঙ্গেই শূদ্রদের তুলনা করা উচিত, পরবর্তী বিকাশের প্রসঙ্গে নয়।[২০]

হপকিন্স-এর সমালোচনা করে কেতকর ( ১৯১১ ) অভিযোগ করেন যে, ইওরোপীয় লেখকরা নিগ্রোদের প্রতি তাঁদের জাতিবৈষম্যমূলক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত, তাই জাতিভেদ প্রথা সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁরা ব্যাপারটিকে অযথা বাড়িয়ে দেখেছেন।[২১] কেতকর, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ঘুরে প্রমুখ

১৬. আর. জি. ভাণ্ডারকর, 'কলেক্টেড ওয়র্কস', ২য়, পৃ ৫৩৮-৮৩। আরও দ্রষ্টব্য, 'হিস্ট্রি অফ চাইল্ড ম্যারেজ'—জলির এই প্রবন্ধের ভাণ্ডারকরের সমালোচনা, ঐ, ৫৮৪-৬০২।

১৭. 'কলেক্টেড ওয়র্কস', ২য়, পৃ ৫২২-২৩।

১৮. 'কাস্ট ইন ইণ্ডিয়া', পৃ ১২-১৩।

১৯. 'মিউচুয়াল রিলেশন্স অফ দ ফোর কাস্টস্ ইন মনু', পৃ ১০২।

২০. হিল্লেব্রাণ্ট, 'ব্রাহ্মণেন উণ্ড শূদ্রস্', 'ফেট্স্‌খ্রিফট্ ফ্যুর কার্ল ভাইনহোল্ড', পৃ ৫৭।

২১. কেতকর, 'হিস্ট্রি অফ কাস্ট', পৃ ৭৮, টী. ৩।

সাম্প্রতিক লেখকদের রচনায় প্রধান প্রবণতাই হলো জাতিভেদপ্রথাকে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রথাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নিতে সাহায্য পাওয়া যায়।[২২] এর থেকে তাই মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সমস্যাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা হচ্ছিল অনেকটাই সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীলদের সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে। সমাজ-সংস্কার ও জাতীয়তাবাদের মুখ্য অনুপ্রাণনায় প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবন সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বহু মূল্যবান লেখাপত্র তৈরি হয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার মানদণ্ডে যে-সব ব্যাপারকে অশোভন বা কুৎসিত বলে মনে হয়, সেগুলোকে উপেক্ষা করা হয়েছে, নয়তো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। যেমন, তাঁরা এই যুক্তিও দিয়েছেন—অস্পৃশ্যতার দরুন শূদ্রদের সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের কোন হানি হতো না।[২৩]

শুধু আদিপর্বের সমাজ-জীবনের সুবিধাজনক দিকগুলোতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার এই প্রবণতার ফলেই প্রাচীন ভারতে শূদ্রদের অবস্থা নিয়ে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। এমনকি ইওরোপীয় লেখকরাও মূলত হিন্দু সমাজের উচ্চতর শ্রেণীগুলো নিয়ে আলোচনাতেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। মিউঅর তাই ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের সংগ্রাম সংক্রান্ত কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন ১৮৮ পাতা ধরে,[২৪] আর হপকিন্স (১৮৮৯) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন "প্রাচীন ভারতে রাজন্যবর্গের অবস্থা।"[২৫] উত্তর-পূর্ব ভারতের সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে ফিক (১৮৯৭)-এর প্রশংসনীয় কাজটিও মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং গহপতি (গৃহপতি) বা সেট্‌ঠি (শ্রেষ্ঠী)-দের নিয়ে আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ। এই লেখকদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাঁদের যুগের মুখ্য শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি—একথা ধরে না নিলে নিম্নবর্গের মানুষদের ভাগ্য সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহের অভাব ব্যাখ্যা করা কঠিন।

শুধু শূদ্রদের নিয়ে প্রথম লেখেন বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৯২২)। একটি ছোট নিবন্ধে শূদ্র শব্দটির দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেন।[২৬] এই বিষয় নিয়ে লেখা আরেকটি প্রবন্ধে (১৯২৩) তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন যে শূদ্ররাও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অধিকারী ছিলেন।[২৭] ১৯৪৭-এ প্রকাশিত

২২. কেতকর, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ৯; বলকলকরের 'হিন্দু সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন'-এ রাধাকৃষ্ণন-এর ভূমিকা। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ঘুরের রচনা অনেক বেশি ইতিহাস-বোধ সম্মত, কিন্তু দত্ত, পূর্বোক্ত সূত্র, 'প্রস্তাবনা', পৃ [৬] দ্র.।

২৩. 'শুক্রনীতিসার'-এর ভিত্তিতে, বিনয়কুমার সরকার, 'হিন্দু সোসিওলজি', পৃ ৯২-৯৫; তুলনীয়ঃ কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'ইণ্ডিয়ান কামেরালিজ্‌ম্‌', পৃ ৮৫।

২৪. 'অরিজিনাল স্যানস্ক্রিট টেক্সট্‌স', ১ম, অধ্যায় ৪।

২৫. 'জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি', খণ্ড ১৩, পৃ ৫৭-৩৭৬।

২৬. 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকুয়ারি', খণ্ড ৫১, পৃ ১৩৭-১৩৯।

২৭. "দ স্ট্যাটাস অফ দ শূদ্রস্‌ ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া", 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি', খণ্ড ১, পৃ ২৬৮-২৭৮।

একটি গবেষণাপত্রে ধর্মশাস্ত্রে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।[২৮] রুশ লেখক জি. এফ. ইলিন এই বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন ১৯৫০-এ।[২৯] ধর্মশাস্ত্রের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে[৩০] তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন যে শূদ্ররা দাস ছিলেন না। শূদ্রদের বিষয়ে একমাত্র পুস্তিকাটি বার করেন সুপরিচিত এক ভারতীয় রাজনীতিবিদ্ (১৯৪৬)।[৩১] এই পুস্তিকায় তিনি কেবল শূদ্রদের উৎপত্তির প্রশ্নটিই আলোচনা করেছেন। তথ্যসূত্র হিসেবে লেখক নির্ভর করেছেন শুধুমাত্র অনুবাদের ওপর[৩২]; আর তার চেয়েও খারাপ হলো, তিনি লিখেছেন একটা স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে। তা হলো ঃ শূদ্রদের উচ্চ কুলজাত প্রমাণ করা। সাম্প্রতিককালে নিম্নবর্ণের বহু শিক্ষিত লোকের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা গেছে। 'মহাভারতে' শান্তিপর্বের একটি অংশে আছে যে শূদ্র পৈজবন যজ্ঞ করেছিলেন। শূদ্ররা যে আসলে ক্ষত্রিয় ছিলেন—এই তত্ত্ব প্রমাণের জন্য [শান্তিপর্বের] এই উল্লেখই যথেষ্ট।[৩৩] যে-সব বিভিন্ন ঘটনার সমবায়ে শূদ্র নামে শ্রমজীবী শ্রেণীটি গড়ে উঠল, তা নিয়ে লেখক বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাননি। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে[৩৪] (১৯৫৭) প্রাচীন ভারতের শ্রমজীবীদের সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত তথ্য জড়ো করা হয়েছে, কিন্তু তাতে আমাদের জানার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু যোগ হয় না। বইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের শ্রম-অর্থ-নীতির ক্ষেত্রটি বিশদভাবে সন্ধান করা। তা করতে গিয়ে তিনি বর্তমান-কালের মতো তখনকার দিনেও বেতন-বোর্ড, সালিশ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছেন। ফলে বইটি অতিমাত্রায় আধুনিকতা-দুষ্ট। তা ছাড়া, মূলত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'র ভিত্তিতে লেখা এই বইটি অগভীর এবং ইতিহাস-চেতনারও অভাব আছে।

২৮. 'ইণ্ডিয়ান কালচার', খণ্ড ১৪, পৃ ২১-২৭।

২৯. 'শূদ্রস্ উণ্ড স্ক্লাফেন ইন্ ডেন আল্টইন্‌ডিশেন্ গেসেৎসবুশেন'', 'সোভিয়েৎ ভিসেন্‌শাফট'-এর খণ্ড ২, ১৯৫২-র। রচনাটি 'ভেৎস্‌নিক্ দ্রেভনেই ইস্তরি'-র খণ্ড ২, ১৯৫০, পৃ ৯৪-১০৭ থেকে অনূদিত।

৩০. শূদ্রদের অবস্থা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে-র ধর্মশাস্ত্রর অংশবিশেষের সঙ্কলন মূল্যবান আকর-সূত্রের কাজ করে। চিত্রা তিবারীর 'শূদ্রস ইন মনু' (১৯৬৩) কোন বোধ বৃদ্ধি করে না।

৩১. আম্বেডকর, 'হু ওয়্যার দি শূদ্রস ?'

৩২. ঐ প্রস্তাবনা, পৃ [৪]।

৩৩ লক্ষ করার যে, সাম্প্রতিক জাতপাতের আন্দোলনে শূদ্ররা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন। ফলস্বরূপ, দুসাধ ও গোয়ালারা যথাক্রমে দুঃশাসন এবং যদুর উত্তরপুরুষ হিসেবে দাবি করছেন।

৩৪. কে. এম. শরণ, 'লেবার ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া'।

শুধু প্রাচীন ভারতে শূদ্রদের স্থান সম্পর্কে আলোচনা করাই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য নয়। আধুনিককালে অপ্রচুর তথ্যের ভিত্তিতে অথবা সংস্কারপন্থী বা সংস্কারবিরোধী উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে শূদ্রদের যে-সব চরিত্রলক্ষণ দেখানো হয়েছে তার মূল্যায়ন করাও এর উদ্দেশ্য। আনুমানিক ৬০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শূদ্রদের অবস্থার বিভিন্ন বিকাশধারার এক সুসংবদ্ধ ও সুসংহত বিবরণ দেবার চেষ্টাই আমরা করব।

শূদ্রদের মনে করা হতো শ্রমজীবী শ্রেণী। তাই এই লেখায় তাঁদের বাস্তব অবস্থা আর উচ্চবর্ণের লোকদের সঙ্গে তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলো অনুসন্ধানের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই দাসদের অবস্থার আলোচনাও এই প্রসঙ্গে এসে গেছে, কারণ, দাস ও শূদ্র— এঁদের অভিন্ন বলেই ধরা হতো। তত্ত্বগতভাবে অস্পৃশ্যদেরও শূদ্র পর্যায়ে রাখা হয়, তাই তাঁদের উৎপত্তি ও অবস্থাও কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজের তাই নিম্নতম বর্গের অবস্থা অনুধাবন করতে গেলে কয়েকটি প্রশ্ন উঠবেই। শূদ্র সম্প্রদায় গড়ে উঠল কী করে? শুধু উচ্চতর তিনটি বর্গের সেবা করাই যদি শূদ্রদের কাজ হয়, তাহলে তাঁদের কি দাসের পর্যায়ে ফেলা যায়? প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কি দাস-সমাজ ছিল? শূদ্রদের আচার-অবস্থান কি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে মেলে? বিভিন্ন সংস্কারপন্থী ধর্ম-সম্প্রদায় কি নিম্নবর্গের অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন এনেছিল, নাকি তারা সেইসব পরিবর্তনই গ্রহণ ও স্থায়ী করার চেষ্টা করছিল যেগুলো আসলে অন্যান্য কারণের ফল? অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিম্নবর্গের শতাব্দীব্যাপী ভূমিকার কি কোন পরিবর্তন হয়েছিল? দ্বিজ বৈশ্যরা কিভাবে শূদ্রের পর্যায়ে নেমে এলেন, আর শূদ্রদেরই বা কেন রাখা হলো বৈশ্যদের সঙ্গে এক পর্যায়ে? আমাদের আলোচ্য পর্বের শেষদিকে দাসবর্গ এত ছড়িয়ে পড়েছিল কেন? শূদ্রদের ক্ষেত্রে এই দাসত্ব ও বাধা-নিষেধের কি প্রতিক্রিয়া হতো? প্রাচীন ভারতে সামাজিক বিদ্রোহ তুলনায় কম কেন? এইসব এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আমরা এখানে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

মূলত লিখিত সূত্রের ভিত্তিতে বর্তমান আলোচনা করা হচ্ছে। এইসব সূত্র বা তার অংশবিশেষের সঠিক কালনির্ণয় এক দুরূহ সমস্যা। সাধারণ-ভাবে গৃহীত সাল-তারিখই মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মতপার্থক্য আছে এমন ক্ষেত্রে প্রথাবিরুদ্ধ কালগ্রহণের পক্ষে আমরা নিজস্ব যুক্তি নির্দেশ করেছি।

রচনাগুলো বিভিন্ন আমলের হলেও একই বাঁধাগৎ ও পরিভাষা এত বিরক্তিকরভাবে এগুলোয় পুনরুক্ত হয়েছে যে তার থেকে কোন সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই পাঠভেদের আলোচনার দিকেও

বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেক লেখা টীকা ছাড়া বোঝা যায় না। কিন্তু টীকাকাররা আবার প্রায়শ-ই তাদের আমলের ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন আগের যুগে।

তাছাড়াও, ব্রাহ্মণ্য ও অ-ব্রাহ্মণ্য—দু জাতীয় সাহিত্যেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা উভয়েরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু শূদ্রদের প্রতি প্রায় কোন সহানুভূতিই দেখানো হয়নি। বলা হয়েছে যে ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য সন্দর্ভ আসলে শূদ্রদের শত্রুদের লেখা আর তাই এগুলোর কোনো প্রামাণিক মূল্য নেই।[৩৫] কিন্তু অন্যান্য প্রাচীন সমাজের আইন-গ্রন্থেও ধর্মশাস্ত্রের মতোই শ্রেণী-ভিত্তিক আইন-প্রণয়নের নীতিই মেনে চলা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে আমরা খুব নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না, ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধান কতটা মেনে চলা হতো।

প্রাচীন রচনা যে-সব অজস্র অতিকথা আর আচার-অনুষ্ঠানে ভরা সেগুলোও সামাজিক ইতিহাস পুনর্নির্মাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। ইদানীং কিছু সমাজতাত্ত্বিকের প্রভাবে জনাকয় পশ্চিমী সংস্কৃতিবিদ্ এই পদ্ধতির যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। আচারগুলোর ওপর তাঁরা হরেক-রকম প্রতীকী অর্থ চাপিয়ে দেন এবং অনেক ক'টি-কেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন। উর্বরতা সংক্রান্ত আচারগুলো আমরা কখনই উপেক্ষা করতে পারি না, কিন্তু এও লক্ষ করতে হবে যে এগুলো গাছপালা, পশু এবং মানুষের জন্মবৃদ্ধির গুরুত্বকেই বিশেষ করে চিহ্নিত করে। দৈনন্দিন জীবনে এইসব আচার-অনুষ্ঠান থেকে দেখা যায়, এগুলো এসেছে বাস্তব থেকে আর বাস্তব জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন হয়। সামাজিক ঐতিহাসিকরা তাই আচার-এর চর্চা বাদ দিতে পারেন না। অতিকথার মধ্যে বাস্তবের কিছু খণ্ড-উপাদান আছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কোন সামাজিক চাহিদার ফলেই মহাভারতের মূল ৮,৮০০ শ্লোক প্রথমে বাড়িয়ে ২৪,০০০ করা হয়েছিল, শেষ অবধি তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১০০০,০০০ শ্লোকে।

বস্তুগত জীবনের বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক শ্রেণীগুলোর ইতিহাস আলোচনা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য কালপরম্পরায় বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তন নির্দেশ করা হয়েছে পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নলেখের ভিত্তিতে। স্থিত কৃষকজীবন, বর্ধিষ্ণু ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূমিদান—বিভিন্ন স্তরে সামাজিক গড়নের ওপর এইসবের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে এবং বৃত্তিগত ও অঞ্চলগত গতিশীলতার ক্ষেত্রে তার নিহিতার্থও আলোচনা করা হয়েছে।

শূদ্রদের অবস্থানের কয়েক ধরনের বিকাশ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তের জন্য, সম্ভাব্য জায়গায়, অন্যান্য প্রাচীন সমাজ ও আদিম মানবগোষ্ঠীর (নৃতত্ত্বে-যাদের কথা জানা গেছে) মধ্যে অনুরূপ বিকাশের তুলনা করা হয়েছে।

৩৫. আম্বেডকর, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ১১৪।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## উৎপত্তি

১৮৪৭ সালে রোট্ আভাস দেন যে সম্ভবত শূদ্রেরা ছিলেন আর্যসমাজের চতুঃসীমার বাইরে।[১] সেই থেকেই ধরে নেওয়া হয়, ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই চতুর্থ বর্ণটি মূলত সেই অনার্য জনগোষ্ঠী নিয়েই তৈরি যাঁদের আর্য বিজেতারা ঐ অবস্থায় নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।[২] শ্বেতকায় ইওরোপীয়দের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার অশ্বেতকায় জনগোষ্ঠীর সংঘাতের সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকায় এই দৃষ্টিভঙ্গি এখনও সমর্থন পেয়ে চলেছে।

ঐ ধরনের অনুমানে বিজয়ী আর্যদের আর্যজাতি বলে ধরে নেওয়া হয়, অনার্যদের দাস বা দস্যুজাতি বলে। কিন্তু এইচ. ডবলু. বেইলি দেখিয়েছেন যে 'ঋগ্বেদে'র যে-সব জায়গায় 'আর্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো থেকে একই রকমের জাতিগত তাৎপর্য বার করা যায় না। ব্যুৎপত্তিগতভাবে অবশ্য শব্দটি 'অর্' এই ধাতু-নিষ্পন্ন হতে পারে, যার অর্থ 'পাওয়া'।[৩] ইরাণীয় উল্লেখে 'আর্য' শব্দটির অর্থ অধিকৃৎ বা অভিজাত;[৪] আর বৈদিক রচনায় এর থেকেই সম্প্রসারিত 'আর্য' শব্দটির অন্য কোন অর্থ নেই।[৫] বেদোত্তর সংস্কৃত এবং বৌদ্ধ ও জৈন রচনাতেও শব্দটি যে অভিজাত বা সভ্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।[৬] " 'আর্য' এক কবি-দল, আর এটি অবশ্যই প্রশংসাসূচক অভিধা।"[৭] এইসব থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, সূক্তগুলোতে যে সব ঋগ্বেদীয় মানবগোষ্ঠী বা দেবতাদের 'আর্য' বলে মহিমান্বিত করা হয়েছে তাঁদের প্রচুর সম্পদ ছিল, অথবা তাঁরা অভিজাত, বা দুই-ই। কিন্তু তাঁদের ধনসম্পদ খুব বেশি ছিল তা বলা যায় না। প্রধানত এক পশুপালক সমাজে যে-সব বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি থাকে তা বেশি মাত্রায়

১. 'ৎসাইটশ্রিফ্ট্ ডোর ডায়েটশেন মোর্গেনলান্ডিশেন গেসেলশাফ্ট্', ১ম, পৃ ৮৪।

২ 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ২৬৫, ৩৮৮; রমেশচন্দ্র দত্ত, 'আ হিস্ট্রি অফ সিভিলিজেশন্ ইন্ এনশেন্ট ইন্ডিয়া', ১ম, পৃ ২; সেনার্ট, 'কাস্ট ইন্ ইন্ডিয়া', পৃ ৮৩; এন. কে. দত্ত, 'অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অফ কাস্ট ইন ইন্ডিয়া', পৃ ১৫১-৫২; ঘুরে, 'কাস্ট অ্যান্ড ক্লাস', পৃ ১৫১-৫২; ডি. আর. ভান্ডারকর, 'সাম আসপেক্টস্ অফ এনশেন্ট ইন্ডিয়ান কালচার', পৃ ১০।

৩. এইচ. ডবলু. বেইলি, "ইরানীয়ান আর্য অ্যান্ড দহ-", 'ট্রানজাক্শন্স অফ দ ফিলোলজিক্যাল সোসাইটি', ১৯৫৯, পৃ ৭১-৮৩।

৪. যে সমস্ত অর্থ খাপ খেয়ে যায় এমন প্রাসঙ্গিক অংশগুলো উদ্ধৃত হয়েছে পূর্বোক্ত সূত্রের পৃ ৭০-৯৪-তে।

৫. ঐ, পৃ ১০৩-১০৪। ৬. ঐ, পৃ ১০২-১০৩। ৭. ঐ, পৃ ১০২।

সঞ্চয় করা যায় না।[৮] তাই ঋগ্‌বেদীয় সমাজ শ্রমের সামাজিক বিভাজনের উপর সংগঠিত হয়নি, সম্পত্তির ভেদাভেদের উপরেও নয়। এই সমাজ গঠিত হয়েছিল মূলত জ্ঞাতি, গোষ্ঠী, কুল ইত্যাদির ভিত্তিতে। জ্ঞাতি-ভিত্তিক একক বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত নানা শব্দ প্রায়ই পাওয়া যায়। 'জন' ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ২৭৫ বার, আর 'বিশ্' প্রায় ১৭০ বার। একইভাবে 'গণ' এবং 'ব্রাত' শব্দদুটিও প্রায়ই আসে। এইসব একক, মনে হয়, বেশ বড়ই ছিল। কারণ 'কুল' শব্দটি 'ঋগ্‌বেদে' ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র একবারই, তাও 'কুলপা' শব্দের অংশ হিসেবে। 'কুল' মানে প্রথমে ছিল পরিবার, পরে অভিজাত পরিবার। 'গৃহ' শব্দটিকে অবশ্য পরিবার অর্থে নেওয়া যেতে পারে। শব্দটি 'ঋগ্‌বেদে' বহু উল্লিখিত, যদিও তা ১০০-র কম, অর্থাৎ 'জন' বা 'বিশ্' শব্দের চেয়ে এটির ব্যবহার হয়েছে কম। 'ঋগ্‌বেদে' যে-'আর্য' জনগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে তাঁরা হয়তো একই নৃকুল-ভুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা একত্র ছিলেন একই সাধারণ ভাষা ও একই ধরনের জীবনযাত্রার বন্ধনে। আমাদের ব্যবহৃত 'আর্য' শব্দটি এই অর্থেও বোঝা যায়।

যদিও যুক্তি দেখানো হয় যে দাস আর দস্যুরাও জাতিগতভাবে অনার্য ছিলেন না,[৯] আমাদের মতে কিন্তু দাসদের ক্ষেত্রেই একথা অনেক বেশি সত্য। পরে দেখানো হবে যে দস্যুদের ভিন্নভাষী হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে আর তাঁদের জীবনযাত্রার ধরনও ছিল আলাদা। দাসদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম ছিল না। উপরন্তু, দাসরা সংগঠিত ছিলেন 'বিশ্' নামের এক জনগোষ্ঠীতে। বৈদিক মানবগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীর জন্যেও একই নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে দেখলে আর্য এবং দাসদের মধ্যেকার লড়াইকে মনে হবে মোটামুটিভাবে একই ধরনের জীবনযাপনকারী বৈদিক জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ সংঘাত। 'ঋগ্‌বেদে'র বহু সূক্ত 'অথর্ববেদে' পুনরাবৃত্ত হয়েছে। সেগুলো থেকে মনে হয়, আর্য দেবতা ইন্দ্র দাসদের জয় করেছিলেন, আর এই দাসদের বহুলাংশে মানুষ বলেই মনে হয়। বলা হয়েছে ইন্দ্র এই নীচ দাস বর্ণকে গুহায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[১০] পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক হিসেবে দাসদের বশ মানানোর দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন,[১১] আর দাসদের ধ্বংস করার জন্য তাঁকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।[১২] 'ঋগ্‌বেদে' ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনায় দাস 'বিশ্'গুলোকে পরাস্ত করার জন্য বারবার তাঁকে

৮. রামশরণ শর্মা, "ফর্মস্ অফ প্রপার্টি ইন দি আর্লি পোর্শন্স্ অফ দ ঋগ্‌বেদ", 'এসেস্ ইন্ অনার অফ প্রফেসর এস. সি সরকার', পৃ ৩৯-৫০।

৯. মিউঅর, 'অরিজিনাল স্যান্সক্রিট টেক্সট্স', ২য়, পৃ ৩৮৭।

১০ 'যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি, যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ', ঋগ্‌বেদ ২।১২।৪, অথর্ববেদ, ২০।৩৪।৪। ১১ '...যথাবশং নয়তি দাসমার্যঃ', ঋগ্‌বেদ ৫।৩৪।৬।

১২. '...দাসবেশায় চাবঃ', ঋগ্ ২।১৩।৮। সায়ণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন দাসদের ধ্বংস অর্থে, কিন্তু 'বৈদিক ইনডেক্স', ১ম, পৃ ৩৫৮-তে জনৈক দাসের নাম হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

অনুরোধ করা হয়েছে।[১৩] ইন্দ্রকেও উপস্থাপিত করা হয়েছে এমনভাবে যেন তিনি দস্যুদের সমস্ত গুণ কেড়ে নিয়েছেন, আর দাসদের বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন।[১৪]

দাসদের চেয়ে দস্যুদেরই ইন্দ্র বেশি ধ্বংস করেছেন ও বশ্যতা-স্বীকার করিয়েছেন—এমন উল্লেখের সংখ্যাই বেশি। বলা হয়েছে যে দস্যুদের হত্যা করে তিনি আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছিলেন।[১৫] তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, তিনি যেন আর্যদের শক্তি বাড়ানোর জন্য দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।[১৬] এও গুরুত্বপূর্ণ যে দস্যুদের হত্যার অন্তত বারোটি উল্লেখ আছে, যার অধিকাংশই ইন্দ্রের কীর্তি।[১৭] অন্যদিকে দু-চারজন দাস-হত্যার উল্লেখ থাকলেও, 'দাসহত্যা' শব্দটি কোথাও নেই। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এ-দুটি একই ব্যাপার ছিল না। আর মনে হয়, দস্যুদের ক্ষেত্রে আর্যরা নির্মমভাবে বিলুপ্ত করে দেওয়ার নীতি মেনে চলতেন, কিন্তু দাসদের ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণ ছিল অনেকটা সংযত।

বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আর্যরা প্রধানত তাঁদের দুর্গ আর পাঁচিল-ঘেরা বসতি ভেঙে দিতেন। লড়াই-এর চেহারাই ছিল এরকম। দাস ও দস্যু উভয়েরই ছিল অসংখ্য 'পুর'[১৮] যেগুলো আবার সাধারণভাবে আর্য-শত্রুদের সঙ্গে যুক্ত।[১৯] স্বভাবতই আমাদের মনে আসে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত পাঁচিল-ঘেরা হরপ্পা-জনবসতির কথা।[২০] অবশ্য হরপ্পাবাসীদের সঙ্গে আর্যদের ব্যাপক গণ-সংঘর্ষের কোন পরিষ্কার পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মনে হয়, আর্যদের শত্রুরা তাঁদের স্থায়ী

১৩. ঋগ্‌ ২।১১।৪ ; ৬।২৫।২ এবং ১০।১৪৮।২। ১৪. ঋগ্‌ ৪।২৮।৪।

১৫. '...হত্বীদস্যূন্‌প্রার্যং বর্ণমাবৎ', ঋগ্‌ ৩।৩৪।৯ ; অথর্ব ২০।১১।৯ ('পৈপল্লাদ সংহিতায় নেই)। ১৬. ১।১০৩।৩ ; অথর্ব ২০।২০।৪।

১৭. 'দস্যু হত্যা' শব্দটি 'ঋগ্‌বেদে'র ১।৫১।৫-৬, ১০৩।৪ ; ১০।৯৫।৭, ৯৯।৭ ; 'দস্যুঘ্ন ৪।১৬।১০ এবং 'দস্যুহন্‌' ১০।৪৭।৪ ; 'দস্যুহন্তম ৬।১৬।১৫, ৮।৩৯।৮-এ এসেছে এবং 'বাজসনেয়ি সংহিতা'য় ১০।৩৪-এ পুনরুল্লিখিত। আর্য ও দস্যুদের শত্রুতা নিয়ে আরও অনেক তথ্য আছে, যেমন, ঋগ্‌ ৫।৭।১০, ৭।৫।৬ ইত্যাদিতে। ঋগ্‌ ১।১০০।১২ ; ৩।৪৫।২৪ ; ৮।৭৬।১১ ও ৭৭।৩-এ ইন্দ্রকে বলা হয়েছে 'দস্যু-হা'। ইন্দ্রের দস্যু নিধন প্রসঙ্গে একই তথ্য আছেঃ অথর্ব ৩।১০।১২ ; ৮।৮।৫ ও ৮।৮।৭ ; ৯।২।১৭ ও ১৮, ১০।৩।১১ ; ১৯।৪৬।২ ; ২০।১১।৬, ২১।৪, ২৯।৪, ৩৪।১০, ৩৭।৪, ৪২।২, ৬৪।৩ এবং অগ্নির প্রসঙ্গে অথর্ব ১।৭।১, ১১।১২। অথর্ববেদ ৪।৩২।৩-এ মন্যুকে বলা হয়েছে 'দস্যু-হা'।

১৮. ঋগ্‌ ১।১০৩।৩ ; ২।১৯।৬ ; ৪।৩০।২০ ; ৬।২০।১০, ৩১।৪।

১৯. ঐ, ১।৩৩।১৩, ৫৩।৮ ; ৮।১৭।১৪।

২০ হুইলার, 'দা ইন্ডাস্‌ সিভিলিজেশন', পৃ ৯০-৯১।

বসতিতে ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, আর যাযাবর আর্যরা সেই সম্পত্তি-লোলুপ হয়ে ওঠায় তার অধিকারস্বত্ব নিয়ে উভয়ের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়।[২১] অর্চনাকারীরা আশা করতেন, যাঁরা যাগযজ্ঞ করেন না তাঁদের মেরে ফেলা হবে আর তাঁদের ধন-সম্পদ সবাইকে বিলিয়ে দেওয়া হবে।[২২] দস্যুদের ধনী ( 'ধনিনঃ' ) কিন্তু যজ্ঞহীন বলা হয়েছে।[২৩] দুজন দাস-অধিপতির উল্লেখ আছে যাঁদের বলা হয়েছে ধনার্থী।[২৪] বাসনা প্রকাশ করা হয়েছে যে ইন্দ্রকে দিয়ে[২৫] যেন দাসদের শক্তি খর্ব করা হয় ও তাদের সঞ্চিত ধন লোকেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। দস্যুদেরও ছিল মণিমুক্তো ও সোনা, সেগুলোই বোধহয় আর্যদের লোভ জাগিয়ে তুলত।[২৬] কিন্তু আর্যদের মতো পশুপালক-সংস্কৃতির মানবগোষ্ঠীর কাছে শত্রুদের গবাদি পশুই ছিল সবচেয়ে লোভনীয়। তাই যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে কীকটদের ( সম্ভবত হরিয়ানাবাসী ) গরু রাখার কোন অধিকার নেই, কারণ তাঁরা যজ্ঞে দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যবহার করেন না।[২৭] অন্যদিকে আর্যদের ঘোড়া আর রথকে তাঁদের শত্রুরাও খুব মূল্যবান বলে গণ্য করতেন মনে হয়। একটি ঋগ্বেদীয় আখ্যানে বলা হয়েছে যে অসুরেরা দধীতি নামে এক রাজর্ষির নগর অধিকার করেন। কিন্তু তাঁদের ফেরার পথে ইন্দ্র এসে পড়ে তাঁদের পরাস্ত করেন ও যাবতীয় গরু-ঘোড়া-রথ পুনরুদ্ধার করে রাজাকে ফিরিয়ে দেন।[২৮]

দস্যুদের জীবনযাত্রার ধরনও আর্যদের আরও বিরূপ করে তুলেছিল। আর্যদের জীবনযাত্রার ধরন ছিল গোষ্ঠীগত, তাঁরা ঠিক স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না। তাঁদের জীবন-যাপনের ভিত্তি ছিল গো-পালন। এর সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির মানবগোষ্ঠীর স্থায়ী ও নাগরিক জীবন একেবারেই খাপ খেত না।[২৯] আর্যদের মূলত গোষ্ঠীগত জীবনের প্রকাশ দেখা যায় নানান সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যেমন 'গণ', 'সভা', 'সমিতি' ইত্যাদিতে এবং 'বিদথ'-য়—যাতে যজ্ঞের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু যজ্ঞের সঙ্গে 'দস্যু'দের কোন সম্পর্কই ছিল না। একথা অবশ্য দাসদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, কারণ ইন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দাস ও আর্যদের মধ্যে পার্থক্য করেই যজ্ঞস্থলে আসেন।[৩০] 'ঋগ্বেদে'র সপ্তম মণ্ডলের একটি সম্পূর্ণ সূক্তে দস্যুদের

২১. ঋগ্ ৪।৩০।১৩ ; ৫।৪০।৬, ১০।৬৯।৬।
২২. 'অস্মভ্যমস্য বেদনং দদ্ধি সূরিশ্চিদো হতে'। ঋগ্ ১।১৭৬।৪।
২৩. ঋগ্, ১।৩৩।৪।
২৪. 'অহনদাসা বৃষভো বস্নয়ন্তোদব্রজে বর্চিনং শম্বরং চ'। ঋগ্ ৬।৪৭।২১।
২৫. 'বয়ং তদস্য সংভৃতং বসু-ইন্দ্রেণ বিভজেমহি'। ঋগ্ ৮।৪০।৬।
২৬. ঋগ্ ১।৩৩।৭-৮।
২৭. কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ঘর্মম্'। ঋগ্ ৩।৫৩।১৪।
২৮. ঋগ্ ২।১৫।৪। ২৯. হুইলার, 'দা ইনডাস সিভিলেজেশন', পৃ ৯০-৯১।
৩০. ঋগ্ ১০।৮৬।১৯ ; অথর্ব ২০।১২৬।১৯।

সম্পর্ক 'অক্রতু‌ন', 'অশ্রদ্ধান্', 'অযজ্ঞান্' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে দস্যুদের অ-যজ্ঞীয় চরিত্রই প্রকট হয়।[৩১] যজ্ঞকারী 'আর্য' ও অ-যজ্ঞকারী দস্যুদের মধ্যে ইন্দ্রকে পার্থক্য করতে বলা হয়েছে।[৩২] দস্যুদেরও বলা হয়েছে 'অযজ্বানঃ'।[৩৩] 'অনিন্দ্র' (ইন্দ্রহীন) শব্দটিও বেশ কয়েক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৪] মনে হয় শব্দটি দিয়ে দাস, দস্যু এবং সম্ভবত কিছু ভিন্নমতের আর্যদের উল্লেখ করা হয়েছে। আর্যদের চোখে দস্যুরা ছিলেন মায়াবান্, অর্থাৎ অশুভ জাদুর চর্চাকারী।[৩৫] বিশেষত 'অথর্ববেদে' ঐ ধরনের বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। দস্যুদের এখানে দেখানো হয়েছে দুরাত্মা হিসেবে, যজ্ঞ থেকে যাদের ভয় দেখিয়ে তাড়ানো দরকার।[৩৬] বলা হয়েছে যে একটি সর্বশক্তিমান্ কবচ থাকার ফলে ঋষি অঙ্গিরা দস্যুদের দুর্গ ভেদ করতে পেরেছিলেন।[৩৭] মনে হয় 'ঋগ্‌বেদে'র সময়ে দস্যুদের যুদ্ধ-বিবরণের ওপর ভিত্তি করেই 'অথর্ববেদে' দস্যুদের কু-চরিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অথর্ববেদে'র কথা অনুযায়ী দেব-নিন্দক দস্যুদের ধরে এনে বলি দেওয়া উচিত।[৩৮] দস্যুদের ভাবা হতো বিশ্বাসঘাতক, তারা আর্য রীতিনীতি মানে না, আর প্রায় অমানুষ।[৩৯]

আর্য এবং দস্যুদের জীবনযাত্রার পার্থক্য আরও প্রকট হয় আর্য 'ব্রত' সম্পর্কে দস্যুদের অবস্থান দিয়ে। সাধারণভাবে 'ব্রত' মানে বিধিবিধান বা অনুশাসন।[৪০] 'ব্রাত' মানে হলো জনগোষ্ঠী বা বাহিনী। 'ব্রত' এবং 'ব্রাত' শব্দদুটির মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়, তাহলে 'ব্রত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় সম্ভবত জনগোষ্ঠীর বিধি বা রীতিনীতি। দস্যুদের সাধারণত 'অব্রত'[৪১] বা 'অন্যব্রত'[৪২] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অপব্রত' শব্দটিও ব্যবহার হয়েছে দুজায়গায়। মনে হয় এটি দস্যু ও ভিন্নমতের আর্যদের প্রতি প্রযুক্ত।[৪৩] লক্ষ করার যে দাসদের প্রতি ঐ ধরনের কোন বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়নি। এর থেকে আবার আভাস পাওয়া যায় যে দস্যুদের চেয়ে দাসদের জীবনপ্রণালী আর্যদের সঙ্গে মিলত অনেক বেশি।

আর্য ও তাদের শত্রুদের মধ্যে গায়ের রঙের তফাৎ ছিল, এমন ভাবারও

৩১. ঋগ্ ৭।৬।৩। ৩২ ঐ, ১।৫১।৮। ৩৩. ঐ, ১।৩৩।৪।

৩৪. ঐ, ১।১৩৩।১ ; ৫।২।৩ ; ৭।১।৮, ১৬ ; ১০।২৭।৬ ; ১০।৪৮।৭।

৩৫. ঐ, ৪।১৬।৯। ৩৬. অথর্ব, ২।১৪।৫। ৩৭. অথর্ব, ১০।৬।২০।

৩৮. অথর্ব, ১২।১।৩৭। ৩৯. ঋগ্, ১০।২২।৮।

৪০. কাণে, 'জার্নাল অফ দ বম্বে ব্রাঞ্চ অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২৯, পৃ ১২।

৪১. ঋগ্ ১।৫১।৮-৯ ; ১।১০১।২ ; ১।১৭৫।৩ ; ৬।১৪।৩ ; ৯।৪১।২। যদিও 'অব্রত' শব্দটি দাসদের ক্ষেত্রে কোথাও ব্যবহার করা হয়নি।

৪২. ঋগ্ ৮।৭০।১১ ; ১০।২২।৮।

৪৩. ঐ, ৫।৪২।৯ ; ৫।৪০।৬-এ 'অপব্রত' শব্দটি কৃষ্ণত্বের সমার্থক।

কারণ আছে। 'মানুষী প্রজা' (মানুষ) নামে অভিহিত আর্যরা অগ্নি বৈশ্বানরের উপাসক ছিলেন বলে মনে হয়। তারা কখনও কখনও কালো মানুষদের (অসিক্নীবিশঃ) বসতিতে আগুন লাগিয়ে দিতেন। কালোরা অবশ্য তাঁদের যাবতীয় সম্বল ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যেতেন বিনা লড়াই-এই।[৪৪] আর্যদেবতা সোমকে বলা হয়েছে কৃষ্ণচর্ম লোকদের ঘাতক। এঁরা বোধহয় দস্যু-ই।[৪৫] এ-ছাড়া কৃষ্ণচর্মের রাক্ষসদের (ত্বচর্মাসিক্নীম্) সঙ্গে লড়তে হয়েছে ইন্দ্রকেও।[৪৬] এক জায়গায় তাঁর পঞ্চাশ হাজার 'কৃষ্ণ' নিধনের কথা আছে। সায়ণ এঁদের কৃষ্ণবর্ণের রাক্ষস বলে মনে করেন।[৪৭] এ-ও বলা হয়েছে যে এই দেবতাটি অসুরদের কালো চামড়া ছিঁড়ে ফেলেন।[৪৮] কৃষ্ণ নামক জনৈক বীরের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের যুদ্ধ হলো তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। এর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকতেও পারে। বলা হয়েছে, কৃষ্ণ যখন অংশুমতী বা যমুনা নদীর তীরে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে শিবির গড়েন, ইন্দ্র তখন মরুৎদের (আর্য 'বিশ্') সংগঠিত করেন এবং পুরোহিত-দেবতা বৃহস্পতির সাহায্যে 'অদেবীঃ বিশঃ'-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।[৪৯] সায়ণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'অদেবীঃ বিশঃ'-রা হলো কালো রঙের অসুর (কৃষ্ণরূপাঃ অসুরসেনাঃ)। কৃষ্ণ ছিলেন যাদব বংশীয় অনার্য, কৃষ্ণবর্ণ বীর।[৫০] এমন হওয়া সম্ভব বলেই মনে হয়, কারণ পরবর্তীকালের জনশ্রুতিতে কৃষ্ণ আর ইন্দ্রের পারস্পরিক শত্রুতার কথা আছে। 'কৃষ্ণগর্ভা'-দের হত্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। সায়ণ এই শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণ নামক এক অসুরের গর্ভবতী পত্নীগণ।[৫১] এই ব্যাখ্যা অবশ্য সন্দেহজনক। একইভাবে, 'কৃষ্ণ-যোনিঃ দাসীঃ' পরাস্ত করছেন ইন্দ্র, এমন উল্লেখও আছে।[৫২] সায়ণ এঁদের

৪৪. ঐ, ৭।৫।২-৩; গেলড্নারের অনুবাদ। তৃতীয় রাণা ঘুন্ডাই-তে হরপ্পা সংস্কৃতির সমাপ্তি সূচিত হয় 'এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে'র সঙ্গে। বি. বি. লাল, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', খণ্ড ৯, পৃ ৮৮।

৪৫. 'ঘ্নন্তঃ কৃষ্ণাম্ আপ ত্বচং···সাহ্বাংসো দস্যুমব্রতম্'। ঋগ্ ৯।৪১।১-২।

৪৬. ঋগ্, ৯।৭৩।৫।

৪৭. ঐ, ৪।১৬।১৩। গেলড্নার যদিও এ প্রসঙ্গে রাক্ষসদের কথা তোলেননি।

৪৮. ঋগ্, ১।১৩০।৮।

৪৯. '···অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থে ধারয়তন্বং তিত্বিষাণঃ; বিশো অদেবীরভ্যা চরন্তী-র্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে'। ঋগ্ ৮।৯৬।১৩-১৫।

৫০. কোসম্বী, 'জার্নাল অফ দ বম্বে ব্রাঞ্চ অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২৭, পৃ ৪৩।

৫১. 'যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বানা'। ঋগ্, ১।১০১।১।

৫২. স বৃত্রহেন্দ্রঃ কৃষ্ণযোনিঃ পুরন্দরোদাসীরৈরয়দ্বি···'। ঐ, ২।২০।৭ সায়ণভাষ্য। কিন্তু গেলড্নার মনে করেন 'দাসীঃ'র মধ্যে 'পুরঃ' উহ্য আছে এবং কবি গর্ভধারণের সাপেক্ষেই ভেবেছেন।

নিকৃষ্ট ধরনের অসুর-জাতীয় সৈন্য বলে কল্পনা করেছেন। উইলসন কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দটিকে নিয়েছেন কালো অর্থেই। পরের অর্থটি ঠিক হলে দাসদের রঙ কালো বলেই মনে হয়। অথবা, দস্যু এবং আর্যদের অন্যান্য শত্রুদের সম্বন্ধে যেমন নির্বিচারে কৃষ্ণ এই পরিচয়টি ব্যবহার করা হয়েছে, এখানেও সে-রকম হয়ে থাকতে পারে। ওপরের উল্লেখগুলো থেকে একটা ব্যাপারে অবশ্য প্রায় সন্দেহই থাকে না যে ইন্দ্র, অগ্নি ও সোমের আর্য অনুসারীদের লড়াই করতে হয়েছিল ভারতের কালো মানুষদের সঙ্গে। একটি উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে পুরুকুৎসের পুত্র 'ঋগ্‌বেদে'র বীর ত্রসদস্যু-কে কালো রঙের লোকদের নেতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৩] হয়তো এ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে তিনি তাঁদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

দস্যুদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'অনাস'[৫৪] শব্দটির অর্থ যদি ধরা হয় 'নাসিকা-বিহীন' বা খর্ব-নাসা, এবং দাসদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'বৃষশিপ্র'[৫৫] শব্দটির অর্থ হয় 'ষাঁড়ের মত ঠোঁট' বা পুরু বেরিয়ে-আসা ঠোঁট, তাহলে আর্যদের শত্রুরা শারীরসংস্থানের দিক দিয়ে আলাদা ছিলেন বলেই মনে হয়।

'মৃধ্রবাক্' পদটি তার বিভিন্ন শব্দরূপে 'ঋগ্‌বেদে'র কয়েক জায়গায় আছে।[৫৬] আর্য ও তাঁদের শত্রুদের বাক্‌রীতির পার্থক্য সম্পর্কেও এ থেকে খানিকটা ধারণা করা যায়। দুটি জায়গায় শব্দটিকে দস্যুদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[৫৭] সায়ণ এর ব্যাখ্যা করেছেন আর গেল্‌ড্‌নার অর্থ করেছেন 'ভুল-কথা'।[৫৮] 'মৃধ্রবাচঃ' শব্দটিকে 'অবোধ্য ভাষা' অর্থে গ্রহণ না করলে একথা বলা যায় না যে আর্যদের সঙ্গে দস্যুদের ভাষাগত পার্থক্য ছিল। বরং বলা চলে যে দস্যুদের বাক্‌রীতি যথাযথ ছিল না, আর এতেই আর্যরা ক্ষুন্ন হতেন। অর্থাৎ, আর্যদের সঙ্গে তাঁদের শত্রুদের যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল গবাদি পশু, রথ ও অন্যান্য ধরনের ধনসম্পদের অধিকার; কিন্তু জাতি, ধর্ম এবং বাক্‌রীতির পার্থক্যও তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল।

'ঋগ্‌বেদে' 'দাস' এবং 'দস্যু' এই দুটি শব্দের মধ্যে কোন্‌টি কতবার এসেছে তার থেকে যদি কোন সিদ্ধান্ত টানা যায়, তাহলে মনে হবে সংখ্যায় অবশ্যই শক্তিশালী ছিলেন দস্যুরা। দস্যুদের উল্লেখ পাওয়া যায় চুরাশি বার, দাসদের একষট্টিবার।[৫৯] দস্যুদের সঙ্গে লড়াই-এ অনেক রক্ত ঝরেছিল।

৫৩ ঋগ্. ৮।১৯।৩৬-৩৭।

৫৪. ঐ, ৫।২৯।১০। সায়ণ ব্যাখ্যা করেছেন, 'অনাস' মানে যার বাক্ নেই ('আস্যরহিত')।

৫৫. ঐ, ৭।১৯।৪।

৫৬. ঋগ্. ১।১৭৪।২; ৫।২৯।১০, ৩২।৮; ৭।৬।৩, ১৮।১৩। শুধু চারটি স্থানেই নয়, যেমন 'হু ওয়্যার দ শূদ্রস্'-এ বলা হয়েছে। ৫৭. ঐ, ৫।২৯।১০; ৮।৬।৩।

৫৮. ঐ, ১।১৭৪।২-এ গেল্‌ড্‌নার মৃধ্রবাচঃ'-র অনুবাদ করেছেন 'মিস্‌স্রেডেণ্ড' (missredend)।

৫৯. বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রীর 'বৈদিক কোষ'-এর ভিত্তিতে এই গণনা করা হয়েছে।

সে সময়ে আর্যরা ছিলেন তাঁদের প্রসারের প্রাথমিক পর্যায়ে। জীবনধারণের জন্য গবাদি পশুর প্রতি তাঁদের লোভ ছিল বেশি। স্বভাবতই নাগরিক বসতি ও সংগঠিত কৃষির মূল্য তাঁরা বুঝতেন না।[৬০] শেষদিকের হরপ্পা সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশের চিহ্ন যদিও খুব একটা পাওয়া যায় না, তবুও প্রাগ্-আর্য নাগরিক বসতিগুলোর ধ্বংসসাধনে আর্যদের কিছুটা ভূমিকা ছিল বলেই মনে হয়। যুদ্ধে জেতা ধন-সম্পদ, বিশেষ করে গবাদি পশু, নিশ্চয়ই যোদ্ধা আর পুরোহিতদের ক্ষমতা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আর তাঁদের উন্নীত করেছিল 'বিশ্'-এর ঊর্ধ্বে। ধীরে ধীরে বোঝা গেল, প্রাচীনতম সভ্যতার কৃষকরা আর্যদের দিতে পারতেন শ্রমশক্তি, যার সাহায্যে আর্যরা চাষ-আবাদ চালিয়ে যেতে পারতেন।

আর্যদের সঙ্গে তাদের শত্রুদের সংঘাতের পাশাপাশি চলছিল আর্য জনগোষ্ঠীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাত। মন্যু ( মূর্তিমান্ ক্রোধ )-র উদ্দেশ্যে লেখা একটি সমরগীতির মাধ্যমে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে দু-ধরনের শত্রু জয় করার জন্য : আর্য আর দাস।[৬১] ইন্দ্রকেও অনুরোধ করা হয়েছে, যাঁরা তাঁর অনুগামীদের শত্রু ( শত্রবঃ ), সেই দেবহীন দাস এবং আর্য উভয়ের বিরুদ্ধেই তিনি যেন লড়াই করেন।[৬২] বলা হয়েছে, সুদাসের বৈরী, দাস ও আর্যদের সংহার করে ইন্দ্র ও বরুণ তাঁকে রক্ষা করেন।[৬৩] সৎ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে দুই প্রধান ঋগ্বেদীয় দেবতা অগ্নি এবং ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে : তাঁরা যেন আর্য ও দাসদের প্রতিকূল কার্যকলাপ ও অত্যাচার নিবারণ করেন।[৬৪] আর্যরাও ছিলেন তাঁদের প্রতিবেশীদের অন্যতম প্রধান শত্রু। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ইন্দ্র দাসদের সঙ্গে আর্যদেরও ধ্বংস করেছিলেন বলে কথিত আছে।[৬৫] 'ঋগ্বেদে'র একটি ঋকের উইলসন-কৃত অনুবাদ মেনে নিলে দেখা যাবে, সপ্তসিন্ধুর তীরবর্তী সাধারণ মানুষকে রাক্ষস ও আর্যদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ইন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে এবং দাসদের অস্ত্রচ্যুত করার জন্যও তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছে।[৬৬]

৬০. হুইলারের মতে অমার্জিত যাযাবর ( অর্থাৎ আর্য )-দের আগ্রাসনে সংগঠিত কৃষি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ৮।

৬১. 'সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা বয়ং সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা'। ঋগ্ ১০।৮৩।১ ; অথর্ব ৪।৩২।১ এরই অভিন্ন রূপ।

৬২. ঋগ্, ১০।৮৮।৩ ; তুলনীয় : অথর্ব ২০।৩৬।১০।

৬৩. 'দাসা চ বৃত্রা হতমার্যাণি চ সুদাসমিন্দ্রাবরুণাবসাবতম্'। ঋগ্ ৭।৮৩।১।

৬৪. ঋগ্, ৬।৬০।৬। ৬৫. ঐ, ৬।৩৩।৩ ; তুলনীয় ১০।১০২।৩।

৬৬. 'য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্যো বার্যাৎসপ্তসিন্ধুষু ;
বধর্দাসস্য তুবিনৃম্ণ নীনমঃ'। ঋগ্ ৮।২৪।২৭।
ঋক্‌টি গেল্‌ড নার এই অর্থে নিয়েছেন যে দাসদের অস্ত্র ইন্দ্র আর্যদের দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেন।

'ঋগ্‌বেদে' আর্য শব্দটি এসেছে ছত্রিশবার, তার মধ্যে ন'টিতে আর্যদের নিজেদের মধ্যে শত্রুতার উল্লেখ আছে।[৬৭] আর্যকুলের শত্রুদের এক জায়গায় দস্যুদের সঙ্গে আর পাঁচ জায়গায় দাসদের সঙ্গে একযোগে রাখা হয়েছে। এর থেকেও বোঝা যায়, দস্যুদের চেয়ে দাসদের সঙ্গে আর্যদের এক অংশের সুসম্পর্ক ছিল। আর্য জনগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে লড়াই-এ, দাসরা ছিলেন আর্যদের স্বভাব-মিত্র। এর ফলে আর্যদের জনগোষ্ঠীয় ভিত্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসে, এবং আর্য ও দাসদের পারস্পরিক মিলন প্রক্রিয়ায় তা সহায়ক হয়। এই উল্লেখগুলোর মধ্যে পাঁচটি আছে 'ঋগ্‌বেদে'র প্রাচীনতর অংশে। এ থেকেই দেখা যায় অন্তর্বিরোধের ধারাটি ছিল বেশ প্রাচীন।

গোড়ার দিকে আর্যদের মধ্যে সংঘাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো 'দশরাজ্ঞ' যুদ্ধের বিবরণ। 'ঋগ্‌বেদে' এটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। 'ঋগ্‌বেদ', ৭।৩৩ সূক্তে এই যুদ্ধের কথা আছে। গেলডনার মনে করেন এটি আদি পর্বের ঘটনা।[৬৮] দশ-রাজার যুদ্ধ মূলত ঋগ্‌বেদীয় আর্যদের দুটি প্রধান শাখা—পুরু এবং ভারতের মধ্যে সংঘাত। অনার্যরাও হয়তো এই যুদ্ধে সহযোগী ছিলেন।[৬৯] ভারতের নেতা ছিলেন 'ঋগ্‌বেদে'র বিখ্যাত নায়ক সুদাস আর তাঁকে সাহায্য করেছিলেন পুরোহিত বশিষ্ঠ। তাঁদের শত্রুপক্ষে ছিলেন দশজন রাজা। এঁদের মধ্যে পাঁচজন হলেন অনু, দ্রুহ্যু, যদু, তুর্বশ এবং পুরু এই সুপরিচিত পাঁচটি জনগোষ্ঠীর ; আর বাকি পাঁচজন অল্প পরিচিত অলিন, পক্‌থ, ভলান, শিব এবং বিষাণী। বিরোধী-পক্ষীয় যোদ্ধাদের সংগঠিত করেছিলেন পুরোহিত বিশ্বামিত্র আর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পুরুরা।[৭০] মনে হয়, এই ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্রতর আর্য জনগোষ্ঠীগুলোর পৃথক্‌ অস্তিত্ব রক্ষার এক স্মরণীয় প্রয়াস। কিন্তু সুদাসের নেতৃত্বে ভারতরা পরুষ্ণি নদীর তীরে তাঁদের চূড়ান্ত পযুদস্ত করেন। পরাজিত আর্যদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হয়েছিল তার কোন আভাস পাওয়া যায় না ; কিন্তু অনার্যদের ক্ষেত্রে যা করা হতো এখানেও হয়তো মূলত তা-ই করা হয়েছিল।

জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই ধরনের আরও অনেক অন্তর্বিরোধ হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু তার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। যে-সব উল্লেখে আর্যদের দেখানো হয়েছে দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত 'ব্রত' ভঙ্গকারী হিসেবে, তার

৬৭. ঋগ্‌ ৬।৩৩।৩, ৬০।৬ ; ৭।৮৩।১ ; ৮।২৪।২৭ (এই ঋক্‌টি বিতর্কিত) ; ১০।৩৮।৩, ৬৯।৬, ৮৩।১ ; ৮৬।১৯, ১০২।৩। এই সূত্রগুলোর মধ্যে চারটি আম্বেডকর সঠিকভাবে উদ্‌ধৃত করেছেন, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ৮৩-৮৪।

৬৮. 'বৈদিক ইনডেক্স', ১ম, পৃ ৩৫৬, "দাস-রাজ্ঞ"-র ৪ নং টীকা।

৬৯. ঋগ্‌ ৭।৩৩।২-৫, ৮৩।৪। ঋগ্‌ ৭।১৮-তে আছে মূল যুদ্ধ স্তোত্রটি।

৭০. 'দ বৈদিক এজ', পৃ ২৪৫। অন্যান্য আর্যদের প্রতি বিদ্বেষের কারণে পুরুষদের 'মৃধ্রবাচঃ' বলা হতো, ঋগ্‌, ৭.১৮।১৩।

থেকে এই ধরনের সংঘাতেরই আভাস পাওয়া যায়। কাণে 'ঋগ্‌বেদ' থেকে এই ধরনের পাঁচটি উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন, সেগুলোকে এই আলোয় ব্যাখ্যা করা যায়।[৭১] আদিযুগের পুরোহিত অথর্বনের সঙ্গে বরুণের একটি কথোপ-কথনে পুরোহিত গর্ব করে বলেছেন, "আমি যে নিয়ম (ব্রত) প্রবর্তন করব তা লঙ্ঘন করতে পারবে না কোন দাস, তা-সে যত বড়ই হোক না কেন, না পারবে কোন আর্যও।"[৭২]

মিউঅর 'ঋগ্‌বেদ' থেকে আটান্নটি অংশ উদ্‌ধৃত করে ব্যাখ্যায় বলেছেন যে তাঁর মতে সেগুলোয় আর্যসম্প্রদায়ের সেই সমস্ত সদস্যের নিন্দাবাদ করা হয়েছে যাঁরা ধর্মের ব্যাপারে বিরূপ বা উদাসীন।[৭৩] এই অংশগুলোর অনেক-ক'টি 'ঋগ্‌বেদে'র কেন্দ্রীয় ভাগের (দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল)। ধরা যেতে পারে যে আর্যদের বসতি স্থাপনের একেবারে গোড়ার আমলে যে-অবস্থা ছিল এগুলোতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এর মধ্যে কয়েকটি অনুদার ব্যক্তিদের উদ্দেশে প্রযুক্ত। তাঁদের বলা হয়েছে 'অরাধসম্'[৭৪], 'অপৃণতম্'[৭৫] বা 'অপৃণতঃ'[৭৬]। ইন্দ্রকে একজায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে সেইসব ধনীদের, সম্ভবত আর্য ধনীদের, শত্রু (এধমানদ্বিৎ) বলে, যাঁরা তাঁর কোন সেবায় লাগেন না।[৭৭] কারণ যে-সব দাস ও আর্য সর্বসাধারণের থেকে নিজেদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখতেন, তাঁদেরই ধরা হতো আক্রমণের লক্ষ্য বলে।[৭৮] বলা হয়েছে অগ্নি তাঁর নিজের প্রজাদের জন্য সমতল অথবা পাহাড় যে-কোন জায়গায় অবস্থিত সম্পত্তি অধিগত করেছেন এবং দাস ও আর্য শত্রুদের পরাজিত করেছেন।[৭৯] এই সমস্ত আখ্যান থেকে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে এমনকি আর্য শত্রুদেরও তাঁদের সম্পত্তি (সম্ভবত গবাদি পশু) থেকে বঞ্চিত করা হতো এবং পরিণামে তাঁদের নামিয়ে আনা হতো দুঃস্থ অনার্য পর্যায়ে।

৭১. 'জার্নাল অফ দ বম্বে ব্রাঞ্চ অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২৯, পৃ ১১।

৭২. 'ন মে দাসো নার্যো মহিত্বা ব্রতং মীমায় যদহং ধরিষ্যে'। অথর্ব ৫।১১।৩; পৈপ্পলাদ ৮।১।৩।

৭৩. 'জার্নাল অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২, পৃ ২৮৬-২৯৪।

৭৪. ঋগ্, ১।৮৪।৮। ৭৫. ঐ, ১।১২৫।৭। ৭৬. ঐ, ৬।৪৪।১১।

৭৭. ঐ, ৬।৪৭।১৬; 'জার্নাল অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২, পৃ ২৮৬-২৯৪।

৭৮. 'যস্যায়ং বিশ্ব আর্যো দাসঃ শেবধিপা অরিঃ'। ঋগ্ ৮।৫১।৯। এই ঋক্ প্রসঙ্গে সায়ণভাষ্য এবং উবট ও মহীধরও বা. স. ৩৩-এ ঐ অংশে 'দাস' শব্দটি 'আর্য'র বিশেষণ হিসেবে নিয়েছেন, কিন্তু গেল্‌ড্‌নার (ঋগ্ ৮।৫১।৯) 'আর্য' এবং দাস'-কে আলাদা আলাদা বিশেষ্যরূপে নেন। যাই হোক, এর থেকে স্পষ্ট যে আর্যরাও ছিলেন আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য।

৭৯. 'সমজ্র্যা পর্বত্যা বসূনি দাসা বৃত্রাণ্যার্যা জিগেথ'। ঋগ্ ১০।৬৯।৬।

যে-সব লোককে 'পণি' বলা হতো তাঁদের বিরুদ্ধেও এক ধরনের বৈরী মনোভাব অনেক জায়গায় লক্ষ করা যায়।[৮০] মিউঅর এঁদের কৃপণ অর্থে বুঝেছেন.[৮১] 'বৈদিক সূচি' (বেদিক ইনডেক্স)-প্রণেতাদের মতে 'ঋগ্বেদে' পণি বলতে বোঝানো হয়েছে ধনীদের। কিন্তু ধনী হওয়া সত্ত্বেও এঁরা দেবতাদের কিছু উৎসর্গ করতেন না বা পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতেন না বলে সংহিতা-রচয়িতারা এঁদের খুবই অপছন্দ করতেন।[৮২] একটি রচনাংশে এঁদের 'বেকনাট' বা কুসীদজীবী (?) বলা হয়েছে। ইন্দ্র এঁদের দমন করেন।[৮৩] পণিরা যজ্ঞ করতে পারতেন এবং বৈরদেয় বা প্রায়শ্চিত্তের অর্থের ভাগীদার ছিলেন। এ-থেকেই বোঝা যায় যে তাঁরা ছিলেন আর্য-সম্প্রদায়ভুক্ত।[৮৪] হিলেব্রাণ্ট এঁদের সেই পণিদের[৮৫] সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন "যাঁরা শক জনগোষ্ঠীয় অশ্বারোহী ও যোদ্ধাদের এক বিশাল গোষ্ঠী দহ'দের একটি অংশ।[৮৬] 'বৈদিক সূচি'-প্রণেতারা মনে করেন, শব্দটি এতই ব্যাপক যে এ দিয়ে আদিবাসী বা বৈরী আর্য জনগোষ্ঠী যে-কোনটিই বোঝাতে পারে।[৮৭]

যে-সব অংশে পণিদের কৃপণ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং অনুদার লোকদের সাধারণভাবে নিন্দাবাদ করা হয়েছে, তার কিছু কিছু হয়তো দান-লাভেচ্ছু পুরোহিতদের অনুপ্রেরণায় রচিত। তবে মোটের উপর মনে হয়, এক শ্রেণীর আর্যদের মধ্যে জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের বঞ্চিত করে ধনসঞ্চয়ের যে-প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল, এই অংশগুলো তারই প্রতিফলন। স্বাভাবিক-ভাবেই জনগোষ্ঠীর সদস্যরা আশা করতেন যে, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞের ব্যবস্থা করে[৮৮] গোষ্ঠীর সকলের পানাহারের ব্যবস্থা হবে, এবং এইভাবে তাঁরা সঞ্চিত সম্পদে কিছুটা ভাগ পাবেন। এই ধারায় বাধা দিতে না পারলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য দেখা দিতে বাধ্য।

আর্য জনগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বাইরের জনগোষ্ঠীর, এবং গোষ্ঠীগুলোর আভ্যন্তর সংঘর্ষের ফলে কী করে জনগোষ্ঠীয় সমাজ ভেঙে গিয়ে সামাজিক শ্রেণীগুলো গড়ে উঠল—এবার সে-কথা বিচার করা দরকার। 'ঋগ্বেদে' 'বর্ণ' শব্দটি আর্য[৮৯] এবং দাস[৯০] উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হলেও, শব্দটি কোন শ্রম-বিভাজনের ইঙ্গিত দেয় না। এই শ্রম-বিভাজনই হয়ে ওঠে পরবর্তী-কালের ব্যাপক সামাজিক শ্রেণীগুলোর ভিত্তি। 'আর্য' এবং 'দাস'-বর্ণ ছিল

৮০ ঐ, ১।১২৪।১০ ; ১৮২।৩ ; ৪।২৫।৭, ৫১।৩ ; ৫।৩৪।৭ ; ৬।১৩।৩, ৫৩।৬-৭।

৮১. 'জার্নাল অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২, পৃ ২৮৬-২৯৪।

৮২. 'বেদিক ইনডেক্স', ১ম, পৃ ৪৭১। ৮৩. ঐ, ঋগ্ ৮।৬৬।১০।

৮৪. 'বেদিক ইনডেক্স', ১ম, পৃ ৪৭২। ৮৫. ঐ।

৮৬. ঘার্শমান, 'ইরান', পৃ ২৪৩। ৮৭. ১ম, পৃ ৪৭২।

৮৮. ঋগ্ ৭।৪০।৬। ৮৯. ঐ, ৩।৩৪।৯।

৯০. 'দেবাসো মন্যুং দাসস্য শ্চম্নস্তে ন আবক্ষন্তসুবিতায় বর্ণম্', ঐ, ১।১০৪।২ ; ৩।৩৪।৯।

দুটি বড় জনগোষ্ঠীয় দল, যেগুলো তখন ভেঙে গিয়ে সামাজিক শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। আর্যদের ক্ষেত্রে এই ঘটনার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সেনার্ট-এর সমালোচনা করে ওল্ডেনবের্গ ঠিকই বলেছেন যে 'ঋগ্‌বেদে' কোন জাতির ('কাস্ট') কথা নেই।[৯১] কিন্তু এই সংহিতা থেকে ধারণা হয় যে ধীরে ধীরে অভ্যুদীয়মান সামাজিক শ্রেণীগুলো ভ্রূণাবস্থায় ছিল। 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি এসেছে পনেরো বার আর ক্ষত্রিয় ন বার। তাহলেও, 'জন' এবং 'বিশ্‌'[৯২] শব্দদুটির পুনরাবৃত্তি এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃতি থেকে মনে হয় যে, ঋগ্‌-বেদীয় সমাজের চরিত্র ছিল মূলত জনগোষ্ঠীয়। আমরা জানি না, আর্যরা ভারতে আসার সময় তাঁদের অধীনে দাস ছিল কিনা। বৈদিক ভারতীয়রা ছিলেন মূলত পশুপালক,[৯৩] অন্তত 'ঋগ্‌বেদে'র গোড়ার দিকে যে-আর্যদের কথা জানা যায় তাঁরা তো বটেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে দেখা যায়, পশুপালক জনগোষ্ঠীও দাস রাখত, যদিও আপেক্ষিক অর্থে কৃষিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যেই দাসপ্রথার বিকাশ হয় বেশি।[৯৪]

তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সমাজ ও আর্যদের পারস্পরিক অভিঘাতের ফল ঠিক কী হয়েছিল, তথ্যের অভাবে সে সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করা কঠিন। যুদ্ধে-লুণ্ঠিত সম্পদ নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করেছিল জনগোষ্ঠীয় নেতাদের ধন-সম্পদ আর সামাজিক মর্যাদা। তখন তাঁরা গো-ধন ও কোন কোন ক্ষেত্রে দাসী দান করে পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষণ করতে পারতেন। তাই যজমানকে বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে: তিনি রথে চলেন, "মর্যাদায় প্রথম এবং সম্পদশালী, উদারহস্ত ও সভাস্থলে বন্দিত।"[৯৫]

তথ্যের অভাব সত্ত্বেও আর্যদের সঙ্গে প্রাগ্‌-আর্য তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সমাজের লোক এবং অন্যান্যদের সামাজিক বোঝাপড়া সম্বন্ধে একটা যুক্তিগ্রাহ্য প্রকল্প খাড়া করা যায়। মনে হয়, আর্য বিস্তারের প্রথম ধাক্কায় জনবসতি এবং দস্যু-জাতীয় লোকেদের এত বেশি ধ্বংস করা হয়েছিল যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন সমাজে আত্মীভূত করার লোক পড়েছিল অল্পই। কিন্তু তাঁদের বিস্তারের পরবর্তী সব পর্বে এমন না-ও হয়ে থাকতে পারে। পূর্বতন সমাজের জীবিতদের অধিকাংশকেই, বিশেষত তুলনায় অনগ্রসর লোকদের নামিয়ে আনা হলো দাসের পর্যায়ে। আর, আর্য সমাজের 'বিশ্‌'-দের যে স্বাভাবিক প্রবণতাই হবে নীচুতলার লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করা, যেমন বৈদিক

৯১. 'ৎসাইটশ্রিফ্‌ট্‌ ডের ডয়েটশেন মোর্গেনলান্ডিশেন গেসেলশাফ্‌ট্‌', ২য়, পৃ ২৭২।

৯২. প্রায় ২৭৫ বার উল্লেখ আছে 'জন'-এর এবং প্রায় ১৭০ বার 'বিশ্‌'-এর।

৯৩. রামশরণ শর্মা, "ফর্মস্‌ অফ প্রপার্টি ইন দি আর্লি পোর্শনস্‌ অফ দ ঋগ্‌বেদ", 'এসেস্‌ ইন অনার অফ প্রফেসর এস. সি সরকার' দ্র.। কৃষিকর্ম সংক্রান্ত একটি সূক্তকে (৪।৫৭) হপকিন্স প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

৯৪. লান্টমান, 'অরিজিন্‌স্‌ অফ সোশ্যাল ইনইক্যুয়ালিটিস্‌', পৃ ২৩০।

৯৫. ঋগ্‌ ২।২৭।১২।

পুরোহিত ও যোদ্ধারা মেলামেশা করবেন পূর্ববর্তী সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে—এটাই স্বাভাবিক। দুটি উল্লেখ থেকে স্পষ্ট হয় যে অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে আর্যদের শত্রুদেরও নতুন মিশ্র সমাজে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হতো। এক জায়গায় বলা হচ্ছে যে ইন্দ্র দাসদের আর্যে পরিণত করেছেন।[৯৬] সায়ণ এর ব্যাখ্যা করে বলেছেনঃ তাঁদের আর্য জীবনযাত্রা শেখানো হয়েছিল। আর এক জায়গায় দেখা যায় যে ইন্দ্র দস্যুদের 'আর্য' নাম কেড়ে নিয়েছিলেন।[৯৭] কিছু কিছু দস্যুকে আর্য পর্যায়ে উন্নীত করে পরে সম্ভবত আর্য-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁদের সেই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়—এর অর্থ কি এই? আমরা একথাও বিবেচনা করে দেখতে পারি যে 'অর্য' বা এর বৃদ্ধিতে 'আর্য' শব্দটির অর্থ সম্পদশালী ব্যক্তি।[৯৮] তার ভিত্তিতে মনে হবে যে কিছু দস্যুর সম্পদ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এর থেকে আমাদের অনুমানঃ শত্রুপক্ষের যেসব পুরোহিত এবং অধিপতি তখনও রয়ে গেলেন, নতুন আর্যসমাজে তাঁদের অনুরূপ মর্যাদা (সম্ভবত নিম্নতর ধরনের) দেওয়া হয়েছিল।

এমনও বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ্যবাদ হলো একটি প্রাগ্-আর্য প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে।[৯৯] রোমান রাজাদের আমলে এক বিশেষ ধরনের পুরোহিতের পদ তৈরি হয়েছিল, লাতিন ভাষায় যার নাম 'ফ্লামেন'।[১০০] কিন্তু এর সঙ্গে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির সমীকরণের শব্দতাত্ত্বিক অনুশীলন অনেকটাই যেন চেষ্টাকৃত। বৈদিক ভারতীয়দের অথর্বন্ পুরোহিতদের সঙ্গে ইরাণীয় অথর্বন্দের সাদৃশ্যের বিষয়টি অবশ্য সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু সে যাই হোক, একটা বড় আপত্তির উত্তর দেওয়া দরকার। কীথ বলেছেন, ঋগ্বেদীয় বিশ্বাস এবং বৈদিক দেবতামণ্ডলীর তুলনামূলক বৃহত্ত্ব অবশ্যই পুরোহিতদের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফল এবং এক সামগ্রিক ধর্মসমন্বয় প্রয়াসেরই পরিণতি।[১০১] এ-ছাড়াও, বেদ ও মহাকাব্য থেকে প্রচুর দৃষ্টান্ত জোগাড় করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে ইন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মঘাতী, তাঁর মূল শত্রু বৃত্র ছিলেন ব্রাহ্মণ।[১০২] এর ফলে সেই প্রকল্পটিই আরও দৃঢ় হয় যে উন্নত

৯৬. 'যয়া দাসান্যার্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্ত্সুতুকা নাহুষাণি'। ঋগ্ ৬।২২।১০।

৯৭. 'অহং শুষ্ণস্য শ্নথিতা বধর্যমং ন যো রর আর্যং নাম দস্যবে'। ঋগ্ ১০।৪৯।৩।

৯৮. এইচ. ডবল্যু. বেইলি, "ইরানীয়ান আর্য—অ্যান্ড দহ—", 'ট্রানজ্যাকশন্স অফ দ ফিলোলজিক্যাল সোসাইটি', ১৯৫৯, পৃ ৮৪।

৯৯. পার্জিটার, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল ট্র্যাডিশন', পৃ ৩০৬-৩০৮।

১০০. দুমেজিল, 'ফ্লামেন-ব্রহ্মন্', ২য় ও ৩য় অধ্যায়। অপর একটি মতের জন্য দেখুন পাউল টিমে, 'ৎসাইটশ্রিফট্ ডোর ডারেটশেন মোর্গেনলান্ডিশেন গেসেলশাফ্ট', নয়ে ফোলগে, খণ্ড ২৭, পৃ ৯১-১২৯।

১০১. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ১০৩।

১০২. ভাল্টের রুবেন, "ইন্দ্রস্ ফাইট এগেন্স্ট বৃত্র ইন দ মহাভারত", 'এস কে. বেলবল-

পুরোহিততন্ত্র ছিল এক প্রাগ্-আর্য প্রতিষ্ঠান, এবং বোঝা যায়, বিজিত পক্ষের সকলকেই দাস বা শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সুতরাং প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হলেও, মনে হয়, বিজয়ী আর্যদের পুরোহিত শ্রেণীর অনেককেই বিজিত শ্রেণীর মধ্যে থেকে নেওয়া হয়েছিল।[১০৩] সেই অনুপাতের কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তাহলেও হয়তো পুরোহিতদের কেউ কেউ নতুন সমাজের স্থান পেয়েছিলেন। সমস্ত 'কৃষ্ণকায় লোক'কেই যে শূদ্র-দাসের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে-কথা ভাবলে ভুল হবে, কারণ অন্তত কয়েকজন কৃষ্ণবর্ণ ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ঋগ্‌বেদে' আছে, অশ্বিনীরা কৃষ্ণকায় ( 'শ্যাবায়' ) কণ্বকে গৌরবর্ণা স্ত্রী উপহার দিয়েছেন।[১০৪] এই কণ্বকেই সম্ভবত আরেক জায়গায়[১০৫] কৃষ্ণ বলা হয়েছে এবং তিনিই হয়তো এই দেবদ্বয়ের উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলোর ( ঋক্ ৮।৮৫ ও ৮৬ ) কবি। তাঁকেই আবার সম্ভবত 'ঋগ্‌বেদে'র প্রথম মণ্ডলে 'কৃষ্ণ ঋষি'-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৬] তেমনি 'ঋগ্‌বেদে'র একটি সূক্তে গায়ক হিসেবে উল্লিখিত দীর্ঘতমাও সম্ভবত কৃষ্ণকায় ছিলেন, যদি অবশ্য সে অনুযায়ী তাঁর নামকরণ হয়ে থাকে।[১০৭] গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো 'ঋগ্‌বেদে'র বেশ কয়েকটি জায়গায় তিনি তাঁর মাতৃকুলজ্ঞাপক মামতেয় নামেই পরিচিত। পরের দিকের একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে তিনি উশিজ্ নামে এক দাসকন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে কাক্ষীবন্তের জন্ম দেন।[১০৮] এর পরেও 'ঋগ্‌বেদে'র প্রথম মণ্ডলে পুরোহিত দিবোদাসদের কয়েকটি নতুন সূক্তের রচয়িতা বলা হয়েছে।[১০৯] তাঁদের নাম থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁদের জন্ম দাসকুলে।[১১০] আবার ১০।৪২-৪৪ সূক্তের রচয়িতা অঙ্গিরাকে 'কৃষ্ণকায়' বলা হয়েছে।[১১১] ঐ ধরনের উল্লেখের

কর কমমেমোরেশন ভল্যুম', পৃ ১১৬-৮৮ দ্র. ; ধর্মানন্দ কোসম্বী, 'ভগবান্ বুদ্ধ', পৃ ২৪।

১০৩ কোসম্বী, 'জার্নাল অফ দ বম্বে ব্রাঞ্চ অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২২ পৃ ৩৫।

১০৪. ঋগ্ ১।১১৭।৮. কিন্তু সায়ণ ব্যাখ্যা দেন শ্যাবায়' অর্থে 'কুষ্ঠরোগেণ শ্যামবর্ণায়'।

১০৫. ঋগ্ ৮।৮৫।৩-৪। ঐ, ৮।৫০।১০-এ কণ্বেরও উল্লেখ আছে।

১০৬. ঐ, ১।১১৬।২৩ ; তুলনীয় ১।১১৭।৭। পার্জিটার মনে করেন যে কাণ্বায়নরাই একমাত্র যথার্থ ব্রাহ্মণ। 'ডাইনাস্‌টিস্ অফ দ কলি এজ', পৃ ৩৫।

১০৭ ঐ, ১।১৫৮।৬ ; আম্বেডকর, 'হু ওয়্যার দ শূদ্রস্ ?' পৃ ৭৭।

১০৮. 'বৈদিক ইনডেক্স', ১ম, পৃ ৩৬৬। শ. ব্রা. ১৪ ৯।৪।১৫-য় বেদের বিদ্যাধিকারী কৃষ্ণবর্ণের সন্তানের জন্য এক মায়ের আকাঙ্ক্ষার কথা আছে। ১০৯. ঋগ্ ১।১৩০।১০।

১১০. হিলেব্রাণ্টের মত, 'বৈদিক ইনডেক্স', ১ম, পৃ ৩৬৩।

১১১ কোসম্বী, 'জার্নাল অফ দ বম্বে ব্রাঞ্চ অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২৬, পৃ ৪৪।

অধিকাংশই পাওয়া যায় 'ঋগ্‌বেদে'র পরবর্তী অংশে, তাই মনে হয় যে ঋগ্‌বেদীয় পর্বের শেষভাগে কিছু কৃষ্ণকায় ঋষি ও দাস-পুরোহিত নবগঠিত আর্য সম্প্রদায়ে সঙ্গোপনে নিজেদের স্থান করে নিচ্ছিলেন।

মনে হয়, এইরকমভাবে, নতুন সমাজে কিছু বিজিত অধিপতিকেও উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছিল। দাস-অধিপতি বল্‌বূথ ও তরুক্ষর দান গ্রহণ করেন পুরোহিতরা, আর তার ফলে সেই অধিপতিরা অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন ও নতুন বর্গের মধ্যে তাঁদের মর্যাদাও স্বীকৃত হয়। দাসরাও যে দান করার মতো অবস্থায় ছিলেন ও তাঁদের উদারহস্ত দাতা হিসেবে দেখা হতো সেটা অনুমান করা যায় 'দাস' এই বিশেষ্য পদটি যে-'দস্‌' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন তার অর্থ থেকে।[১১২] প্রতর্দন দৈবোদাসি যে ইন্দ্রলোকে গিয়েছিলেন আরও পরের যুগের সাহিত্যে সেই ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে।[১১৩] ইতিহাসের দিক দিয়ে ইন্দ্র ছিলেন আর্য আক্রমণকারীদের উপাধিধারী শাসক। সুতরাং পরের যুগেও এই আত্তীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

পূর্বতন সমাজের যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁদের সঙ্গে আর্যসাধারণের ('বিশ্‌') আত্তীকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গোড়ার দিকের রচনাগুলোতে প্রায় কোন আলোকপাতই করা হয়নি। এমন হতে পারে যে আর্য সমাজের যাঁরা চতুর্থ বর্ণ বলে পরিচিত তাঁদের সেই পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু "পুরুষসূক্ত" বাদ দিলে 'ঋগ্‌বেদে'র যুগে শূদ্রবর্ণের অস্তিত্বের অন্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদীয় যুগের গোড়ার দিকে অবশ্য ছোট একটি দাসী সম্প্রদায় ছিল। মনে হয়, আর্যরা যখন শত্রুপক্ষের পুরুষদের হত্যা করতেন, তখন তাঁদের স্ত্রীরা পরিণত হতেন দাসীতে। কথিত আছে যে, পুরুকুৎসের পুত্র অসদস্যু পঞ্চাশজন নারী দান করেছিলেন।[১১৪] দাসীর অস্তিত্বের আরও উল্লেখ পাওয়া যায় 'অথর্ববেদে'র গোড়ার দিকের অংশগুলোতে। সেখানে দাসীদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাদের হাত থাকে ভিজে, তারা শিল-নোড়ায় বাটনা বাটে[১১৫] আর গোবর দিয়ে ঘুঁটেও দেয়।[১১৬] এর থেকে বোঝা যায়, তাঁদের দিয়ে গৃহস্থালির কাজই করানো হতো। এই সংহিতাতেই প্রথম কালো দাসীর উল্লেখ আছে।[১১৭] সুতরাং এই সবকিছু থেকে বোঝা যায়, আদি বৈদিক সমাজে দাসীদের গৃহকর্মে নিয়োগ করা হতো। 'দাসী' শব্দের ব্যবহার থেকে এও স্পষ্ট যে এঁরা ছিলেন বিজিত 'দাস'দের স্ত্রী।

১১২. 'দাশ্‌', 'দাস্‌' দ্র মনিয়ের-উইলিয়ামস্‌, 'সং—ইং ডিক্‌শনারি'।

১১৩ 'কৌষীতকি উপনিষদ্‌,' ৩ ১। 'বেদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ৩০-এ উদ্‌ধৃত।

১১৪ ঋগ্‌ ৮।১৯।৩৬।

১১৫. 'যৎবা দাস্যার্দ্রহস্তা সমংক্তা উলূখলং মুষলং শুম্ভতাপঃ'। অথর্ব ১২।৩।১৩; পৈপপ্পলাদ ১৭।৩৭।৩।

১১৬. অথর্ব ১২।৪।৯; পৈপপ্পলাদ ১৭।১৬।৯-এ একই জায়গায় 'দাসী' শব্দটির পরিবর্তে 'দেবী' বসেছে।

১১৭. অথর্ব ৫।১৩।৮।

ক্রীতদাস অর্থে 'দাস' শব্দের ব্যবহার 'ঋগ্‌বেদে'র শেষ অংশেই বেশি পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলে দুটি,[১১৮] দশম মণ্ডলে একটি,[১১৯] এবং অষ্টম মণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত খিল (বালখিল্য নামক) সূক্তগুলোর একটিতে[১২০] এই শব্দটি এসেছে। গোড়ার দিকে এই ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায় একমাত্র অষ্টম মণ্ডলে।[১২১] মনে হয়, 'ঋগ্‌বেদে' এমন আর কোন শব্দ নেই যার অর্থ হতে পারে ক্রীতদাস। অর্থাৎ একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায় যে পুরুষ-দাস ঋগ্‌বেদীয় পর্বে প্রায় ছিলই না।

ঋগ্‌বেদীয় যুগের পরের দিকে দাসদের সংখ্যা ও প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখগুলো থেকে শুধু অস্বচ্ছ ধারণাই করা যায়। ''বালখিল্য''য় ১০০ জন দাসের উল্লেখ আছে, যাদের রাখা হয়েছে গাধা ও ভেড়ার সঙ্গে একই পর্যায়ে।[১২২] পরবর্তীকালের একটি উল্লেখে 'দাসপ্রবর্গ'' শব্দটির অর্থ হতে পারে সম্পদ বা দাস-সমুদয়।[১২৩] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ঋগ্‌বেদীয় যুগের শেষদিকে দাসদের সংখ্যা বাড়ছিল। কিন্তু তাঁদের যে উৎপাদনমূলক কাজে লাগানো হতো এমন কোন প্রমাণ নেই। মনে হয় তাঁরা ছিলেন অনেকটা গৃহভৃত্য ধরনের, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় প্রভুদের তাঁরা সেবা করতেন। এইসব প্রভুদের বেশিরভাগই ছিলেন যোদ্ধা, শুধু একটিমাত্র উল্লেখে দেখা যায় যে ঋষি দীর্ঘতমার দাস ছিল।[১২৪] গবাদি পশুর সঙ্গে দাসদেরও অবাধে হস্তান্তর করা যেত।[১২৫] মনে হয় ঋণ শোধ করতে না পারলে সেই খাতক দাসে পরিণত হতেন।[১২৬] কিন্তু 'দাস' এই নামটি থেকে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধই ছিল বৈদিক যুগে দাসত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

দাস ছিলেন কারা? সাধারণত দস্যুদের সঙ্গে তাঁদের গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু 'দস্যু-হত্যা' শব্দটি থাকলেও 'দাস-হত্যা' শব্দটি নেই, আর্য-জনগোষ্ঠীগুলোর নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে সহকারী সেনা হিসেবে দাসদের উপস্থিতি,[১২৭] 'অপ-ব্রত', 'অন্য-ব্রত' ইত্যাদি হিসেবে দাসদের অনুল্লেখ, 'দাস-

১১৮. ঋগ্‌ ১ ৯২'৮, ১৫৮ ৫. গেলডনার এর অনুবাদের ভিত্তিতে।

১১৯. ঐ, ১০ ৬২।১০।  ১২০ ঐ, ৮ ৫৬ ৩।

১২১. ঐ, ৭ ৮৬।৭। হিল্লেব্রান্ট এটিকে সংশয়জনক মনে করেন। ভুল করে তিনি 'সম্ভবত', 'ফিল্লাইশ্‌ট্‌' (vielleicht) জুড়ে দিয়েছেন ৭।৮৬।৩-এ, আসলে যেটি হওয়া উচিত ৭।৮৬।৭। 'ৎসাইটশ্রিফ্‌ট্‌ ফ্যুর ইণ্ডোলগি উণ্ড ইরানিস্টিক', খণ্ড ৩, পৃ ১৬।

১২২. 'শতং মে গর্দভানাং শতমূর্ণাবতীনাম্‌; শতং দাসা অতি স্রজঃ'। ঋগ্‌ ৮।৫৬।৩। 'শত' একটি প্রথাগত অংক হতে পারে।

১২৩. 'উষস্তমশ্যাং যশসং সুবীরং দাসপ্রবর্গং রয়িমশ্ববুধ্যম্‌'। ঋগ্‌ ১ ৯২ ৮।

১২৪ ঋগ্‌ ১।১৫৮।৫-৬।

১২৫. 'উত দাসা পরিবিষে স্মদ্দিষ্টী গোপরীণসা; যদুস্তুর্বশ্চ মামহে'। ঋগ্‌ ১০।৬২।১০।

১২৬. ঐ, ১০।৩৪ ৪।  ১২৭. পৃ ১৫-১৬ দ্রষ্টব্য।

বিশ্' শব্দটির তিন জায়গায় উল্লেখ,[১২৮] এবং সর্বোপরি শকদের একটি জনগোষ্ঠী, ইরাণীয় 'দহ্'দের সঙ্গে দাসদের সনাক্তকরণ[১২৯]—এইসব কারণে দাসরা দস্যুদের (যাঁদের সঙ্গে আর্যদের প্রায় কোন মিলই নেই) থেকে স্পষ্টতই পৃথক্।[১৩০] ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলোয় 'দস্যু'র কোন সবর্গ শব্দ নেই। প্রাচীন পারসী এবং আবেস্তীয় ভাষায় আমরা 'দহ্যু' শব্দটি পাই। কিন্তু তার অর্থ জনবসতি, 'জেলা, দেশ, ভূমি'।[১৩১] বিপরীতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় 'দস্যু' শব্দটি ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক নয়।[১৩২] অন্যদিকে আবার 'দাস' শব্দটির সবর্গ রয়েছে বেশ কয়েকটি ভাষায়। গ্রীক ভাষায় আছে 'দৌলোস' ('সেরউইউস'), মাইকেনীয় 'দোএরো' শব্দটি বর্তমানে যার সাক্ষ্য। এটি ইরানীয় 'দহ' থেকে এসে থাকতে পারে।[১৩৩] 'দহ' শব্দটি আবার ইন্দো-ইওরোপীয় 'দোস্' শব্দের সূচক।[১৩৪] এই সমস্ত ভাষাতেই শব্দটির অর্থ পুরুষ অথবা বীর। শেষ অবধি শব্দটিতে কিছুটা নৃকুলগত তাৎপর্য চলে আসে। 'দাআই', 'দাওই', 'দোআই'—এই নানা নামে পরিচিত এক মানব-গোষ্ঠীর কথা গ্রীকদের জানা ছিল।[১৩৫] এইচ. ডবলু. বেইলি মনে করেন, ভারতীয় রচনাদিতে দাস শব্দটি আদৌ কোন ব্যক্তিনাম নয়।[১৩৬] কিন্তু 'ঋগ্‌বেদে'র অজস্র উল্লেখে আর্যদের শত্রু অথবা মিত্রপক্ষ হিসেবে দাসদের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের 'দাস' শব্দটি 'দস্' ধাতু নিষ্পন্ন, যার অর্থ 'ভয়ানক আচরণ করা'।[১৩৭] তাঁরা হয়তো জাতিগতভাবে সমসত্ত্ব ছিলেন না, কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁরাও বৈদিক যুগের এক মানবগোষ্ঠী। ইরাণীয় 'দহ' এই নৃকুলগত নামে যে একটি মানবগোষ্ঠী ছিলেন, অধ্যাপক বেইলি নিজেই তা দেখিয়েছেন। পরে এঁদেরই প্রাচীন পারস্য ভাষায় 'দহা'-রূপে পাওয়া যায়; জারেক্সেস-এর একটি প্রত্নলেখে এঁদের 'শক'-এর আগে রাখা

১২৮. ঋগ্ ২ ২১১৪, ৪।২৮।৪ ও ৬।২৫।২। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন, ঋগ্ ৬।২৫।২-এ দাসের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে দাসেরা বৈশ্যদের মর্যাদা পান ('স্টাডিজ ইন হিন্দু সোশ্যাল পলিটি', পৃ ৩৩৪)। কিন্তু বৈশ্যরা যেহেতু তখন সামাজিক শ্রেণী হিসেবে ছিলেন না, ফলে 'বিশ্'কে আমাদের আলোচনায় গোষ্ঠীরূপে ব্যাখ্যা করাই সুবিধা-জনক।

১২৯. জাতি ও ভাষাগত দিক থেকে 'দহ'দের খুব নিকট সম্পর্ক থাকতে পারে ইরাণীদের সঙ্গে, কিন্তু এটি খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় না। ('বৈদিক ইনডেক্স', ১ম, পৃ ৩৫৭. টী. ২০)। র্‌সিমার হেরোডোটাস-এর 'দাওই' বা 'দাঅই'-কে (১ম, ১২৬) তুরাণীয় উপজাতি বলেছেন। (ঐ)

১৩০. বলা হয়েছে দস্যু-ভিলদের উর্ধ্বে দাস ও আর্যরা এক সামাজিক স্তরে ছিলেন। শেফার, 'এথনোগ্রাফি ইন্ এনশেন্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৩২।

১৩১. এইচ. ডবলু. বেইলি, "ইরানীয়ান আর্য—অ্যাণ্ড দহ—". 'ট্রানজ্যাক্‌শন্স অফ দ ফিলোলজিক্যাল সোসাইটি', ১৯৫৯, পৃ ১১০।

১৩২. ঐ, পৃ ১১২। ১৩৩. ঐ, পৃ ১০৯। ১৩৪. ঐ।

১৩৫. ঐ। ১৩৬ ঐ, পৃ ১০২। ১৩৭. ঐ, পৃ ১১৪।

হয়েছে।[১৩৮] ঠিকই বলা হয়েছে যে প্রাচীন ভারতীয় 'দস্' ধাতু নিন্দাসূচক হয়ে ওঠে পরবর্তী পরিবেশের কারণে।[১৩৯]

দাসরা সম্ভবত ছিলেন মিশ্র ইন্দো-আর্যজাতির এক অগ্রবাহিনী। কাসাইটরা যখন ব্যাবিলোনিয়ায় দেখা দেন (আনু. খৃপূ ১৭৫০) তাঁরা সেই সময়েই ভারতে আসেন। এর সঙ্গে যোগ স্থাপন করা যায় সেই পুরাতাত্ত্বিক প্রকল্পের যাতে ধরে নেওয়া হয় যে উত্তর পারস্য থেকে নানা মানবগোষ্ঠী ভারতের দিকে এসেছিল একটিই নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, অথবা দুটি মূল ধারায় এবং তাঁদের আগমন প্রথম শুরু হয় খৃপূ ২০০-এর অল্প কিছু পরেই।[১৪০] দাসরা ছিলেন ঋগ্বেদীয় মানবগোষ্ঠীর ভাষা ও অন্যান্য কিছু সাংস্কৃতিক উপাদানের অংশভাক্, তাই তাঁদের সঙ্গে মানিয়ে চলাই ছিল ঋগ্বেদীয় মানবগোষ্ঠীর নীতি। দিবোদাস, বল্বূথ ও তরুক্ষের মতো দাস-অধিপতি-দের তাঁরা অনায়াসেই নিজেদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এই কারণেই, আর্য জনগোষ্ঠীগুলোর আন্তঃ-সংঘাতের সময় দাসদের প্রায়শই তাঁদের মিত্র রূপে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় যে 'দাস' শব্দটি ইন্দো-আর্যদের সজাতীয় মানবগোষ্ঠীর থেকেই পাওয়া, ভারতের অনার্য অধিবাসীদের থেকে নয়। ইরাণে যাঁদের প্রশংসা করা হতো, ভারতে তাঁদের নিন্দা করার কারণ বোধহয় পূর্বাগত ইন্দো-আর্য হিসেবে তাঁরা উত্তরাগত একই লোকদের পথে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করেছিলেন। 'ঋগ্বেদে'র পরবর্তী পর্বে সম্ভবত 'দাস' শব্দটি নির্বিচারে ব্যবহার করা হতো। মূল ইন্দো-ইওরোপীয় 'দাস'-দের মধ্যে তখনও যাঁরা জীবিত ছিলেন এই শব্দটি দিয়ে শুধু যে তাঁদেরই বোঝানো হতো তা-ই নয়, প্রাগ্ আর্য দস্যু, রাক্ষস জাতীয় লোক এবং সেই শ্রেণীর আর্য যাঁরা গরীব হয়ে গেছেন অথবা স্বগোষ্ঠীর অন্তঃকলহের দরুন যাঁদের বশীভূত করে ফেলা হয়েছে—বোঝানো হতো তাঁদেরও।

আর্যদের সংখ্যা যদি অল্প হতো তাহলে তাঁরা উচ্চশ্রেণীদের নিয়ে গঠিত নতুন এক সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী হিসেবে বিজিত জাতিগুলোর উপর নিজেদের প্রভুত্ব আরোপ করতে পারতেন, যেমন হিট্টাইটরা করেছিলেন আনা-তোলিয়ায় এবং কাসাইট ও মিত্তানীরা মেসোপটেমিয়ায়। কিন্তু ইরাণ এবং ভারত, উভয়ক্ষেত্রেই ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থাবিচারে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যায় মানুষের আগমন হয়েছিল। আর্যরা সংখ্যালঘু হিসেবে ভারতবর্ষে নিজেদের স্থাপন করেছিলেন—'ঋগ্বেদে'র সাক্ষ্য এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ বিপক্ষে

১৩৮. ঐ, পৃ ১০৯। ১৩৯. ঐ, পৃ ১১৩।

১৪০. স্টুআর্ট পিগট, 'অ্যান্টিকুইটি', খণ্ড ২৪, সংখ্যা ৯৬, পৃ ২১৮। লালের মতে, ২০০০ খৃপূর প্রথমার্ধে শাহী টুম্প (আধুনিক বালুচিস্তান)-এ এক মানবগোষ্ঠী নির-বচ্ছিন্নভাবে আসে এবং ঐ সহস্রাব্দেরই দ্বিতীয়ার্ধে আসে ফোর্ট মুনরো (আফ-গানিস্তান) এ। 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া', সংখ্যা ৯, পৃ ৯০-৯১।

যায়।[১৪১] বৈদিক রচনায় আমরা বহুসংখ্যক আর্য জনগোষ্ঠীর চলাচল এবং বসতি স্থাপনের কথা পাই।[১৪২] ১৯৪৭ থেকে[১৪৩] যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য ও আবিষ্কার চলছে, তার ফলে আর্যদের সনাক্ত করার ব্যাপারে প্রভূত তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। যদি আমরা ধরে নিই যে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি প্রবাহে এই নবাগতরা এসেছিলেন, তাহলে এই ধরনের বেশ কয়েকটি তত্ত্বের মধ্যে সঙ্গতি আনা যায়। খৃপূ ১৫০০ থেকে ৫০০ অবধি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে তাঁদের বস্তুগত সংস্কৃতির প্রচুর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে পুরোনো ঋগ্বেদীয় অবশেষ যদিও সনাক্ত করা শক্ত, তবুও গন্ধার সমাধি-গুলো খৃপূ ১৮০০ নাগাদ আর্যদের প্রথম আগমনের সূচক হলেও হতে পারে। সে যাই হোক, পূর্ব-পাঞ্জাব হরিয়ানা, উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, রাজস্থান এবং পাকিস্তানের সংলগ্ন এলাকায় প্রাপ্ত চি. ধূ. মৃ. (চিত্রিত ধূসর মৃৎভাণ্ড, পেণ্টেড গ্রে ওয়্যার, সংক্ষেপে পি জি ডবল্যু) থেকে মনে হয় যে আনুমানিক খৃপূ ১০০০ থেকে ৫০০-র মধ্যে নবাগত মানবগোষ্ঠী ঐসব এলাকায় ব্যাপক হারে বসতি স্থাপন করেছিলেন। উচ্চ-গঙ্গা এবং শতদ্রু অববাহিকায় প্রায় ৩১৫টি চিত্রিত ধূসর মৃৎভাণ্ডের ক্ষেত্র পাওয়া যায়।[১৪৪] সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীর তীরে খননের ফলে আরও প্রায় ৩০০ চি.ধূ.মৃ. ক্ষেত্র পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে বোধ হয় ঐসব ক্ষেত্রের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে।[১৪৫] যেসব জায়গায় খননকার্য হয়েছে তার থেকে দেখা যায়, প্রায় দু-তিন শতাব্দী ধরে সেখানে লোকবসতি ছিল।

আবার, ভারতবর্ষের বৃহত্তর অংশ জুড়ে আর্যভাষাগুলোর ব্যাপ্তি থেকে ধরে নিতে হয় যে আর্যভাষীরা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য বৈদিক যুগ থেকেই অনেক ভাবী ('প্রোটো')-মুণ্ডা এবং 'দ্রাবিড়' গোষ্ঠীর শব্দ আছে। কিন্তু উত্তর-ভারতের প্রাগ্-আর্য আদি অধিবাসীরা নবাগতদের স্রোতে এমনভাবে ভেসে গিয়েছিলেন যে তাঁদের ভাষাও তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি। পরে দেখানো হবে যে উত্তর-ভারতে শূদ্র ও বৈশ্যরা ছিলেন জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ, কিন্তু এমন কিছুই নেই যা থেকে বলা যায় যে তাঁরা অনার্যভাষী ছিলেন। অপরপক্ষে, পরবর্তী বৈদিক যুগে শূদ্রেরা যে আর্যভাষা বুঝতেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায় যজ্ঞের সময়ে তাঁদের সম্বোধনের রীতি থেকে।[১৪৬] 'মহাভারতের একটি কাহিনী এই

১৪১. 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ২২৫, টী. ৬৭-তে 'বর্ণ' শব্দের অন্তর্গত।

১৪২. ঋগ্বেদীয় জনগোষ্ঠীর জন্য দ্র. 'বৈদিক এজ', পৃ ২৪৫-৪৮ ; এবং পরবর্তী বৈদিক জনগোষ্ঠীর জন্য পৃ ২৫২-৬২।

১৪৩. বি বি লাল, "প্রোটোহিস্টরিক ইনভেস্টিগেশন", এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', সংখ্যা ৯, পৃ ৯৭।

১৪৪. বিদ্যা ত্রিপাঠীর 'দ পেন্টেড্ গ্রে ওয়্যার', পরিশিষ্ট ১-এর ভিত্তিতে।

১৪৫. ড. সুরজ ভান ও তাঁর সহকর্মীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

১৪৬. শ. ব্রা ১।৪।১১-১২।

প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। "ব্রহ্মা প্রথম চার-বর্ণের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন সরস্বতীকে, বেদ যাঁর অন্তর্গত। কিন্তু শূদ্ররা তাদের লোভের জন্য 'অজ্ঞানতা'র অন্ধকারে পতিত হয় এবং বেদে অধিকার হারায়।"[১৪৭] ভেবার মনে করেন, এই অংশটির অর্থ হলো শূদ্ররা পুরাকালে আর্যদের ভাষায় কথা বলতেন।[১৪৮] এরকম হতেই পারে যে কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে আর্যদের মুখের ভাষা গ্রহণ করেছিলেন, যেমন করেছেন আধুনিককালে বিহারের কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তাঁরা নিজেদের ভাষা ছেড়ে কুর্মালী, সদানা প্রভৃতি আর্য কথ্যভাষা বরণ করেছেন, কিন্তু যাঁদের ভাষা তাঁরা নিলেন তাঁদের তুলনায় এঁদের নিজেদের সংখ্যা নিশ্চয়ই ছিল খুব কম। এমনকি আধুনিক যুগেও যখন আর্যভাষী মানবগোষ্ঠী তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, তখনও তাঁরা অনার্য ভাষাগুলোকে একেবারে উৎখাত করতে পারেননি, বরং ক্ষেত্রবিশেষে সেগুলো প্রবল বৃদ্ধির ক্ষমতাই দেখিয়েছে।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এমন বললে অতিসাহসের পরিচয় হবে না যে, আর্যরা প্রচুর সংখ্যায় ভারতে এসেছিলেন। শত্রুপক্ষের জনগোষ্ঠী-গুলোর সঙ্গে সম্ভাব্য মিশ্রণের পরেও যোদ্ধা ও পুরোহিতরা ছিলেন আর্য জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। কালক্রমে আর্যদের অধিকাংশই অন-ভিজাত বা অর্ধ-দাসের পর্যায়ে পর্যবসিত হওয়ার দুর্ভাগ্য এড়াতে পারলেন না। কিন্তু ঋগ্‌বেদীয় পর্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজনের এই প্রক্রিয়া ছিল একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায়। মূলত জনগোষ্ঠীমূলক, পশু-পালক একটি সমাজে. উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বা এমনকি গবাদি পশু সংগ্রহের নির্দিষ্ট ও নিয়মিত উপায় কদাচিৎ সামরিক নেতাদের হাতে থাকে, যা দিয়ে তাঁদের নিজেদের তথা পুরোহিত শ্রেণীভুক্ত সমর্থকদের জীবনধারণ ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁদের আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় ছিল সময়বিশেষে উপঢৌকন আদায়, ও যুদ্ধে পরাজিতদের লুণ্ঠিত সম্পত্তি। দ্বিতীয়টি সম্ভবত জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হতো।[১৪৯] উদ্বৃত্ত জাতীয় কোনকিছু সংগ্রহ বা গ্রহণের রীতির নির্দেশক একটিই শব্দ 'ঋগ্‌বেদে' পাওয়া যায়ঃ 'বলি'। শব্দটি দিয়ে সাধারণত দেবতাকে নিবেদিত উপঢৌকন বা শ্রদ্ধার্ঘ্যই বোঝাত।[১৫০] কিন্তু রাজাকে প্রদত্ত কর

১৪৭. বর্ণশ্চত্বার এতে হি যেষাং ব্রহ্ম সরস্বতী, বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বা লোভাৎ ত্বজ্ঞানতাং গতঃ'। "শান্তিপর্ব", ১৮১।১৫।

১৪৮. 'ইন্ডিশে স্টুডিয়েন', ২য়, পৃঃ ১৯৪ টী।

১৪৯. রামশরণ শর্মা, 'জার্নাল অফ বিহার রিসার্চ সোসাইটি,' খণ্ড ৩৮, পৃঃ ৪৩১-৩৫, খণ্ড ৩৯, পৃঃ ৪১৮ ১৯।

১৫০ ঋগ্‌ ১।৭০।৯ ; ৫ ১।১০ ; ৮।১০০।৯।

অর্থেও শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।[১৫১] মনে হয় 'বলি' দেওয়া হতো স্বেচ্ছায়।[১৫২] কারণ এটি সংগ্রহের জন্য না ছিল কোন নিয়মিত ব্যবস্থাপনা, না বেদোত্তর কালের 'বলিসাধক'-এর মতো কোন সংগ্রাহক, যিনি লোকের থেকে এটি সংগ্রহ করবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জনগোষ্ঠীয় জ্ঞাতিবর্গ তাঁদের অধিপতির উপর আস্থা জানাতেন, স্বেচ্ছায় কিছু দান করতেন। তার পরিবর্তে তিনি তাঁদের একের পর এক যুদ্ধজয়ের নেতৃত্ব দিতেন এবং যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটা ভাগও দিতেন। কেবল পরাজিত বৈরী জনগোষ্ঠীদেরই বোধহয় 'বলি' বা বশ্যতাজ্ঞাপক উপঢৌকন দিতে বাধ্য করা হতো। বড়জোর গৃহকর্ম বা সম্ভবত গবাদি পশু দেখাশোনার জন্য রাজন্যবর্গ বা পুরোহিতরা দাসীদের দিয়ে শ্রম করিয়ে নিতেন। মনে হয় ঋগ্বেদীয় পরিবারের লোকে নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করতেন, কারণ ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলোতে বেতন-সূচক কোন সাধারণ শব্দই নেই। 'ঋগ্বেদে' কৃষি-দাস বা বেতনভুক্ বা ভাড়া-করা শ্রমিক ('কর্মকর')-এর কথাও জানা নেই। বেদোত্তর কালে কৃষিজ কর্মকাণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এঁদের দেখা যায়।[১৫৩] জনগোষ্ঠীর অধিপতিরা তাঁদের অনুগামী যোদ্ধা বা পুরোহিতদের ভূমিদান করছেন এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তার কারণ বোধ হয় এই যে, জমি থাকত সমগ্র জনগোষ্ঠীর হাতে। ঋগ্বেদীয় সমাজে সকলের—নারী বা পুরুষ[১৫৪]— জন্য বৈরদেয় ('ভেরগেল্ট্') ছিল একই ঃ ক্ষতিপূরণ বাবদ একশটি গাভী।[১৫৫] এর থেকেই ঋগ্বেদীয় সমাজের প্রায় সমতাধর্মী চরিত্র আরও স্পষ্ট হয়।

মূলত, ঋগ্বেদীয় আর্যসমাজের বৈশিষ্ট্যই এই যে এর সদস্যদের মধ্যে প্রখর শ্রেণীবিভাজন ছিল না। সাধারণত, আদি জনগোষ্ঠীয় সমাজগুলোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।[১৫৬] মর্যাদাভেদ হয়তো ছিল, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ছিল না। বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে যেমন ভাবা হয়েছে তা হয়তো এই পর্বেরই প্রসঙ্গে। সেখানে বলা হয়েছে, ত্রেতা যুগের

১৫১ 'বলিহৃৎ' (উপঢৌকন দেন) আছে ঐ, ৭।৬।৫ ; ১০।১৭৩।৬।

১৫২. 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ৬২-তে ৎসিমার-এর মত উদ্ধৃত।

১৫৩. ঋগ্বেদীয় অর্থনীতির বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রামশরণ শর্মা, "ফর্মস্ অফ প্রপার্টি ইন দি আর্লি পোর্শন্স্ অফ দ ঋগবেদ", 'এসেস্ ইন অনার অফ প্রফেসর এস সি সরকার', পৃ ৩৯-৫০।

১৫৪. ঋগ্ ৫।৬১।৮-র মাক্সমূলর-কৃত অনুবাদ, সেক্রেড বুকস্ অফ দি ইস্ট, খণ্ড ৩২, পৃ ৩৬১।

১৫৫. 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ৩০১।

১৫৬. লান্টমান, 'অরিজিন অফ সোশ্যাল ইনইক্যুয়ালিটিস'-এর পৃ ৫-১২-র সব উদাহরণ উদ্ধৃত। তিনি আরও দেখান যে (পৃ ১১) পূর্ব ভারতের নাগা ও কুকিদের মধ্যে শ্রেণীপ্রথা নেই।

আগে অবধি কোন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না, লোভ বা চুরির প্রবণতার মতোও কিছু ছিল না।[১৫৭] কিন্তু প্রাচীনতম যুগেও, ধীরে ধীরে সমরনায়ক ও পুরোহিতদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও বিভিন্ন হস্তশিল্পে নিযুক্ত কারুশিল্পীরাও ছিলেন। তন্তুবায়, চর্মকার, সূত্রধর ও চিত্রকরের জন্য একই সাধারণ শব্দের ব্যবহার থেকে তাঁদের ইন্দো-ইওরোপীয় উৎপত্তিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৫৮] রথ বোঝাতে একটি বহুলপ্রচলিত ইন্দো-ইওরোপীয় শব্দ আছে।[১৫৯] এর থেকে দেখা যায় যে রথ-নির্মাতারা হয়তো ইন্দো-ইওরোপীয়দের পরিচিত ছিলেন। 'রথকার' শব্দটি অবশ্য 'ঋগ্‌বেদে' পাওয়া যায় না, সেখানে গোড়ার কয়েকটি জায়গায় ছুতোরের কাজের উল্লেখ আছে।[১৬০] 'অথর্ববেদ' থেকে মনে হয়, 'রথকার' এবং ধাতু-শিল্পী ('কর্মার')-রা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ-স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সংহিতারই গোড়ার দিকের একটি অংশে দেখা যায় যে নবনির্বাচিত জনৈক রাজা একটি পাতার কবচের ('পর্ণ-মণি') কাছে প্রার্থনা করছেনঃ সেটি যেন তাঁর আশপাশের কুশল ('ধীবান্') রথকার এবং সুদক্ষ ('মনীষী') ধাতুশিল্পীদের মধ্যে তাঁর আধিপত্য সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। এই কারুশিল্পীদের রাজার সহায়ক করা হতো।[১৬১] মনে হয়, স্বয়ং রাজা ও যাঁরা রাজাকে অভিষিক্ত করেন সেই রথচালক ('সূত'), দলপতি ('গ্রামণি')[১৬২] ইত্যাদি রাজার পার্শ্বচর, এবং অনুরূপভাবে যাঁদের রাজার সহায়ক করা হতো তাঁদের সঙ্গে এই কারুশিল্পীরাও এই অর্থে সমপর্যায়ভুক্ত।[১৬৩]

১৫৭. 'বর্ণাশ্রমব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ন সংকরঃ; ন লিপ্সন্তি হি তেঽন্যোন্যান্নানুগৃহ্ণন্তি চৈব হি'। বায়ু পুরাণ ১।৮।৬০; তুলনীয়ঃ 'দীঘ নিকায়', "অগ্‌গঞ্‌ঞসুত্ত"।

১৫৮. কার্ল ডারলিং, 'আ ডিক্‌শনারি অফ সিলেক্‌টেড সিনোনিম্‌স ইন দ প্রিন্সিপাল ইন্দো-ইওরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস্‌', চামড়ার কাজের জন্য দ্র. পৃ ৪০, বয়নের জন্য দ্র. পৃ ৪০৮, তক্ষণ-এর জন্য দ্র. পৃ ৫৮৯-৯০ ও ধাতুর কাজের জন্য দ্র. পৃ ৬২১-৬২২। তুলনীয়ঃ চাইল্ড, 'দি এরিয়ান্‌স্‌', পৃ ৮৬।

১৫৯. চাইল্ড, 'দি এরিয়ান্‌স্‌', পৃ ৮৬ ও ৯২।

১৬০. ঋগ্‌ ৪।৩৫।৬; ৩৬।৫; ৬।৩২।১।

১৬১ 'যে ধীবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ; উপস্তীন্‌পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্‌ কৃণ্বভিতো জনান'। অথর্ব ৩।৫।৬।

ব্লুমফিল্ড-এর অনুবাদই এখানে অনুসৃত। হুইট্‌নি ব্লুমফিল্ড-এর মতো একই অনুবাদ করেছেন, কিন্তু সায়ণের ভাষ্যের ভিত্তিতে তিনি 'উপস্তিন্‌' অর্থে ধরেছেন সহায়ক। সায়ণ 'ধীবানঃ' ও 'মনীষিণঃ' শব্দ দুটি ধীবর ও বুদ্ধিজীবী অর্থে আলাদা বিশেষ্য রূপে নিয়েছেন। 'পৈপপ্পলাদ সংহিতা'র সামান্য পাঠভেদ আছেঃ 'যে তক্ষাণো রথকারা কর্মারা যে মনীষিণঃ; সর্বং স্তান্‌ পর্ণ রন্ধয়োপস্তিং কৃণু মেদিনম্‌'। ৩।১৩।৭।

১৬২. সম্ভবত তিনি ছিলেন গ্রামের সামাজিক ও সামরিক কার্যকলাপের সর্বোচ্চ ব্যক্তি। 'বৈদিক ইনডেক্স', ১ম, ২৪৭। ১৬৩ অথর্ব ৩।৫।৭।

স্পষ্টতই, উল্লিখিত কারুকর্মে আর্যগোষ্ঠীর সদস্যরাই ( 'বিশ্' ) নিযুক্ত ছিলেন এবং [ তার জন্য ] তাঁদের কোন সামাজিক কলঙ্কের ভাগী হতে হতো না। 'ঋগ্বেদে'র পরবর্তী একটি অংশে জনৈক সূত্রধরের বর্ণনায় বলা হয়েছে, পিঠে ব্যথা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঝুঁকে পড়ে কাজ করেন।[১৬৪] তাঁর কাজটা কত কঠিন ছিল এর থেকে হয়তো তার কিছু ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু কোন ঘৃণার ভাব এতে নেই। সূত্রধররা যে নীচু জাতের অথবা আলাদা শ্রেণীর লোক ছিলেন—একথা নিশ্চয়ই বৈদিক যুগ সম্পর্কে সত্য নয়।[১৬৫] 'ঋগ্বেদে'র কামার ( 'কর্মার' ), ছুতোর ( 'তক্ষণ' ), মুচি ( 'চর্মম্ন' )[১৬৬], তাঁতি ও অন্যান্য অনেক বৃত্তি ছিল যথেষ্ট মর্যাদার; স্পষ্টতই 'বিশ্'-এর সম্মানীয় সদস্যরাই তাতে নিযুক্ত থাকতেন। পালি রচনায় কিন্তু তাঁরা শূদ্র রূপে গণ্য হচ্ছেন।[১৬৭] এমন হতেই পারে যে অনার্যরাও স্বাধীনভাবে এইসব কারুকার্য করতেন।[১৬৮] কিন্তু আর্য কারু-শিল্পীদের বহু বংশধর, যাঁরা তাঁদের পুরোনো বৃত্তিতেই থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের যে শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনতম অনুমানটি আছে 'ঋগ্বেদে'র "পুরুষসূক্তে" রক্ষিত সৃষ্টি সংক্রান্ত অতিকথায়। মনে করা হয় যে ঐ সংহিতার দশম মণ্ডলে এটি এক প্রক্ষেপ। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক রচনা,[১৬৯] মহাকাব্য,[১৭০] পুরাণ[১৭১] এবং ধর্মশাস্ত্রে[১৭২] কিঞ্চিৎ পরিবর্তনসহ এটি পুনরুস্থাপিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে আদি পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি, বাহু থেকে রাজন্যের, উরু থেকে বৈশ্যের ও পা থেকে শূদ্রের।[১৭৩] এতে দেখানো হচ্ছে, শূদ্রদেরও একই উৎসজাত বলে ভাবা হতো, সুতরাং তাঁরা আর্যগোষ্ঠীরই একটি অংশ, অথবা অসমসত্ত্ব ব্রাহ্মণ্য সমাজের সাধারণ অতিকথামূলক উৎপত্তি সন্ধান-প্রয়াসের এটি একটি দৃষ্টান্ত। রচনাকালের দিক থেকে "পুরুষসূক্ত" 'অথর্ববেদে'র পর্বের শেষ দিকের।[১৭৪] 'অথর্ববেদে'ও এটি আছে সর্বশেষ অংশে, এমনকি খৃপূ ৮০০ শতকের মতো পরবর্তীকালেরও হওয়া সম্ভব।[১৭৫] মনে হয় এই

১৬৪. ঋগ্ ১।১০৫।১৮।
১৬৫. 'বৈদিক ইনডেক্স' ১ম, পৃ ২৯৭।
১৬৬ ঋগ্ ৮।৫।৩৮।
১৬৭ 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ২৬৫-৬।
১৬৮ তুলনীয় ফিক, 'দ সোশ্যাল অরগানাইজেশন ইন নর্থ-ইস্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৩২৬-২৭।
১৬৯. পঞ্চ. ব্রা. ৫।১।৬ ১০ ; বা. স. ৩১।১১ ; তৈ. আ ৩।১২।৫ ও ৬।
১৭০. 'মহাভারত' ১২।৭৩।৪-৮।
১৭১. বা পু. ১।৮।১৫৫-৯ ; মার্ক. পু, ৪৯ অধ্যায় ; বি. পু. ১।৬ষ্ঠ অধ্যায়।
১৭২. ব. ধসূ. ৪।২ বৌ. ধসূ. ১।১০।১৯।৫-৬ ; তুলনীয় আ. ধসূ. ১।১।১।৭ ; মনু ১।৩১ ; যাজ্ঞবল্ক্য, ৩।১২৬।
১৭৩ ঋগ্ ১০।৯০।১২।
১৭৪. অথর্ব ১৯।৬।৬।
১৭৫. হুইট্নি, হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ৭ম, পৃ [১৪১] ; ৮ম, ৮৯৫-৯৮।

সূক্তে জনগোষ্ঠীমূলক সমাজ ভেঙে শ্রেণীসমাজে পরিণত হওয়ার সপক্ষে একটি তাত্ত্বিক যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। ঋগ্‌বেদীয় পর্বেই শ্রম-বিভাজন অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একই পরিবারের লোকে কবি, ভিষক্‌ এবং উপলপ্রক্ষিণী (জাঁতায় যব ইত্যাদি ভাঙেন) রূপে কাজ করলেও[১৭৬] তাঁদের মধ্যে কোন সামাজিক বিভাজন ছিল না। 'অথর্ববেদ'-পর্বের শেষ দিকে অবশ্য কর্ম-বিভাজন ক্রমেই হয়ে উঠতে থাকল (সামাজিক) স্তর-বিভাজন এবং জনগোষ্ঠী ও পরিবারগোষ্ঠী ক্রমে সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গেল। মনে হয়, শূদ্র জনগোষ্ঠী, বা আর্যদের যে অংশ দাসসুলভ কাজ করতেন, তাঁদের স্থান নির্ধারিত হলো চতুর্থ বর্ণে ; আর এই অর্থে চতুর্বর্ণের একটি সাধারণ উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনীর মধ্যে খানিকটা সত্য থাকতেও পারে। এমনও হতে পারে যে, নতুন উর্বর গাঙ্গেয় বসতি এলাকায় আর্য শূদ্রদের বংশধররা ক্রমশ সংখ্যাবৃদ্ধি করতে থাকলেন, কিন্তু সেই বৈদিক যুগ থেকেই বিভিন্ন কুলের বহু আদিবাসীদের ক্রমাগত শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল।[১৭৭] এক সাধারণ উৎস থেকেই বর্ণগুলোর উৎপত্তি—এই প্রাচীন পরম্পরা দিয়ে অবশ্য অনার্য জনগোষ্ঠীগুলোর ব্রাহ্মণ্য-সমাজে অন্তর্ভুক্তি ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু উপযোগী কল্পকাহিনীরূপে এটি কার্যকর হতে পারত। ভিন্নধর্মী উপাদানগুলোকে অঙ্গীভূত ও একত্র করতে সাহায্য করতে পারত এই কাহিনী। আর শূদ্ররা যেহেতু আদিপুরুষের পা থেকে জাত, তাই ব্রাহ্মণ্য-সমাজে তাঁদের দাসবৎ অবস্থানও ন্যায্য বলে প্রমাণ করা যেত।

তিন উচ্চবর্ণের সেবার ভারপ্রাপ্ত একটি সামাজিক শ্রেণীরূপে শূদ্রদের কখন প্রথম দেখা গেল ? ঋগ্‌বেদীয় সমাজে গৃহকর্মের জন্য কিছু দাস-দাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কখনোই এত বেশি ছিল না যে শূদ্রদের একটি দাস-বর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। সামাজিক শ্রেণী হিসেবে শূদ্রদের আদি তথা একমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় "পুরুষসূক্তে"র একটি অংশে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এটি আবার দেখা যায় 'অথর্ববেদে'র ঊনবিংশ কাণ্ডে।[১৭৮] ঐ একই কাণ্ডে আরও দুটি অংশে, মনে হয়, চতুর্বর্ণের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটিতে 'দর্ভ' (ঘাস)-এর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে ঃ তিনি যেন অর্চনাকারীকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও আর্যদের কাছে প্রিয় করে তোলেন।[১৭৯] এখানে আর্য শব্দটি সম্ভবত বৈশ্য অর্থে বসেছে। দ্বিতীয় অংশে দেবতা, রাজা, তথা শূদ্র ও আর্য উভয়েরই প্রিয় হবার বাসনা

১৭৬. ঋগ্‌ ৯ ১১২।৩।

১৭৭. ওল্ডেনবের্গ, 'ৎসাইট্‌শ্রিফ্‌ট ডে র ডয়েটশেন মোর্গেনলান্ডিশেন গেসেলশাফ্‌ট' ৫১, পৃ ২৮৬।

১৭৮. অথর্ব ১৯।৬।৬।

১৭৯. ঐ, ১৯।৩২।৮ ; পৈপ্প ১২ ৪।৮।

প্রকাশ করা হয়েছে।[১৮০] মনে হয় দেবতারা ব্রাহ্মণের সপর্যায়ী, আর্যরা বৈশ্যের।[১৮১] মনে রাখতে হবে, এইসব অংশই আছে ঊনবিংশ কাণ্ডে। ঊনবিংশ এবং বিংশ কাণ্ড 'অথর্ববেদে'র মূল সংহিতার পরিশিষ্ট।[১৮২] এর আগের একটি অংশে ব্রাহ্মণ, রাজন্য বা শূদ্রের তৈরি একটি বরণমণির (যাদু) উল্লেখ আছে। তার একটি মন্ত্র উল্টে মন্ত্রকারের উপরেই কাজ করতে পারে।[১৮৩] এটি আছে 'অথর্ববেদে'র দ্বিতীয় বড় বিভাগে (অষ্টম-দ্বাদশ কাণ্ড)। হুইট্‌নি-র মতে এই বিভাগটি 'অবশ্যই পুরোহিত-উৎস জাত'।[১৮৪] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বর্ণব্যবস্থার মতাদর্শের বিকাশ ঘটেছিল পুরোহিতদের প্রভাবেই। আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক আর একটিমাত্র উল্লেখে ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্যের কথা আছে,[১৮৫] কিন্তু শূদ্রের কথা নেই। হুইট্‌নি-র বক্তব্য অনুযায়ী এটিকে 'অথর্ববেদে'র আদি পর্বে ফেলা যায়। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, একটি সামাজিক শ্রেণীরূপে শূদ্রদের আবির্ভাব 'অথর্ববেদ'-পর্বের শেষ দিকে, যখন তাঁদের উৎপত্তি বিষয়ক "পুরুষসূক্ত" 'ঋগ্‌বেদে'র দশম মণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়।

জানতে ইচ্ছে হয় চতুর্থ বর্ণকে শূদ্র বলা হতো কেন। মনে হয়, সাধারণভাবে ইওরোপে প্রচলিত শব্দ 'স্লেভ' ও সংস্কৃত 'দাস' যেমন বিজিত মানবগোষ্ঠীর নাম থেকে নেওয়া, তেমনি শূদ্র শব্দটিরও উৎপত্তি হয়েছে একটি বিজিত জনগোষ্ঠীর নাম থেকে। খৃঃপূঃ চতুর্থ শতকে শূদ্র নামে যে একটি জনগোষ্ঠী ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই, কারণ দিওদোরস লিখেছেন যে আলেকজাণ্ডার সোদ্রাই নামক এক জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করেছিলেন।[১৮৬] তাঁরা বাস করতেন বর্তমান সিন্ধু প্রদেশের এক অংশে। গ্রীক লেখকরা যে-সব জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করেছেন, প্রাচীনকালে তাদের কয়েকটির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, আরিয়ান-এর আবাস্তানোই (দিওদোরস যাঁদের 'সাম্‌বাস্তাই' বলেছেন) হলেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র অম্বষ্ঠ।[১৮৭] সেখানে এক

১৮০. অথর্ব ১৯।৬২।১ ; পৈপ্প. ২।৩২।৫।

১৮১. অথর্ব ১৯।৬২।১-এর অনুবাদে হুইট্‌নির টীকা দ্র, হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ৮ম, ১০০৩।

১৮২. হুইট্‌নি, পূর্বোক্ত সূত্রে উদ্‌ধৃত, পৃ ৩৩।

১৮৩. অথর্ব, ১০।১।৩।

১৮৪. হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ৭ম, পৃ [১৫৫]।

১৮৫. অথর্ব, ৫।১৭।৯ ; পৈপ্প. ৯।১৬।৭।

১৮৬. ম্যাক্‌ক্রিন্‌ড্‌ল, 'ইনভেশন অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ২৯৩। আরিয়ান 'সোগ্‌দোই' (ঐ, পৃ ১৫৭) উল্লেখ করেন, যা সম্ভবত ভুল। টলেমি (৬।২০।৩) আবার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, 'সিদরোই'রা আরকোসিয়ার (পূর্ব আফগানিস্তানের এক বিস্তৃত অঞ্চল) মধ্যাঞ্চলের অধিবাসী। এর পূর্বসীমা ঘিরে ছিল সিন্ধু (ম্যাক্‌ক্রিন্‌ড্‌ল, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া…টলেমি', পৃ ৩১৭)। ১৮৭. রায়চৌধুরী, পৃ ২৫৫।

অম্বষ্ঠ রাজার কথা আছে।[১৮৮] শূদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার প্রযোজ্য হতে পারে। এইভাবে খৃপূ চতুর্থ শতকের শূদ্র জনগোষ্ঠী থেকেই আনু. খৃপূ দশম-অষ্টম শতকের শূদ্রবর্ণের ধারা সন্ধান করা যেতে পারে।

'অথর্ববেদে'র গোড়ার দিকে শূদ্রদের তিনটি উল্লেখও এর সূত্রেই বিচার করা যায়। হুইট্‌নি যাকে 'অথর্ববেদের' প্রথম বড় বিভাগ (প্রথম-সপ্তম কাণ্ড) বলেছেন, এগুলো সেই অংশে আছে। তাঁর মতে এই ভাগটি 'অনেকাংশেই লোক-উৎস' জাত এবং যত অদ্ভুতই হোক না কেন, এটিই 'সংহিতার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক অংশ'।[১৮৯] এর মধ্যে দুটিতে অর্চনাকারী একটি ওষধির সাহায্যে আর্য বা শূদ্র সবাইকে দেখতে চাইছেন, যাতে তিনি পিশাচকে খুঁজে বার করতে পারেন।[১৯০] এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ বা রাজন্যের কোন উল্লেখ নেই। এখন প্রশ্ন হলো : এখানে উল্লিখিত আর্য বা শূদ্র কি কোন সামাজিক শ্রেণীর (বর্ণ) প্রতিভূ, নাকি দুটি জনগোষ্ঠী? পরের সম্ভাবনাটি যুক্তিযুক্ত বলে বলে মনে হয়। আগে ছিল আর্য-দাস বা দস্যুর বিরোধ, এখন তার স্থান নিয়েছে আর্য-শূদ্র বিরোধ। এ-কথার উপর জোর দেওয়া দরকার যে বর্ণের ধারণার মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বা বাধানিষেধের যে-ভাবনা অন্তর্নিহিত আছে এইসব উল্লেখ থেকে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না। ঐ সংহিতারই আরেকটি অংশের (যেখানে আর্য ও দাসদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে) সঙ্গে এগুলোর তুলনা করা যেতে পারে। সেখানে পুরোহিত অথবা বরুণ দাবি করছেন, তিনি যে-পথ অবলম্বন করেছেন কোন দাস বা আর্য তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১৯১] 'ঋগ্‌বেদে'র অনুরূপ অংশের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অর্চনাকারী আশা করেছেন, তিনি আর্য তথা দাস বা দস্যু উভয় শত্রুকেই জয় করবেন। যেসব বৈদিক রচনার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে, ব্রাহ্মণ্য টীকাকারদের পক্ষে সেগুলোকে সঠিক ব্যাখ্যা করার একটা বড় বাধা হলো : পরবর্তী সমাজ-বিকাশের দিকে তাঁদের দৃষ্টি দেওয়ার প্রবণতা। যেমন, 'ঋগ্‌বেদে' 'আর্য' ও 'দাস' শব্দদুটির অর্থ। সায়ণ ধরে নিয়েছেন, প্রথম তিন বর্ণভুক্তরা 'আর্য', আর দাস হলেন 'শূদ্র'।[১৯২] স্পষ্টতই এর ভিত্তি পরবর্তীকালের চতুর্বর্ণে বিভক্ত সমাজ; তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার জন্যই সায়ণের এই ব্যাখ্যা। অনুরূপভাবে, 'অথর্ববেদে'র উল্লেখগুলোর ক্ষেত্রেও, সায়ণ 'আর্য' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন তিন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলে।[১৯৩] স্বাভাবিকভাবেই, 'শূদ্র'রা হয়ে যান চতুর্থ বর্ণের প্রতিনিধি। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে 'আর্য' ও 'শূদ্র'

১৮৮. ঐ. ব্রা. ৭।২১।

১৮৯. হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ৭ম, পৃ [১৬৮] ও [১৫৫]।

১৯০. 'তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্যঃ'। অথর্ব ৪।২০।৪ ; পৈপ্প. ৮।৬।৮।

১৯১. অথর্ব ৫।১১।৩। ১৯২. ঋগ্‌বেদের ভাষ্য, ২।১২।৪।

১৯৩. অথর্ববেদের ভাষ্য, ৪।২০।৪।

সংক্রান্ত ধারণা পরবর্তীকালে যে-রকম দাঁড়িয়েছিল, তার দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববর্তী রচনাগুলো ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

'অথর্ববেদে'র সবচেয়ে গোড়ার দিকে একটি জনগোষ্ঠী হিসেবেই শূদ্রদের কথা বলা হয়েছে—তৃতীয় উল্লেখটি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়। সেখানে 'তকমা' জ্বরকে বলা হয়েছে সে যেন মূজবন্ত, বল্হিক এবং মহাবৃষদের সঙ্গে এক কুলটা শূদ্রাকেও আক্রমণ করে।[১৯৪] এঁরা সবাই, মনে হয়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাস করতেন।[১৯৫] 'মহাভারতে' বলা হয়েছে, ঐ অঞ্চলের শূদ্র জনগোষ্ঠীও থাকতেন আভীরদের সঙ্গে।[১৯৬] আরেকটি শ্লোকেও আবার ইচ্ছাপ্রকাশ করা হয়েছে যে ঐ জ্বর যেন বিদেশীদের আক্রমণ করে।[১৯৭] এই সমস্ত কিছু থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে 'অথর্ববেদে'র যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসবাসকারী বিদেশী জনগোষ্ঠীগুলোর প্রতি আর্যদের মনোভাব ছিল বিরূপ এবং শূদ্রার উল্লেখ ঐ পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়েছে। তাই 'শূদ্রা' শব্দটি দিয়ে এখানে বোধহয় শূদ্র জনগোষ্ঠীর কোন রমণীকেই বোঝানো হয়েছে। 'পৈপ্পলাদ সংহিতা'র সমতুল্য অংশটিতে 'শূদ্রা' শব্দের জায়গায় আছে 'দাসী'।[১৯৮] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, রচয়িতা মনে করেছেন শব্দ দুটি পরস্পর পরিবর্তনীয়। সুতরাং 'অথর্ববেদে'র যে-অংশকে মনে করা হয় সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক, সেখানে শূদ্র শব্দটি জনগোষ্ঠী অর্থে বুঝতে হবে—বর্ণ অর্থে নয়, কারণ ঐ দ্বিতীয় অর্থটিই এই প্রসঙ্গে মানায় আরও ভালো।

'মহাভারতে' আভীরদের সঙ্গে যুক্তভাবে শূদ্রদেরও বারবার জনগোষ্ঠী-রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহাকাব্যের পরম্পরা অতীতে খৃপূ দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে শূদ্রকুল ও শূদ্র জনগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথমটির উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের 'কুলে'র সঙ্গে;[১৯৯] আর আভীর, দরদ, তুখার, পহ্লব ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে দ্বিতীয়টি।[২০০] দিগ্বিজয় করতে গিয়ে নকুল যাঁদের জয় করেছিলেন, তার তালিকায় জনগোষ্ঠী হিসেবে শূদ্রের উল্লেখ আছে।[২০১] আর আছে রাজসূয় যজ্ঞ করার সময় যুধিষ্ঠিরকে যাঁরা উপহার পাঠিয়েছিলেন তাঁদের তালিকায়।[২০২] বহু জায়গায় আভীরদের সঙ্গে তাঁদের একযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয়, শক, তুখার, পহ্লব, রোমক, চীনা এবং হূণদের

১৯৪ অথর্ব ৫।২২।৭ ও ৮। ১৯৫. তুলনীয়: 'বৈদিক এজ', পৃ ২৫৮-৯।

১৯৬. 'শূদ্রাভীরাথ দরদাঃ কাশ্মীরাঃ পশুভিঃ সহ'। মহাভারত ৬।১০।৬৬, ৪৬। প্রামাণিক সংস্করণে 'অপরান্তাঃ'র জায়গায় ভুল করে 'অপরন্ধ্রাঃ' আছে।

১৯৭. অথর্ব ৫।২২।১২, ১৪। ১৯৮. পৈপ্প. ১৩।১।৯।

১৯৯. ঐ, ২।২৯।৮-৯। পহ্লব ও বর্বরদেরও উল্লেখ আছে। ঐ, ২।২৯।১৫।

২০০. 'মহাভারত' ৬।১০।৬৫। ২০১. ঐ, ৬।১০।৬৬।

২০২. ঐ, ২।৪৭।৭।

আগেই এঁরা ভারতে ছিলেন। "সভাপর্বে" উল্লিখিত মানবগোষ্ঠীর তালিকায় শেষোক্তদের নাম পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত।[২০৩] খৃস্টপূর্ব বা খৃস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীতে এমন কোন অ-ভারতীয় তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না যার থেকে মনে হতে পারে, শূদ্র ও আভীরদের কোন বিদেশী যোগসূত্র ছিল। খৃস্টীয় প্রথম কয়েক শতকে আভীররা ভারতে এসেছিলেন—এই ধারণার সমর্থনে প্রায় কোন প্রমাণই নেই। মনে হয়, ভারতযুদ্ধের সময়ে তাঁরা ছিলেন একটি জনগোষ্ঠী।[২০৪] তারপর সেই মহাযুদ্ধের উত্তরপর্বে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন পাঞ্জাবে।[২০৫] আভীরদের সঙ্গে শূদ্রদের বারংবার উল্লেখ থেকে মনে হয়, তাঁরাও ছিলেন এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী, যুদ্ধের সময় তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি হতো। 'অথর্ববেদে'র গোড়ার দিকে জনগোষ্ঠী অর্থে শূদ্র শব্দের ব্যাখ্যার সঙ্গে এটি বেশ ভালোই খাপ খেয়ে যায়।

এর পরের প্রশ্ন হলো: শূদ্রেরা আর্য না প্রাগ্‌-আর্য জনগোষ্ঠী, আর যদি তাঁরা আর্যই হন তবে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন কবে? শূদ্র জনগোষ্ঠীর নৃকুলগত বর্গীকরণের ক্ষেত্রে যে সব মতামত আছে তা পরস্পরবিরোধী। প্রথমে মনে করা হতো, শূদ্রেরা ছিলেন আর্যদেরই এক পূর্বতরঙ্গ।[২০৬] পরে ধরে নেওয়া হয় যে শূদ্রেরা প্রাগ্‌-আর্য জাতিগুলোরই এক শাখা।[২০৭] কোন মতের পক্ষেই প্রমাণ দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এমন ভাবার প্রবণতা আসতে পারে যে শূদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যদের কিছুটা সারূপ্য ছিল। কৌতূহলের বিষয় এই যে, শূদ্রদের সর্বদাই আভীরদের সঙ্গে একযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।[২০৮] আভীররা কথা বলতেন

২০৩. ঐ, ২।৪৭।৭ ইত্যাদি।

২০৪. পি. ব্যানার্জী, 'জার্নাল অফ দা বিহার রিসার্চ সোসাইটি', খণ্ড ৪১, পৃ ১৬০ ১।

২০৫. বুদ্ধ প্রকাশ, ঐ, খণ্ড ৪০, পৃ ২৫৫, ২৬০-৩।

২০৬. ভেবার, 'ৎসাইট্‌শ্রিফ্‌ট্‌ ডোর ডায়েটেশেন মোর্গেনলান্ডিশেন গেশেলশাফ্‌ট্‌', খণ্ড ৪, পৃ ৩০১, টী. ২। তুলনীয়: রোট, ঐ, খণ্ড ১, পৃ ৮৪।

২০৭. ফিক্‌, 'সোশ্যাল অর্গানাইজেশন অফ নর্থ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া', পৃ ৩১৫; কীথ, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম পৃ ৮৬. লাসেন, 'ইণ্ডিশে আলটেরটুম্‌স্‌কুন্ডে', ২য়, পৃ ১৭৪; তুলনীয় 'ইণ্ডিশে স্টুডিয়েন', খণ্ড ১৮, পৃ ৮৫-৮৬ ও ২৫৫। ৎসিমার লিমির 'শূদ্রো'কে শনাক্ত করেছেন 'ব্রাহুই'-এর সঙ্গে ('আল্ট. লেব', পৃ ৪৩৫), কিন্তু এমন অনুমানের কোন ভিত্তি নেই। হপকিন্সের 'রিলিজিয়নস অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ৫৪৪. টী ৩—এ প্রসঙ্গে তুলনীয়। পার্জিটার মনে করেন যে শূদ্র ও আভীররা বেশ ভালোরকমেরই সংমিশ্রিত ছিল এবং আদি প্রজাতিদের সঙ্গে যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অনুবাদ, পৃ ৩১৩-১৪ টী.)।

২০৮. 'মহাভারত' ৬।১০।৪৫ ও ৪৬; ৬৫ ও ৬৬; মহাভারত, প্রামাণিক সংস্করণের ৭।১১। ৭-এ 'শূরাভীর' মনে হয় ভুল পাঠ। এটি হওয়া উচিত 'শূদ্রাভীরাঃ', যেমন অন্যান্য

'আভীরী' নামে এক আর্য উপভাষায়।[২০৯] 'ব্রাহ্মণে'র যুগে শূদ্ররা আর্যদের কথা বুঝতে পারতেন। ক্ষীণভাবে হলেও, এই ব্যাপারটি হয়তো এমন ইঙ্গিতই দেয় যে শূদ্র জনগোষ্ঠী আর্যভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আর দ্রাবিড়, পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি প্রাগ্-আর্য মানবগোষ্ঠীর তালিকাতেও শূদ্রের কোন উল্লেখ নেই। তাঁদের বাসস্থান, সর্বদাই বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিমে।[২১০] পরবর্তীকালে এই এলাকা মূলত আর্যদেরই অধিকারে ছিল।[২১১] আভীর ও শূদ্ররা বসতি করেছিলেন সরস্বতী নদীর কাছে।[২১২] বলা হয়েছে যে, তাঁদের প্রতি বিরূপতাবশতই সরস্বতী মরুভূমিতে হারিয়ে যান।[২১৩] এইসব উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, দৃষদ্বতীর সঙ্গে সরস্বতীও ছিল আর্য-দেশ নামে পরিচিত অঞ্চলের অন্যতম সীমানা।

'দাহাএ' শব্দটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এটি ভারতীয় 'দাস' শব্দের ইরাণীয় প্রতিরূপ। কিন্তু শূদ্রদের ক্ষেত্রে ঐরকম কোন সমীকরণ স্থাপন করা কঠিন। গ্রীক শব্দ 'কুদ্রোস'-এর সঙ্গে 'শূদ্র'কে মেলানোর প্রস্তাবটি সংশয়জনক।[২১৪] হোমর (আনু. খৃপূ দশম-নবম শতাব্দী) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন 'মহৎ' অর্থে। সাধারণত দেবকুলের বিশেষণ রূপেই শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে, মানুষের ক্ষেত্রে কদাচিৎ।[২১৫] পরবর্তীকালে ভারতে, ব্রাহ্মণরা যাঁদের অপছন্দ করতেন তেমন লোকের ক্ষেত্রে শব্দটির

পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। (৭।১৯।৭-এর টী.)। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' শূদ্র ও আভীরদের পুনরায় একসঙ্গে উল্লেখ আছে ('মহাভাষ্য', ১।২।৭২।৬)।

২০৯ খৃস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর রচনা ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' 'আভীরোক্তি'র সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (পি. ডি. গুণে, 'ভবিষয়ত্তকহা'র মুখবন্ধ, পৃ ৫০ ৫১)। এগুলো স্পষ্টতই সংস্কৃতের খুব নিকট সম্পর্কিত।

২১০. প্রকৃতপক্ষে 'মহাভারতে'র তালিকাটি পুরাণের তালিকার অনুরূপ। পুরাণে আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পহ্লব। মহাভারত, প্রামাণিক সংস্করণে ভুলক্রমে পল্লব আছে। ও অন্যান্যদের সঙ্গে শূদ্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্ক. পু. ৫৭ অধ্যায়, ৩৫-৩৬ ও ম. পু. ১১৩ অধ্যায়, ৪০। মনে হয় গুপ্ত যুগে শূদ্র জনগোষ্ঠী এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করতেন। 'বিষ্ণু পুরাণে' (৪।২৪।১৮) সৌরাষ্ট্র, অবন্তী ও অর্বুদ অঞ্চলের তালিকার সঙ্গে এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের নাম আছে। দীক্ষিতর-এর পাঠ 'শূর'-র কোন অর্থই হয় না ('গুপ্ত পলিটি', পৃ ৩ ৪), মূলপাঠে শূদ্র অঞ্চল স্পষ্ট উল্লিখিত।

২১১. মিউঅর, 'অরিজিনাল স্যান্সক্রিট টেক্সট্স্', ২য়, পৃ ৩৫৫-৩৫৭।

২১২. 'শূদ্রাভীরগণাশ্চৈব যে চাশ্রিত্য সরস্বতীম্'। মহাভারত ২।২৯।৯।

২১৩. শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্ যত্র নষ্টা সরস্বতী'। মহাভারত (কলকাতা সং) ৯।৩৭।১।

২১৪. ভাকেরনাগেল, "ইন্ডোইরানিশেস্", 'সিৎসুংস্বেরিশ্টে ডোর ক্যোনিগ্লিশ প্রয়েসিশেন আকাডেমি ডের ভিসেনশাফ্টেন', ১৯১৮, পৃ ৪১০-৪১১।

২১৫. 'কুদ্রোস' শব্দের অন্তর্গত, লিডেল ও স্কট, 'আ গ্রীক ইংলিশ লেক্সিকন', ১।

প্রয়োগ হতে থাকে নিন্দার্থে। অন্যদিকে হোমরীয় গ্রীসে শব্দটি ছিল সম্মান-সূচক। এর একটা আপাত-ধরনের ব্যাখ্যা অবশ্য দেওয়া যায়। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে 'কুদ্র' বলে কোন এক প্রকল্পিত ইন্দো-ইওরোপীয় জনগোষ্ঠী ছিল। গ্রীস-আক্রমণকারী জনগোষ্ঠীগুলোর নেতাদের মধ্যে তাঁরা প্রাধান্য অর্জন করেন। অপরপক্ষে ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁদেরই মতো আরেক দল আক্রমণকারীর কাছে তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করেন। ভিন্ন প্রসঙ্গে একই শব্দের যে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ হয়, 'অসুর' শব্দটির উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট। 'অসুর' ভারতে অশুভের সঙ্গে জড়িত, অথচ তার আদিরূপ অহুর কিন্তু ইরাণের দেবতা। ভারতে এবং গ্রীসে শূদ্র শব্দটির ব্যবহার এরই সদৃশ হতে পারে, কিন্তু গ্রীসে 'কুদ্রোই' নামে কোন জনগোষ্ঠী ছিল বলে যতক্ষণ-না কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত বলে ধরা যায় না। যাই হোক, এতক্ষণ যা বলা হলো তার ভিত্তিতে এটাই সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে দাসদের মতো শূদ্ররাও ছিলেন ইন্দো-আর্যদের সজাতি।

কিন্তু, তাঁরা যদি ইন্দো-আর্যদের সজাতিই হন, তাঁরা ভারতে এসেছিলেন কোন্ সময়ে? বলা হয়েছে, তাঁরা বহিরাগত আর্যদেরই একটি পূর্ব-তরঙ্গ।[২১৬] কিন্তু 'ঋগ্বেদে' তাঁদের উল্লেখ নেই। তাই এমনও হতে পারে যে তাঁরা ঋগ্বেদীয় পর্বের শেষের দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগত কোন বিদেশী জনগোষ্ঠী। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে মনে হয়, খৃপূ ২০০০-এর পর থেকে প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতে নানা জাতীয় মানব-গোষ্ঠী ক্রমাগত আসছিলেন।[২১৭] ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনেও এই প্রকল্পের সমর্থন মেলে।[২১৮] তাই এমনও হতে পারে যে শূদ্ররা ভারতে আসেন খৃপূ ২০০০-এর শেষদিকে। বৈদিক আর্যরা তাঁদের পরাস্ত করেন এবং ধীরে ধীরে পরবর্তী বৈদিক সমাজে তাঁরা চতুর্থ বর্ণ হিসেবে পরিগৃহীত হন। কৌতূহলজনক হলো, সরস্বতী নদী যে-এলাকা দিয়ে গেছে সেখানে চিত্রিত ধূসর মৃৎভাণ্ডের অজস্র নিদর্শনস্থল পাওয়া যায়। খৃপূ ১০০০ নাগাদ এর সূচনা। শূদ্রদের সঙ্গে যোগও এই এলাকারই।

একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে দীর্ঘকাল ধরে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংঘাতের ফলে ক্ষত্রিয়দের অবনমিত করা হয় শূদ্র-পর্যায়ে, এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা তাঁদের প্রতিপক্ষদের উপনয়নের (যজ্ঞোপবীত ধারণের) অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেন।[২১৯] 'মহাভারতে'র "শান্তিপর্বে" আছে যে পৈজবন

২১৬. ভেবার, 'ৎসাইট্শ্রিফ্ট্ ডোর ডয়েট্শেন মোর্গেনলাণ্ডিশেন গেসেলশাফ্ট্', ৪র্থ, পৃ ৩০১, টী. ২ ; তুলনীয়ঃ রোট, ঐ, ১ম. পৃ ৮৪।

২১৭. স্টুয়ার্ট পিগট্. 'অ্যাণ্টিক্যুইটি', ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৯৬, পৃ ২১৮।

২১৮. টি. বারো, 'দ স্যান্স্ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ', পৃ ৩১।

২১৯. আম্বেডকর, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ২৩৯।

ছিলেন শূদ্ররাজা। কেবল এই একটিমাত্র কিংবদন্তীর ভিত্তিতেই দাবি করা হয় যে শূদ্ররা আদিতে ছিলেন ক্ষত্রিয়।[২২০] ঐ ধরনের মতের কোন তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। প্রথমত, 'ঋগ্বেদে'র যুগে নিজস্ব অধিকার ও কর্তব্য সমেত ক্ষত্রিয় বলে কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণ ছিল না। যুদ্ধ আর সর্বসাধারণের বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল গোটা জনগোষ্ঠীর, বড় জোর গোষ্ঠীপতির। কিন্তু কাজটা কখনোই কেবল বাছাই-করা একদল যোদ্ধার হাতে থাকত না। একেবারে শুরু থেকেই ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিল যোদ্ধা আর পুরোহিতদের দল। আর্য তথা অনার্যদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ 'বিশ্'-এর নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা পরস্পরের সহযোগিতা করতেন। শান্তির সময়ে দু-দলই একযোগে চেষ্টা করতেন 'বিশ্'-এর কাছ থেকে উপঢৌকন আদায় করার; রাজাকে তাই বলা হতো 'বিশমত্তা'। কালক্রমে যোদ্ধারা পুরোহিতদের উদার হাতে দান করতেন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হয়ে উঠল আরও পল্লবিত। এর ফলে, যেসব পুরোহিত এই অনুষ্ঠান করতেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষক যোদ্ধৃবর্গ—এ'দের ক্ষমতা গেল সাধারণ লোকের চেয়ে বেড়ে। দ্বিতীয়ত, পরবর্তী বৈদিক পর্বে যোদ্ধা এবং পুরোহিতদের মধ্যে সংঘাতের প্রতিধ্বনি শোনা গেলেও (পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের কাহিনীতে যেমন পাওয়া যায়), এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে মনে হয় 'উপনয়ন'ই তার কারণ, এবং এই সংঘাতের ফল ক্ষত্রিয়দের বিপক্ষে গিয়েছিল। যে-প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই সংঘাত আবর্তিত হচ্ছিল তা সম্ভবত এই: জনগোষ্ঠীয় কৃষককুলের (যাঁদের 'বিশ্' বলা হতো) কাছ থেকে মাঝে মাঝে আদায় করা হতো উপহার ও উপঢৌকন। এইভাবে সংগৃহীত উদ্-বৃত্তের ভাগ কে কতটা পাবে এ-ই সম্ভবত ছিল সংঘাতের কারণ। আর ছিল সামাজিক উচ্চাসনের প্রশ্ন, যা দিয়ে নির্ধারিত হতো তারা কী কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবে। বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য নিয়েও কিছু বিবাদ ছিল। ক্ষত্রিয়রা এর বিরোধিতা করে সফল হয়েছিলেন। মনে হয় এও অসম্ভব নয় যে অশ্বপতি কৈকেয় ও প্রবাহণ জৈবলি ছিলেন ব্রাহ্মণদের আচার্য।[২২১] মিথিলার রাজা জনকের মতো ক্ষত্রিয় রাজারা ঔপনিষদিক চিন্তার বিকাশে সহায়তা করেছিলেন; ক্ষত্রিয় শাসক বিশ্বামিত্র আরোহণ করেছিলেন পুরোহিতদের আসনে। গৌতম বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীরের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে ক্ষত্রিয় বিদ্রোহ তুঙ্গে ওঠে। তাঁরা সমাজে ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য দাবি করেন ও ব্রাহ্মণদের স্থান দেন তার নীচে। বিবাদের মূল বিষয় ছিল: সমাজে প্রথম স্থান কে পাবে,

২২০. ঐ, পৃ ১৩৯-৪২। লাসেন লক্ষ করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রাচীন রাজা সুদাসকে মহাভারতে শূদ্র বলা হয়েছে ('ইন্ড. আল্ট', ১ম, পৃ ৯৬৯)।

২২১. কোসম্বী, 'জার্নাল অফ দ বম্বে ব্রাঞ্চ অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', নিউ সিরিজ, খণ্ড ২৩, পৃ ৪৫।

ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়। উপহার, উপঢৌকন এবং শ্রমশক্তি ভাগ করে নেওয়ার প্রশ্নটি কিন্তু এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বেদোত্তর বা প্রাগ্-মৌর্য সাহিত্যে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যাতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণে পরিণত করতে চাইছিলেন বা ক্ষত্রিয়রাও ব্রাহ্মণদের করতে চাইছিলেন ঠিক তা-ই।

তৃতীয়ত, এমন ভাবাও ভুল যে শুরু থেকেই শূদ্র-হওয়া-না হওয়ার চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিল উপনয়নের সংস্কার হারানো। এক্ষেত্রে, শূদ্র শ্রেণী যখন সৃষ্টি হচ্ছিল তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে আধুনিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত[২২২] কোন সহায় হতে পারে না। পরে দেখানো হবে যে শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কার হারানোর ব্যাপারটি পাওয়া যায় কেবল পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষ পর্যায় থেকে। তাও আবার দাসত্বের নিদর্শন রূপে শূদ্রদের উপর যে শুধু এই একটি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এমন নয়, কয়েকটির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম। পরে, আমরা আরও দেখব যে আর্যদের শূদ্রে পরিণত হওয়ার কারণ উপনয়ন-সংস্কার হারানো নয়, আসলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির ফলেই তাঁরা নিম্নতর বর্গে নেমে যান।

চতুর্থত, "শান্তিপর্বে" যে বলা হয়েছে, পৈজবন ছিলেন শূদ্র, সেই কিংবদন্তীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তাঁকে ভরত জনগোষ্ঠীর প্রধান সুদাসের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে যে দশরাজার যুদ্ধের এই বিখ্যাত নায়ক ছিলেন শূদ্র।[২২৩] বৈদিক সাহিত্যে অবশ্য এই মতের কোন সমর্থন মেলে না, এবং মহাকাব্য, পুরাণ বা অন্য কোন তথ্যসূত্রেও "শান্তিপর্বে"র এই কিংবদন্তী সমর্থিত হয় না। কিংবদন্তী মতে, শূদ্র পৈজবন যজ্ঞ করেছিলেন। একথা আছে আবার 'মহাভারতে'র একেবারে শেষের দিকে, যেখানে বলা হয়েছে, শূদ্ররা পাঁচটি মহাযজ্ঞ ও দান করতে পারবে।[২২৪] এই কিংবদন্তীর সত্য-মিথ্যা বিচার করা কঠিন, কিন্তু শূদ্ররাও যে দান ও যজ্ঞ করতে পারেন তার একটা পূর্বদৃষ্টান্ত উপস্থিত করাই এর উদ্দেশ্য—সেটা স্পষ্ট। পরে দেখানো হবে যে "শান্তিপর্বে"র উদার মনোভাবের সঙ্গে এই কাহিনীর সংগতি আছে। এও উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে, যে-কোন লোক তাঁদের বিরোধিতা করলেই, ব্রাহ্মণরা তাঁকে নির্বিচারে বৃষল অথবা শূদ্র আখ্যা দিতে শুরু করেন। আমরা জানি না শূদ্র পৈজবনের ক্ষেত্রেও এরকমই হয়েছিল কিনা। বহুক্ষেত্রেই এ ধরনের কথার অর্থ এই নয় যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের শূদ্রের পর্যায়ে অবনমিত করা হয়েছিল। বরং এঁরা যে জন্মসূত্রে শূদ্রজ, বিশেষত মাতৃকুলের দিক থেকে, এসব কথা শুধু তারই ইঙ্গিত দেয়।[২২৫]

২২২. আম্বেডকর, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ ১৮৫-৯০।

২২৩. ঐ, পৃ ১৩৯।

২২৪. মহাভারত ১২।৬০।৩৮-৪০।

২২৫. যে-সব ঋষির মা শূদ্রবর্ণরূপে গণ্য এক বা অন্য শাখার অন্তর্গত ছিলেন, ভবিষ্যপুরাণ

স্পষ্টতই, বিভিন্ন আর্য জনগোষ্ঠী ও তাদের জনগোষ্ঠীয় প্রতিষ্ঠানের মতো শূদ্র জনগোষ্ঠীও সামরিক ভূমিকা পালন করতেন।[২২৬] 'মহাভারতে' অম্বষ্ঠ, শিবি, সূরসেন ইত্যাদির সঙ্গে শূদ্র সেনাবাহিনীরও উল্লেখ আছে।[২২৭] কিন্তু তাতে গোটা শূদ্রগোষ্ঠীই ক্ষত্রিয়বর্ণে পরিণত হয় না, কারণ আমরা জানি, ক্ষত্রিয়বর্ণের নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য ও সুযোগ-সুবিধা ছিল। সুতরাং ক্ষত্রিয়দের শূদ্রের পর্যায়ে অবনমিত করা হয়েছিল—এই তত্ত্বের সমর্থনে প্রায় কোন তথ্যই নেই।

'শূদ্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা থেকে এই চতুর্থ বর্ণটি যখন তৈরি করা হয় তখনকার অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায়, কিন্তু এই বর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাখ্যায় তা প্রায় কোন কাজেই আসে না। বাদরায়ণের 'বেদান্তসূত্রে' সর্বপ্রথম এই প্রচেষ্টা দেখা যায়। সেখানে শব্দটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'শুক্' অর্থাৎ শোক এবং 'দ্রু' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'দ্র' অর্থাৎ 'ধাবন করা'।[২২৮] জনশ্রুতিকে[২২৯] কেন শূদ্র বলা হয়েছিল সে সম্পর্কে শঙ্করের ভাষ্যে তিনটি বিকল্প ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে: (১) তিনি দুঃখের প্রতি ধাবিত হলেন ('শুচম্ অভিদুদ্রাব'), (২) শোক তাঁর দিকে ধেয়ে এল ('শুচা বা অভিদুদ্রুবে') এবং (৩) শোকমগ্ন অবস্থায় তিনি রৈকের দিকে ধেয়ে গেলেন ('শুচা বা রৈকম্ অভিদুদ্রাব')।[২৩০] শঙ্কর সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'শূদ্র' শব্দটিকে বোঝা যাবে কেবল তার অবয়বের অর্থের ব্যাখ্যা থেকে, অন্য কোনভাবে নয়।[২৩১] বাদরায়ণ-কৃত শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং তার উপর শঙ্করের ভাষ্য—সঠিকভাবেই এর কোনটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়নি।[২৩২] কথিত আছে, শঙ্কর যে-জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন মহাবৃষদের শাসক। 'অথর্ববেদে' উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী হিসেবে এঁদের উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি শূদ্র-বর্ণের ছিলেন কিনা তা-ই সন্দেহজনক। তিনি ছিলেন শূদ্র জনগোষ্ঠীর লোক, কিংবা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্য কোন জনগোষ্ঠীর—ব্রাহ্মণ লেখকরা যাঁদের শূদ্ররূপে চিহ্নিত করেছেন।

১।৪২।২২ ২৬-এ তাঁদের তালিকা আছে। অন্যান্য কয়েকটি পুরাণে ও 'মহাভারতে' এই তালিকা দেখা যায়। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়, টী. ১৫৯ দ্র.।

২২৬. রামশরণ শর্মা, 'জার্নাল অফ বিহার রিসার্চ সোসাইটি', খণ্ড ৩৮, পৃ ৪৩৫-৭ : খণ্ড ৩৯, পৃ ৪১৬-৭।

২২৭. মহাভারত, ৭।৬।৬ : তুলনীয় ১।১৭।

২২৮. 'শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাতসূচ্যতে'। বেদান্ত সূত্র ১।৩।৩৪।

২২৯. 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' রাজা হিসেবে উল্লেখ আছে, ৪।২।৩।

২৩০. 'বেদান্ত সূত্র' ১।৩।৩৪-এর শঙ্কর ভাষ্য।

২৩১. 'শূদ্র অবয়বার্থ সম্ভবাৎ রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ'। ঐ।

২৩২. 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকুয়্যারি', খণ্ড ৫১, পৃ ১৩৭-৮।

পাণিনির ব্যাকরণের "উণাদিসূত্রে"র লেখকও শব্দটির অনুরূপ ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন। সেখানে শূদ্র শব্দটিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'শুচ্' বা 'শুক্' ধাতু+'র'।[২৩৩] 'র' প্রত্যয় যোগের কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন, তাছাড়া এই ক্ষেত্রেও ব্যুৎপত্তিটিকে উৎকাল্পনিক ও দূরানীত বলে মনে হয়।[২৩৪]

পুরাণের ব্রাহ্মণ্য পরম্পরাতেও 'শূদ্র' শব্দটিকে 'শুচ্' (অর্থাৎ সন্তপ্ত হওয়া) ধাতুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "যারা দুঃখ করছিল ও ধেয়ে আসছিল, পরিচর্যায় রত ছিল, যারা নিস্তেজ ও অল্পবীর্য তাদের শূদ্র বলা হলো।"[২৩৫] কিন্তু শূদ্র শব্দের ঐ ধরনের ব্যুৎপত্তি শব্দটির অর্থ নির্ণয়ে ততটা সাহায্য করে না, বরং এটি ঐ বর্ণের পরবর্তী অবস্থারই পরিচায়ক। প্রসঙ্গত বৌদ্ধরা শব্দটির যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যার মতোই উৎকাল্পনিক। বুদ্ধের মতে, যারা রুদ্রাচারী ও ক্ষুদ্রাচারী ('লুদ্দাচারা খুদ্দাচারা তি') তারাই 'সুদ্দ' নামে পরিচিত হয়। আর এই-ভাবেই 'সুদ্দ' শব্দটির উৎপত্তি।[২৩৬] আদি-মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ শব্দকোষে শূদ্র শব্দটি 'ক্ষুদ্র'র সমার্থক হয়ে গেছে,[২৩৭] আর এর ভিত্তিতেই বলা হয়েছে, 'শূদ্র'র উৎপত্তি 'ক্ষুদ্র' থেকে।[২৩৮] ভাষাতত্ত্বের নিরিখে এই দুই ব্যুৎপত্তির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়; কিন্তু প্রাচীনকালে শূদ্রবর্ণের ধারণার সঙ্গে যেসব চিন্তা-ভাবনা জড়িয়ে ছিল সেগুলোর দৃষ্টান্তরূপে এই ব্যুৎপত্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ্য ব্যুৎপত্তিতে দেখা যায় শূদ্রদের দুর্দশা আর বৌদ্ধ ঐতিহ্যে আসে সমাজে তাঁদের হীন ও অধস্তন অবস্থান। শব্দমূলগত ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরেও সমকালীন সামাজিক অবস্থার কেমন প্রভাব পড়ে, ব্যুৎপত্তিগুলো থেকে সেটুকুই শুধু দেখা যায়। জনৈক সাম্প্রতিক লেখক শূদ্র শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন, 'শিব' ধাতু (স্থূল হওয়া)+'দ্রা' ধাতু (অর্থাৎ দৌড়নো)। এরপর তিনি বলেছেন যে শব্দটির অর্থ হলো: 'যে ব্যক্তি স্থূল জীবনের দিকে ধাবিত হয়'; সুতরাং তাঁর মতে, শূদ্র হলো 'এমন নির্বোধ যাকে দিয়ে শুধু কায়িক শ্রমই করানো চলে।'[২৩৯] এটা

২৩৩ 'শুচের্দশ্চ'। ২।১৯। ২৩৪. 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি', খণ্ড ৫১, পৃ ১৩৭-৮।

২৩৫. 'শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্যাসু যে রতাঃ; নিস্তেজসো অল্পবীর্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীৎ তু সঃ'। বা. পু. ১।৮।১৫৮। ভবিষ্য পুরাণ ১।৪৪।২৩ ইং-তে আরও বলা হয়েছে বেদজ্ঞানের ক্ষরণ প্রাপ্তির জন্য তাদের শূদ্র বলা হয়; 'যে তে শ্রুতের্দ্রুতিং প্রাপ্তাঃ শূদ্রাস্তেনেহ কীর্তিতাঃ'।

২৩৬. 'সুদ্দা ত্বেব অক্খরং উপনিব্বত্তম্'। দীঘ নিকায়, ৩য়, পৃ ৯৫।

২৩৭. দ্র. "শূদ্র", 'মহাব্যুৎপত্তি'।

২৩৮. 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি', খণ্ড ৫১, পৃ ১৩৮-৯।

২৩৯. সূর্য কান্ত, "কীকট, ফলিগা, অ্যান্ড পণি", 'এস. কে. বেলবলকর কোমেমোরেশন ভল্যুম', পৃ ৪৪।

অস্বাভাবিক যে তিনি দুটি ধাতু থেকে শব্দটির মূল নির্ণয় করছেন, প্রায় কোন প্রাচীন ব্যুৎপত্তিগত ভিত্তি ছাড়াই। শব্দটির যে অর্থ তিনি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে শুধু শূদ্র সম্বন্ধে গতানুগতিক মনোভাবেরই পরিচয় মেলে, কিন্তু তার উৎপত্তি বিষয়ে কোন আলোকপাত করে না।

'ঋগ্বেদ' ও 'অথর্ববেদে'র সমাজচিত্র থেকে আদৌ মনে হয় না যে উদ্ভবের সময়ে শূদ্রবর্ণের অবস্থান ছিল দুর্দশাগ্রস্ত বা অবজ্ঞেয়। দাস ও আর্য, অথবা শূদ্র ও উচ্চতর বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক আহার ও বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে নিষেধের কোন নিদর্শন এই সংহিতাগুলোর কোথাওই পাওয়া যায় না।[২৪০] বর্ণগুলোর মধ্যে এই ধরনের সামাজিক দূরত্বসূচক একটিমাত্র উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় 'অথর্ববেদে'। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে রাজন্য ও বৈশ্যের চেয়ে কোন রমণীর প্রথম স্বামী হওয়ার অধিকার আছে ব্রাহ্মণেরই।[২৪১] এই প্রসঙ্গে শূদ্রের উল্লেখই নেই, কারণ সেই পর্বে এই বর্ণটি বোধহয় ছিলই না। এমন কোন প্রমাণও নেই যাতে দেখা যায় যে দাস বা শূদ্রদের অশুচি বলে মনে করা হতো কিংবা তাঁদের স্পর্শে উচ্চতর বর্ণের লোকের খাদ্য বা দেহ হয়ে যেত দূষিত।[২৪২]

শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত এই আলোচনার সারসংক্ষেপ করে বলা যায় যে, অংশত বাহ্য ও অংশত আভ্যন্তরীণ সংঘাতের মধ্য দিয়ে আর্য ও প্রাগ্-আর্য সাধারণের বৃহৎ অংশকে ঐ পর্যায়ে অবনমিত করা হয়।[২৪৩] যেহেতু এই সংঘাত হতো মূলত গোধন এবং পরবর্তীকালে ভূমি ও তার উৎপন্নের অধিকার নিয়ে, তাই, যাঁরা এ-সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ও নিঃস্ব হয়ে গেলেন, তাঁরাই গণ্য হতে থাকলেন নতুন সমাজের চতুর্থ শ্রেণীরূপে। শূদ্রবর্ণ গঠিত হয়েছিল প্রাগ্-আর্যদের নিয়ে বা প্রধানত আর্যদের নিয়ে—দুটি অভিমতই সমান একপেশে ও অতিরঞ্জিত।[২৪৪] শ্রেণী-বিভাজন সর্বদাই নৃকুলগত বৈষম্যের সঙ্গে জড়িত—সমাজবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব[২৪৫] শূদ্র ও দাসদের উদ্ভবের আংশিক ব্যাখ্যামাত্র দিতে পারে। বরং এই সম্ভাবনাই বেশি যে দাস ও শূদ্রদের নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্দো-আর্যদের সদৃশ জনগোষ্ঠীর নাম অনুযায়ী। কিন্তু কালক্রমে শূদ্র ও দাসদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো প্রাগ্-আর্য এবং পতিত আর্যদের দাস বা শূদ্র কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে, যাঁদের কোনরকম

২৪০. এন এন. ঘোষ ভুল করে বলেছেন যে আর্য ও দাসদের মধ্যে এই ধরনের নিষেধের প্রমাণ 'ঋগ্বেদে'ই আছে। 'ইণ্ডিয়ান কালচার, খণ্ড ১২, পৃ ১৭৯।

২৪১. অথর্ব ৫।১৭।৮-৯।

২৪২. তু. দত্ত, 'অরিজিন অ্যাণ্ড গ্রোথ অফ দ কাস্ট সিস্টেম', পৃ ২০ ও ৬২।

২৪৩. গেল্ড, 'এথ্নোলজি অফ দ মহাভারত', পৃ ৮৯-৯৫ ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল পলিটি', পৃ ২৮-৩০ ; আম্বেডকর, হু ওয়্যার দ শূদ্রস', পৃ ২৩৯।

২৪৪. তু. 'বেদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ২৬৫।

২৪৫. লাণ্টমান, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮।

নুকুলগত যোগ ছিল না।৮ এও বেশ পরিষ্কার যে ঋগ্বেদীয় সমাজে পরিচয়-যোগ্য কোন শূদ্র বর্গ ছিল না। যেহেতু এই সমাজ ছিল মুখ্যত জনগোষ্ঠী-ভিত্তিক এবং পশুপালক, তাই সমরনায়ক ও তাঁদের সমর্থক পুরোহিতবর্গের পক্ষে নিজেদের জনগোষ্ঠীয় জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে এত বেশি উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ও শ্রম আদায় করা সম্ভব হতো না যাতে তাঁদের অবস্থান্তর ঘটিয়ে দাস বর্গের পর্যায়ে আনা যায়। জনগোষ্ঠীভুক্তদের কাছ থেকে যা কিছু উপঢৌকন আদায় করা হতো কিংবা সংগ্রহ করা হতো যুদ্ধের লুণ্ঠন থেকে, তার সবটাই জনগোষ্ঠীয় সভাগুলিতে পুনর্বণ্টন করে দেওয়া হতো জ্ঞাতিদেরই মধ্যে। প্রধানরা যে অশ্ব, রথ এবং দাস ইত্যাদির অধিকারী ছিলেন, তা ছিল তাঁদের পদমর্যাদারই সূচক, সামাজিক শ্রেণীর নয়। দাস-শ্রেণী গঠনের এই প্রক্রিয়া পরিবাহিত হয়েছিল পরবর্তী বৈদিক যুগে, যখন পশুপালন-বৃত্তির জায়গায় এসেছে চাষবাস আর আধা-যাযাবরবৃত্তির জায়গায় ব্যাপক বসতি স্থাপন। চিত্রিত ধূসর মৃৎভাণ্ড-স্থল ও পরবর্তী বৈদিক রচনাদি থেকে তার কথা অনুমান করা যায়।

## তৃতীয় অধ্যায়

# গোষ্ঠী বনাম বর্ণ

( আনু. খৃপূ ১০০০-৫০০ )

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যই সে-যুগের প্রায় একমাত্র তথ্যসূত্র যা থেকে আমরা শূদ্রদের তৎকালীন অবস্থা অনুধাবন করতে পারি। লোক-জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করেছিল যেসব আচার-অনুষ্ঠান এই সাহিত্য মূলত সে নিয়েই ব্যাপৃত। প্রতিটি সার্বজনীন বা ব্যক্তিগত কাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল একটি উপযুক্ত অনুষ্ঠান। সমাজ যে চারবর্ণে বিভক্ত, এইসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা প্রায়শই স্বীকৃত ছিল।

আচার-অনুষ্ঠানগুলো থেকে যে-তথ্য জানা যায় তা মূলত কুরু-পাঞ্চাল দেশের। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বড় অংশই এখানে রচিত হয়েছিল।[১] মোটামুটিভাবে এই সাহিত্যের সময়কাল আনুমানিক খৃপূ ১০০০ থেকে ৫০০। আর এ থেকেই ধরে নেওয়া যায় যে কোন রচনাবিশেষের নির্ধারিত রচনাকালের সঙ্গে সমাজবিকাশের স্তরও হতো বিভিন্ন। যেমন, 'কৃষ্ণযজুর্বেদ সংহিতা' 'শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা'র চেয়ে প্রাচীন।[২] 'ব্রাহ্মণ'গুলোর মধ্যে 'শতপথ' ও 'ঐতরেয়'—যাতে আন্তর্বর্ণ-সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আছে—'তুলনায় আধুনিক', আর 'পঞ্চবিংশ' এবং 'তৈত্তিরীয়' হলো সর্ব-প্রাচীন।[৩] এমনকি 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ'ও 'শতপথ ব্রাহ্মণ' ও 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর পরবর্তী[৪]; 'কৌষীতকি' বা 'শাংখায়ন ব্রাহ্মণ'-ও তা-ই।[৫] কোন কোন শ্রৌতসূত্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ভেদরেখা টানা কঠিন; যেমন, 'বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র' উত্তরকালীন ব্রাহ্মণ বলেই ধরা যেতে পারে।[৬] বোধহয়, 'আপস্তম্ব শ্রৌত-সূত্র'ও একই রকমের প্রাচীন।[৭] উপরন্তু মুখ্য শ্রৌতসূত্রগুলোর (যেমন

১. ভিনটারনিৎস, 'হিস্ট্রি অফ ইনডিয়ান লিটরেচার', ১ম খণ্ড, পৃ ১৯৫-৬। কীথ জানিয়েছেন যে 'কাঠক', 'মৈত্রায়ণী', এমনকি 'বাজসনেয়ি' ও 'শতপথ' শাখার [ বৈদিক সাহিত্যের ] মতোই তৈত্তিরীয় শাখার চর্চাকেন্দ্র ছিল মধ্য দেশ। হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৮, পৃ ৯৩।

২ ভেবার, ইনডিশে লিটেরাটুর', পৃ ৮৬।

৩. ভাকেরনাগেল, আলট্‌ইনডিশে গ্রামাটিক', ১ম খণ্ড, পৃ ৩০-৩১; কীথ, হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ২৫, পৃ ৪৪।

৪. কীথ, হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ২৫, পৃ ৪৬।

৫. ভিনটারনিৎস. 'হিস্ট্রি অফ ইনডিয়ান লিটরেচার', ১ম খণ্ড, পৃ ১৯১।

৬. বটকৃষ্ণ ঘোষ, 'বৈদিক এজ', পৃ ২৩৫।

৭. কীথ, হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৮, পৃ ৪১।

'আশ্বলায়ন', 'কাত্যায়ন', 'শাঙখায়ন', লাট্যায়ন', 'দ্রাহ্যায়ন' এবং 'সত্যাষাঢ়' )- সময় স্থির করা হয়েছে খৃপূ ৮০০ থেকে ৪০০।[৮] কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবার এগুলোর কাল স্থির করেন খৃপূ ৪০০-২০০।[৯] কিন্তু ঐসব রচনায় যেহেতু সংহিতা ও ব্রাহ্মণে উল্লিখিত বহু আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তাই পরবর্তী বৈদিক সমাজ অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রেই কেবল আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে চেয়েছি। বেদোত্তর কালের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করেছি গৃহ্যসূত্র। অবশ্য প্রধান শ্রৌতসূত্রগুলোও যে গৃহ্যসূত্রেরই সমসাময়িক তাও আমরা লক্ষ না করে পারি না। বর্তমানে উপনিষদের সংখ্যা এমনকি দুশোরও বেশি, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ছ'টিকে ফেলা যেতে পারে প্রাগ্-বৌদ্ধ যুগে।[১০] পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রাপ্ত উপাদান পরীক্ষা করতে হলে কোন রচনাবিশেষের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক কালও খেয়াল রাখতে হবে।[১১] উপরন্তু, পরবর্তী সংহিতায় ও বিশেষত ব্রাহ্মণে 'ঋগ্বেদ' ও 'অথর্ববেদে'র চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় 'লিঙ্' বা ইচ্ছা-সূচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়।[১২] তাই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বহু কথাই প্রকৃত ঘটনার বিবরণ রূপে নেই। বরং উপদেশ বা নির্দেশ রূপেই সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু যা ঘটলেও ঘটে থাকতে পারে তার কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শন 'মহাভারতে'র মূল আখ্যানভাগ থেকে চয়ন করা যেতে পারে। 'মহাভারত' সম্ভবত পরবর্তী বৈদিক পর্বের ঘটনারই প্রতিফলন।[১৩] 'জয় সংহিতা' বা মূল মহাকাব্যের একটা বড় অংশ—যাতে প্রায় ৮০০০ শ্লোক আছে—প্রাচীন বলেই মনে হয়। পরবর্তী বৈদিক রচনাদির থেকে পাওয়া তথ্য পরিপূরণের জন্য এটি ব্যবহার করা চলে।[১৪]

পরবর্তী বৈদিক কালের সমাজ-বিকাশের বস্তুগত পটভূমি নির্মিত হয়েছে চিত্রিত ধূসর মৃৎভাণ্ডের ( চি ধূ মৃ ) পুরাতত্ত্ব দিয়ে। চি ধূ মৃ ও পরবর্তী বৈদিক রচনা একই অঞ্চল ও পর্বের। সুতরাং পরবর্তী বৈদিক পর্ব চর্চার ক্ষেত্রে চি ধূ মৃ-র নিদর্শনও ব্যবহার করা চলে। ১৯৭৫ অবধি ৩১৫টি চি ধূ মৃ স্থলের খবর পাওয়া গিয়েছিল[১৫], কিন্তু এখন শুধু হরিয়ানাতেই

৮ বৈদিক এজ, পৃ ৪৭৬।

৯. লুই রেনু ও জে. ফিলিওজা, 'ল্যাঁদ ক্লাসিক্', ১+২, জে. খোন্ডা র 'দ রিচুআল সূত্রস্' এ পৃ ৪৭৬-৭৭, পাদটীকায় উদ্ধৃত।

১০. বৈদিক এজ, পৃ ৪৬৭।

১১. সাধারণভাবে স্বীকৃত পণ্ডিতদের মত উল্লেখ করা ছাড়া আর বেশি কিছু বর্তমান ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

১২. ম্যাকডোনেল, 'আ বৈদিক গ্রামার ফর স্টুডেন্টস্', পৃ ১১৮।

১৩. তুলনীয় : হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পৃ ৭-৮।

১৪. মহাভারত, প্রামাণিক সংস্করণের ৭৮,০০০ শ্লোকের মধ্যে ৮,০০০ এর মতো শ্লোক নির্বাচিত করে কে. কে শাস্ত্রী, 'উর্-মহাভারত' বা 'জয় সংহিতা'-র পাঠ পুনর্বিন্যাস করেছেন।

১৫. বিভা ত্রিপাঠী, 'দ পেন্টেড্ গ্রে ওয়্যার', পরিশিষ্ট ১।

ঐরকম প্রায় ৩০০টি স্থান দেখা গেছে।[১৬] সুতরাং মোট সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বেশ কয়েকটি খনিত এলাকার কার্বন-১৪ পরীক্ষায় একই কালনির্ণয় হওয়ায় বোঝা যায়, চি ধূ মৃ পর্ব মোটামুটিভাবে আনু. খৃপূ ১০০০-৫০০ অবধি বিস্তৃত।[১৭] এক পশুপালক ও আধা-যাযাবর-গোষ্ঠী থেকে বৈদিক মানুষের স্থিতিশীল ও কৃষিজীবী গোষ্ঠীতে রূপান্তরের ইঙ্গিতই এর থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের ওপর বাড়ি-ঘরের কাঠামো দুর্বল এবং তার মধ্যে কোন সামাজিক বিভাজনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অবশ্য সুচারু চি ধূ মৃ ও কয়েকটি কাঁচের জিনিসের ব্যবহার হয়তো সমাজে একটি উচ্চস্তরের আবির্ভাবের সূচক হতে পারে। লোহার জিনিস প্রথম দেখা যায় উচ্চ-গাঙ্গেয় অববাহিকায়। কিন্তু সেগুলো প্রধানত যুদ্ধের জন্যেই ব্যবহার হতো, হস্তশিল্প এবং দানাশস্য চাষের ক্ষেত্রে সেগুলো তেমন কোন কাজে লাগেনি। সুতরাং আশা করা যায় না সেখানে এত বেশি সামাজিক উদ্বৃত্ত হবে যার থেকে অত্যধিক পেশাদার পুরোহিত, যোদ্ধা ইত্যাদির সংস্থান হতে পারে, কৃষক এবং বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন এবং শ্রমের উপর যাঁরা বেঁচে থাকেন। বস্তুগত সংস্কৃতির ফলেই সেই সামাজিক বৈষম্যের সূচনা হতে পারল[১৮] যা কেবল বেদোত্তর কালেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বেদোত্তর কালে শূদ্র জাতিকে মূলত সেবক শ্রেণী হিসেবেই দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে তাঁদের অবস্থান অনুধাবনের জন্য আগে তাঁদের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান দিয়েই আমরা তাই শুরু করব। গোড়ার দিকের একটি রচনাংশে বলা হয়েছে যে তাঁদের গবাদি পশু ছিল, উচ্চবর্ণের লোকেরা যজ্ঞের জন্যে সেগুলো নিয়ে যেতে পারতেন।[১৯] আদি পর্বের একটি 'ব্রাহ্মণে' অন্য একটি উল্লেখ থেকেও তার সমর্থন মেলে। সেখানে দেখানো হয়েছে, শূদ্ররা কোন দেবতা যা যজ্ঞ ছাড়াই জন্মেছেন, কিন্তু তাঁদের বহু পশু আছে ('বহুপশুঃ')।[২০] শূদ্ররা, স্পষ্টতই, স্বাধীনভাবে গোধনের অধিকারী ছিলেন, তাঁদের বোধহয় অন্যের অধীনে কাজ করার দরকার হতো না। গবাদি পশুই, মনে হয়, তখনও পর্যন্ত ছিল সম্পদের মুখ্য রূপ।

তাহলেও সেবক শ্রেণীরূপে শূদ্রদের কাজকর্মের কিছু উল্লেখ পাওয়া

১৬. ড. সূরজ ভান ও তাঁর সহযোগীদের খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে।

১৭. বি. বি. লাল, 'ডিড্ দ পেন্টেড গ্রে ওয়্যার কন্টিনু্য আপ টু দ মৌর্যান টাইম্স?' (সাইক্লোস্টাইল্ড্)।

১৮. রামশরণ শর্মা, "দ লেটার বেদিক ফেজ্ অ্যান্ড দ পেন্টেড্ গ্রে ওয়্যার কালচার", 'হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি: এসেস্ ইন অনার অফ প্রফেসর নীহাররঞ্জন রায়', পৃ ১৩৩-৪১;…শর্মা, "ক্লাস ফরমেশন অ্যান্ড ইট্স মেটিরিয়াল বেসিস ইন দ আপার গ্যাঞ্জেটিক বেসিন (১০০০-৫০০ বি.সি.)", 'দ ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিয়ু', খণ্ড ২, পৃ ১-১৩।

১৯. 'মৈত্রায়ণী সংহিতা' ৪।২।৭ ও ১০। ২০. 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' ৬।১।১১।

যায়। 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে', বলা হয়েছে, কোনরকম দেবতা ছাড়াই শূদ্রদের উৎপত্তি হয়েছিল প্রজাপতির পা থেকে, আর তাই গৃহস্বামীই হলেন তাঁদের দেবতা এবং তাঁর পা ধুয়েই তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে হবে।[২১] অর্থাৎ, একটি পরবর্তী সূত্রে যেমন বলা হয়েছে, উচ্চতর বর্ণের শুশ্রূষা করেই তাঁদের বাঁচতে হবে।[২২] প্রথম সূত্রটি থেকে আরও জানা যায় যে অশ্বমেধের ফলে পোষক বৈশ্য হয়ে ওঠেন ধনী আর উদীয়মান শূদ্র হন দক্ষ কর্মকর্তা।[২৩] 'কর্মকর্তা' শব্দটি এখানে ভাড়া-করা শ্রমিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা জানা নেই, তবে বেদোত্তর সাহিত্যে অনুরূপ শব্দ 'কর্মকর'-এর অর্থ সর্বদাই তা-ই।[২৪] গোড়ার দিকের একটি উপনিষদে অবশ্য শূদ্রকে বলা হয়েছে 'পূষণ' বা পোষক।[২৫] 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে'[২৬] ঐ অভিধা ('পোষয়িষ্ণুঃ') বৈশ্যদের প্রতি প্রযুক্ত। এর থেকে তাহলে আভাস পাওয়া যায় যে তাঁরা ভূমি কর্ষণ করতেন,[২৭] সমাজের পোষণকল্পে পালন ও উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবত এই পর্বের গোড়ার দিকে তাঁরাও উৎপাদনের একটা অংশ শুল্ক দিতেন। বেদোত্তরকালে এই বাধকতা থেকে তাঁরা মুক্তি পান।

কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখ থেকেও ধারণা হয়, শূদ্ররা ছিলেন শ্রমজীবী শ্রেণী। পুরুষমেধে ব্রাহ্মণদের উৎসর্গ করতে হবে পুরোহিতদের কাছে, রাজন্যদের অভিজাতবর্গের কাছে, বৈশ্যদের মরুৎদের (এক কৃষক সম্প্রদায়) কাছে এবং শূদ্রদের শ্রমের কাছে ('তপসে')।[২৮] মনে করা হতো, শূদ্র কঠোর শ্রমের প্রতিভূ। বধ্যের তালিকায় চতুর্বর্ণের সদস্যদের নামের পরেই আছে নানা বৃত্তির মানুষের তালিকা, যথা, রথকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, কর্মকার, মণিকার, পশুপালক, পশুচারক, কৃষক, শৌণ্ডিক, ধীবর ও ব্যাধ। এছাড়াও আছে কয়েকটি মানবগোষ্ঠী, যথা নিষাদ, কিরাত, পর্ণক, পৌল্কস ও বৈন্দ।[২৯] সম্ভবত 'শূদ্র' এই ব্যাপক নামের মধ্যে এঁরা সকলেই অন্তর্ভুক্ত

২১. 'শূদ্রো অনুষ্টুপ্‌ছন্দা বেশ্মপতিদেবস্‌; তস্মাদ্‌ উ পাদাবনেজ্যেনৈব জিজীবিষতি'। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১।৬৮ ৬৯।

২২. 'শুশ্রূষা শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানাম্‌'। স. শ্রৌ. ২৬।১-৭, কিন্তু শ্রৌতসূত্রের অন্যান্য প্রাচীন পাঠের কোথাও এটি পাওয়া যায় না।

২৩. 'উত্থাতা শূদ্রো দক্ষঃ কর্মকর্তা'। জৈ. ব্রা. ২।২৬৬। এর সমতুল্য কোন অংশ অন্যান্য ব্রাহ্মণে সম্ভবত নেই।

২৪. 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'র ৩।১১।১০।৩-এ 'কর্মকার' শব্দটি এসেছে ঋত্বিক্‌ ব্রাহ্মণ অর্থে, ভাড়া-করা শ্রমিক হিসেবে নয়। মনে হয় না অন্যান্য 'ব্রাহ্মণে' কর্মকারের উল্লেখ আছে।

২৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ১।৪।১৩। ২৬. ২।২৬৬।

২৭. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'এনশেন্ট ইন্ডিয়ান এডুকেশন', পৃ ১৫৮।

২৮. বাজসনেয়ি সংহিতা, ৩০।৫; শতপথ ব্রা. ১৩।৬।২।১০; তৈত্তিরীয় ব্রা. ৩।৪।১।১১।

২৯. বাজসনেয়ি ৩০।৬ ২১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪।২।১৭।

ছিলেন।[৩০] সুতরাং, এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, হস্তশিল্পের সংখ্যা যদিও বেড়েছে, 'বিশ্'-এর সদস্যরা এখন আর ঐসব কাজ করেন না। এই ধারণা ক্রমেই আরও দৃঢ় হচ্ছিল যে শূদ্রদের মধ্যে পড়েন বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পী ও শ্রমিক।

শূদ্র শ্রমিক ও তাঁদের নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি কী ছিল? 'বৈদিক সূচি'র প্রণেতারা বলেছেন, 'শূদ্র' এই শব্দের মধ্যে দাসরাও অবশ্যই অন্তর্ভূত।[৩১] কিন্তু দাসের সংখ্যা খুবই কম ছিল বলে মনে হয়। আমরা জানতে পারি যে রাজা অঙ্গ তাঁর ব্রাহ্মণ পুরোহিত আত্রেয়কে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বন্দী করে দশ হাজার দাসী দিয়েছিলেন।[৩২] সংখ্যাটি অবশ্যই অতিবর্ধিত ও গতানুগতিক। শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি গর্ব করেছেন যে তাঁর হিরণ্য, গো, অশ্ব, দাসী, প্রবর (অনুচর) ও পরিধান (পোশাক) আছে। কিন্তু পুরুষ-দাসের কথা তিনি বলেননি।[৩৩] কিংবদন্তী অনুসারে যুধিষ্ঠিরের অভিষেককালীন মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণরা দাসী লাভ করেছিলেন।[৩৪] এই ঘটনা পরবর্তী বৈদিককালীন বলে গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এই যুগে শাসক ও পুরোহিতবর্গ যথেষ্ট সংখ্যায় দাসীর অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দাস সম্পর্কে একথা বলা যায় না। 'ঐতরেয়' ও 'গোপথ ব্রাহ্মণে' 'দাস' শব্দটির উল্লেখ আছে,[৩৫] কিন্তু ক্রীতদাস অর্থে নয়। এও লক্ষণীয় যে, 'নিঘণ্টু'[৩৬]-তে ভৃত্যবাচক শব্দের যে তালিকা ('পরিচারণকর্মাণঃ') আছে তাতে 'দাসে'র উল্লেখ নেই, যদিও 'ভৃত্য'র সমার্থক দশটি শব্দ রয়েছে। সম্ভবত দাসের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে চোখেই পড়ত না। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ-শূদ্রদের যথেষ্ট সংখ্যায় দাস হিসেবে নিয়োগের সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায়। সুতরাং কীথ-এর বক্তব্য— 'ব্রাহ্মণে'র যুগে চাষীরা আর নিজেই নিজের ভূমি কর্ষণ করতেন না, তার বদলে ভূস্বামীরা দাস-শ্রমিক দিয়ে নিজের যোত্র চাষ করিয়ে নিচ্ছিলেন[৩৭]— প্রকৃত ঘটনার চিত্র না-ও হতে পারে।

৩০. 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ২৬৭। ৩১. ঐ।

৩২. 'দেশাদ্ দেশাৎ সমোল্‌হানাং সর্বাসাম্ আধ্যদুহিতৃণাম্ ; দশাদদাৎ সহস্রাণি আত্রেয়ো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ'। ঐতরেয় ব্রা. ৮।২২। এই রচনার পরবর্তী অংশের একটি ভাগ এই অধ্যায়টি।

৩৩. বৃহদারণ্যক, ৭।২।৭। ভূমিরও উল্লেখ নেই।

৩৪. মহাভারত: কলকাতা, ২।৩৩।৫২। দেখা যাচ্ছে, অঙ্গ-র সূত রাজা কর্ণ সঙ্গীত-কলায় পারদর্শিনী এমন একশো মাগধী দাস-কন্যা দান করতে চাইছেন। ঐ, ৮।৩৮।৭।১৮।

৩৫. ঐতরেয় ব্রা. ৬।১৮-১৯ ; গোপথ ব্রা., ২।৪।২, ৬।১। ৩৬. ৩।৫।

৩৭. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম খণ্ড, পৃ ১২৮। তুলনীয়ঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'হিস্টোরিওগ্রাফি অ্যাণ্ড আদার এসেস্', পৃ ৮৭, টী. ৯।

জমিতে দাসদের কাজ করার কথা প্রথম শোনা যায় শ্রৌতসূত্রে। শ্রৌতসূত্রগুলো বৈদিক যুগের শেষদিকে বা তারও পরে রচিত। একটি শ্রৌতসূত্রে বলা হয়েছে, ধান, লাঙল এবং ধেনুর সঙ্গে দুটি দাসও দান করতে হবে।[৩৮] এর থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে চাষের কাজে দাস নিয়োগ করা হতো এবং প্রভুরা তাঁদের অবাধে হস্তান্তর করতে পারতেন। কিন্তু কয়েকটি রচনাংশে ভূমি ও তার সঙ্গে কর্মরত লোকদের দান করার প্রথাকে ভালো চোখে দেখা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে, অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে ভূমি ও ভূমিতে কর্মরত লোকদের যজ্ঞের দক্ষিণার মধ্যে ধরা চলবে না ('ভূমিপুরুষবর্জম্')।[৩৯] আবার একদিনের যজ্ঞে ('একাহ') দানের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ভূমি ও শূদ্রদের দান করা চলবে না ('ভূমিশূদ্রবর্জম্')।[৪০] একটা বিকল্প অবশ্য আছে: কখনও কখনও শূদ্রদের দান করা যেতে পারে।[৪১] কিন্তু টীকায় বলা হয়েছে যে এমন করা চলে একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁরা দাস হয়েই জন্মেছেন।[৪২] 'শাংখায়ন শ্রৌতসূত্রে' অনুরূপ দুটি উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটিতে বলা হয়েছে, পুরুষমেধ যজ্ঞের সময়ে ভূমির সঙ্গে মানুষকেও যজ্ঞদক্ষিণারূপে দান করা হয়।[৪৩] অন্য উল্লেখটি স্পষ্ট নয়। তবে মনে হয়, সর্বমেধ যজ্ঞের সময়ে 'পুরুষসহ' ভূমিও দেওয়া হয়[৪৪]—এমন আভাসই আছে। এইসব উল্লেখ সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষদিকে এক নতুন সমাজ-বিকাশের ইঙ্গিত দেয়। ব্যক্তিস্বত্বের (অধিকাংশই ক্ষমতাসীন প্রধানদের) জমিতে কাজ করার জন্য দাসরূপে নিয়োগ করা হতো শূদ্রদের, আর জমির সঙ্গে তাঁদের দেওয়া যেত দানরূপে—'আশ্বলায়ন' ও 'কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে'র রচয়িতারা যদিও এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন।

বৈদিক যুগে শূদ্ররা ভূমিদাস ('সাফ') ছিলেন বলে ধরা হয়েছে।[৪৫] ভূমিদাস মানে এমন কোন লোক যিনি তাঁর প্রভুর ভূমির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নিজের থাকে এক টুকরো জমি, যার জন্যে তিনি প্রভুকে কর দেন এবং প্রভুর ক্ষেতে কাজ করে দেন। কিন্তু জমির সঙ্গে সঙ্গে দাসদেরও অন্য ভূ-স্বামীর কাছে হস্তান্তরিত করা যেত। যতদিন তিনি তাঁর ভূস্বামীর বৃহত্তর ভূখণ্ডে কাজ করে দেন ততদিনই তাঁকে ছোট এক টুকরো জমি রাখতে ও চাষ করতে দেওয়া হয়। ফলে ভূমিদাস-প্রথায় বৃহত্তর বিস্তৃত ভূখণ্ডের সঙ্গে ছোট ছোট

৩৮. ...দাসমিথুনৌ ধান্যপাল্যং সীরং ধেনুরীতি। লাট্যা. শ্রৌ. সূ. ৮।৪।১৪।

৩৯. আশ্বলায়ন, ১০।১০।১০। ৪০. কাত্যায়ন, ২২।১০।

৪১. শূদ্রদানং বা দর্শনাবিরোধাভ্যাম্। ঐ, ২২।১১।

৪২. ন চ বিরোধ গর্ভদাসস্য। কাত্যায়ন ২২।১১-এর ভাষ্য।

৪৩. সহপুরুষং চ দীয়তে। শাংখায়ন শ্রৌ. সূ, ১৬।১৪।১৮।

৪৪. সহভূমি চ দীয়তে। ১৬।১৫।২০। ঐ শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যে যুক্ত হয়েছে 'সপুরুষং চ'।

৪৫. 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ৩৮৯। ৪৬. ৪।২।৪-৫।

জমির টুকরো অর্থকরী ও বিধিসঙ্গতভাবেই যুক্ত থাকে। কিন্তু এমনকি বৈদিক যুগের শেষদিকেও ঐ ধরনের কোন প্রথা বহাল ছিল না। তাই প্রাসঙ্গিক উল্লেখগুলিতে শূদ্র শব্দটি ভূমিদাস অর্থে ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত। প্রথমত বৈদিক যুগে জমির ব্যক্তিস্বত্ব ছিল খুবই সীমিত ধরনের। স্বত্বের অর্থ হলো সম্পত্তির অবাধ হস্তান্তর, কিন্তু সংহিতাগুলোয় ভূমিদানের কোন উল্লেখই নেই। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' অবশ্য একটি ঐ ধরনের উদাহরণ আছে; সেখানে রাজা জনশ্রুতি রৈক্বকে পুরো একটি গ্রাম দান করেছেন।[৪৬] আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পরবর্তীকালের দুটি 'ব্রাহ্মণে'। তার থেকে জানা যায়, কুলের সম্মতিক্রমে ভূমিদান করা চলে,[৪৭] কিন্তু এমনকি সেখানেও ধরিত্রী হস্তান্তরিতা হতে অস্বীকৃতা হয়েছেন।[৪৮] পূর্বভিন যুগেও যে জমির সঙ্গে শূদ্রদেরও দান করা হতো এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। এই জাতীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে দেখা যায় কয়েকটি শ্রৌতসূত্রে। কিন্তু একটি টীকা থেকে মনে হয়, ঐ ধরনের শূদ্ররা ছিলেন জন্মদাস ('গর্ভদাস'),[৪৯] ভূমির সঙ্গে যুক্ত দাস নন। মনে হয়, আরও একটা ঘটনা দিয়েও একথা সমর্থিত হয়: বেদোত্তরকালে শূদ্রের করপ্রদায়ী চাষীরূপে দেখা যায় না। বাজপেয় (শক্তিপানীয়) যজ্ঞে কৃষকদের ('বিশ্' বা 'বৈশ্য') রাজন্যবর্গের খাদ্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০] এইজন্যই বোধহয় বৈশ্যদের দুঃখ আর পাপে পীড়িত হতে হবে।[৫১] 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'[৫২] বলা হয়েছে, বৈশ্যরা কর দেন ('বলিহৃৎ') এবং তাঁদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করা চলে (অজয়েয্যম্')। এই সব কিছু থেকে একটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায়: বৈশ্যরা তাঁদের উৎপাদনের একটা অংশ শাসকদের দিতে বাধ্য ছিলেন, আর তাঁরা তা-ই দিয়েই জীবনধারণ করতেন। শূদ্রদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঐরকম কোন ভূমিকা নির্ধারিত হয়নি। এর থেকেই দেখা যায়, করযোগ্য কোন সম্পত্তি যে শূদ্রদের থাকতে পারে—এমন ভাবাই হতো না। একটি উপনিষদে সোমের বর্ণনায় বলা হয়েছে: তিনি তাঁর ব্রাহ্মণ ও রাজন্য এই দুই মুখ দিয়ে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের আহার করেন।[৫৩] রাজন্যরা ব্রাহ্মণদের ও বৈশ্যরা রাজন্যদের কর দেন—এইভাবেই এখানে তাঁদের উপস্থাপিত করা হয়েছে। কর দিতে অক্ষম বলে শূদ্র যথারীতি বাদ পড়েছেন।

দাসত্ব বা ভূমিদাসত্বের নিরিখে বৈদিক যুগে শূদ্রদের অবস্থা নির্ণয় করা দুষ্কর। অতি-অর্বাচীন বৈদিক রচনার উল্লেখ থেকে শূদ্রদের শ্রমজীবী মানুষ বলেই মনে হয়; কিন্তু এমন মনে হয় না যে সাধারণভাবে তাঁরা ব্যক্তি-

৪৭. ঐতরেয় ব্রা. ৮।২১; শতপথ ব্রা. ১৩।৭।১।১৫। ৪৮. ঐ।

৪৯. কাত্যায়ন, ২২।১১-র ভাষ্য।

৫০. বৈশ্য দামানো ন ক্ষীয়তে···ব্রাহ্মণস্য চ রাজন্যস্য চাদ্যোঽধরোহি সৃষ্টঃ। পঞ্চবিংশ ব্রা. ৬।১।১০; শতপথ ব্রা. ৫।২।১ ১৭; ৮।৭।১২, ২।২।

৫১. শতপথ ব্রা. ৫।১।৫।২৮। ৫২. ৭।২৯। ৫৩. কৌষীতকি উপ. ২।৮-৯।

স্বত্বাধীন দাস বা ক্রীতদাস ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে, ভূমির উপর জনসমাজের যেমন একটা সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ছিল, তেমনি নিয়ন্ত্রণ ছিল শ্রমজীবী জনতার উপরেও। আর, এই অর্থে, শূদ্রদের মোটামুটিভাবে স্পার্টার 'হেলট'-দের সঙ্গে তুলনা করা চলে; পার্থক্য শুধু এই যে তাঁদের সহ্য করতে হতো আরও কম ঘৃণা ও অত্যাচার।

বৈদিক যুগের শেষ দিকে 'বিশ্'-এর হস্তশিল্পী সম্প্রদায়কে পরিণত করা হয়েছিল শূদ্রে, কিন্তু যে-সব কারুশিল্প বা কৃষি-কর্মে তাঁরা নিযুক্ত ছিলেন সেগুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো—এমন কোন নিদর্শন নেই। কৃষির ক্ষেত্রে অন্তত মন্ত্র প্রয়োগ ও কয়েকটি গৃহ্য আচার-পালনের মাধ্যমে সে-কাজকে সাহায্য, উৎসাহ ও মর্যাদা দান করা হতো।[৫৪] কারুশিল্পের ক্ষেত্রে এমনকি চর্ম-শিল্পকেও ঘৃণার দৃষ্টান্ত নেই।[৫৫] এর থেকে মনে হয়, অশুচিতার প্রসঙ্গটি কাজের প্রকৃতি (পরেও যা অপরিবর্তিত ছিল) থেকে উদ্ভূত হয়নি। এও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে শ্রৌতসূত্রে একটি অনুষ্ঠানের নাম 'শিল্প',[৫৬] যার অর্থ কারুবিদ্যাও বটে। পরবর্তী যুগে কায়িক শ্রমের প্রতি ঘৃণার ভাব নেই। এর সঙ্গে গ্রীসে অনুরূপ মতবিবর্তনের তুলনা করা যায়। সেখানে হেসিওদ থেকে সক্রেতিস পর্যন্ত (আনু. খৃপূ ৮০০-৪০০) সাধারণ মানুষের বিবেকবুদ্ধি ছিল কায়িক শ্রমের অনুকূলে।[৫৭] পরবর্তী বৈদিকযুগে কায়িক শ্রমের প্রতি এই শ্রদ্ধার মনোভাব সম্ভবত থেকে গিয়েছিল সেই প্রাচীন জটিলতাহীন সমাজ থেকে, যে-সমাজে এমনকি রাজাও লাঙলে হাত লাগাতেন। রাজা জনক সত্যই যজ্ঞভূমি কর্ষণ করেছেন, রাজা দুর্যোধনকেও তা-ই করতে বলা হয়েছে—মহাকাব্যের এই দৃষ্টান্ত দুটি সম্ভবত সেই প্রাচীন বৈদিক সমাজেরই প্রতিফলন, যে-সমাজ তখনও জনগোষ্ঠীয় সমতার অনেকটাই ধরে রেখেছিল। বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বপ্পমঙ্গলে দেখা যায়, রাজাদের হলকর্ষণের অবশেষ তখনও বিদ্যমান।[৫৮] এও খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে, প্রাচীন ইহুদী সমাজের রাব্বি-রা (শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা) কায়িক শ্রম করে নিজেদের জীবিকা-নির্বাহ করতেন এবং এই শিক্ষা দিতেন যে ঈশ্বর মানুষকে শুধু কর্মবিরতির দিন ('সাবাথ') বিশ্রাম করার আদেশই দেননি, সপ্তাহের অন্য ছ'দিন কাজ করতেও বলেছেন।[৫৯]

৫৪. অথর্ববেদ, ৩।২৪, ৬।১৪২; বাজসনেয়ি ৪।১০; শতপথ ব্রা., ১।৬।১।১-৮।

৫৫. প্রাসঙ্গিক তথ্য জোগাড় করেছেন এস. কে. দাস, 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ১৩৯-৪০।

৫৬. আশ্বলায়ন শ্রৌ. সূ. ৮।৪।৫-৮; ৯।১০।১১, ১১।২।

৫৭. 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট', সংখ্যা ৬, পৃ ১।

৫৮. "বপ্প-মঙ্গল", রিস্ ডেভিডস্ ও স্টিড, 'পালি ইংলিশ ডিক্‌শনারি' দ্র.। এখনও থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ-সম্রাট বাৎসরিক হলকর্ষণ উৎসব পালন করেন।

৫৯. লিন হোয়াইট, জুনিয়র, 'মিডিয়েভাল রিলিজিঅন অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি', পৃ ৩১৯।

শূদ্ররা, মনে হয়, এই পর্বের রাজনৈতিক জীবনেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইন্দো-আর্য শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর্যায়ে রাষ্ট্রের কাজকর্মে তাঁরা যথেষ্ট অংশভাক্ ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, 'রাষ্ট্রের উচ্চ-পদাধিকারীদের মহামান্য সংস্থা'য় (যাঁদের বলা হতো 'রত্নী') শূদ্রদেরও স্থান ছিল।[৬০] প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় মানবগোষ্ঠীদের (যেমন প্রাচীন স্যাক্সন, ফ্রিজীয়, কেল্ট ইত্যাদি[৬১]) একটি অতীব প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'বারোজনের পরিষদ্'-এর সঙ্গে এই 'রত্নী'দের তুলনা করা যায়। 'রত্নী'-রা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যে রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে বিভিন্ন দেবতাকে রত্ন-নিবেদন অনুষ্ঠানে রাজাকে তাঁদের বাড়ি যেতে হতো। 'রত্নী'দের তালিকা থেকে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে সব বর্ণের প্রতিনিধিই ছিলেন।[৬২] বিভিন্ন রচনায় দু-ধরনের রত্নী, রথকার ও 'তক্ষা'-র উল্লেখ আছে।[৬৩] এঁরা ছিলেন শূদ্রবর্ণভুক্ত কারুশিল্পী বর্গের লোক। তাঁদের বাড়িতে যে-যজ্ঞ হতো তার দক্ষিণারূপে যাবতীয় ধাতুর কথা বলা হয়েছে।[৬৪] এর থেকেই দেখা যায় যে ধাতুকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যই তাঁরা গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন। আগেই দেখানো হয়েছে কী করে 'অথর্ববেদে'র জনৈক রাজা 'কর্মার' ও 'রথ-কার'দের সহায়তা লাভের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি রচনায় 'কর্মারে'র জায়গা নিয়েছেন 'তক্ষা'। 'রথকার'দের সঙ্গে এই 'তক্ষা'রাও হয়তো ধাতুকর্ম ও রথ-নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বে ছিলেন। এই কাজ-দুটি ছাড়া আরও পূর্ব ও দক্ষিণে আর্যদের বিস্তার তথা বসতিস্থাপন আদৌ হতে পারত না। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' অবশ্য এই দুই রত্নীর উল্লেখ নেই তাঁদের স্থান নিয়েছেন 'গোবিকর্তন' (ব্যাধ) এবং 'পালাগল' (দূত)।[৬৫] এমন ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে এঁরা ছিলেন অনু-আর্যভূত আদিবাসী, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁদের শূদ্রবর্ণভুক্ত করে নেওয়া হয়। রত্নদান অনুষ্ঠানের পরেই রাজাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো, কারণ ভাবা হতো যে অযজ্ঞীয় শূদ্রদের যজ্ঞের সংস্পর্শে আনার দোষে তিনি দোষী।[৬৬] সায়ণ আরও অনেক এগিয়ে

৬০. জায়সবাল, 'হিন্দু পলিটি', ২য় খণ্ড, পৃ ২০।

৬১. চ্যাড্উইক, 'দ হিরোইক এজ', পৃ ৩৭০।

৬২. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'হিস্টোরিওগ্রাফি অ্যান্ড আদার এসেজ্', পৃ ২৫৩।

৬৩. ...তক্ষরথকারোয়োর্গৃহে। মৈত্রায়ণী ২।৬।৫; আপস্তম্ব ১৮।১০।১৭; সত্যাষাঢ় ১৩।৪।৮। লক্ষ করার মতো যে 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র ১।৮।৯।১-২ ও 'কাঠক সংহিতা'-র ১৫।৪-এ রত্নীদের অনুরূপ বর্ণনায় তক্ষা ও রথকারের উল্লেখ করা হয়নি।

৬৪. সর্বাযসানি দক্ষিণা। ঐ।

৬৫. শতপথ ব্রা. ৫।৩.১, ১০-১১।

৬৬. এষইত্তমঃ প্রবিশত্যেতং বা তমঃ প্রবিশতি যদযজ্ঞীয়ানিয়োজ্ঞেন প্রসজত্যা যজ্ঞিয়ান্-স্বাই এতদ্ যজ্ঞেন প্রসজতি শূদ্রান্স্ত্বদ্যাংস্তু।। শতপথ ব্রা. ৫।৩।২।২-৪। প্রায়শ্চিত্তের রীতি হিসেবে সোম ও রুদ্র এবং মিত্র ও বৃহস্পতিকে উৎসর্গ করা হতো। যজ্ঞে শূদ্রদের যোগদানের ব্যাপারে এই দুটি বিপরীত ধারণার মধ্যে একটি বোঝাপড়ায়

'সেনানী' ( সেনাবাহিনীর অধিনায়ক )-কেও শূদ্র 'রত্নী'দের মধ্যে ধরেছেন।[৬৭] খুব সম্ভব অযজ্ঞীয় শূদ্রদের উল্লেখ শুধু 'পালাগল' ও 'গোবিকর্তন'-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'পালাগল'-কে শূদ্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে তিনি ছিলেন শূদ্র।[৬৮] আর এক জায়গায় 'পালাগল' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে মিথ্যা দূত ( 'অনৃতদূত' ) বলে।[৬৯] এখানে 'পালাগলে'র উপর যে-সব গুণ আরোপ করা হয়েছে সেগুলো সবই পরবর্তীকালে শূদ্রদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৭০] 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র[৭১] তালিকা ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি তালিকায় 'রত্নী' হিসেবে 'গোবিকর্তনে'র উল্লেখ আছে। সায়ণ[৭২] এঁকে 'হীনজাতি' বলে চিহ্নিত করেছেন। মনে হয় মৃগ ও বন সংরক্ষণের ভার ছিল তাঁর উপর, আর তিনি হয়তো শূদ্রই ছিলেন। 'রত্নী'দের মধ্যে একজন ছিলেন 'ক্ষত্তা'। কীথ এঁকে খোদাইকার অর্থে ধরেছেন।[৭৩] সে-অর্থে তিনিও ছিলেন শূদ্র। এই ব্যাখ্যা অবশ্য সন্দেহ-জনক, কারণ মহাকাব্যে 'ক্ষত্তা' শব্দের অর্থ হলো কঞ্চুকী।[৭৪] আর এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যে শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'রত্নী'দের মধ্যে 'তক্ষা'কেই খোদাইকার অর্থে ধরা ভালো। সুতরাং মনে হয়, কতক ক্ষেত্রে শূদ্রবর্ণভুক্ত কারুশিল্পী, আবার অন্য কতকক্ষেত্রে ঐ বর্ণের পশুপালক ও দূতদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো—এতই গুরুত্বপূর্ণ যে অভিষেক যজ্ঞ উপলক্ষ্যে রাজা তাঁদের কাছে যেতেন।

কিন্তু শূদ্র 'রত্নী'দের অবস্থানটি আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রথমত, ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও বৈশ্য 'রত্নী'দের ক্ষেত্রে তাঁদের যেমন বর্ণের নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, শূদ্র 'রত্নী'দের বেলায় কিন্তু তেমন করা হয়নি।[৭৫]

আসার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে হয়। শূদ্রদের সঙ্গে রাজা যজ্ঞীয় সম্পর্কে আসতে পারতেন, কিন্তু এর ফলে যে পাপ হতো এক আনুষ্ঠানিক কৃত্য করে তা মোচন করতে হতো। উল্লেখ্য যে 'কৃষ্ণ যজুর্বেদে' বা 'শুক্ল যজুর্বেদে'র অন্যান্য পাঠে এটি পাওয়া যায় না। ( উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'হিন্দু পাবলিক লাইফ', ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৩ )।

৬৭. শূদ্রান্ সেনান্যাদিন্…। শতপথ ব্রা. ভাষ্য, ৫।৩।২।২।

৬৮. শাঙ্খ্যায়ন শ্রৌ. সূ, ১৬।৪।৪ ; তুলনীয়ঃ শতপথ ব্রা. ১৩।৫।২।৮।

৬৯. আপস্তম্ব শ্রৌ সূ. ( গার্বে সং ), ১৮।১০।২৬।

৭০. ঐ, ৬।৩।১২।

৭১. মৈত্রায়ণী, ২।৬।৫ ; আপস্তম্ব শ্রৌ সূ. ( গার্বে সং ), ১৮।১০।২০ ; সত্যাষাঢ় ১৩.৪।৮।

৭২. শতপথ ব্রা. ভাষ্য, ৫।৩।২।২-৪।

৭৩. "ক্ষদ্", খোদাই করা থেকে এই অর্থ করেছিলেন তিনি। হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, খণ্ড ১৮, পৃ ১১০।

৭৪. "ক্ষত্তৃ", মনিয়ের উইলিয়ম্‌স, 'স্যান্‌স্‌ক্রিট-ইংলিশ ডিক্‌শনারি' দ্র.। সায়ণের মতে ক্ষত্তা হলো শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার পুত্র।

৭৫. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল তাঁর 'হিস্টোরিওগ্রাফি অ্যাণ্ড আদার এসেজ্'-এর পৃ ২৪৯-এর মুখপাত পৃষ্ঠায় 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণে' প্রাপ্ত রত্নীদের তালিকা সংকলিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা, কাজ এবং প্রতিনিধিত্বের নিরিখে মনে হয় শূদ্র 'রত্নী'দের বিরুদ্ধেই পাল্লা ছিল ভারী। কালক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে তাঁদের আগমন হয়তো নিয়মরক্ষায় পরিণত হয়। ভিন্ন ভিন্ন তালিকায় শূদ্র 'রত্নী'র সংখ্যা দুই থেকে তিনের মধ্যেই থাকে।[৭৬] কোন কিছু থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে তাঁদের উপস্থিতিতেই পুরো শূদ্রবর্ণের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হতো। তবে ঐ সম্প্রদায়ের কিছু অংশ নিশ্চয়ই রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্থান পেয়েছিলেন।

রত্নহবীংষি অনুষ্ঠানকে জায়সবাল এক বিরাট সাংবিধানিক পরিবর্তন-রূপে দেখেছেন এই বিচারে যে "বিজিত 'হেলট' শূদ্রকে এখন পূজা করছেন সেই লোক যিনি রাজা হতে চলেছেন।"[৭৭] এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আর্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিজিত প্রাগ্-আর্য জনসাধারণকে ইচ্ছাকৃতভাবেই উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে অন্তত দুজন হস্তশিল্পী রত্নী, 'রথকার' ও 'তক্ষা'র সামাজিক পদমর্যাদার কারণ এই নয় যে আর্য রাষ্ট্রীয় সংগঠনে বিজেতাদের উচ্চস্থান দেওয়ায় কোন সুচিন্তিত নীতি ছিল। তাঁদের পদমর্যাদার কারণ হলো তাঁরা ছিলেন সেইসব আর্য জনগোষ্ঠীর আদি সদস্য যাঁরা ইতোমধ্যে বহুবর্ণে বিভক্ত হয়ে গেছেন। কারণ 'অথর্ববেদে' স্পষ্টই 'রথকার' ও 'কর্মার' (ইতোমধ্যে যাঁর স্থান নিয়েছেন 'তক্ষা')-এর উল্লেখ করা হয়েছে রাজার পার্শ্ববর্তী 'বিশ্' (জনতা)-এর অংশ বলে।[৭৮] ধাতুকর্ম ও রথনির্মাণের ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক রূপে তাঁদের অপরিহার্যতাও হয়তো পূর্ববর্তী সমাজে তাঁদের গুরুত্বের হেতু ছিল। তাহলেও এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এই শূদ্র রত্নীরা ছিলেন বলেই শূদ্রবর্ণভুক্ত অন্যান্য অংশও খানিক প্রতিফলিত গুরুত্ব পেতেন।

এ যুগের রাজনৈতিক জীবনে শূদ্রদের যোগদানের আরও প্রমাণ পাওয়া যায় অক্ষক্রীড়া অনুষ্ঠানে। রাজসূয় যজ্ঞকালে পালনীয় একটি আচাররূপে এটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই খেলার দুটি আলাদা কাহিনী আমরা পাই। প্রথম দিককার কাহিনীটি আছে 'কৃষ্ণ যজুর্বেদে'। একটি গাভীর জন্য অক্ষক্রীড়ায় বসেছিলেন ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র। গাভীটিকে রাজাই জিতে নেন।[৭৯] পরের কাহিনীটি আছে 'শুক্ল যজুর্বেদে'। সেখানে প্রতিযোগী হিসেবে বৈশ্য আর শূদ্রকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে; গাভীটির জন্য বাজি ধরেছেন রাজার আত্মীয়-স্বজন ('সজাতি') এবং রাজার হয়ে

৭৬. একটি তালিকায় (মৈত্রায়ণী, ২।৬।৫ ; ৪।৩।৮) তাদের সংখ্যা তিন, অন্য দুটিতে আছে দুই (কাঠক, ১৫।৪ ; শতপথ, ৫।৩।১ ইঃ)। আশ্চর্যের ব্যাপার যে 'কৃষ্ণ-যজুর্বেদে'র পাঠে এদের উল্লেখ নেই (তৈত্তিরীয়, ১।৮।৯।১ ইঃ ; তৈ. ব্রা. ১।৭।৩)।

৭৭. 'হিন্দু পলিটি', ২য় খণ্ড, পৃ ২১।

৭৮. অথর্ব ৩।৫।৬।

৭৯. তত্র পষ্ঠৌহীং বিদীব্যন্তে ব্রাহ্মণো রাজন্যো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ। বারাহ শ্রৌ. সূ. ৩।৩।২।৪ ; মৈত্রায়ণী ৪।৪।৬ ; আপস্তম্ব (গার্বে সং), ১৮।১৯।২-৩ ; সত্যাষাঢ়, ১৩।৬।২৯-৩০।

তা জিতে নেন অধ্বর্যু।[৮০] মনে হয় গরু নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আদিতে ছিল এক জনগোষ্ঠীয় প্রথা, এই দিয়ে নেতার বুদ্ধি-বিচক্ষণতা পরীক্ষা করা হতো। সুতরাং, সমস্ত বর্ণের অক্ষ-ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের কারণ হলো জন-গোষ্ঠীর সংহতি ও সমরূপতার প্রাচীন পরম্পরা। কিন্তু কালক্রমে এই আচারের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা অক্ষক্রীড়া থেকে বাদ পড়লেন। তাহলেও এ-বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে পূর্ববর্তী যুগে এমনকি শূদ্রও প্রতিযোগীরূপে তাতে ভাগ নিতে পারতেন, যে-খেলা ছিল রাজার আনুষ্ঠানিক অভিষেকের সূচনার অন্যতম অংশ।

আবার, রাজসূয় যজ্ঞের আরেকটি অনুষ্ঠানেও শূদ্রদের দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানে যজমান প্রথম স্বর্ণদান করেন ব্রাহ্মণকে এবং তা-ই দিয়ে কিনে নেন তেজ; তারপর রাজন্যকে তিনটি তীর সমেত একটি ধনুক দিয়ে কেনেন ওজ; এরপরে একটি অংকুশের বিনিময়ে বৈশ্যের কাছ থেকে কেনেন পুষ্টি, আর সবশেষে একপাত্র মাষ দেন শূদ্রকে আর কিনে নেন আয়ু।[৮১] যদিও বর্ণবৈষম্য রক্ষিত হয়েছে এবং শূদ্রদের উপস্থিত করা হয়েছে সম্ভবত কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিক রূপেই, তবুও তাঁদের আনা হয়েছে রাজার সংস্পর্শে, এবং ভাবা হয়েছে তাঁরা রাজাকে দীর্ঘায়ু দিতে পারেন।

সম্ভবত রাজসূয় যজ্ঞের আরও একটি অনুষ্ঠানেও শূদ্ররা যুক্ত ছিলেন। সেখানে নব-অভিষিক্ত রাজাকে আকাশের চতুর্দিকে আরোহণ করতে বলা হয়েছে। পূর্বে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ক্ষত্র, পশ্চিমে 'বিশ্' এবং উত্তরে 'ফল', 'বর্চস্' ও 'পুষ্টম্'কে অনুরোধ করা হয়েছে তাঁকে রক্ষা করার জন্য।[৮২] কাশী-প্রসাদ জায়সবাল বলেছেন, স্পষ্টতই শূদ্রের পরিবর্তে এসেছে ফল।[৮৩] উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল অবশ্য এই মত মানেননি; তিনি এই অনুষ্ঠানকে বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চতর তিন বর্ণের প্রভাবের প্রতীক বলেই মনে করেন।[৮৪] এমনও বলা হয়েছে যে 'ফল' পদটি শ্রমে নিযুক্ত শ্রেণীকেই বোঝায়।[৮৫]

৮০. বাজসনেয়ি সংহিতা ১০।২৯; শতপথ ব্রা ৫।৪।৪।১৯-২৩; কাত্যায়ন, ১৫।৭।৭।১১-২০।

৮১. কাঠক, ৩৭।১। এটির সমজাতীয় কোন অংশ 'বাজসনেয়ি', 'কপিষ্ঠল', 'তৈত্তিরীয়' ও 'মৈত্রায়ণী সংহিতা'য় নেই, কিন্তু 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'র ২।৭।৯।১ ও ২-এ পরিবর্তিত রূপে আছে। 'ওজস্'-এর পরিবর্তে আছে 'বীর্যম্'। তুলনীয় সত্যাষাঢ়. ২৩।৪।২১, যেখানে ঐ অংশটি 'ওদনোসবে'র প্রসঙ্গে এসেছে।

৮২. 'ফল' ও 'বর্চস্', বাজসনেয়ি, ১০।১০-১৩-য়; 'বল' ও 'বর্চস্' তৈত্তিরীয়, ১।৮। ১৩-য়; 'পুষ্টম্' ও 'ফলম্' মৈত্রায়ণী, ২।৬।১০-এ, 'পুষ্টম্' ও 'বর্চস্' কাঠক ১৫।৭-এ।

৮৩. পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ২৯ টী. ২। ৮৪. 'হিস্টোরিওগ্রাফি অ্যাণ্ড এসেজ্', পৃ ২৬৪।

৮৫. এস. ভি. বেঙ্কটেশ্বর, 'ইণ্ডিয়ান কালচার থ্রু দি এজেস্', ১ম ভাগ, পৃ ১১।

আমাদের মতে, বৈদিক সাহিত্যে 'ফল' শব্দটিকে[৮৬] যে তার পরবর্তী গৌণ অর্থে ( 'পরিণতি' ) ব্যবহার না করে আক্ষরিক অর্থেই ( অর্থাৎ বৃক্ষাদির ফল অর্থেই ) করা হয়েছে, তা হয়তো শূদ্রদের উৎপাদক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত না-ও হতে পারে। কিন্তু 'বর্চস্' ( যার মানে ঔজ্জ্বল্য ) শব্দটি সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। আর 'পুষ্টম্' ( পুষ্টি ) শব্দটি সাধারণত বৈশ্যদের সঙ্গেই যুক্ত হলেও, এক জায়গায় শূদ্রকেও 'পূষা' ( পুষ্টিদাতা ) বলা হয়েছে।[৮৭] সুতরাং খুব নির্দিষ্টভাবে না হলেও এমন প্রস্তাব করা যায় যে 'ফলম্' এবং 'পুষ্টম্' শব্দদুটি হলো শূদ্রদেরই উৎপাদক ক্রিয়াকলাপের প্রতিফলন ; উত্তর দিকে রাজাকে রক্ষা করার জন্য পরোক্ষে তাঁদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

"সভাপর্ব"কে 'মহাভারতে'র অন্যতম আদি অংশ বলেই ধরা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, যুধিষ্ঠিরের বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের সময়ে সম্মানীয় শূদ্রদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।[৮৮] এর বিরোধী বিবৃতি—কোন অ-যজ্ঞকারী শূদ্র ঐ উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন না[৮৯]—সম্ভবত রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে শূদ্রদের বাইরে রাখার পরবর্তী প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। যাই হোক, স্পষ্টই মনে হয় যে শূদ্রদের অন্তত কয়েকটি শাখা রাজ-অভিষেকে যোগ দিতেন।

শুক্ল ও কৃষ্ণ 'যজুর্বেদ সংহিতা'র[৯০] একটি অংশে বলা হয়েছে, রাজসূয় যজ্ঞকালে 'বিশ্' ( জনতা )[৯১]-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজা আর্য ও শূদ্রদের বিরুদ্ধে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সূর্যের কাছে প্রার্থনা করেন। পাণিনির ভিত্তিতে[৯২] টীকাকার উবট ও মহীধর 'অর্য' শব্দটিকে বৈশ্য অর্থে ধরেছেন।[৯৩] এর থেকে দেখা যায়, এমনকি রাজাও নিম্নতর দুটি বর্ণকে যথেচ্ছ নিপীড়ন করতে পারতেন না। এই অবস্থা 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'[৯৪]-কালীন অবস্থার চেয়ে একেবারেই আলাদা। সেখানে দেখা যায়, বৈশ্য ছিলেন নিপীড়নের যোগ্য [ 'যথাকাম-জেয়ঃ' ] এবং শূদ্রকে রাজার ইচ্ছামতো প্রহার করা যায় [ 'যথাকাম-বধ্যঃ' ]।

লোকের ধারণা ছিল যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যজমান সার্বভৌমত্ব লাভ

৮৬. 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ৫৭। ৮৭. বৃহদারণ্যক, ১।৪।১৩।

৮৮. বিশশ্চ মান্যাঞ্ শূদ্রাংশ্চ সর্বানানয়তেতি চ। মহাভারত ২।৩০।৪১।

৮৯. ন তস্যাং সংনিধৌ শূদ্রাঃ কশ্চিদাসীন্ন চাব্রতঃ। ঐ, ২।৩৩।১।

৯০. যদ্‌চ্ছূদ্রে যদর্যে যদেনশ্চকৃমা বয়ং যদেকস্যা ধি ধর্মণি তস্যাবয়জনমসি। বাজসনেয়ি, ২০।১৭ ( সৌত্রামণি যজ্ঞ প্রসঙ্গে ) : তৈত্তিরীয়, ১।৮।৩।১ : কাঠক ৩৮।৫ , তুলনীয় : শতপথ ব্রা. ১২।৯।২।৩।

৯১. বাজসনেয়ি ২০।১। ৯২. অর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ। পাণিনি ৩।১।১০৩।

৯৩. বাজসনেয়ি সংহিতা ২০।১৭-র ভাষ্য। 'বৈদিক ইনডেক্স'-এ এটি আর্য অর্থে ধরা হয়েছে। ৯৪. ৭।২৯।

করেন। এই যজ্ঞে যে-ঘোড়াকে বিশ্বজয়ের অভিযানে পাঠানো হতো তার সশস্ত্র রক্ষী হিসেবে দেখা যায় শূদ্রদের।

শূদ্ররা যে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন পূর্বতন একটি রচনাংশ থেকে তা অনুমান করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, রাজাকে সহায়রূপে পেলে তাঁরা হত্যা করেন রাজাকে, বৈশ্যের সহায়ে বৈশ্যকে এবং শূদ্রের সহায়ে শূদ্রকে।[৯৬] 'মহাভারতে'র পরম্পরাগত আখ্যানে দম্ভোদ্ভব বলে এক রাজার কথা আছে। যুদ্ধে তাঁর সমকক্ষ বলে নিজেদের প্রমাণ করবার জন্য তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের সশস্ত্র সৈন্যদের প্রতিদিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জানাতেন।[৯৭] যুদ্ধে রত বিভিন্ন নেতা ও মানবগোষ্ঠীর বর্ণনা প্রসঙ্গে এই মহাকাব্যে চতুর্বর্ণের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। সব বর্ণের লোকেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন আর তার ফলে অর্জন করেছিলেন ধর্ম, স্বর্গ ও যশ।[৯৮] সুতরাং শূদ্রেরাও সৈনিকরূপে কাজ করতে পারতেন। এর মধ্যে আবার সেই প্রাচীন জনগোষ্ঠীয় ব্যবস্থার প্রভাবই দেখা যায়, যে-সমাজের প্রতিটি সদস্যই অস্ত্র-ধারণ করতে পারতেন।

আরও লক্ষণীয় যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে প্রহরী কুকুরের কাজ করেন 'আয়োগব'।[৯৯] ভাষ্যকার তার অর্থ করেছেন শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার সন্তান। সম্ভবত এখানে আদিবাসীদের প্রহরীরূপে নিয়োগের প্রথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' একটি অনন্য দৃষ্টান্ত আছে: মরুত্ত আবিক্ষিত নামে এক আয়োগব রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞে মরুৎরা হয়েছিলেন তার পরিবেষ্টা (দেহরক্ষী), অগ্নি ক্ষত্তা এবং বিশ্বদেবরা (বিশ্বেদেবাঃ) সভাসদ্।[১০০] এটি কোন শূদ্র রাজার ঘটনা বলে মনে হয় না। বরং সম্ভবত কোন অ-ব্রাহ্মণ শাসককে ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করে নেওয়ারই উদাহরণ। ধর্মসূত্রের আগে 'আয়োগবে'র কোন সংজ্ঞার্থ

৯৫. শতং শূদ্রা বরূথিনঃ। আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ (গার্বে সং), ২০।৫।১৩; তুলনীয়ঃ কাত্যায়ন শ্রৌ. সূ. ২০।৫০। 'আপস্তম্ব'-এর জনগ্রাহ্য সংস্করণ 'সত্যাষাঢ়'-এ 'শূদ্রা বরূথিনঃ' —শব্দগুচ্ছটি বাদ পড়েছে। মনে হয় পরবর্তী পঙ্‌ক্তিপাতের ফলে এমন ঘটেছে।

৯৬. তস্মাদ্ রাজ্ঞা রাজানম্ অংশভূবা ঘ্নন্তি বৈশ্যেন বৈশ্যম্ শূদ্রেণ শূদ্রম্। তৈত্তিরীয়, ৬।৪।৮।

৯৭. অস্তি কশ্চিদ্বিশিষ্টো বা মদ্বিধো বা ভবেদ্যুধি; শূদ্রো বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বা ব্রাহ্মণো বাপি শস্ত্রভৃৎ। মহাভারত ৫।৯৪।৭।

৯৮ তেষামন্তকরং যুদ্ধং দেহপাপপ্রণাশনম্।
শূদ্র বিট্‌ক্ষত্রবিপ্রাণাং ধর্ম্যং স্বর্গ্যং যশস্করম্॥ মহাভারত ৮।৩২।১৮।
প্রামাণিক সংস্করণে 'বিপ্রাণাম্'-এর জায়গায় আছে 'বীরাণাম্'। কিন্তু দুটি পুঁথিতে (তেলগু ১ ও গ্রন্থ ৩) প্রথমটিই আছে। সেটিই আরও উপযুক্ত বলে মনে হয়।

৯৯. কাত্যায়ন শ্রৌ. সূ. ২০।৩৭। ১০০. শতপথ ব্রা. ১৩।৫।৪।৬।

চোখে পড়ে না, আর তাই আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে মরুত্ত আবিক্ষিত ছিলেন এক নিম্নবর্ণের রাজা।

অশ্বমেধ যজ্ঞে রথকারের বাড়ি হবে ঘোড়া ও রক্ষীদের বিশ্রামের জায়গা —এমন ব্যবস্থাই দেওয়া হয়েছিল।[১০১] দেখা যাচ্ছে যে অশ্বমেধের উত্তর-কালীন অনুষ্ঠানেও রথকারের রাজনৈতিক অবস্থানে কোন ছেদ পড়েনি।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হতো চতুর্বর্ণের সবকটিকেই জয় করার উদ্দেশ্যে। শাসক যে সমাজের সর্বস্তরের আনুগত্য লাভের প্রয়োজন বোধ করতেন—এর থেকেই তা দেখা যায়।[১০২] আর একটি রচনাংশ থেকেও একই ধারণা হয়। সেখানে রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, রাজাকে তেজ, বীর্য, প্রজনন ও প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দেন পুরোহিত। এই গুণগুলো যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[১০৩] 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র একটি অংশেও অনুরূপ ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।[১০৪] সেখানে বলা হয়েছে রাজন্যকে প্রজ্বালনমন্ত্র পড়তে হবে তিনবার, কারণ যোদ্ধার আনুগত্য ছাড়াও তাঁকে অর্জন করতে হবে আরও তিন শ্রেণীর লোকের বিশ্বস্ততা: ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের। এই সব থেকেই দেখা যায়, পরবর্তী কয়েকটি তথ্যসূত্রে যেমন ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে শূদ্রেরা হবেন অনুগত, এখানে ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে'র একটি অংশ থেকেও একথা সুস্পষ্ট যে রাজার পক্ষে শূদ্রদের সমর্থন লাভ করাটা ছিল অপরিহার্য। এর থেকে জানা যায় যে পাঞ্চাল রাজা দর্ভ শাতানীকি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন যথাক্রমে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্, জগতী ও অনুষ্টুভ্ ছন্দ ব্যবহার করে।[১০৫]

'যজুর্বেদ সংহিতা'র সব শাখাতেই অগ্নির উদ্দেশে একটি প্রার্থনা আছে। তাতে বলা হয়েছে, তিনি যেন 'আমাদের' পুরোহিত, যোদ্ধা, বৈশ্য এবং শূদ্রদের 'রুচি' (দীপ্তি) দান করেন।[১০৬] 'বাজসনেয় সংহিতা'য় 'বসোর্ধারা' সম্পাদনের মন্ত্রাদির আলোচনা প্রসঙ্গে এই অংশের উল্লেখ আছে। 'বসোর্ধারা' হলো রাজরূপে অগ্নির এক ধরনের অভিষেক-অনুষ্ঠান।

১০১. শতপথ ব্রা. ১৩।৪।২।১৭; আপস্তম্ব (গার্বে সং), ২০।৫।১৮; কাত্যায়ন ২০।৫৫; সত্যাষাঢ় শ্রৌ. সূ. ১৩।১।৪৭।

১০২. জৈমিনীয় ব্রা. ২।২৬৬-৬৭।

১০৩. ঐতরেয় ব্রা. ৮।৪।

১০৪. তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।৫।১০। যজুর্বেদের অন্যান্য সংহিতায় এর সমজাতীয় অংশ নেই।

১০৫. জৈমিনীয় ব্রা. ২।১০২। শাংখায়ন শ্রৌ. সূ. ১৪।৩৩।১৮-১৯-এ সামান্য পরিবর্তিত রূপে একই কথা বলা হয়েছে।

১০৬ রুচং বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচা রুচম্। তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।৭।৬।৪; বাজসনেয় সংহিতা ১৮।৪৮; কাঠক ৪০।১৩; মৈত্রায়ণী ৩।৪।৮; শতপথ ব্রা. ৯।৪।২।১৪-য় আছে 'রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেম্বিত্যিতি'। জে. এগলিং মনে করেন আর তিনটি

এই উপলক্ষ্যে যজমানকে যাবতীয় ঐহিক ও আধ্যাত্মিক ফল প্রদান করার জন্য যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুরোহিত (অধ্বর্যু) মন্ত্র আবৃত্তি করেন। যদিও ব্যাপারটি অস্পষ্ট, তাহলেও এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে রাজার জন্যই এই অনুষ্ঠান পালনের বিধান দেওয়া হয়েছিল। শূদ্র সমেত তাঁর সমস্ত বর্ণের প্রজাদের দীপ্তিদানের জন্য অগ্নির কাছে প্রার্থনা করেন তিনি।

যেসব আচার-অনুষ্ঠানকে বলা যায় রাজনৈতিক ধরনের তাতে শূদ্র-অংশগ্রহণের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। কতক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খ বিষয়গুলো বর্ণ অনুযায়ী ভিন্ন হতো, আর স্বাভাবিকভাবেই শূদ্রদের দেওয়া হয়েছিল নিম্নতম স্থান। অন্যান্য ক্ষেত্রে শূদ্র সমেত সমস্ত বর্ণই একইভাবে অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন এবং আশাও করতেন অনুরূপ সুফল। অন্তত এটুকু লক্ষণীয় যে ধর্মশাস্ত্রের বিধিবিধানের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক যুগের রাজনৈতিক ক্ষমতায় উচ্চতর তিনবর্ণের সদস্যদের সঙ্গে শূদ্ররাও কিছু ভাগ পেতে পারতেন।

কিন্তু এর একটা অন্য দিকও আছে। ইতিমধ্যেই এই যুগে, বিশেষত শেষের দিকে, গোষ্ঠীজীবনে শূদ্রদের যোগ দিতে না-দেওয়ার একটা সুস্পষ্ট প্রবণতার সূচনা হয়। যেমন, রাজসূয় যজ্ঞকালীন অভিষেচন অনুষ্ঠানে উচ্চতর তিন বর্ণের মতো শূদ্ররা যোগ দিতে পারতেন না।[১০৭] জায়সবাল দাবি করেছেন যে বিভিন্ন রচনায় 'জন্য' বা 'জন্যমিত্র' নামে যে চতুর্থ ব্যক্তিকে রাজার অভিষেচন করতে দেখা যায়, তিনি হলেন শূদ্র, এই অর্থে যে তিনি বৈরী জনগোষ্ঠীর লোক।[১০৮] এই ধরনের ব্যাখ্যার কোন প্রামাণিকতা আছে বলে মনে হয় না। আমাদের মত অন্য। 'ব্রাত্য'রা যেমন 'ব্রাত' বা কোন জনগোষ্ঠীয় এককের সদস্য ছিলেন না, 'জন্য'-রাও তেমনি ছিলেন না 'জন' বা অন্য কোন জনগোষ্ঠীয় সম্প্রদায়ের সদস্য, যে-সম্প্রদায় রাজসূয় বা অনুরূপ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। তাঁরা ছিলেন অন্য কোন বিরোধী জনগোষ্ঠীর সদস্য, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁদের ক্রমবর্ধমান ব্রাহ্মণীকৃত সমাজের অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়। শব্দটির সঠিক অর্থ যা-ই হোক না কেন,[১০৯] (বৈদিক) সাহিত্যে কোথাওই এর সঙ্গে শূদ্রের

বর্ণ উহ্য রয়েছে, তাই ইংরিজি অনুবাদে বন্ধনীর মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন (সেক্রেড বুক্স্ অব দি ইস্ট, খণ্ড ৪৩, পৃ ২৩৮)। কিন্তু এই পাঠে বোধহয় পুরোহিতদের দাবির স্বার্থে প্রাচীন আচারের ব্রাহ্মণ্য কারচুপির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১০৭. শতপথ ব্রা. ৫।৩।৫।১১-১৪ ; তৈত্তিরীয় ব্রা. ১।৭।৮।৭ ; বারাহ শ্রৌ. সূ. ৩।৩।২।৪৮।

১০৮. 'হিন্দু পলিটি', ২য় খণ্ড, পৃ ২৫। জায়সবাল আরও যা বলেছেন তার অর্থ এই যে, পরবর্তী সময়ে অভিষেচন অনুষ্ঠানে শূদ্রদের সবসময়ই অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা আদি-মধ্যযুগীয় রচনা 'অগ্নিপুরাণে'র অভিষেক অনুষ্ঠান জানতে পারছি, সে-পর্যন্ত তার কোন প্রমাণ নেই। অগ্নিপুরাণ ২১৮।১৮-২০।

১০৯. আরও বিভিন্ন মতামতের জন্য দ্র. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'হিস্টোরিওগ্রাফি অ্যান্ড এসেজ', পৃ ২৬৫-৬৬ ও এস. ভি. বেঙ্কটেশ্বর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম ভাগ, পৃ ১১।

কোন সম্পর্ক নেই। এও বলা হয়েছে যে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় উচ্চতর তিন বর্ণের লোকে দেব-যজমানের উদ্দেশ্যে কোন স্থান অনুদানের জন্য রাজাকে অনুরোধ করতে পারেন।[১১০] শূদ্ররা দেবতা ছাড়াই জন্মান, এই তত্ত্ব থেকে যদিও স্বাভাবিকভাবেই শূদ্রদের বহির্ভূত রাখার ব্যাপারটি আসে, তাহলেও রাজনৈতিক জীবনে শূদ্রদের ক্রমহ্রাসমান গুরুত্বের সূচক রূপেও এটিকে ধরা যায়।

'শতপথ ব্রাহ্মণে' কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে এগুলো দিয়ে ক্ষত্ররা 'বিশ্'-এর ( জনগোষ্ঠীয় সমাজ ) ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।[১১১] কৃষিকর্মে নিযুক্ত আত্মীয়-স্বজন তাঁদের প্রধানকে সময়ে সময়ে যেসব উপহার-উপঢৌকন দিতেন, সেগুলোকে নিয়মিত 'কর'-এ পরিণত করতে বাধ্য করার যে-প্রক্রিয়া, এইসব আচার-অনুষ্ঠান হয়তো তারই ইঙ্গিত। শূদ্রদের যে এর বাইরে রাখা হয়েছে তার কারণ মনে হয় এই যে, ধরেই নেওয়া হতো তাঁদের ওপর রাজার নিয়ন্ত্রণ আছে, আর তাঁরা প্রবলভাবে প্রতিরোধ করতে পারবেন না। আরেকটি অংশেও অনুরূপ ধারণা পাওয়া যায়; ব্রহ্ম এবং ক্ষত্ররা 'বিশ্'-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত,[১১২] কিন্তু শূদ্রদের রাখা হয়েছে বাইরে।

'বাজপেয়' ( শক্তিপান ) যজ্ঞ, যা রাজার শক্তি বাড়ায় বলে ভাবা হতো, তাতেও শূদ্রের স্থান ছিল না। একটি শ্রৌতসূত্র অনুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এতে অবাধে যোগ দিতে পারেন,[১১৩] কিন্তু অন্যান্য রচনায় এমনকি বৈশ্যদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে।[১১৪]

শূদ্রদের যে কোন নাগরিক মর্যাদা ছিল না তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' বর্ণিত একটি গৌণ অনুষ্ঠানে। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় অনুষ্ঠেয় একটি আচারের ( দর্শপূর্ণমাস ) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে-শূদ্ররা তাঁদের প্রভুদের সামনে থেকে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেন, আর যাঁরা কোনরকম বিরোধিতা করতে পারেন না, তাঁদের দুজনকেই একইভাবে শূদ্র হিসেবে গণ্য করতে হবে।[১১৫] এর থেকে মনে হয়, শূদ্ররা তাঁদের প্রভুদের বিরুদ্ধবাদী হবেন—এমন আশা করা হতো না; ভাবা হতো যে তাঁরা হবেন সম্পূর্ণ দাসভাবাপন্ন।

১১০. ঐতরেয় ব্রা. ৭।২০। ১১১. শতপথ ব্রা., ১৩।৪।১৫; ২।৫।২।৬; ২।৫।২।২৭; তুলনীয়: ১২।৭।৩।১৫। ১১২. ঐ, ১১।২।৭।১৬।

১১৩. শাঙ্খায়ন শ্রৌ. সূ. ১৬।১৭।৪; 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ২৫৬-য় উদ্ধৃত।

১১৪. বারাহ শ্রৌ সূ. ৩।১।১।১; উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'হিস্টোরিওগ্রাফি অ্যান্ড এসেজ', পৃ ২৮৩। কাত্যায়ন শ্রৌ. সূ. ১৪।৭৫-এ আছে যে, এসব সত্ত্বেও বাজপেয় যজ্ঞের অন্যান্য অনুষ্ঠানে বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গেই যুক্ত থাকতেন।

১১৫. তৈ. ব্রা. ৩।৩।১১।২, ভট্টভাস্করের ভাষ্য সমেত।

পরবর্তী বৈদিক যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি নতুন দিক উল্লেখযোগ্য। বৈশ্য ও শূদ্রের থেকে আলাদা করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য বিশেষ অবস্থান দাবি করার প্রবণতা। সমাজের দুটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে ব্রহ্ম ও ক্ষত্রদের গুরুত্ব, তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ ও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক মৈত্রী প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।[১১৬] 'সংহিতা'[১১৭] ও 'ব্রাহ্মণে'[১১৮] উচ্চতর বর্ণদুটিকে রক্ষার প্রার্থনা দেখা যায়। এগুলো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রথমত, এগুলোর অধিকাংশই আছে পরবর্তীকালের রচনায়, বিশেষত 'শতপথ ব্রাহ্মণে'। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী উল্লেখগুলো সাধারণত উচ্চতর দুটি বর্ণের সংযোগই নির্দেশ করে; কিন্তু পরবর্তী উল্লেখে বিশেষভাবে বৈশ্য ও শূদ্রদের বর্জন করা হয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' তাই পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বৈশ্য এবং শূদ্রদের ঘিরে রাখেন।[১১৯] ঐ একই রচনায় আবার বলা হচ্ছে, যাঁরা ক্ষত্রিয় বা পুরোহিত কোনটাই নন, তাঁরা অসম্পূর্ণ।[১২০] এই রাজসূয় অনুষ্ঠানের পরবর্তীকালের একটি বর্ণনায় বৈশ্য ও শূদ্রদের যে অক্ষক্রীড়া থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে ইতোমধ্যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।[১২১] ঐ একই যজ্ঞ প্রসঙ্গে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণরা যান ক্ষত্রিয়ের আগে, কিন্তু বৈশ্য আর শূদ্ররা তাঁর অনুবর্তন করেন।[১২২] সুতরাং মনে হয়, শূদ্রের সঙ্গে বৈশ্যকে এক করার ও জনজীবন থেকে তাঁদের বর্জন করার যে প্রবণতা গোড়ার দিককার রচনাদিতে প্রচ্ছন্ন, পরের রচনায় তা-ই কিন্তু হয়ে উঠেছে প্রকট ও পরিস্ফুট।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র একটি অংশ পর্যালোচনা করে পরবর্তী বৈদিক যুগের জনজীবনে শূদ্রদের ভূমিকার এই সমীক্ষা শেষ করা যেতে পারে।[১২৩] এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বলে যে, এটি হলো বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূদ্রদের চূড়ান্ত দাসসুলভ অবস্থার ইঙ্গিত। এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাংশের প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ঐ মত যুক্তিসঙ্গত নয়। বলা হয়েছে যে বিশ্বন্তর সৌষদমন নামে এক রাজা শ্যাপর্ণ গোত্রীয় পুরোহিতদের ছাড়াই যজ্ঞ করেন। বেদী থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন, তাঁদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ান তাঁদের পণ্ডিত নেতা রাম মার্গবেয়। তিনি পুরোহিতদের অপসারণের প্রতিবাদ করেন, এই যুক্তিতে যে, রাজসূয় যজ্ঞে রাজাকে সোমের অনুকল্পে কোন্ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে সেই জ্ঞান তাঁর আছে।[১২৪] রাজা

১১৬. 'হিন্দু পাবলিক লাইফ', ১ম খণ্ড, পৃ ৭৩-৮০।

১১৭. তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৮।৩৮-৪৪; কাণ্ব ২০।২।

১১৮. শতপথ ব্রা. ৩।৫।২।১১; ৩।৬।১।১৭-১৮; ৯।৪।১।৭-৮।

১১৯. ঐ, ৬।৪।৪।১২-১৩। ১২০. ঐ, ৬।৬।৩।১২-১৩। ১২১. পৃ ৫৪ দ্র.।

১২২. বিশং চৈবাস্মৈ তচ্ছূদ্রং চ বর্ণম অনুবর্ত্তমানৌ কুর্বন্তি। ঐতরেয় ব্রা. ৮।৪।

১২৩. ৭।২৯। ১২৪. ঐতরেয় ব্রা. ৭।২৭-৮।

যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যগ্রহণ করবেন তার সম্ভাব্য ফলাফলের বর্ণনা আলোচ্য রচনাংশে তাঁর উক্তিতেই বর্ণিত হয়েছে ; আর সেই প্রসঙ্গে শাসক ক্ষত্রিয় বর্ণের সঙ্গে অন্য তিন বর্ণের কী সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধেও আভাস দেওয়া হয়েছে। কথিত আছে, রাজা যদি ব্রাহ্মণের খাদ্য সোম গ্রহণ করেন তবে তাঁর সন্তান হবেন ব্রাহ্মণ, থাকবে ব্রাহ্মণের যাবতীয় চরিত্রলক্ষণ। তিনি দান গ্রহণ করবেন, সোমপান করবেন, জীবিকার সন্ধান করবেন, এবং তাঁকে যথেচ্ছ কর্মচ্যুত করা যাবে ( 'যথাকামপ্রয়াপ্যঃ' )।[১২৫] রাজা যদি বৈশ্যদের খাদ্য দধি খান, তাঁর সন্তান হবেন বৈশ্য, থাকবে বৈশ্যের যাবতীয় চরিত্রলক্ষণ। তিনি অপরকে কর দেবেন, অপরে তাঁকে ভক্ষণ করবেন এবং যথেচ্ছ নির্যাতন করবেন। কিন্তু শূদ্রের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে-সমস্ত অভিধা দিয়ে, সেগুলোই আমাদের আরও বেশি আলোচ্য। বলা হয়েছে, রাজা যদি শূদ্রের খাদ্য জল পান করেন, তাহলে তিনি শূদ্রদের অনুকূল হবেন আর তাঁর সন্তান পাবেন শূদ্রের যাবতীয় চরিত্রলক্ষণ।[১২৬] তিনি হবেন ( এক ) 'অন্যস্য প্রেষ্যঃ', ( দুই ) 'কামোত্থাপ্যঃ', এবং ( তিন ) 'যথাকামবধ্যঃ'। কীথ সঠিকভাবেই প্রথম শব্দটির অনুবাদ করেছেন 'অপরের ভৃত্য', যদিও 'ভৃত্যে'র জায়গায় 'বার্তাবহ'ই হতো আরও যথাযথ অনুবাদ। কিন্তু, কীথ অপর দুটির অভিধা যা অনুবাদ করেছেন তা মানা যায় না। দ্বিতীয় অভিধা ''কামোত্থাপ্যঃ'-র অনুবাদ তিনি করেছেন এমন একজন 'যাঁকে ইচ্ছামতো অপসারণ করা যাবে' ;[১২৭] আর হাউগ এর অনুবাদ করেছেন প্রভুর খুশিমতো যাঁকে 'বিতাড়ন করা যাবে'।[১২৮] এর ভিত্তিতে বলা চলে, শূদ্ররা ছিলেন যথেচ্ছ উচ্ছেদযোগ্য প্রজা যাঁদের যে-কোন সময়েই ঘোত্র থেকে উৎখাত করা যেতে পারে।[১২৯] কিন্তু শব্দটির ব্যাখ্যায় সায়ণ বলেছেন, দিবা-রাত্রের যে-কোন সময়েই প্রভুর ইচ্ছামতো শূদ্রদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।[১৩০] তাঁর এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট সম্ভাব্য মনে হয়, কারণ 'উত্থাপন' শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো ওঠানো বা তোলা। আদিকালের সংস্কৃতে 'বহিষ্কার' অর্থ বোঝানো হতো অন্যান্য শব্দ, যেমন 'নির্বাসন'[১৩১] বা 'নিষ্কাষণ'

১২৫. মিউঅর, হাউগ, ভেবার শব্দটিকে সকর্মক অর্থে নিয়েছেন অর্থাৎ 'ইচ্ছানুসারে চলমান'। কিন্তু এটি স্পষ্টতই পরোক্ষ নিজন্ত ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত ( 'বৈদিক ইনডেক্স', খণ্ড ২, পৃ ২৫৫ )। সায়ণ এই রূপটিই স্বীকার করেছেন।

১২৬. অথ যদি অপঃ শূদ্রাণাং স ভক্ষঃ শূদ্রাংস্তেন ভক্ষেণ জিন্বিষ্যসি, শূদ্রকল্প তে প্রজায়ামাজনিষ্যতে। ঐতরেয়, ৮।২৯।

১২৭. হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড ২৫, পৃ ৩১৫।

১২৮. ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, পৃ ৪৮৫।

১২৯. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ খণ্ড, পৃ ১৫৮।

১০ . মধ্যরাত্রাদৌ যদাকদাচিদ্দিন ইচ্ছা ভবতি তদানীম্ অন্নম্ উত্থাপ্যতে।

১০১ পাণিনি, ২।৪।১০।

দিয়ে। তৃতীয় অভিধা 'যথাকামবধ্যঃ'-র অনুবাদ কীথ করেছেন 'যথেচ্ছ হননযোগ্য',[১৩২] কিন্তু সায়ণ এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাখ্যা করেছেন: শূদ্র যদি তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে যান, তাহলে ক্রুদ্ধ প্রভু তাঁকে তাড়ন করতে পারেন।[১৩৩] 'নিরুক্ত'-তেও সায়ণের ব্যাখ্যারই সমর্থন মেলে। সেখানে 'বধ' শব্দের অর্থ তিন জায়গায় বলা হয়েছে হনন করা,[১৩৪] কিন্তু পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে আঘাত করা বা আহত করা।[১৩৫] সুতরাং হাউগ সঠিকভাবেই তৃতীয় অভিধাটির অর্থ করেছেন 'ইচ্ছামতো প্রহারযোগ্য'।[১৩৬]

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-মতে শূদ্রদের বধ করা যেত প্রভুর ইচ্ছামতো[১৩৭]—এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাৎক্ষণিকভাবে ও নির্বিচারে মেনে নিলে, তার থেকে স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত এ-ই হয় যে বৈদিক যুগে শূদ্রদের কোন 'বৈরদেয়' ('ভেরগেল্ট') ছিল না; তাঁরা এটি পেতে শুরু করেন ধর্মসূত্রের যুগ থেকে, যখন সরাসরি দাসত্বের সম্পর্ক লোপ করা হচ্ছিল।[১৩৮] স্পষ্টতই এই মত 'যথাকামবধ্যঃ' শব্দটির সংশয়িত ব্যাখ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। উপরন্তু, 'বৈর' বা 'বৈরদেয়' রূপে সম্ভবত একশটি গাভী[১৩৯] স্থির করা হয়ে থাকলেও বর্ণ অনুযায়ী এর যে পরিমাণভেদ হতো, বা কোন বর্ণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো—তেমন কোন উল্লেখও নেই। মনে হয়, যজ্ঞের মাধ্যমে নরহত্যা ('বৈরহত্যা') জনিত পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও ছিল।[১৪০] কিন্তু এক্ষেত্রেও কোন বর্ণবিচার করা হতো না। তাই মনে হয় পরবর্তী বৈদিক সমাজে বর্ণভেদ এতটা প্রখর ও ব্যাপক হয়নি যে তা ধর্মসূত্রের বিধানমতো তীব্র বৈষম্যের জায়গায় নেমে যাবে, যেখানে শূদ্রের জন্য ধার্য হয়েছে সর্বনিম্ন বৈরদেয়: দশটি গাভী।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র অংশটিতে আবার ফিরে যাওয়া যাক। শূদ্রদের সম্পর্কে প্রযুক্ত অভিবাদটির যে-সব অর্থ প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলো সম্ভাব্য বলেই মনে হয়। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের আর কোথাও এমন কথা বলা হয়নি যে শূদ্র প্রভুর ইচ্ছামতো বহিষ্কারযোগ্য ও বধ্য।

উপরে যে-সব বিকল্প অর্থের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেগুলো প্রকৃত অবস্থার সূচক কি-না তা নির্ণয় করা দুষ্কর। তার কারণ, কথাগুলো আছে

১৩২. হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড ২৫, পৃ ৩১৫।

১৩৩. বধ্যঃ = কুপিতেন স্বামিনা তাড্যো ভবতি ইচ্ছামনতিক্রম্য।

১৩৪. ৩।১১; ৫।১৬ ও ১০।১১। ১৩৫. ৩।১; ৯।১৫, ১৬, ১৮; ১০।২৯।

১৩৬. ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, পৃ ৪৮৫। ১৩৭. 'বেদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ২৫৬।

১৩৮. কীথ, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম খণ্ড, ১২৮-২৯, দত্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৬৬; তুলনীয়: উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'হিন্দু পাবলিক লাইফ', ১ম খণ্ড, পৃ ১৬৭।

১৩৯. 'বেদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ৩৩১।

১৪০. তৈ. ব্রা. ১।৫।৯।৫-৬; তুলনীয়: ৩।৪।১।১৭।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র সপ্তম পঞ্জিকায়। এটি পরবর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত।[১৪১] বিভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত সব অভিধা যদি ব্যবহার করে থাকেন কোন অপসারিত পুরোহিত (যিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার অনুগ্রহভাজন হতে চাইছিলেন) তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এমনকি ব্রাহ্মণকেও যে ইচ্ছা-মতো অপসারণযোগ্য বলা হয়েছে—তা-ও একেবারেই তাৎপর্যহীন নয়। সেক্ষেত্রে অন্যান্য বর্ণের অবস্থা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়।

এইসব বিবেচনা করলেও অবশ্য পরবর্তী বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূদ্রদের নিম্ন মর্যাদা কোনভাবেই অপ্রমাণ হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো বিষয়টিকে যতদূর সম্ভব সুনির্দিষ্ট করা। আর এ-ও অত্যন্ত স্পষ্ট যে শূদ্ররা যদিও দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধরনের যজ্ঞের—অশ্বমেধ ও রাজসূয়—অনেক ক-টি অনুষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন, তাহলেও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান থেকে তাঁদের বাইরে রাখার এক সবিশেষ প্রবণতার সূচনা হয়েছিল সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষদিকেই। কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈশ্যকেও শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাঁর বিভিন্ন প্রাচীন অধিকার থেকে। কিন্তু আমরা যদি 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র অংশটির ওপর নির্ভর করি, এবং এটিকে মোটামুটি খৃপূ ১০০০-এর মাঝামাঝি সময়ে রাখি, তাহলে মনে হবে, সেই সময় নাগাদ উচ্চ-গাঙ্গেয় অব-বাহিকার সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং, যদিও বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিলেন দুটি নিম্নতর বর্গ, তাহলেও তাঁদের যথাক্রমিক অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দিষ্ট। বৈশ্যরা ছিলেন কৃষকের প্রতিভূ, কারণ ধান ও অন্যান্য দানাশস্য-উৎপাদনকারী চিত্রিত মৃৎ স্থলগুলো থেকে অজস্র গ্রামীণ বসতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আশা করা হতো, কৃষকরা তাঁদের প্রদেয় অংশ নিয়মিত-ভাবে দেবেন, আর তাই বলা হয়েছে যে তাঁদের আহার করা ও বলপূর্বক 'বলি' আদায়ের জন্যই 'ক্ষত্র'রা আছেন। অপরপক্ষে শূদ্ররা আবির্ভূত হলেন উচ্চতর ও নিয়ন্ত্রক শ্রেণীগুলোর সেবার উদ্দেশ্যে এক গৃহভৃত্য-শ্রেণীরূপে।

আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত রচনা থেকেও শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য নিষ্কাশন করা যায়। 'যজুর্বেদ সংহিতা'র একটি অংশে বলা আছে যে বৈশ্য ও শূদ্রদের একই সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছিল।[১৪২] এ-কথা "পুরুষসূক্তে"র বিপরীত। "পুরুষসূক্তে" বলা হয়েছে যে সৃষ্টির পরম্পরায় শূদ্রের আগে এসেছেন বৈশ্য, তাই সমাজে শূদ্রদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে নিম্নতম স্থান। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রকে একই পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়াসও কিছু আচার-অনুষ্ঠানে লক্ষ করা যায়। তার থেকে দেখা যায়, শূদ্রার স্বামী

১৪১ কীথ, হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ, খণ্ড ২৫, পৃ ২৯; তুলনীয়ঃ 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ২৫৬।

১৪২. বাজসনেয়ি সংহিতা ১৪।৩০; মৈত্রায়ণী ২।৮।৬; কাঠক ১৭।৫; কাত্যায়ন ২৬।৩৪; তৈত্তিরীয় ৪।৩।১০।২।

হতে পারেন বৈশ্য, এবং তার বিপরীতও হতে পারে।[১৪৩] বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে, শূদ্রা রমণীর 'অর্য'পতি [ 'জার' ] সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করেন না। এর তাৎপর্য এই যে, ঐ বিবাহ তাঁকে এক দীর্ঘ দরিদ্র জীবনযাপনে বাধ্য করে।[১৪৪] ভাষ্যকাররা 'অর্য' ( আদিতে হ্রস্ব স্বর ) শব্দটিকে ধরেছেন বৈশ্য অর্থে।[১৪৫] এর থেকে বৈশ্যের সঙ্গে শূদ্রার বিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু 'বৈদিক সূচি'-র প্রণেতারা এগুলোকে আর্য ও শূদ্রের মধ্যে অবৈধ মিলনের দৃষ্টান্ত রূপে গণ্য করেছেন।[১৪৬] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠ হলো 'অর্য', তাই ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা সঠিক বলেই মনে হয়। জে. এগালিং-ও তাঁর 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র [ ইংরিজি ] তর্জমায় 'অর্য' পাঠটিই গ্রহণ করেছেন।[১৪৭] সেখানে তিনি সঠিকভাবেই এর অনুবাদ করেছেন 'বৈশ্য'। কিন্তু এমন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয় যে উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে শূদ্রদের বিবাহ যখন আর ভালো চোখে দেখা হতো না, তখন সেই নতুন পরিস্থিতির উপযোগী করার জন্য এইসব পাঠের উপর হয়তো কলম চালানো হয়েছিল। ঐ ধরনের কোন অনুমানের ভিত্তিতে আর্যদের সঙ্গে শূদ্র জনগোষ্ঠীর, অথবা যাঁরা শূদ্র বর্ণভুক্ত হলেন তাঁদের অবাধ বিবাহ-সম্পর্কের কথাও ভাবা সম্ভব। পরবর্তীকালে ঐ ধরনের সম্পর্ক কেবল নিম্নতর বর্ণদুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে পুরোহিত ও অভিজাতরা, মনে হয়, শূদ্রসমেত নিম্নতর শ্রেণীগুলোর সঙ্গে অবাধে অসবর্ণ বিবাহ করতে পারতেন। বৎস এবং কবষের ঘটনা থেকে তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৪৮] বৎসকে তাঁর ভাই মেধাতিথি বলেছেন 'শূদ্রপুত্র'। দেখা যাচ্ছে, শব্দটি সম্ভবত নিন্দার্থে ব্যবহৃত হতো না।[১৪৯] বলা হয়, অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত থেকে বৎস তাঁর ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ দেন, আর এইভাবেই মোচন করেন এই কলঙ্ক। এই ঘটনার থেকে দেখা যাচ্ছে, মানুষের সামাজিক পদমর্যাদা তাঁর জন্ম দিয়ে নির্ধারিত হতো না, হতো তাঁর যোগ্যতা দিয়ে।[১৫০] কবষ ঐলূষের ক্ষেত্রে দাসীগর্ভজাত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক বলেই মনে হয়। তাঁর সম্পর্কে প্রযুক্ত

১৪৩. শতপথ ব্রা. ১৩।২।৯।৮ ; তৈ. ব্রা. ৩।৯।৭।৩ ; বাজসনেয়ি সংহিতা ২৩।৩০-৩১।

১৪৪. শূদ্রা যদর্যজারা ন পোষায় ধনায়তি। বাজসনেয়ি সংহিতা ২৩।৩০ ; মৈত্রায়ণী ৩।১৩।১ ; তৈত্তিরীয় ৭।৪।১৯।১৩ ; কাঠক ( অশ্বমেধ ) ৫।৪।৮ ; শাঙ্খায়ন শ্রৌ. সূ. ১৬।৪।৪-৬।

১৪৫. বাজসনেয়ি সংহিতা ২৩।৩০, মহীধর ও উবট-এর ভাষ্য।

১৪৬. বৈদিক ইনডেক্স', খণ্ড ২, পৃ ৩৯১।

১৪৭. 'সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ইস্ট', খণ্ড ৪৪, পৃ ৩২৬।

১৪৮. কীথ, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', খণ্ড ১, পৃ ১২৬।

১৪৯. পঞ্চবিংশ ব্রা. ১৪।৬।৬। ১৫০. ঐ।

'দাস্যাঃ পুত্রঃ' অভিধাটিকে সায়ণ নিন্দাসূচক বলেই গণ্য করেছেন।[১৫১] 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে'[১৫২] ঋষি দীর্ঘতমার মাতা দাস-কন্যা উশিজের বৈধ বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—অবশ্যই 'বৃহদ্দেবতা'য় প্রদত্ত তাঁর বর্ণনা যদি গ্রহণ করা হয়।[১৫৩] পৌরাণিক ধারা থেকে জানা যায়, কক্ষীবান্ নামক জনৈক 'ব্রহ্মবাদী' ছিলেন দীর্ঘতমার পুত্র। রাজা বলীর এক শূদ্রা দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম।[১৫৪] আর 'মহাভারতে'ও তাঁকে 'শূদ্র-যোনি' বলা হয়েছে।[১৫৫] এও দেখানো হয়েছে যে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র রচয়িতা মহীদাস ছিলেন শূদ্র।[১৫৬] এই মতের সপক্ষে অবশ্য কিছুই বলা যায় না, যদি না তাঁর উপনাম 'ঐতরেয়'-র ব্যাখ্যা হয়—তিনি ছিলেন 'ইতরা'-র পুত্র।[১৫৭] ইতরা মানে নীচ, অধম ও ত্যক্ত; কিন্তু তা কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয়। একটি পরবর্তী 'ব্রাহ্মণে' জনৈক ঋষি ও পুরোহিত সুদাক্ষিণ ক্ষৈমিকে শূদ্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে।[১৫৮] তিনি ছিলেন ক্ষেমের বংশধর, শুধু এইটুকু ছাড়া তাঁর পিতামাতার আর কোন বিবরণই নেই। এবং তাঁর ক্ষেত্রে, মনে হয়, এই অভিধাটি নিন্দার্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। 'ভবিষ্যপুরাণে'[১৫৯] প্রায় বারো জন ঋষির একটি তালিকা আছে, যাঁদের মা-এরা শূদ্রবর্ণের কোন-না-কোন শাখার অংশীভূত ছিলেন বলে ধরা যেতে পারে। গৌণ প্রভেদসহ এই তালিকাই আছে আরও কয়েকটি পুরাণে ও 'মহাভারতে'।[১৬০] এতে বলা হয়েছে, ব্যাস ছিলেন ধীবর রমণীর সন্তান, পরাশর শ্বপাক রমণীর, কপিঞ্জলাদ চণ্ডালিনীর, বশিষ্ঠ গণিকার, ও মুনিশ্রেষ্ঠ মদনপালের জননী নৌকা পারাপার করতেন। এই জাতীয় তালিকার সমর্থনে যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, ঋষি, নদী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, মহাত্মা ও দুশ্চরিত্রা রমণীর উৎপত্তি অনাবিষ্কার্য।[১৬১] এই ঋষিদের কালানুক্রমিক অবস্থান, বা সত্যই তাঁরা ছিলেন কিনা—সে সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না; কিন্তু পরবর্তী বৈদিক পর্বে পুরোহিত ও ঋষিদের মধ্যে যে শূদ্রা ও দাসী বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল, ঐ ধরনের একটি তালিকা তারই সাক্ষ্য দেয়। রাজা ও প্রধানরাও শূদ্রা বিবাহ করতেন বলে মনে হয়। 'পালাগলী', রাজার চতুর্থা ও সবচেয়ে কম সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন শূদ্রা।[১৬২]

উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে দেখা যায়, উচ্চবর্ণ পুরুষের সঙ্গে

১৫১. ঐতরেয় ব্রা. ৭।১৯, সায়ণভাষ্য সমেত। ১৫২. পঞ্চবিংশ ব্রা. ১৪।১১।১৭।

১৫৩. 'বৈদিক ইনডেক্স', খণ্ড ২, পৃ ২৫৯; বৃহদ্দেবতা ৪।২৪-২৫।

১৫৪. বায়ু পুরাণ ২।৩৭।৬৭-৯৪। ১৫৫. আদিপর্ব: মহাভারত ৯৮।২৫।

১৫৬ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'এনশেন্ট ইন্ডিয়ান এডুকেশন', পৃ ৫২।

১৫৭. সায়ণের মত, 'বৈদিক ইনডেক্স', খণ্ড ১, পৃ ১২১-১২২।

১৫৮. জৈমিনীয় উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ২।২।৫-৬। ১৫৯. ১।৪২।২২-২৬।

১৬০. অনুশাসনপর্ব, মহাভারত: কুম্ভকোণম, ৫৩।১৩-১৯।

১৬১. ঐ, ৫৩।৩৮। ১৬২. শাঙ্খায়ন শ্রৌ. সূ. ১৬।৪।৪।

শূদ্রার বিবাহে কোন অসমর্থন ছিল না।[১৬৩] সূচনায়, মনে হয়, বৈদিক ভারতীয় ও আদিবাসীরা স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ করতেন।[১৬৪] এমনকি জনগোষ্ঠীগুলোর ভাঙন ও তার সদস্যদের চতুর্বর্ণে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরেও হয়তো কিছুকাল এই প্রাচীন রীতিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই, পরবর্তী বৈদিক পর্বে বর্ণভেদ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর পুরুষের বিবাহের অনুমতি দেওয়া হতো না। শূদ্রা-রমণীকে উচ্চবর্ণের পুরুষের ভোগসামগ্রী রূপে দেখার প্রবণতাও শুরু হয়েছিল। তাই তুলনামূলকভাবে পরবর্তী একটি 'ব্রাহ্মণে' 'অনুষ্টুভ্' ছন্দের উপমা দেওয়া হয়েছে অভিগমনের উপযুক্তা শূদ্রা গণিকার সঙ্গে।[১৬৫]

এই পর্বে আমরা চণ্ডালের প্রতি ঘৃণার চিহ্নও পাই। বলা হয়েছে যে সদাচারী লোক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যরূপে উত্তম পুনর্জন্ম লাভ করবেন; কিন্তু কদাচারী লোকে প্রবেশ করবে কুক্কুরী, শূকরী অথবা চণ্ডালীর পূতিগন্ধময় যোনিতে।[১৬৬] লক্ষণীয় যে, চণ্ডালদের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে, শূদ্রবর্ণে জন্মগ্রহণকে কিন্তু সেইরকমভাবে অপবিত্র ('কপূয়াম্') বলা হয়নি; যদিও মনে হয়, সে-জন্মকে অবাঞ্ছিতরূপেই দেখা হতো। আরও মনে হয় যে চণ্ডালরা (যাঁরা ছিলেন এক আদিবাসী জনগোষ্ঠী)[১৬৭] দূষণীয় আচরণকারী বলে গণ্য হতে থাকেন। কিন্তু এই পর্বের সূচনাকালীন রচনায় চণ্ডালকে দেখা যায় পুরুষমেধ যজ্ঞের বলি রূপে,[১৬৮] যার থেকে এমন কোন ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না যে তাঁরা ছিলেন অস্পৃশ্য। পৌল্কসদের অবশ্য বীভৎসার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।[১৬৯]

আলোচ্য পর্বের সমাজনীতিতে কয়েকটি অপকর্ষকে শূদ্রাদের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায়। আমরা দেখি, আঙ্গিরস গোত্রের শুনঃশেপ, তাঁর পিতা অজীগর্তকে শূদ্র বলে নিন্দা করেছেন, কারণ তিনি তিনশ গরুর বিনিময়ে বরুণের বলিরূপে তাঁকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।[১৭০] যদিও দেবতারা তাঁকে মুক্তি দেন, এবং কলঙ্ক-মোচনের জন্য পিতা তাঁকে একশ গরু দান করেন,

১৬৩. তুলনীয় ঘুরে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫১।

১৬৪. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম খণ্ড, পৃ ১২১।

১৬৫. শাংখায়ন ব্রা. ২৭।১। শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চেয়ে এই ব্রাহ্মণটি অনেক পরবর্তী সময়ের রচনা বলে ধরা হয়।

১৬৬. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৭।

১৬৭. মনে হয় যে ত্রিশঙ্কু, যাঁর বর্ণনা দেওয়া আছে ঘন কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের, ছিলেন সম্ভবত চণ্ডালদের নেতা। রামায়ণ, ১।৫৮।১০-১১।

১৬৮. বাজসনেয়ি সংহিতা ৩০।২১; তৈত্তিরীয় ব্রা. ৩ ৪.১-১৭।

১৬৯. বাজসনেয়ি ৩০।১৭; তৈত্তিরীয় ব্রা. ৩।৪।১।১৪।

১৭০. ঐতরেয় ব্রা. ৭ ১৫-১৭; শাংখায়ন শ্রৌ. সূ. ১৫।২৪।

তবুও শুনঃশেপ পিতাকে তিরস্কার করেছেন কঠোর ভাষায়। তিনি বলেছেন, "…তুমি এখন শূদ্রের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত নও, কেননা এমন অপরাধ তুমি করেছ যার কোন ক্ষমা নেই।"[১৭১] এর থেকে মনে হয়, অজীগর্তের মতো ক্ষুৎপীড়িত অবস্থায় শূদ্ররা তাঁদের সন্তানদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। মনে করা হতো যে ঐহিক লাভের জন্য তাঁরা স্বজনের প্রতিও নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হতে পারেন।

কৌতূহলজনক এই যে, বিশ্বামিত্র যখন শুনঃশেপকে গ্রহণ করেন, এবং জ্যেষ্ঠের প্রাধিকার-সমেত তাঁকে অধিস্থাপিত করেন তাঁর শতপুত্রের মধ্যে প্রথম স্থানে, তখন অগ্রজ পঞ্চাশজন পুত্র শুনঃশেপের স্থান স্বীকার করেননি। এতে তাঁদের পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন: তাঁদের বংশধররা হবে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিব, দস্যু ও 'অন্ত' (জাতিচ্যুত) ইত্যাদি নিম্নবর্ণের।[১৭২] ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিম্নবর্গে অনার্য মানবগোষ্ঠী আত্তীকরণের উদ্দেশ্যে কুলপঞ্জি আবিষ্কারের ব্যাপারে পুরোহিতদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার একটি আদি দৃষ্টান্ত এই বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। তেমনি আবার এ-ও দেখা যায় যে অনিচ্ছুক ও অবাধ্য পুত্রদের দস্যু এবং 'অন্ত' হিসেবে গণ্য করা হতো। সায়ণ, এই অংশের ভাষ্যে, চণ্ডাল ও অন্যান্য নিম্নবর্ণকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু মূলে তার কোন উল্লেখ নেই।[১৭৩]

বিভিন্ন ঋতুতে ও গৃহ্যযাগে ব্যবহার্য যেসব অনুপূরক মন্ত্র 'বাজসনেয়ি সংহিতা'য় আছে, তারই একটিতে সমস্ত বর্ণের লোকদের প্রতি 'কল্যাণীবাক্' বলার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে।[১৭৪] বলা হয়েছে, এখানে বেদপাঠে সর্ব-শ্রেণীর সমাধিকারের উল্লেখ আছে।[১৭৫] কিন্তু, 'কল্যাণীবাক্' শব্দটি বেদ অর্থে বসেনি। টীকাকাররা সঠিকভাবেই এটিকে মৃদু ও শিষ্টভাষণ অর্থে ধরেছেন।[১৭৬] এর নিহিতার্থ হলো: সমস্ত বর্ণের লোকের সঙ্গে কথা বলার সময়েই শোভন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' অবশ্য এক ভিন্ন রীতি দেখা যায়। সেখানে একটি অনুষ্ঠান সম্পাদনের যেসব নির্দেশ আছে, তাতে বর্ণ অনুযায়ী সম্বোধনের রীতিও ভিন্ন হয়। যেমন, ব্রাহ্মণ, রাজন্যবন্ধু, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের কাছ থেকে 'হবিষ্কৃৎ'-কে (যিনি 'হবি' অর্থাৎ যজ্ঞের অর্ঘ্য প্রস্তুত করেন) ডাকবার জন্য যথাক্রমে 'এখানে আসুন' ('এহি'), 'কাছে আসুন' ('আগহি'), 'তাড়াতাড়ি এখানে এসো'

১৭১. নাপাগাঃ শৌদ্রান্ ন্যায়াদ্ অসংধেয়ং ত্বয়া কৃতম্। ঐতরেয় ব্রা. ৭।১৭।

১৭২. ঐতরেয় ব্রা. ৭।১৮।

১৭৩. চণ্ডালাদিরূপান্নীচজাতিবিশেষান্। ঐতরেয় ব্রা. ৭।১৮ র ভাষ্য।

১৭৪. যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ; ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ। বাজসনেয়ি সংহিতা ২৬।২।

১৭৫. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন', পৃ. ৫৩।

১৭৬. উবট ও মহীধর-কৃত বাজসনেয়ি সংহিতা ২৬।২-এর ভাষ্য।

('অদ্রব') ও 'দৌড়ে এখানে এসো' ('আধাব')—এই ক'টি পদ প্রযুক্ত হয়েছে।[১৭৭] বেদোত্তর কালে সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে এই ধরনের পার্থক্য প্রায়ই চোখে পড়ে।

বৈদিক পর্বের শেষদিকে জীবনের চতুরাশ্রমের কথা এসেছে। তাতে পরবর্তীকালে শূদ্রদের জন্য শুধু গার্হস্থ্যেরই অনুমোদন আছে, কিন্তু এই পর্বে ঐ ধরনের কোন পার্থক্যের উল্লেখ নেই। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' যদিও চতুরাশ্রমের নাম আছে, বর্ণের সঙ্গে তার সম্পর্কের কোন উল্লেখ সেখানে নেই।[১৭৮] এর থেকেই আমরা চলে আসি শূদ্রের শিক্ষার প্রসঙ্গে, কারণ, পরবর্তী নানা রচনায় দেখা যায় যে, ছাত্রজীবন পর্বে (ব্রহ্মচর্য-আশ্রম) শূদ্রের কোন স্থান নেই। এই আশ্রমের সূচনা হয় উপনয়ন অনুষ্ঠান দিয়ে। উপনয়নের সর্বাদি উল্লেখ পাওয়া যায় 'অথর্ববেদে'। সেখানে জনৈক যুবককে নতুন জীবনে প্রবেশ ('উপ-নী') করাচ্ছেন জনৈক শিক্ষক। ধরে নেওয়া হয়েছে যে তাঁর উদর থেকে তার জন্ম।[১৭৯] এই উপনীত তরুণই হয়ে যান 'ব্রহ্মচারী', কিন্তু তাঁর বর্ণ নির্দেশ করার মতো কিছুই (সেখানে) নেই। আরুণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর 'ব্রহ্মচর্য' উদ্‌যাপন করা উচিত। এর ভিত্তিতে ধরে নেওয়া হয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ উপনয়ন কেবল পুরোহিত বা শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল; তাঁদের থেকে এটি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত আর্যদের মধ্যে।[১৮০] যদি ধরে নেওয়া হয় যে উপনয়ন দিয়েই অক্ষর-শিক্ষার সূচনা, তাহলে একথা সত্য হতে পারে, কারণ প্রাচীন সমাজে শিক্ষার ভার সাধারণত পুরোহিতদের হাতেই থাকত। বেশ কয়েকটি সূত্র[১৮১] থেকে জানা যায় যে ব্রহ্মচারীরা সাধারণত ব্রাহ্মণই হতেন। অবশ্য যদি ধরে নেওয়া হয় যে পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরূপে জনগোষ্ঠীতে আনুষ্ঠানিক-ভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াই কোন ব্যক্তির নতুন জীবনের সূচনা, আর 'উপনয়ন' ও 'ব্রহ্মচর্য' তারই দ্যোতক, তাহলে আর ঐ ধারণাটি সত্য বলে মনে হয় না। কিংবদন্তী অনুসারে দেবতা, মানুষ ও দৈত্যরা 'ব্রহ্মচর্যে'র কাল কাটান তাঁদের পিতা প্রজাপতির তত্ত্বাবধানে, যিনি আবার তাঁদের গুরুও।[১৮২] এর ব্যাখ্যায় ঐ ধরনের একটা মত খাড়া করা যায়। কিন্তু এর এমন অর্থ করা

১৭৭. শতপথ ব্রা., ১।১।৪।১২।

১৭৮. ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ২।২৩।১ ২। সাম্প্রতিককালে এক গবেষক যুক্তি দিয়েছেন যে চতুরাশ্রমের তত্ত্ব প্রাগ্-বৌদ্ধ নয়। জি সি. পাণ্ডে, 'দ অরিজিন্‌স্ অফ বুদ্ধিজম্', পৃ ৩২২-২৩।

১৭৯. অথর্ব ১১।৫।৩।

১৮০. অলটেকর, 'এডুকেশন ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া,' পৃ ১০।

১৮১. তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৩।১০; গোপথ ব্রা. ১।২।২ ও ৪; শতপথ ব্রা. ১১।৫।৪।১২।

১৮২. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৫।২।১।

যায় না যে আদি মানবগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অক্ষরশিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। বরং এর তাৎপর্য শুধু এই হতে পারে যে বৈদিক আর্যদের, বা তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে গোষ্ঠীজীবনে দীক্ষিত করে নেওয়ার কোন এক ধরনের সার্বজনীন রীতি ছিল। আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ রীতির প্রচলন থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ব্রাত্যদের ক্ষেত্রেও দীক্ষা-রীতি প্রসারিত করা হয়। 'ব্রহ্মচর্য' লাভের মাধ্যমে তাঁদের আর্য সমাজভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।[১৮৩]

লক্ষণীয় এই যে, উপনয়নের মতো দীক্ষারীতি প্রচলিত ছিল প্রাচীন ইরাণীয়দের মধ্যেও। পনের বছর বয়সে ইরাণীয় নর-নারীর দীক্ষা হতো পবিত্র উপবীত ধারণের মাধ্যমে। আহুর মাজদা-র অনুগামী সম্প্রদায়ে তাঁদের প্রবেশের সূচনা হতো এই দিয়ে।[১৮৪] এই প্রসঙ্গে গাইগার বলেছেন যে, এটি ছিল প্রাচীন প্রথা, পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়।[১৮৫] এও সুপরিজ্ঞাত যে স্পার্টানদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।[১৮৬] সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে বৈদিক ভারতীয়দের মধ্যেও আচরিত হতো উপনয়নের রীতি। এইভাবে হয়তো প্রথম-প্রথম খণ্ড, ছিন্ন আর্য জনগোষ্ঠীর শূদ্র সদস্যরা আরও কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের মতো উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা-আচারও পালন করে চলতেন। 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণে' উপনয়ন কর্ম থেকে শূদ্র-বর্জনের কোন উল্লেখ নেই।

'ছান্দোগ্য উপনিষদে' জানানো হয়েছে যে রৈক্ক যাঁকে 'প্রাণ' এবং 'বায়ু' বিদ্যা শিখিয়েছিলেন সেই জানশ্রুতি ছিলেন শূদ্র।[১৮৭] কিন্তু অন্যত্র তাঁকে দেখা যায় উত্তর-পশ্চিমবাসী মহাবৃষ নামক মানবগোষ্ঠীর প্রধান রূপে।[১৮৮] তাকে শূদ্র বলা হয়েছে এই কারণে যে শূদ্র জনগোষ্ঠীর লোকের (যাঁরা ঐ অঞ্চলে বাস করতেন) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, অথবা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের প্রতি শূদ্র শব্দটি নিন্দার্থে[১৮৯] প্রযুক্ত হয়েছে।

১৮৩. অথর্ব ১১।৫, ১৫; পঞ্চবিংশ ব্রা. ১৭।১।২। ব্লুমফিল্ড মনে করেন যে ধর্মান্তরিত ব্রাত্যকে একজন বিশুদ্ধ ব্রহ্মচারী হিসেবে সমুন্নত করা হচ্ছে। 'দি অথর্ববেদ', পৃ. ৯৪।

১৮৪. বেনদীদাদ, ১৮।৯ ও ৫৪।৯; স্পীগেল, আলটইরাণিশেস্কুণ্ডে, খণ্ড ৩, পৃ. ৭০০; তুলনীয়: পৃ. ৫৪৮-৯।

১৮৫. 'সিভিলাইজেশন অফ দি ইস্টার্ন ইরাণিয়ানস ইন এনশেণ্ট টাইমস', খণ্ড ১, পৃ. ৫৮-৯।

১৮৬. জর্জ টমসন, 'স্টাডিজ ইন এনশেণ্ট গ্রীক সোসাইটি', খণ্ড ১, পৃ. ২৭২।

১৮৭. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৪।১।১-৮, ৩।১-৪।

১৮৮. জৈমিনীয় ব্রা ৩।৭।৩।২। জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণ-এ নগরী জানশ্রুতেয়-ও বলা হয়েছে (৩।৭।৩।২)। ঔপবি জানশ্রুতের বাজপেয় অনুষ্ঠান করতেন (শতপথ ব্রা- ৫।১।১।৫ ও ৭)।

১৮৯. ভিনটারনিৎস, 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান লিটরেচর', ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯, টী. ৩।

জানশ্রুতি হয়তো শূদ্র ছিলেন না, কিন্তু অন্য কয়েকটি ইঙ্গিত থেকেও দেখা যায় যে কয়েক ধরনের বিদ্যা অর্জনে শূদ্রদের পুরোপুরি বাধা দেওয়া হয়নি। যেমন, 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে যে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্ররা জন্মেছেন যথাক্রমে ঋক, যজুঃ ও সাম বেদ থেকে।[১৯০] স্পষ্টতই এর অর্থ: অথর্ববেদ উদ্দিষ্ট ছিল শূদ্রদের জন্যই। পরবর্তীকালে 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'ও অস্পষ্টভাবে একই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তার মানে, সনাতন বেদ-বিদ্যা আহরণের ক্ষেত্রে শূদ্রদের বর্জন করা হলেও, অন্যান্য ধরনের বিদ্যার ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র কয়েকটি অংশ থেকেও এই ধারণাই পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, সর্পবিদ্, কুসীদজীবী, মৎস্যহন্তা, ব্যাধ, সেলগ, নিষাদ, অসুর, গন্ধর্ব ইত্যাদিকে শিক্ষা দিতে পারেন পুরোহিত। এঁদের মধ্যে অনেকেই শূদ্রবর্ণভুক্ত।[১৯১] শিক্ষার বিষয় ছিল ইতিহাস, অথর্ববেদ, সর্পবিদ্যা এবং অসুর সংক্রান্ত বিদ্যা ('দেবজন-বিদ্যা')।[১৯২] ছাত্র- ও বিষয়-সূচি থেকে মনে হয়, শূদ্রবর্ণের জন্য নির্ধারিত কাজকর্মের মধ্যে যেসব শিল্প ও কলা ছিল, পুরোহিতরা আদিপর্বে তার চর্চা থেকে বিরত থাকেননি। কিন্তু ঐ সমস্ত শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রদের অক্ষরশিক্ষাও দেওয়া হতো কিনা তা স্পষ্ট নয়।

বৈদিক পর্বের উপান্তে শূদ্রদের 'উপনয়ন' ও ফলত শিক্ষা না-দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে'র একটি অংশ থেকে সম্ভবত ঐরকমই ধারণা হয়। সেখানে জনৈক খ্যাতনামা ছাত্র দাবি করেছেন তিনি ব্রাহ্মণ, রাজা ও বৈশ্যের যশঃস্বরূপ।[১৯৩] কিন্তু অন্যত্র জনৈক শিক্ষার্থী শূদ্রসমেত সর্বস্তরের মানুষের প্রিয় হতে চেয়েছেন।[১৯৪] শূদ্রদের প্রথম সুস্পষ্ট বর্জন করতে দেখা যায় পরবর্তী একটি শ্রৌতসূত্রে। সেখানে উচ্চতর তিন বর্ণের উপনয়নের সময় নির্দিষ্ট করা আছে।[১৯৫] পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে উপনয়ন, বেদপাঠ ও অগ্নি-আধান ফলপ্রসূ হতে পারে কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই, যাঁরা অশূদ্র ও কুকর্মে লিপ্ত হন না।[১৯৬] আরেকটি রচনায় বিধান দেওয়া হয়েছে, উপনীত ছাত্র যেন শূদ্রের সঙ্গে কথা না বলেন।[১৯৭] আরও বিধান দেওয়া হয়েছে যে মধুপর্ক নামক অনুষ্ঠানে শূদ্ররা 'স্নাতক' ছাত্রের পা ধুয়ে দেবেন।[১৯৮] দুটি শ্রৌতসূত্রের এইসব উল্লেখ পরবর্তী বৈদিক পর্বের অবস্থার ইঙ্গিত দেয় কিনা তা বলা কঠিন। এগুলো ঐ পর্বের একেবারে অন্তিম পর্যায়ের হতে পারে, এমনকি বেদোত্তর কালেরও হতে পারে, কেননা আদি শ্রৌতসূত্রাবলির সমসাময়িক, প্রাচীনতম একটি গৃহ্যসূত্রে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে রথকার উপনয়নের অধিকারী।[১৯৯]

১৯০. তৈ. ব্রা. ৩।১২।৯।২।
১৯১. শতপথ ব্রা ১৩।৪।৩।৭-১৩।
১৯২. ঐ, তুলনীয়: ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।১।১।
১৯৩. ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।১৪।১।
১৯৪. সত্যাষাঢ় শ্রৌ. সূ ১১।৩।২৬।
১৯৫. ঐ, ১১।১।৪; ২৬।১।২০।
১৯৬. ঐ, ২৬।১।৬।
১৯৭. দ্রাহ্যা শ্রৌ. সূ. ৭।৩।১৪।
১৯৮. সত্যাষাঢ় শ্রৌ. সূ. ১১।৪।১৩।
১৯৯. বৌধায়ন গৃ. সূ. ২।৫।৬।

সুতরাং মনে হয় যে, গোড়ার দিকে উপনয়ন ছিল গোটা জনগোষ্ঠীর ব্যাপার, এবং তার প্রত্যেক সদস্যকেই উপনয়ন গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু জনগোষ্ঠী যতই শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়তে লাগল, ততই এটি হয়ে উঠল এক বিশেষ অধিকার, একটি সম্মানসূচক স্বাতন্ত্র্য, যা ধনসম্পদ ও উচ্চ-সামাজিক অবস্থানের সাহায্যে প্রাপ্য, এবং উপনীত ব্যক্তিকে যা অল্পাধিক বিশিষ্ট ও কখনও কখনও গুহ্য সমাজে প্রবেশাধিকার দেয়।[২০০] ইরাণে যেমন হূইতী শ্রেণীকে এই অধিকার দেওয়া হয়নি,[২০১] ভারতে তেমনি দেওয়া হয়নি শূদ্রকে। কুলগত অসবর্ণ বিবাহ এবং জনগোষ্ঠীগত সবর্ণ বিবাহই পরবর্তীকালে জাতিভেদ-প্রথার লক্ষণে পরিণত হয়—সেনার্ট-এর এই মত অনুসরণ করে এমন যুক্তিও দেওয়া যায় যে জনগোষ্ঠীয় দীক্ষা প্রথাই রূপান্তরিত হয় উচ্চতর তিন বর্ণের 'উপনয়নে' এবং ফলত শূদ্রদের সামাজিক অবনমনে এটি সাহায্য করে।

যদিও 'উপনয়ন' হারানোর ফলেই শূদ্ররা শেষ অবধি বঞ্চিত হলেন শিক্ষার অধিকার থেকে, তাহলেও আমাদের আলোচ্য পর্বে ব্যাপারটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তী বৈদিকপর্বে শিক্ষার প্রকৃতি ঠিক কী ছিল—সে নিয়ে এখনও সংশয় আছে এবং এই পর্বে আদৌ লেখার প্রচলন ছিল কিনা সে সম্পর্কেও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।[২০২] এও হতে পারে যে এমনকি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও "বেদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করতেন না, আর করলেও, করতেন দায়সারাভাবে।"[২০৩] পরবর্তীকালীন একটি রচনায় দেখা যাচ্ছে যে ছাত্রদের সাধারণত বেদ অধ্যয়ন করতে হতো নেহাতই আনুষ্ঠানিকভাবে,[২০৪] এবং শিক্ষা হয়তো ছিল মুখ্যত ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই সম্পর্কিত। কিন্তু শিক্ষার অধিকারের চেয়ে উপনয়ন আরও বেশি কিছুর সূচক ছিল। এটি হয়ে উঠেছিল ঐ আচারের অধিকারীদের উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার চিহ্নস্বরূপ।

উপনয়ন একটি বৈদিক আচার—এই যুক্তিতে শূদ্রের এতে অধিকার ছিল না। কিন্তু বৈদিক যুগের ধর্মীয় জীবন থেকে দেখা যায় যে শূদ্রদের বিশেষ কয়েকটি অংশকে সর্বদা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে

২০০. ঘেল্ড, 'এথনোলজি অফ দ মহাভারত', পৃ ২৪১-৪২।

২০১. সেনার্ট, 'কাস্ট ইন ইণ্ডিয়া', পৃ ১১৮।

২০২ হস্তিনাপুরে সাম্প্রতিক খননের ফলে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ম ডগার বেশ-কিছু যন্ত্র পাওয়া গেছে। ধরা হয়েছে এগুলো খৃপূ ১১০০-৮০০-র সময়কালীন বসতি পর্বের। কিন্তু এ-ও নিশ্চিত নয় যে এগুলো লেখার জন্যই ব্যবহৃত হতো। 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', সংখ্যা ১০-১১, পৃ ১৪।

২০৩. হপকিন্স-এর উদ্ধৃতি, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন', পৃ ৩৩৯-৪০।

২০৪. শাঙ্খায়ন গৃ. সূ ২।৭।২১।২৫।

বাদ দেওয়া হতো না। বহু রচনায় বিধান দেওয়া হয়েছে যে রথকারই যজ্ঞের অগ্নি-আধান করবেন,[২০৫] বর্ষায় তিনি এই যজ্ঞ করতে পারতেন।[২০৬] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পর তালিকায় তাঁর স্থান চতুর্থ। 'আশ্বালায়ন শ্রৌতসূত্রে' রথকার-এর জায়গা নিয়েছেন 'উপকৃষ্ট'। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো তিরস্কৃত বা ভৎর্সিত ব্যক্তি, কিন্তু টীকাকারের মতে এটি সূত্রধরের ('তক্ষক') প্রতিশব্দ।[২০৭] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তক্ষকদের যদিও খুবই ধিক্কার দেওয়া হতো, তাহলেও তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠান অব্যাহত ছিল। বৈদিক যজ্ঞের অধিকারী ছিলেন আরও এক ব্যক্তি। তিনি হলেন নিষাদদের অধিপতি ('নিষাদ-স্থপতি')।[২০৮] কিন্তু তাঁর যজ্ঞের উদ্দিষ্ট ছিল রুদ্র-পশুপতির অর্চনা করে পশুদের শান্ত রাখা।[২০৯] অন্যত্র অনুরূপ একটি উল্লেখে শুধু নিষাদের কথা আছে।[২১০] কিন্তু টীকাকার বলেছেন যে এটি নিষাদ-অধিপতি ('স্থপতি')-কেই নির্দেশ করছে। তিনি আরও বলেছেন, 'আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে' নিষাদ হলেন ত্রৈবর্ণিক (প্রথম তিন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত)।[২১১] 'মহাভারতে'ও বলা হয়েছে, নিষাদ-অধিপতি যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।[২১২] 'ঋগ্‌বেদে'র একটি অংশে যজ্ঞে 'পঞ্চজনাঃ'-র যোগ দেওয়ার উল্লেখ আছে।[২১৩] 'নিরুক্তে' 'পঞ্চজনাঃ' পদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে চার বর্ণ ও নিষাদ বলে।[২১৪] এই অর্থ 'ঋগ্‌বেদে'র যুগে প্রযোজ্য বলে মনে করা যায় না, যদিও কখনও কখনও সেইরকমই করা হয়েছে।[২১৫] 'নিষাদ' শব্দটি 'ঋগ্‌বেদে' নেই এবং চতুর্বর্ণের অস্তিত্ব সেখানে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনা নয়। স্পষ্টতই 'পঞ্চজনাঃ' শব্দটি দিয়ে 'ঋগ্‌বেদে'র জন-গোষ্ঠীদের বোঝায়, যার সদস্যরা বর্ণভেদ ছাড়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করতে পারতেন। যাস্ক-র ব্যাখ্যা থেকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে, তাঁর সময়ে শূদ্র ও নিষাদরাও

২০৫. তৈ. ব্রা. ১।১।৪।৮, আপস্তম্ব শ্রৌ সূ. (গার্বে সং) ৫।১১।৭ ; কাত্যায়ন ১।৯ ; সত্যাষাঢ় ৩।১ ; বারাহ ১।১।১।৪।

২০৬. আপস্তম্ব (কালান্ড ও গার্বে সং) ৫।৩।১৯, কাত্যায়ন ৪।১৭।৯-৮১ ; সত্যাষাঢ় ৩।২ ; বারাহ ১।৪।১।১ ; বৈখানস ১।১ ; তুলনীয় : আশ্বলায়ন ২।১।১৩।

২০৭. তক্ষককর্মোপজীব্যুপকৃষ্ট ইত্যুচ্যতে। আশ্বলায়ন শ্রৌ সূ. ২।১।১৩ নারায়ণ ভাষ্য সমেত।

২০৮. আপস্তম্ব (গার্বে সং) ৯।১৪।১২ ; সত্যাষাঢ় ১৫।৪।২০ ; বারাহ ১।১।১।৫ ; তুলনীয় : কাত্যায়ন ১।১২।

২০৯. আপস্তম্ব (গার্বে সং) ৯।১৪।১১ ; সত্যাষাঢ় ১৫।৪-১৯ ; বারাহ ১।১।১।৫।

২১০. সত্যাষাঢ় ৩।১।

২১১. সত্যাষাঢ় শ্রৌ. সূ. ভাষ্য ৩।১।

২১২. মহাভারত ১৬১।৪৮।

২১৩. ঋগ্ ১০।৫৩-৪।

২১৪. নিরুক্ত ৩।৮। ঔপমন্যব 'নিষাদ' শব্দটি 'নিষাদ স্থপতি' হিসেবে ধরেছেন। স্কন্দস্বামী ও মহেশ্বর, 'নিরুক্ত' ৩।৮ প্রসঙ্গে।

২১৫. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন,' পৃ ৫২-৫৩।

(ধর্মসূত্রে যাঁদের ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার সন্তান এক সংকর জাতি বলে নির্দেশ করা হয়েছিল) যজ্ঞে যোগ দিতে পারতেন। সুতরাং উল্লেখটি প্রমাণ করে যে কখনও কখনও নিষাদ মানবগোষ্ঠী ও সাধারণভাবে নিষাদ-অধিপতি বৈদিক যজ্ঞের অধিকারী ছিলেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের নিয়ম ছিল: যজ্ঞকারীকে নিষাদের সঙ্গে এবং বৈশ্য ও রাজন্যের সঙ্গে তিন রাত্রি থাকতে হবে।[২১৬] এর থেকে দেখা যায়, নিষাদ মানবগোষ্ঠী পরোক্ষে যজ্ঞের সংগে যুক্ত ছিলেন।

যজ্ঞের অধিকারী এই দু-ধরনের লোকের মধ্যে রথকার বা তক্ষক ছিলেন আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু নিষাদরা স্বগ্রামবাসী অনার্য মানবগোষ্ঠীর লোক বলেই মনে হয়।[২১৭] 'মহাভারত' ও 'বিষ্ণুপুরাণে' বার কয়েক নিষাদদের কৃষ্ণ বর্ণের উল্লেখ আছে।[২১৮] সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যীকরণের একটি সোপানরূপে, জনগোষ্ঠী হিসেবে নিষাদদের, বৈদিক পদ্ধতিতে তাঁদের স্বকীয় যজ্ঞরীতি অনুসরণ করতে দেওয়া হয়েছিল। এই বিশেষ অধিকার পরে শুধু তাঁদের অধিপতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে বৈদিক যুগের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত যজ্ঞের অধিকার ভোগ করতেন শূদ্রবর্গীয় রথকার ও নিষাদ। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো: 'পঞ্চজনাঃ' পদটির যাস্ক-কৃত ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায়, তাঁর মতে সমগ্র শূদ্রবর্ণই এই অধিকার ভোগ করতেন।

বেশ কয়েকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শূদ্রদের যোগদানের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে। অন্য তিনবর্ণের লোকের সংগে তাঁরাও দেবতাকে প্রদেয় অর্ঘ্য ('হবিষ্') তৈরির কাজে যোগ দিতে পারেন। তাঁদের ক্ষেত্রে সম্বোধনের যে-রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় সেই অনুষ্ঠানে তাঁদের স্থান ছিল সবার নীচে।[২১৯] অনুরূপভাবে, অন্যান্য বর্ণের লোকের সংগে তারা সোমপান করতে পারতেন; বমন করলে তাঁদের প্রায়শ্চিত্তও করতে হতো।[২২০] 'দাসীপুত্র' কবষ ঐলুষের ঘটনা উল্লেখ করে হপকিন্স দেখিয়েছেন, শূদ্রাপুত্রেরও যজ্ঞভাগ ছিল এবং একটি আধা-ব্রাহ্মণ্য, আধা-লৌকিক অনুষ্ঠানে শূদ্রও সোমপান করতেন।[২২১] এও কৌতূহলজনক যে 'কাঠক সংহিতা'-র একটি অংশে শূদ্র ও স্ত্রীলোককে সোমপান করতে

২১৬. ...নিষাদেষু হৈব তা বসেদ্...বৈশ্যে বা হ তা ভ্রাতৃব্য বা বসেদ্...রাজোনি হৈব তা বসেদ্। জৈমিনীয় ব্রা ২।১৮৪; পঞ্চবিংশ ব্রা. ১৬।৬।৭; কৌষিতকী ব্রা ২৫।১৫; আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. (গার্বে সং) ১৭।২৬।১৮; লাট্যায়ন ৮।২।৮।

২১৭. লাট্যায়ন শ্রৌ. সূ. ভাষ্যে নিষাদ-গ্রামের উল্লেখ আছে (৮।২।৮)।

২১৮. শেফার, 'এথনোগ্রাফি অফ এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া'-য় উদ্ধৃত, পৃ ১০।

২১৯. শতপথ ব্রা. ১।১।৪।১১-১২; আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. (গার্বে সং) ১।১৯।৯।

২২০. চত্বারো বৈ বর্ণাঃ। ব্রাহ্মণো রাজন্যো বৈশ্যঃ শূদ্রো ন হৈতেষামেকশ্চন ভবতি যঃ সোমং বমতি, স যৎ হৈতেষামেকশ্চিত্তস্যাত্তস্যৈব প্রায়শ্চিত্তিঃ।
শতপথ ব্রা. ৫।৫।৪ ৯।

২২১. ঐতরেয় ব্রা. ২ ১৯; হপকিন্স, 'রিলিজিয়ন স অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ৪৭৭।

অনুমতি দেওয়া হয়নি।[২২২] অন্য কোন 'যজুঃসংহিতা'য় অবশ্য এটি পাওয়া যায় না। তাই মনে হয় এটি প্রক্ষেপ, বা বড়জোর 'কাঠক' শাখার অভিমত।

অন্য দুটি গৌণ অনুষ্ঠানেও শূদ্ররা যোগ দিতেন। অপর তিন বর্ণভুক্তদের মতো তাঁরাও অংশ নিতে পারতেন রান্না-করা খাদ্যে উৎসর্গের অনুষ্ঠান 'ওদনসবে'।[২২৩] তেমনি সব বর্ণের লোকই [ গাছের ] প্রথম ফল উৎসর্গের আচার পালন করতে পারতেন।[২২৪] অয়নান্তিক আচার 'মহাব্রতে' শূদ্রের ভূমিকা, ঐ যুগের ধর্মীয় জীবনে তাঁদের যোগদানের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন উপস্থিত করে। এই অনুষ্ঠানে শূদ্র থাকেন বেদীর বাইরে, আর্য ভেতরে। পশুচর্মের অধিকার নিয়ে তাঁরা লড়াই করেন আর তাতে জেতেন আর্যই।[২২৫] কয়েকটি গ্রন্থে শূদ্র বর্ণ ও আর্য বর্ণের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।[২২৬] শব্দটি যেখানে 'অর্য' সেখানে তার অর্থ বৈশ্য।[২২৭] পক্ষান্তরে, শব্দটি যেখানে 'আর্য' সেখানে এর অর্থ প্রথম তিন বর্ণ। কতক রচনায় আর্যের জায়গা নিয়েছেন ব্রাহ্মণ,[২২৮] শূদ্রের প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে তাঁকেই। বেদোত্তরকালে বিষয়টি সুপ্রচলিত হয়ে ওঠে। আরেকটি বৈদিক রচনায় বিশেষ করে এঁদের দুজনের উল্লেখ আছে। তাতে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কাউকেই প্রজাপতির কাছে উৎসর্গ করা যায় না।[২২৯] এই অংশটি আছে 'বাজসনেয়ি সংহিতা'র পরবর্তী ভাগে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতই দিতে চাওয়া হচ্ছে যে উৎসর্গ করার পক্ষে ব্রাহ্মণের স্থান অতি উচ্চে আর শূদ্রের স্থান অতি নীচে।

'মহাব্রত' অনুষ্ঠানের তাৎপর্য এই যে এটিতে সম্ভবত রক্ষিত হয়েছে সেই যুদ্ধের স্মৃতি যখন গরুর জন্য যুদ্ধ হতো—আর্যদের নিজেদের মধ্যে আর আর্য-অনার্যের মধ্যে। এই অনার্যদেরই পরে শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। 'শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে' বলা হয়েছে, এই প্রাচীন ও অপ্রচলিত প্রথা পালন করা অনুচিত।[২৩০] এর থেকেই দেখা যায়, মহাব্রতের মতো একটি প্রাচীন

২২২. কাঠক সংহিতা ১১।১০।

২২৩. আজ্যমন্থং ব্রাহ্মণঃ পয়োমন্থং রাজন্যো দধিমন্থং বৈশ্য উদমন্থনং শূদ্রঃ। সত্যাষাঢ় শ্রৌ. সূ. ২০।৪।১৭। এ থেকে শূদ্রদের তুলনামূলক দারিদ্র্যের আভাস পাওয়া যায়।

২২৪. আশ্বলায়ন শ্রৌ. সূ. ২।৯।৭।

২২৫. শূদ্রার্যৌ চর্মণি পরিমণ্ডলে ব্যয়চ্ছেতে জয়ত্যার্যঃ। ক্যাত্যায়ন শ্রৌ. সূ. ১৩।৪০।৪১; পঞ্চবিংশ ব্রা. ৫।৫।১৪; সত্যাষাঢ় শ্রৌ. সূ. ১৬।৬।২৮।

২২৬. জৈমিনীয় ব্রা. ২।৪০৪-৫। কাঠক সংহিতা-র ৩৪।৫-এ 'আর্য বর্ণ' আছে, কিন্তু শূদ্র বর্ণের কোন উল্লেখ নেই।

২২৭. শাঙ্খায়ন শ্রৌ. সূ. ১৭।৬।১-২; লাট্যায়ন ৪।৩।৯।৫।৬। ২২৮. তৈ. ব্রা. ১।২।৬।৭।.

২২৯. অশূদ্রা অব্রাহ্মণাস্তে প্রাজাপত্যাঃ। বাজসনেয়ি সংহিতা ৩০।২২।

২৩০. ১৭।৬।১-২।

আচারের ক্ষেত্রে শূদ্ররাও উচ্চতর তিন বর্ণের সঙ্গে যজ্ঞীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা আর তা করতে পারতেন না।

পরবর্তী বৈদিক যুগের শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানেও শূদ্রের স্থান ছিল। বিধান ছিল যে শূদ্রেরও সমাধিস্তূপ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর উচ্চতা হবে কেবল জানু পর্যন্ত। বিভিন্ন বর্ণ অনুযায়ী উচ্চতার ভেদ ঘটত।[২৩১]

সমাজের অন্য যে-কোন শ্রেণীর মতো শূদ্রেরও উপাস্য দেবতা ছিলেন এবং তাঁরাও উপাসনা করতেন বলে জানা যায়। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে' শূদ্রকে বলা হয়েছে পূষা। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পূষা দেবতাটি ছিলেন তাঁদেরই জন্যে নির্দিষ্ট।[২৩২] একইভাবে 'মহাভারতে'র কাহিনীতে দেবচিকিৎসক অশ্বীদ্বয়কে শূদ্র বলেই ধরা হয়েছে।[২৩৩] এও তাৎপর্যপূর্ণ যে রত্নহবীংষি অনুষ্ঠানে অশ্বীদ্বয়কে যুক্ত করা হয়েছে 'সংগৃহীতা'র[২৩৪] সঙ্গে এবং পূষাকে 'ভাগদুঘে'র[২৩৫] সঙ্গে। কিন্তু 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' বিশ্বেদেবাঃ ও মরুৎদের (কৃষক-দেবতা) সঙ্গে পূষাকেও বৈশ্যদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।[২৩৬] বিশ্বেদেবরা পরোক্ষে শূদ্রদের জন্যও নির্দিষ্ট। অনুষ্টুভ্ হলো পরবর্তীকালের এক জনপ্রিয় ছন্দ। ছন্দটি শূদ্রদের,[২৩৭] আবার বিশ্বেদেবদেরও।[২৩৮] বলা হয়েছে, এই ছন্দ আবৃত্তি করে বিশ্বে-দেবদের মধ্যে সম্মানিত হয়েছেন প্রজাপতি[২৩৯] ও ইন্দ্র, আর শূদ্রদের মধ্যে পাঞ্চাল রাজকুমার দর্ভ শতানীকি।[২৪০] সুতরাং এ-ক্ষেত্রে দেবসমাজের বিশ্বেদেবরা হলেন মানবসমাজের শূদ্রদের প্রতিকল্প।

যেসব দেবতার সম্পর্ক শূদ্রদের সঙ্গে, মনে হয় তাঁদের মধ্যে পূষা ছিলেন পশুচারক-দেবতা,[২৪১] এবং এই অর্থে সম্ভবত আর্য 'বিশ্'-এর গবাদি পশু লালন-পালন সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ। 'ঋগ্বেদে'র পরবর্তী অংশে অশ্বীদ্বয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁরা লাঙল দিয়ে শস্য বপন করেন এবং লোকের জন্য দুগ্ধদোহন করেন।[২৪২] সম্ভবত এঁরা ছিলেন 'বিশ্'-এর কৃষিসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বেদেবরা যে 'বিশ্'-এর জন্য

২৩১. শতপথ ব্রা. ১৩।৮।৩।১১। কৌতূহলজনক এই যে ক্ষত্রিয়দের সমাধিস্তূপের উচ্চতা সর্বোচ্চ, তারপরে ব্রাহ্মণদের।
২৩২. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৪।১১-১৩।
২৩৩. হপকিন্স, 'এপিক মিথলজি', পৃ ১৬৮।
২৩৪. শতপথ ব্রা. ৫।৩।১।৮।
২৩৫. ঐ, ৫।৩।১।৯।
২৩৬ তৈ. ব্রা. ২।৭।২।১ ও ২।
২৩৭. তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪-৫ ; পঞ্চবিংশ ব্রা. ৬।১।৬-১১।
২৩৮. জৈমিনীয় ব্রা. ২।১০১ ; শাংখায়ন ১৫।১০ ১-৪।
২৩৯. শাংখায়ন শ্রৌতসূত্রে প্রজাপতির উল্লেখ নেই।
২৪০. জৈমিনীয় ব্রা. ৩।১০১।
২৪১. রমেশচন্দ্র দত্ত 'আ হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজেশন ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', ১ম খণ্ড, পৃ ৬০-৬১।
২৪২. যবং বৃকেণাশ্বিনা বপন্তেষং দুহন্তা মনুষায় দস্রা···ঋগ্ ১।১১৭।২১।

নির্দিষ্ট হয়েছেন তার কারণ তাঁদের সংখ্যাধিক্য। যে তিনজন দেবতা আর্য 'বিশ্'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন পরে তাঁদেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং এই ঘটনা থেকে এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, যদিও 'বিশ্'-এর কিছু কিছু অংশকে অবনমিত করা হয়েছিল শূদ্রের পর্যায়ে, তাঁরা কিন্তু তখনও তাঁদের প্রাচীন বৈদিক দেবতাদের রক্ষা করে চলেছিলেন।

এমন নিদর্শনও আছে যাতে দেখা যায়, আর্য ও অনার্য উভয়েরই নিম্নবর্গের একটা বড় অংশ রুদ্র-পশুপতির উপাসনা করতেন। ইনি প্রাগ্-আর্য দেবতা বলেই মনে হয়। শূদ্রের বিভিন্ন রূপের প্রতি যথোপযুক্ত অর্ঘ্য নিবেদনের সঙ্গে যুক্ত 'শতরুদ্রীয়' মন্ত্রে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে সমাজের সমস্ত সম্প্রদায়কেই। এই সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন ব্রাহ্মণ, তারপরে যথাক্রমে রাজন্য, সূত ও বৈশ্য আর তার সঙ্গে নানান ধরনের হস্তশিল্পী ও আদিবাসী মানবগোষ্ঠী। কিন্তু প্রথম তিন বর্ণের উল্লেখ আছে কেবল একটিমাত্র 'যজুঃ-সংহিতা'য়।[২৪৩] আর 'যজুঃ'র কোন শাখাতেই যদিও শূদ্রের সরাসরি উল্লেখ নেই, কিন্তু সব তালিকাতেই বলা হয়েছে যে রথকার. 'কুলাল' (কুম্ভকার), 'কর্মার' (কর্মকার), নিষাদ, পুঞ্জিষ্ঠ (আদিবাসী মানবগোষ্ঠী, যাঁরা ধীবর অথবা ব্যাধ হিসেবে কাজ করেন), শ্বনী (কুকুরের পোষক বা পালক) এবং মৃগয় (শিকারী)[২৪৪]-দের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এঁদের সবাইকে অনায়াসেই চতুর্থ বর্ণে ফেলা যায়। এ-ছাড়াও 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় উল্লেখ করা হয়েছে 'ধনুকার' এবং 'ইষুকারের' (ধনুক-নির্মাতা ও তীর-নির্মাতা)।[২৪৫] এঁরাও এই বর্গভুক্ত হতে পারেন।

এইসব হস্তশিল্পী ও জনগোষ্ঠীয় লোক তাঁদের পৃষ্ঠপোষক-দেবতা হিসেবে রুদ্রের উপাসনা করতেন।[২৪৬] ভেবার-এর মতে, "বিজিত আদিবাসী এবং ব্রাত্য বা অ-ব্রাহ্মণীকৃত আর্যদের প্রকাশ্য প্রতিরোধ মোটামুটি বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর যখন গোপন সংঘাত শুরু হলো তখন থেকেই রুদ্র-অধ্যায়ের সূচনা।"[২৪৭] তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, যাঁদের সবলে অধস্তন বর্ণে ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হলো, বিভিন্ন মিশ্র জাতির প্রতিষ্ঠার আগে তাঁদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরুদ্ধতা এসেছিল।[২৪৮] সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, উচ্চতর বর্ণগুলোর ক্রমবর্ধমান সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারায়, আর্য জনগোষ্ঠীর পরাজিত অংশ এবং বিজিত আদিবাসীর মধ্যে যথেষ্ট মাত্রায় অন্তর্মিশ্রণ ঘটেছিল। এরই অনিবার্য ফলরূপে কিছু আর্য, যেমন রথকার,

২৪৩. মৈত্রায়ণী সংহিতা ২।৯।৫।

২৪৪. বাজসনেয়ি সংহিতা ২৬।২৭; কাঠক ১৭।১৩. কপিষ্ঠল ২৮।৩; মৈত্রায়ণী ২।৯।৫; তৈত্তিরীয় ৪।৫।৪।২. কাণ্ব ১৭।৪।

২৪৫. তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৫।৪।২।

২৪৬. তুলনীয়: 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য় খণ্ড, পৃ ২৪৯-৫০।

২৪৭. 'ইণ্ডিয়ান লিটরেচর', পৃ ১১০-১১১।

২৪৮. ঐ।

কর্মার ইত্যাদি, অনার্য দেবতা রুদ্রের পতাকাতলে সমবেত হলেন। লক্ষণীয় যে রত্নহবীংষি অনুষ্ঠানে রুদ্রকে 'গোবিকর্ত'নে'র দেবতা বলা হয়েছে।[২৪৯] সায়ণ তাকে নির্দিষ্ট করেছেন 'যে-কোন নিম্নবর্ণে'র' বলে। রুদ্র-পশুপতি যে নিষাদ-অধিপতির দেবতা ছিলেন, তা আগেই দেখানো হয়েছে। অতএব একথা সন্দেহাতীত যে শূদ্রদেরও নিজস্ব দেবতা ছিলেন যাঁদের কিছু আর্য আর অন্যেরা অনার্য। সুতরাং, শূদ্রদের কোন দেবতা ছিল না[২৫০]—সৃষ্টি-আখ্যানে ব্রাহ্মণদের এই উক্তি সঠিক অবস্থার পরিচয় দেয় না। অন্তত একটি সৃষ্টি-আখ্যানের নিহিত অর্থ হলো: দিবা ও নিশা ছিলেন শূদ্রদের দেবতা।[২৫১] শূদ্রকে অর্চনা ও যজ্ঞের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার একটা ইচ্ছাকৃত প্রয়াস ব্রাহ্মণ্য-আখ্যানগুলোয় পরিষ্কার চোখে পড়ে। শূদ্র ও তাঁর আর্য প্রতিবাসী—দুজনেরই আগে এ-অধিকার ছিল, অথবা আদিবাসী জন-গোষ্ঠীর সদস্যরূপে তাঁরা অন্যনিরপেক্ষভাবে এই অধিকার ভোগ করতেন।

বৈদিক যজ্ঞে শূদ্রদের যোগদানের সপক্ষে প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু বিপক্ষ নিদর্শন আছে তার চেয়েও বেশি। বারবার বলা হয়েছে যে নিম্নবর্ণে জন্ম হওয়ার দরুন যজ্ঞে শূদ্রের কোন অধিকার নেই,[২৫২] যজ্ঞীয় আহুতিও তিনি দিতে পারবেন না।[২৫৩] কোন বৈদিক যজ্ঞই অগ্নিচয়ন-অনুষ্ঠান ছাড়া হতে পারত না। এই আচারটির ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে এতে অগ্নিকে শূদ্রবর্ণে'র থেকে পৃথক্ করা হয়।[২৫৪] কিন্তু বৈদিক যজ্ঞ থেকে শূদ্র-বর্জন বিষয়ে এই ধরনের প্রত্যক্ষ উক্তি সংহিতাগুলোয় পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হয় ঐসব উক্তির উৎপত্তি হয়েছিল পরে। তা সত্ত্বেও এমনকি ঐ সমস্ত রচনাতেও এমন অজস্র উল্লেখ আছে যার নিহিতার্থ তা-ই। অগ্নি-চয়ন সংক্রান্ত নির্দেশের মধ্যে রয়েছে শুধু প্রথম তিন বর্ণের কথা।[২৫৫] কে কোন্ ঋতুতে এটি করবেন 'ব্রাহ্মণ'-সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে। এমনকি রথকারকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অগ্নি হলেন সেই বিশ্বের সদৃশ যার মধ্যে রয়েছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 'বিশ্'।[২৫৬] আরও বলা হয়েছে যে রাজন্য ও 'বিশ্'-এর জন্ম যজ্ঞ থেকে এবং সেই হেতু ব্রাহ্মণ থেকেও।[২৫৭] সুতরাং আবার দেখা যাচ্ছে যে কেবল প্রথম তিন বর্ণভুক্তরাই

২৪৯. শতপথ ব্রা. ৫।৩।১।১০।

২৫০. তৈত্তিরীয় সংহিতা ৮।১।১ ; পঞ্চবিংশ ব্রা. ৬।১।৬-১১।

২৫১. বাজসনেয়ি সংহিতা ১৪।৩০ ; শতপথ ব্রা. ৮.৪।৩।১২।

২৫২. তৈ. ব্রা. ৩।২।৩।৯ ; কাত্যায়ন শ্রৌ. সূ. ১।৫ ; তুলনীয়: শাংখায়ন ১।১।১-৩ ; আশ্বলায়ন ১।৩।৩।

২৫৩. তৈ. ব্রা. ৩।২।৩ ৯।

২৫৪. শতপথ ব্রা. ৬।৪।৪।৯।

২৫৫. মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩।১-৫ ; ৩।২।২। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫।১।৪।৫) ; কাঠক (১৯।৪) ও কপিষ্ঠল (৩০।২)-এ শুধু ব্রাহ্মণ ও রাজন্যরই উল্লেখ আছে। এমনকি বৈশ্যও বাদ পড়েছে।

২৫৬. শতপথ ব্রা. ২।৫।২।৩৬।

২৫৭. ঐ, ৩।২।১।৪০।

যজ্ঞ করতে পারেন এবং সেই যজ্ঞভূমিতে শূদ্রের প্রবেশাধিকার নেই[২৫৮]—একথার সঙ্গে উপরের বক্তব্যের সামঞ্জস্য আছে।

সাধারণভাবে, বৈদিক যজ্ঞ থেকে শূদ্রদের বর্জন করা ছাড়াও বিশেষ কয়েকটি বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে তাঁদের বাদ রাখার উদাহরণ আছে। যেমন 'সোম-যাগ' নির্দিষ্ট করা হয়েছে শুধু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও রাজন্যের জন্য।[২৫৯] আর্য'ই কেবল 'অগ্নিহোত্র' (অগ্নিতে আহুতি দান) সম্পাদন করতে পারবেন—টীকাকারের মতে ইনি হলেন উচ্চতর তিন বর্ণের একজন।[২৬০] অগ্নিহোত্রের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ দোহন করতে শূদ্রকে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে[২৬১], কারণ, ধরেই নেওয়া হয়েছে যে শূদ্রের জন্ম অসত্য থেকে।[২৬২] স্থালী (দুধ দুইবার মাটির ভাঁড়)-টিও তাই গড়বেন কোন আর্য।[২৬৩] কিন্তু 'বাজসনেয়ি' ও 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'য় ঐ ধরনের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, এটি আছে শুধু 'মৈত্রায়ণী' ও 'কপিষ্ঠল সংহিতা'র পরিশিষ্ট-অংশে। 'কাঠক-সংহিতা'র ঐ অংশে স্বরিত-উদাত্ত ইত্যাদি উচ্চারণ-নির্দেশ নেই, তাই মনে হয় এটি পরবর্তী সংযোজন। উপরন্তু, এই জাতীয় রচনার মধ্যে যেটিকে প্রাচীনতম বলে ধরা হয় সেই 'আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে'[২৬৪] বিকল্প ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে শূদ্ররাও গো-দোহন করতে পারেন।[২৬৫] অনুমতি পেলেই তবেই তা করা সম্ভব—এই বলে টীকাকার তার অর্থ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।[২৬৬] এসব থেকে দেখা যায়, অগ্নিহোত্রে শূদ্রদের গো-দোহন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা হয়তো সংহিতাগুলোর মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এটি 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'র সমকালীন বলে ধরা যায়।[২৬৭]

বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানে শূদ্রের 'দেহস্পর্শ' বা দর্শন নিষিদ্ধ করার মতো কঠোর ব্যবস্থা দেখা দিতে শুরু করে বৈদিক পর্বের শেষদিকে। যজমানকে শূদ্রের সঙ্গে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে।[২৬৮] 'উপনীত' ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে একই নিষেধ।[২৬৯] 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বিধান

২৫৮. 'বৈদিক ইনডেক্স', খণ্ড ২, পৃ ৩৯০। ২৫৯. কাত্যায়ন শ্রৌ সূ ৭।১০৫।

২৬০. আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. (গার্বে সং), ৬।৩।৭ রুদ্রদত্তের ভাষ্য সমেত।

২৬১. তৈ. ব্রা. ৩।২।৩।৯।১০; কপিষ্ঠল সংহিতা ৪৭।২; মৈত্রায়ণী ৪।১।৩; আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. (গার্বে সং) ৬।৩।১১; বৌধায়ন ২৪।৩১; শাংখায়ন ২।৮।৩; সত্যাষাঢ় ৩।৭।

২৬২. অসতো বা এষ সংভূতো যচ্ছূদ্রঃ। আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. (গার্বে সং), ৬।৩।১৩।

২৬৩. মৈত্রায়ণী সংহিতা ১।৮।৩। ২৬৪. গার্বে, আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. ভূমিকা, পৃ [১২]।

২৬৫. দুহ্যাদ্ বা। ঐ (গার্বে সং), ৬।৩।১৩।

২৬৬. আপস্তম্ব ৬।৩।১৩। রুদ্রদত্তের ভাষ্য। ২৬৭. তৈ, ব্রা. ৩।২।৩।৯-১০।

২৬৮. শতপথ ব্রা. ৩।১।১।১০; ন শূদ্রেণ সংভাষেরন্। দ্রাহ্য শ্রৌ সূ. ৮।৩।১৪; ল্যাটায়ন ৩।৩।১৫-১৬-এ 'সত্র' অনুষ্ঠানকারীর প্রসঙ্গে এই শর্ত ব্যবহৃত। সত্যাষাঢ় ১০।২।

২৬৯. দ্রাহ্য. শ্রৌ. সূ. ৮।৩।১৪; সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্রের ২৪ ৮।১৬ তে আরও আছে যে দীক্ষান্তে কোন ব্রহ্মচারীর মহিলার সঙ্গে কথা বলা নিষেধ।

দেওয়া হয়েছে যে সোমযাগের সূচনা 'প্রবগ্য'' অনুষ্ঠানের যজমান অবশ্যই স্ত্রীলোক ও শূদ্রের স্পর্শ এড়িয়ে চলবেন কারণ তারা অসত্য।[২৭০] 'কাঠক সংহিতা'র এই জাতীয় একটি উল্লেখ ছাড়া, স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে একই পর্যায়-ভুক্ত করার এটিই হলো প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। পরবর্তী সাহিত্যে এ-ব্যাপারটি প্রায়ই দেখা যায়।[২৭১] আরও বিধান দেওয়া হয়েছে, যে-নারী পুত্রলাভের জন্য কোন আচার-পালন করছেন তাঁকে যেন কোন বৃষল পুরুষ অথবা স্ত্রী স্পর্শ না করেন।[২৭২] পরবর্তীকালে এই বৃষলরা শূদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন এবং চিত্রিত হয়েছেন ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী রূপে। এমনকি ছুতোরের ছোঁয়াতেও যজ্ঞপাত্র অনুষ্ঠানের পক্ষে অপবিত্র হয়ে যায় বলে ভাবা হয়েছে 'শতপথ ব্রাহ্মণে'।[২৭৩] কিন্তু এই গ্রন্থের মাধ্যন্দিন শাখার পাঠ-কেই সঠিক বলে ধরে নিলে, অন্য এক জায়গায় দেখা যায় তক্ষা আরুণির জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।[২৭৪] লক্ষণীয় যে শূদ্রের স্পর্শ বর্জন সংক্রান্ত এ-জাতীয় যাবতীয় উল্লেখ আছে হয় 'শতপথ ব্রাহ্মণে' নয়তো শ্রৌতসূত্রে। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অনুষ্ঠানগুলোতে শূদ্রের অশুচিতা সংক্রান্ত ধারণা— তার শারীরিক ও চাক্ষুষ স্পর্শ বর্জনের নিষেধাজ্ঞাও যার মধ্যে পড়ে—দেখা দিতে শুরু করে বৈদিক যুগের শেষদিকে, এমনকি তারও পরে।

পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মীয় জীবনে শূদ্রের স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রথকার ও নিষাদ তো বৈদিক যজ্ঞে অংশ নিতে পারতেনই, এছাড়া শূদ্রবর্ণেরও নিজস্ব কিছু দেবতা ছিলেন এবং কয়েকটি বৈদিক অনুষ্ঠানে তাঁরাও যোগ দিতে পারতেন। একথা ঠিক যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শূদ্রের যোগদানের রীতিপদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো সমাজে তাঁর হীন অবস্থা নির্দেশ করা, কিন্তু সেই কারণেই আবার এইসব সুযোগ-সুবিধা থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয়নি। পরবর্তীকালের কিছু রচনাতেই শূদ্র-বর্জনের এই প্রক্রিয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের শেষদিকে এই প্রক্রিয়া আরও প্রবল হয়ে ওঠে। মনে হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভেদবৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে জনগোষ্ঠীয় যজ্ঞের চরিত্রই বদলে দেয়। এটি হয়ে উঠল আরও ব্যক্তিগত এবং পুরোহিতদের আরও বেশি করে দক্ষিণা দেওয়া হতে লাগল। কালক্রমে যজ্ঞ হয়ে উঠল উচ্চতর বর্ণগুলোর এক বিশেষ অধিকার। এর ব্যয়ভার বহন করা তাঁদেরই সাধ্যে কুলোত। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে'র একটি অংশের শঙ্কর-ভাষ্য থেকে এই অনুমান করা চলে।[২৭৫] সেখানে বলা হয়েছে, সম্পদ

২৭০. শতপথ ব্রা. ১৪·১।১।৩১ ; সত্যাষাঢ় ২৪।১।১৩-তেও আছে।

২৭১ রামশরণ শর্মা, 'জার্নাল অফ দ বিহার রিসার্চ সোসাইটি', খণ্ড ৩৬, পৃ. ১৮৩-১৯১।

২৭২. শতপথ ব্রা. ১৪।৯।৪।১২।

২৭৩. অশুদ্ধস্তক্ষা। শতপথ ব্রা. ৯।১।৩।১২। ব্রাফ মনে করেন যে গাছকে অপবিত্র করা বনদেবতার কাছে অপরাধ—এমনই এক পূর্বতন ধারণা থেকে সম্ভবত এটি এসে থাকবে। বন্দ্যোপাধ্যায়. 'স্টাডিজ ইন দ ব্রাহ্মণস', পৃ. ১২৭, টী. ২।

২৭৪. শতপথ ব্রা. ২।৩।১।৩১। কাণ্ব শাখার পাঠে আছে 'দক্ষ'।

২৭৫. ১।৪।১২।

অর্জনের জন্যই ঈশ্বর বৈশ্যদের সৃষ্টি করেন, কারণ সম্পদই হলো যজ্ঞ করার উপায়। একইভাবে 'মহাভারতে' দেখানো হয়েছে যে যুধিষ্ঠির বলছেন : দরিদ্ররা যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করতে পারেন না, কেন না তার জন্যে বহু উপকরণের নানা সম্ভার প্রয়োজন। তিনি আরও বলেছেন যে যজ্ঞের পুণ্য অর্জন করতে পারেন শুধু রাজা ও রাজপুত্রেরা, নির্ধন ও নিঃসহায়রা নন।[২৭৬] এর মানে দাঁড়ায় যে, যজ্ঞ উপলক্ষ্যে দান করার ক্ষমতা শূদ্রদের ছিল না, তাঁরা তাই যজ্ঞ করতে পারতেন না। ধনী শূদ্রের সঙ্গে যজ্ঞের যোগাযোগ অবাঞ্ছিত ভাবা হতো না, কারণ বিধান দেওয়া হয়েছে যে তাঁর বাড়ি থেকে আগুন নেওয়া চলে।[২৭৭]

বলা হয়েছে যে "আদিবাসী প্রজাদের মূর্তিপূজার প্রথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিশ্বাসের শুদ্ধতাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে, এরকম একটা ভয় থেকেই" ব্রাহ্মণদের প্রথম মনে হয় যে "মুক্ত আর্য ও দাস-শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তোলা প্রয়োজন।"[২৭৮] মনে হয় এ ব্যাখ্যা অতি সরল। স্পষ্টতই এর ভিত্তিতে রয়েছে এই ধারণা যে শূদ্র বলতে শুধু বিজিত মানবগোষ্ঠীই বোঝায়। সে কথা ভুল। তাছাড়াও 'ঋগ্বেদ', 'অথর্ববেদ' ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের গোড়ার দিককার বহু সূত্রে শূদ্রদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রাচীর তুলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসের শুদ্ধতা রক্ষার কোন ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না। যেসব বিজিত আদিবাসীকে শূদ্রদের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল সম্ভবত যজ্ঞে তাঁদের কোন স্থান ছিল না, কারণ তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতি ছিল আলাদা। কিন্তু ঘটনার এই জাতীয় বিকাশের কারণরূপে শুধু এটিকেই ধরা যায় না। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পৃথক্করণের ফলে শূদ্রদের বর্জন করা হয়, ইতোমধ্যেই আমরা তা নির্দেশ করেছি।

২৭৬. ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং পিতামহ। বহূপকরণা যজ্ঞা নানা সংভারবিস্তরাঃ॥ পার্থিবৈর্রাজপুত্রৈর্বা শক্যাঃ প্রাপ্তুং পিতামহ। নার্থন্যূনৈরবগুণৈরেকাত্মভির্সংহতৈঃ॥ মহাভারত : কুম্ভকোণম, ১৩।১৬৪।২-৩; মহাভারত : কলকাতা, ১২।১০৭।২-৩। মনে হয় এই অংশটি বেশ পরবর্তী সময়ের রচনা, কিন্তু বৈদিক যুগের উত্তরকালের অবস্থার প্রতিফলন রূপে এটিকে নেওয়া যেতে পারে।

২৭৭. যো ব্রাহ্মণো রাজন্যো বৈশ্যশূদ্রো বাইসুর ইব বহুপুষ্টস্ স্যাৎ তস্য গৃহাদাহৃত্যা-দধ্যাৎ পুষ্টিকামস্য। আপস্তম্ব শ্রৌ. সূ. (গার্বে সং), ৫।১৪।১। 'বহুপুষ্টঃ' বিশেষণটি অবশ্য ব্রাহ্মণ রাজন্য ও বৈশ্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু শূদ্রের ক্ষেত্রে তার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। শূদ্রকে অগ্নি-বর্জিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৭৮. এগলিং, সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট, খণ্ড ১২, ভূমিকা, পৃ [১০]। দূষণকে জাতি-গঠনে উল্লেখযোগ্য উপাদান বলে কিছু সমাজতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতিবিদ্ মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল আর্থ-সামাজিক বিকাশের পরিণতি, তার কারণ নয়।

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে যা বেরিয়ে আসে তাতে মনে হয় শূদ্রদের অবস্থা সর্বদাই একই রকম ছিল না। আর্থিক দিক দিয়ে, তাঁদের গবাদি পশু ছিল এবং সম্ভবত স্বাধীন কৃষকরূপেই তাঁরা কাজ করতেন— এমন উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে কোন রচনায় শূদ্রকে দেখা যায় গৃহভৃত্য, কৃষি-শ্রমিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে দাসরূপে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে, শূদ্র 'রত্নী'দের কথা শোনা যায়; কিন্তু এমন কথাও আছে যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শূদ্র ও বৈশ্যকে ঘিরে ফেলেছেন। সামাজিক দিক দিয়ে, এমন ভাবা ঠিক নয় যে শূদ্রদের উপর খাদ্য ও বিবাহ সংক্রান্ত নিষেধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[২৭৯] চণ্ডাল পরিবারে জন্মের জন্য ঘৃণা এবং শূদ্রদের উপর আরোপিত কিছু দোষের নিদর্শন অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তার অধিকাংশই দেখা যায় বেদোত্তর কালে। ধর্মীয় দিক দিয়ে, শূদ্রদের বিশেষ কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের অনুমতি ছিল। কিন্তু তাহলেও, কয়েকটি আচারের ক্ষেত্রে তথা সাধারণভাবে বৈদিক যজ্ঞে তাঁদের স্থান ছিল না। অন্য কথায়, কীথ ঠিকই বলেছেন যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণে শূদ্রদের অবস্থা দ্ব্যর্থ-ব্যঞ্জক।[২৮০]

পরবর্তী বৈদিক যুগে শূদ্রের অবস্থা সম্পর্কিত এই বিরোধ হয়তো আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় উল্লেখ-সূত্রগুলোর কালানুক্রম দিয়ে। সাধারণত, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত এইসব আচার-অনুষ্ঠানে শূদ্রকে প্রবেশাধিকার না দেওয়ার ব্যাপারটা পাওয়া যায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একমাত্র পরবর্তী কালের রচনায়। কিন্তু অধিকার ও বাধানিষেধের সহাবস্থানও দেখা যায়। ক্ষয়িষ্ণু জনগোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বর্ণবৈষম্যের অস্তিত্ব দিয়ে তার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। এমনকি শূদ্রকে যখন দাসবর্গে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখনও, আর্য জনগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে তাঁরা রক্ষা করেছিলেন বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কিছু কিছু জনগোষ্ঠীয় অধিকার।[২৮১]

এই যুগে শূদ্রদের অবস্থার একটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো রথকার, তক্ষা প্রমুখ ঐ বর্ণের হস্তশিল্পী সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা। সম্ভবত দারু- ও ধাতু-শিল্পী হিসেবে তাঁদের মহার্ঘতার জন্যই এই ব্যবস্থা। তাঁদের ছাড়া আর্যদের বিস্তার ও বিকাশ হতে পারত না। আগেই দেখানো হয়েছে, 'তক্ষা' ছিলেন সম্ভবত ধাতুশিল্পী। বৈদিক সমাজে তাঁর উচ্চ পদমর্যাদা ও প্রাচীন কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে তাঁর সম্মানজনক স্থানের মধ্যে সঙ্গতি আছে। সেখানে তিনি এমনকি রাজার মন্ত্রণাদাতাও হতেন।

বস্তুগত সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে একটা নিবিড়

২৭৯. 'ইণ্ডিয়ান কালচার', খণ্ড ১২, পৃ ১৮৩।

২৮০. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', খণ্ড ১, পৃ ১২৯।

২৮১. আর জি ফোর্বেস, 'মেটালার্জি ইন অ্যান্টিকুাইটি', পৃ ৭৯।

সম্পর্কও আমরা লক্ষ করি। চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র প্রত্নতত্ত্ব থেকে যে-ধরনের বস্তুগত জীবনের কথা পাওয়া যায় তাতে সামাজিক পৃথক্‌করণের সম্ভাবনার আভাস থাকলেও সামাজিক উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন সংকোচনেরও ইঙ্গিত রয়েছে। শিল্প ও কৃষিতে লোহা ব্যবহারের খুব অল্প নিদর্শনই পাওয়া যায়। মনে হয়, তার কারণ উচ্চতর গাঙ্গেয় অববাহিকায় লোহার যোগান সীমিত ছিল এবং অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়ায় লোহার যন্ত্রপাতি দৃঢ় করার প্রযুক্তিও জানা ছিল না। পরবর্তী বৈদিক সমাজ বোধহয় ছিল এক ছোট মাপের মুদ্রাব্যবস্থাহীন কৃষক-সমাজ। প্রভূত পরিমাণে তার পরিপূরণ হতো গবাদি পশুপালন দিয়ে। উচ্চতর-গাঙ্গেয় অববাহিকায় জঙ্গল পরিষ্কার করার অসুবিধার দরুন বড় বড় চাষের জমি হয়তো ছিল না। সুতরাং অর্থনীতিতে সাধারণত কৃষিকর্মের জন্য দাস বা ভাড়া-করা শ্রমিক প্রয়োজন হতো না, প্রতিটি পরিবার নিজেদের চাষের জমি নিজেরাই তত্ত্বাবধান করতেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, হস্তশিল্পী ও পশুপালকের প্রয়োজন অবশ্যই ছিল, কিন্তু পুরোহিত ও রাজাদের সঙ্গে তাঁদের স্বজন-সম্পর্কের বন্ধন তখনও বজায় ছিল বলেই মনে হয়। সাহিত্যিক নিদর্শন থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে জনগোষ্ঠীয় উপাদান তখনও বেশ প্রবলই ছিল। একটি দাসবর্গ তখন তৈরি হতে শুরু করেছে, কিন্তু শ্রেণী হিসেবে এর দানা বেঁধে ওঠার শর্তগুলো কেবল বেদোত্তর কালেই দেখা দেয়। পরবর্তী বৈদিক কালে কাঠের তৈরি লাঙলের ফাল দিয়ে যে চাষ-আবাদ হতো তাতে কেবল পুরোহিত ও যোদ্ধাদের প্রতিপালনের মতো প্রান্তিক উদ্‌বৃত্তই উৎপন্ন হতে পারত। লোহার অস্ত্র ব্যবহারের ফলে যোদ্ধারা অবশ্য লাভবান হতেন।[২৮২]

'বৈদিক সূচি'-তে একটা তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে (কয়েকজন লেখক তা মেনেও নিয়েছেন)[২৮৩] যে, গোড়ায় শূদ্ররা ছিলেন ভূমিদাস, তাঁদের জীবনে কোন নিরাপত্তা ছিল না; তারপর ক্রমে ক্রমে পুরনো বাধানিষেধ সরিয়ে নেওয়া হতে থাকে। এটি মানা সম্ভব নয়। যেসব আর্যদের শূদ্রে পরিণত করা হয় তাঁদের ক্ষেত্রে এই মত অপ্রযোজ্য; গোড়ার দিকের যুদ্ধে অবশ্য অনার্যদের বিনাশ করার নীতিই নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই সময়ে বিজিতদের উপর বাধানিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার কোন নিদর্শনই নেই। প্রক্রিয়াটি বরং তার ঠিক বিপরীত ছিল বলেই মনে হয়। পূর্ববর্তী বহু সূত্রে গোষ্ঠীজীবনে শূদ্রদের যোগদানের ইঙ্গিত রয়েছে, পরবর্তী সূত্রে রয়েছে বর্জনের। এর ফলেই বৈদিক যুগের শেষদিকে প্রাচীন গোষ্ঠীজীবনের অধিকারের চেয়ে

২৮২. এই বিষয়ের জন্য রামশরণ শর্মা, "ক্লাস ফরমেশন অ্যান্ড ইট্‌স মেটিরিয়াল বেসিস ইন দি আপার গ্যাঙ্গেটিক বেসিন (১০০০-৫০০ বি. সি.)", 'দি ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রিভিউ', খণ্ড ২, পৃ ১-১৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২৮৩. 'বৈদিক ইনডেক্স', খণ্ড ২, পৃ ৩৯০ঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, 'অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অফ কাস্ট', পৃ ১০১-৫; বলবলকর, 'হিন্দু সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন স', পৃ ২৮৮।

প্রবল হয়ে উঠল বিভিন্ন বাধানিষেধ। সেগুলো এতই দৃশ্যমান ও সম্ভবত এতই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে উপনিষদে জেগে উঠল তার প্রতিবাদ। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদে'[২৮৪] বলা হয়েছে যে, এমনকি চণ্ডাল ও পৌল্কসরাও আত্মার জগতে অচণ্ডাল অপৌল্কস হয়ে যান, সেখানে সব ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। 'ছান্দোগ্য উপনিষদে'[২৮৫] বলা আছে, এমনকি চণ্ডালও অগ্নিহোত্র যজ্ঞের উচ্ছিষ্টের অধিকারী; অগ্নিহোত্র ঘিরে ক্ষুধিত শিশুরা বসে থাকে, যেমন তারা ঘিরে বসে থাকে মা-কে। নিম্নবর্গের সপক্ষে এই ধরনের প্রতিবাদের কতটা জনগোষ্ঠীয় সাম্যের প্রাচীন ধারণা থেকে পাওয়া তা আমরা জানি না, কিন্তু এই সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেদোত্তর কালের সংস্কার আন্দোলনগুলোয় এই প্রবণতাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর এর বিপরীত প্রবণতা—শূদ্র বর্ণের উপর আরও বেশি করে বাধানিষেধ আরোপ করাই যার লক্ষ্য—অব্যাহত রাখলেন গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র-সঙ্কলকরা।

২৮৪. ৪।৩।২২। ২৮৫. ৫।২৪।৪।

# চতুর্থ অধ্যায়

## দাসভাব ও বাধানিষেধ

( আনু. খৃপূ ৬০০-৩০০ )

বেদোত্তর কালে শূদ্রদের অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য যেসব ব্রাহ্মণ্য তথ্যসূত্র রয়েছে তার মধ্যে পড়ে মূলত ধর্মসূত্র ( আইন গ্রন্থ ) ও গৃহ্যসূত্র ( গার্হস্থ্য আচার সংক্রান্ত গ্রন্থ ) এবং পাণিনির ব্যাকরণ। গোড়ার দিককার বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলোকে এর পরিপূরক হিসেবে নেওয়া যায়। এইসব তথ্যসূত্রের পূর্বাপর অবস্থান খুব নির্দিষ্টভাবে স্থির করা যায় না। এ বিষয়ে কাণে-র পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় মূল ধর্মসূত্রগুলোকে মোটামুটিভাবে খৃপূ ৬০০-৩০০-র মধ্যে ফেলা হয়েছে।[১] সূত্রগুলোয় যে ব্যাকরণগত স্বাধীনতা দেখা যায়, পাণিনির পূর্ণ প্রভাবের উত্তরপর্বে তা আদৌ ভাবা যায় না।[২] তাঁর ব্যাকরণ খৃপূ পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত বলে ধরা হয়।[৩] শূদ্রদের সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্যই পাওয়া যায় গৌতমের ধর্মসূত্রে। মনে করা হয় এটিই প্রাচীনতম ধর্মসূত্র।[৪] কিন্তু এতে বলা হয়েছে, যবনরা শূদ্রা ও ক্ষত্রিয়ের সন্তান।[৫] পরবর্তী অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের মতো এতেও রয়েছে বৈশ্য এবং শূদ্রের যৌথ উল্লেখের আরও উদাহরণ,[৬] সমগ্র ভারতের জন্য একই আইন প্রবর্তনের প্রয়াস,[৭] গো-হত্যার জন্য শাস্তির বিধান,[৮] এবং প্রায় কুড়িটি সংকর বর্ণের তালিকা প্রণয়ন[৯]—এইসব বৈশিষ্ট্য থেকেই দেখা যায় যে পরবর্তীকালে এর বিষয়বস্তুর প্রভূত সংস্কার হয়েছিল।[১০] সুতরাং সমাজ বিষয়ে এর সমস্ত বিধিই প্রাগ্-মৌর্য যুগের অবস্থার প্রতিফলন না-ও হতে পারে।

১. 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ২য়, ১ম ভাগ, পৃ [১১]। মেইয়ার ( 'আল্টইণ্ডিশে রেখ্ট্-শ্রিফ্টেন', পৃ [৭] ) 'বৌধায়ন' ও 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্র'কে প্রাগ্-বৌদ্ধ মনে করেন, এবং 'বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র'কে খৃপূ চতুর্থ শতকে ধার্য করেন। তুলনীয়ঃ হপকিন্স, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২৪৯।

২. কীথ, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ১১৩।

৩. আগরওয়ালা, 'ইণ্ডিয়া অ্যাজ নোন টু পাণিনি', পৃ ৪৭৫।

৪. বূ্হ্লার, 'সেক্রেড বুকস অফ দি ইস্ট', ২, পৃ [৪৫]; কাণে, 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ১ম, পৃ ১৩।

৫. গৌতম ধ. সূ. ৪।২১। হপকিন্স মনে করেন, বাক্ট্রীয় ও অন্যান্য এশীয় গ্রীকদের প্রসঙ্গে যবনের কথা বলা হয়েছে। 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২৪০ টী ১।

৬. গৌতম ধ. সূ. ৫।৪১-৫২, ৪৫।

৭. বূহ্লার, পূর্বোক্ত, পৃ [৪৯]।

৮. গৌতম ধ. সূ. ২২।১৮।

৯. ঐ, ৪।১৬-২১।

১০. তুলনীয় ঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি', ৩, ৬, পৃ ৭-১১।

যে-আর্যাবর্তের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্রগুলো প্রযোজ্য, তার মধ্যে পড়ে পাঞ্জাব থেকে বিহার এবং হিমালয় থেকে মালবের পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চল।[১১] সূত্রকার বৌধায়ন অবশ্য ছিলেন দক্ষিণের লোক, কিন্তু আপস্তম্ব সম্বন্ধে সে-কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তিনি উত্তরবাসী ('উদীচ্য')-দের একটি অদ্ভুত শ্রাদ্ধরীতির উল্লেখ করেছেন।[১২] বশিষ্ঠ শাখার উদ্ভব সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে।[১৩]

প্রধান গৃহ্যসূত্রগুলোও খৃঃপূঃ ৬০০-৩০০-র মধ্যে রচিত বলে ধরা যায়।[১৪] প্রাচীন ভারতবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনের 'সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ' বলে এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৫]

বৌদ্ধ তথ্যসূত্রগুলোর মধ্যে চারটি 'সুত্ত' (সংলাপ) সংগ্রহ, অর্থাৎ 'দীঘ', 'মজ্‌ঝিম', 'সংযুত্ত' ও 'অঙ্গুত্তর'[১৬] এবং এর সঙ্গে 'বিনয়পিটক'-কে[১৭] মোটামুটিভাবে প্রাগ্‌-মৌর্য যুগের সংকলন বলা যায়, যদিও 'বিনয়'-এর অনেকটাই ধরা হয় মৌর্য যুগের রচনা বলে। 'জাতক'-এর সময় স্থির করা আরও শক্ত।[১৮] "গাথা"গুলোই এর মূল ধর্মীয় রচনা, অতএব প্রাচীনতম। অতীতের কাহিনীগুলো হলো গদ্যে রচিত ভাষ্য। এগুলো প্রাগ্‌-মৌর্য যুগের রচনা হিসেবে ধরা হয়েছে। তাহলেও বর্তমান কাহিনীগুলোতে, মনে হয়, কখনও কখনও মৌর্য যুগের অবস্থারও প্রতিফলন ঘটে এবং এগুলো স্পষ্টতই পরবর্তী সংযোজন।[১৯] কৌতূহলজনক এই যে, প্রাচীনকালের কাহিনী-গুলোর পটভূমি হলো ভারতের পশ্চিম অথবা মধ্য অংশ, কিন্তু অধিকাংশ বর্তমান কাহিনীর পটভূমিই হলো সাবত্থি [শ্রাবস্তী] বা রাজগহ [রাজগৃহ]।[২০] তাছাড়াও সাধারণভাবে ধরা যেতে পারে যে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের কাহিনীগুলো বর্তমান রূপ পেয়েছে পরে, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ সরল কাহিনীই তার আগেকার।[২১]

১১. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃঃ ২৪২।
১২. বৌধায়ন ধ. সূ. ২।৭।১৭।১৭ ; তুলনীয়ঃ কাণে, পূর্বোক্ত, ১ম, পৃঃ ৪৪।
১৩. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃঃ ২৪৯-৫০।
১৪. কাণে, পূর্বোক্ত, ২য়, ১ম ভাগ, পৃঃ [১১]।
১৫. ভিন্‌টারনিৎস, 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান লিটরেচর', ১ম, পৃঃ ২৭৪।
১৬. লাহা, 'হিস্ট্রি অফ পালি লিটরেচর', ১ম, পৃঃ ৩০-৩৩। ১৭. ঐ, পৃঃ ১৫।
১৮. 'জাতকে'র প্রাচীন কাল প্রসঙ্গে টি. ডব্লু রিস ডেভিডস, 'বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২০৭ দ্র.।
১৯. তুলনীয়ঃ লাহা, পূর্বোক্ত, ১ম, পৃঃ ৩০; হপকিন্স, পূর্বোক্ত, ১ম, পৃঃ ২৬০, টী. ১। এই প্রশ্নের সাম্প্রতিকতম আলোচনা পাওয়া যাবে আই. ফিশের, 'আর্কিভ ওরিয়েন্টালনি', ২২, পৃঃ ২৩৮-৩৯-এ।
২০. 'আর্কিভ ওরিয়েন্টালনি', ২২, পৃঃ ২৩৮-৩৯।
২১. ঐ, পৃঃ ২৪৯ ; রিস ডেভিডস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৮।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে, জাতককাহিনী এমন এক সামাজিক অবস্থা উপস্থিত করে যা বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল—সম্ভবত সাতবাহন যুগের।[২২] কিন্তু রুপো ও তামার ছাঁচ-মুদ্রা ও প্রচুর লোহার জিনিস (যেগুলো উত্তরের কালো পালিশ-করা মৃৎভাণ্ড পর্বের—আনু. খৃপূ ৬০০-২৫০—বলে ধরা হয়) থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, নগর জীবনের নিশ্চিত সূচনা হয়েছিল,[২৩] সূত্রপাত হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের।[২৪] তাছাড়া শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে কৌটিল্যের বিধি-বিধান যদি মৌর্যযুগ সম্বন্ধে সত্য হয়, তবে ধরে নিতে হয় যে তার পূর্ববর্তী যুগেও ঐ সব অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। 'জাতকে' আবার দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় কোন উল্লেখই নেই। সেখানে রোমানদের সঙ্গে সাতবাহন রাজাদের সক্রিয় আদান-প্রদান চলত। সাতবাহন যুগে আমরা যে এতরকম বৃত্তিগোষ্ঠী ('গিল্ড') ও কর্মনিযুক্তির কথা পাই, 'জাতকে' তার উল্লেখমাত্র নেই।[২৫] উপরন্তু, খৃপূ দ্বিতীয় শতকে সাঁচি ও ভারহুতে দেওয়াল-চিত্র ও ভাস্কর্যে যেহেতু বুদ্ধের জন্মসংক্রান্ত কাহিনীগুলো দেখানো হয়েছে, তাই ধরে নেওয়া যায় যে সেগুলো অন্তত আরও দুশ বছর আগেকার, বিশেষত যে-দেশে প্রাচীন ধর্মীয় পরম্পরা শিল্পকর্মের মৌল উপাদান জুগিয়ে এসেছে মধ্যযুগ অবধি। তাই, যদিও ধরা যায় যে মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার দু-তিন শতাব্দী আগে অবস্থা যা ছিল "গাথা" ও অতীত কাহিনীগুলোয় তারই প্রতিফলন ঘটেছে, 'জাতকে'র যে-যে অংশে চণ্ডালদের কথা আছে আমাদের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সেগুলোকে পরবর্তী সংযোজন বলেই গণ্য করা যেতে পারে। কারণ, 'জাতকে' এই যে-সব ঘৃণিত লোকের কথা রয়েছে প্রাগ্‌-মৌর্য যুগের ব্রাহ্মণ্য রচনা দিয়ে তা পুরোপুরি সমর্থিত হয় না। এও লক্ষ করা যায়, মনু যে সংকরবর্ণের এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, জাতকে তার অনুরূপ কিছু নেই। জৈন তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে কালানুক্রম আরও বেশি অনিশ্চিত। বৌদ্ধ রচনাবলির মতো সেগুলো অত সুসম্পাদিত ও পর্যালোচিত হয়নি। ধরা যায় যে খৃপূ চতুর্থ শতকের শেষে বা তৃতীয় শতকের শুরুতে এই

২২. দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী, 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দ স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি', পৃ ২৫৯-৬০। তুলনীয়. ড্যানিয়েল এইচ. এইচ. ইঙ্গলস্, 'জার্নাল অফ আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি', ৭৭, পৃ ২২৩-২৪।

২৩. হস্তিনাপুর ও মথুরার কাছাকাছি উৎখননের ফলে নগরজীবনের যে আদিম সূচনা দেখা যাবে তাকে খৃপূ ৬০০-রও পেছনে টেনে নেওয়া যেতে পারে।

২৪. এই বিষয়ের পর্যালোচনা আরও বেশি করা দরকার; উ. কৃ. পা. পর্বের প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের সঙ্গে আদি পালি রচনার তুলনা করলে শুধু যে এই সাহিত্য-সূত্রগুলোর কালনির্ণয় আরও নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে তা-ই নয়, প্রাগ্‌-মৌর্য-কালের বস্তুগত জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও উপলব্ধিও সমৃদ্ধ হবে।

২৫. ষষ্ঠ অধ্যায় দ্র।

ধর্মীয় রচনাবলি প্রথম সঙ্কলন করা হয়।[২৬] কিন্তু এতে আছে মহাবীরের জীবনকথা, তাই প্রাগ্-মৌর্য যুগের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার করা চলে। সময়ের বিচারে এই রচনাবলি সেই যুগ থেকে খুব দূরের নয়।

এইসব সাহিত্যিক তথ্যসূত্রের প্রামাণিকতা নিয়ে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক রচনা বা প্রত্নলেখ না থাকলে এগুলো ব্যাখ্যা করা কঠিন। ব্রাহ্মণ্য রচনা পরিবর্জন করে তার পরিবর্তে বৌদ্ধ রচনা গ্রহণের একটা প্রবণতা আছে।[২৭] বলা হয় যে, ধর্মশাস্ত্রে বর্ণগুলোকে নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলার যে-চেষ্টা করা হয়েছে তা কৃত্রিম ও অনুমানপ্রসূত।[২৮] এর বিরুদ্ধে বলা হয় যে একাধিক ধর্মশাস্ত্রে যা আছে তার নিশ্চয়ই কিছু বাস্তব ভিত্তি থাকবে।[২৯] বলা হয়, মধ্যযুগের ইওরোপের স্কল্যাস্টিক [ সন্ত টমাস-পন্থী ] লেখকদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা হতো, আধুনিক বিদ্বানরা তা খণ্ডন করেছেন।[৩০] ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য কোন সূত্রের উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করা অবশ্য ঠিক হবে না। সব ধরনের রচনা মিলিয়ে পড়ে, একমাত্র তার ভিত্তিতেই প্রাগ্-মৌর্য যুগের সামাজিক অবস্থার যথাযথ চিত্র পাওয়া যেতে পারে।[৩১] দুর্ভাগ্যক্রমে 'কেম্ব্রিজ ভারত ইতিহাস' ('কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া'),[৩২] প্রথম খণ্ড বা 'সাম্রাজ্য-একতার যুগ' ('দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল

২৬. ইয়াকবি, 'সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট', ২২, ভূমিকা, পৃ [৪৩]। 'দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি', পৃ ৪২৩। শারপঁতিয়েরর ('উত্তরাধ্যয়নসূত্র', ভূমিকা, পৃ ৩২ ও ৪৮) এই ধর্মগ্রন্থগুলোকে খৃপূ ৩০০ ও খৃস্টীয় যুগের সূচনার মাঝামাঝি ফেলেছেন।

২৭. টি. ডব্লু. রিস ডেভিডস, 'ডায়ালগ্‌স্ অফ দ বুদ্ধ', ১ম, পৃ ২৮৬।

২৮. সেনার্ট, 'কাস্ট ইন ইণ্ডিয়া', পৃ ১০১। লেখকের টীকা, পৃ [১০]; 'সেন্সাস রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়া', ১৯০১, পৃ ৫৪৬-এ লেখকের উক্তি—বেন্‌স্, 'এথ্‌নোগ্রাফি', পৃ ১১-র উদ্‌ধৃত।

২৯. কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'অ্যাসপেক্টস্ অফ দ সোশ্যাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ মনু', পৃ ৫৬: তুলনীয়: হপকিন্স, পূর্বোক্ত, ১ম, পৃ ২৯৩-৯৪।

৩০. কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'ইণ্ডিয়ান কামেরালিজম' পৃ ৪৮।

৩১. এ যাবৎ এই সূত্রগুলো শুধু খণ্ডিতভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। ইওলি র 'হিন্দু ল অ্যাণ্ড কাস্টম' ও ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ে কাণে-র বিশ্বকোষ-তুল্য রচনায় ধর্মসূত্রগুলোর বিষয়বস্তু নিয়ে কালানুক্রমিক আলোচনা করা হয়নি। পালি সূত্রাদির উপর নির্ভর করে ফিক, রিস ডেভিডস, আর. মেহতা, অতীন্দ্রনাথ বসুর চমৎকার বইগুলোও এই দোষে দোষী। জে. সি. জৈনের 'লাইফ অ্যাজ ডেপিক্‌টেড ইন দ জৈন ক্যাননস'-এ স্থান কাল নির্বিশেষে সব উপাদান জড়ো করা হয়েছে। কতক ক্ষেত্রে কালানুক্রমিক আলোচনা সত্ত্বেও ভারতীয় জাতি-প্রথা বিষয়ক রচনায় অ-ব্রাহ্মণ্য সূত্রাবলিকে প্রায় গণাই করা হয়নি।

৩২. আদি বৌদ্ধ রচনা ও ধর্মসূত্র থেকে সামাজিক অবস্থা বিষয়ে যা জানা যায়, পৃথক্ অধ্যায়ে ( অষ্টম-নবম ) তার আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিটি' )—কোনোটিতেই এ জিনিস মেলে না। খৃপূ ৬০০—৩০০ খৃস্টাব্দ এই কালপর্ব প্রসঙ্গে সাহিত্যিক তথ্যসূত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় উপাদান সেখানে একত্র করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রকে বিবেচনার যোগ্য বলে ধরা হয়নি।[৩৩]

যেসব তথ্য সর্ববাদিসম্মত, সেগুলো মানতে কোন অসুবিধাই নেই। কিন্তু যেখানে সব মত মেলে না, সেখানে ধর্মসূত্রে লিখিত নিয়মাবলির চেয়ে বৌদ্ধ ও জৈন উপাদানসমূহেই বাস্তব অবস্থার অনেক বেশি প্রতিফলন ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কোন সূত্রেই অবশ্য শূদ্র ও সমাজের অন্যান্য নিমজ্জিত অংশের দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করা হয়নি। ধর্মসূত্রে যেখানে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, বৌদ্ধ এবং জৈন তথ্যসূত্রে সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যের উপর। নিম্নবর্গের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমবেদনাও দেখানো হয়েছে কদাচিৎ। উপরন্তু, ধর্মসূত্র এবং বৌদ্ধ ও জৈন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য যথাক্রমে উত্তর ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যেই সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ।

শূদ্রদের সম্পর্কে সরাসরি কিছু তথ্য আছে ধর্মসূত্রে, আদি পালি রচনায় অল্প, জৈন রচনায় আরও কম। সম্ভবত এ ধরনের তথ্যের অপ্রতুলতার জন্যই ফিক যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আদি পালি রচনায় শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা ছাড়া আর এমন কিছুই নেই যা থেকে দেখা যায় চতুর্থ বর্ণের, শূদ্রদের, অস্তিত্ব ছিল।[৩৪] সঠিকভাবেই এই মত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন ওল্ডেনবার্গ।[৩৫] ব্যক্তির পরিচয় ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হতো তাঁর বর্ণনাম দিয়ে—তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন এক ধনুর্ধরের পরিচয় প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, না শূদ্র।[৩৬] বুদ্ধ তাঁর উপদেশনায় একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আশা করা হয়, জ্ঞানী লোক জানবেন তাঁর প্রেমাস্পদা ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, না শূদ্র বর্ণের।[৩৭] টি. ডবলু. রিস ডেভিডস ব্রাহ্মণ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পুরোপুরিই বর্জন করতে চান। এমনকি তিনিও দেখিয়েছেন যে বৌদ্ধ রচনাদির চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা জীবনের প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে মেলে।[৩৮] এইসব থেকে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বৌদ্ধ রচনায় একটি সামাজিক শ্রেণী হিসেবে শূদ্রেরা থাকলেও, ব্রাহ্মণ্য বিধি-বিধানের মতো তাঁদের অবস্থান ও কার্যকলাপ তত সুনির্দিষ্ট নয়।

৩৩. অধ্যায় ২১।

৩৪. 'সোস্যাল অর্গানাইজেশন অফ নর্থ-ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া', পৃ ৩১৪ ; দত্ত, 'অরিজিন অ্যাণ্ড দ গ্রোথ অফ কাস্ট', পৃ ২৬৮-৬৯।

৩৫. 'ৎসাইটশ্রিফট্ ডোর ডয়েট্শেন মোর্গেনলাণ্ডিশেন গেসেলশাফ্ট', ৫১, পৃ ২৮৬।

৩৬. মজ্ঝিম নিকায়, ১ম, পৃ ৪২৯।

৩৭. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ১৯৩ ; মজ্ঝিম নিকায়, ২য়, পৃ ৩৩ ও ৪০।

৩৮. 'বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৫৪।

উত্তরের কালো পালিশ-করা মৃৎভাণ্ডের [উ. কা. পা.] প্রত্নতত্ত্ব থেকে সমাজের যে বস্তুগত প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়, তার উল্লেখ না করলে বুদ্ধের যুগের সামাজিক অসাম্যের প্রকৃতি বোঝাই যাবে না। উ. কা. পা. আমল চলেছিল মোটামুটি খৃপূ ৬০০ থেকে তিন শতাব্দীর বেশি কাল জুড়ে। খৃপূ ৩০০-র আগের পর্বে উ. কা. পা. সংস্কৃতি প্রায় উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বিহারে, অর্থাৎ কোসল ও মগধ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতির খৃপূ ৩০০-উত্তর পর্যায়ের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত এবং মধ্যপ্রদেশের এক বিরাট অংশে। এমনকি দাক্ষিণাত্যেও উ. কা. পা.-র ভাঙা টুকরো পাওয়া যায়। এর একেবারে প্রাথমিক পর্বেই দেখা গেল, চাষের কাজে আরও বেশি করে লোহার ব্যবহার হচ্ছে, পলিমাটি এলাকা ও ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে বড় বড় বসতি স্থাপন হচ্ছে, নগরজীবন এবং তামা ও রুপোর উপর ছাপ-মারা ধাতুমুদ্রার সূচনা হয়েছে। একবার যখন লোহার লাঙলের ফাল দিয়ে দেশের সবচেয়ে উর্বর জমিতে চাষ-আবাদ শুরু হলো,[৩৯] তখনই পশ্চিম উত্তর প্রদেশের প্রায় আত্মভরণসর্বস্ব অর্থনীতি পরিণত হলো মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকার উদ্বৃত্ত-উৎপাদনকারী অর্থনীতিতে। বিস্তৃত ভূখণ্ড সাফ ও চাষ করার জন্য বহু সংখ্যক কৃষক ও শ্রমিকের প্রয়োজন হতো। বীজতলা থেকে তুলে জলে-ডোবা ধানচাষের পদ্ধতিও সম্ভবত এই সময়ই শেখা।[৪০] কৃষক ও শ্রমজীবীরা উদ্বৃত্ত ধান উৎপন্ন করায় শুধু যে নগরসহ ষোড়শ মহাজনপদের উদ্ভব হলো তা-ই নয়, বৃত্তিধারী ধর্মীয়, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক পদাধিকারীদের প্রতিপালনও সম্ভব হলো এর ফলেই। এদের মধ্যে দেখা দিল স্ব-সম্প্রদায়ের স্বার্থ রুদ্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা। উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির ফলে দেখা দিতে পারল পূর্ণবিকশিত শ্রেণী-সমাজ। এই সমাজ থেকে পাওয়া যেত নগদে ও দ্রব্যে আদায় করার মতো কর, উপঢৌকন, বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় শস্যের অংশ এবং উপহার। এগুলো আদায় করতেন শাসকশ্রেণীর ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক বিভাগ। এই প্রথম আমরা দেখি বহুসংখ্যক ভিক্ষু-ভিক্ষুণী দাননির্ভর হয়ে জীবনযাপন করছেন। একইভাবে কুসীদজীবীরা আদায় করতে পারত সুদ, ব্যবসায়ীরা করতে পারত লাভ এবং এইভাবে বাজারের বিনিময়-প্রক্রিয়া সামাজিক স্তরবিন্যাস তীব্রতর করে তুলল। অর্থ ব্যবহারের

৩৯. উ. কা. পা. পর্বের কোন লোহার লাঙল এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, কিন্তু পালি রচনায় 'অয়ো-নাঙ্গল' শব্দটির ব্যবহার আছে।

৪০. রামশরণ শর্মা, "ডেভেলপমেন্ট অফ প্রোডাকটিভ ফোর্সেস অ্যান্ড ইটস্ সোশ্যাল ইমপ্লিকেশনস্ ইন ইণ্ডিয়া ইন দ ফার্স্ট মিলেনিয়াম বি.সি. উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু দি এজ অফ বুদ্ধ"। বার্লিন, জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে নভেম্বর ১৯৭৮-এ অনুষ্ঠিত, উৎপাদন-কৌশলের বিকাশ ও সামাজিক সংস্থানে তাদের পরিণাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত গবেষণাপত্র।

দরুন সম্ভব হলো সম্পদ সঞ্চয়। তার ফলে, যাঁরা সামাজিক উদ্বৃত্ত উৎপাদন করেন এবং যারা তা বণ্টন ও আত্মসাৎ করে তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হলো বিরাট ব্যবধান। ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের প্রচারকরা এমন এক সামাজিক ব্যবস্থাক্রম উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করলেন যাতে বুদ্ধের যুগের অর্থনৈতিক বিস্তারের ফল, কৃষক ও শ্রমজীবীদের বাদ দিয়ে, শুধু পুরোহিত ও যোদ্ধারাই কুক্ষিগত করে রাখতে পারেন। প্রাণীহত্যা না করার উপর জোর দিয়ে এবং দাস ও ঋণগ্রস্তদের জন্য সঙ্ঘের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের প্রচারকরা এই নতুন বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ-বিন্যাসকে সুস্থিত হতে সাহায্য করেন। একই সঙ্গে স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের সঙ্ঘভুক্তির অনুমতি দিয়ে এবং দাস ও শূদ্রদের প্রতি দয়া দেখানোর উপর জোর দিয়ে কঠোরতা লাঘবের চেষ্টাও করা হয়।

বুদ্ধের যুগে যেভাবে ভূমি ও শ্রম আত্মসাৎ করা হতো তার কয়েকটি ধাপ আমরা নির্দেশ করতে পারি। বিদেঘ মাথবের সুবিদিত কাহিনী, উত্তরাঞ্চলে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব এবং উ. কা. পা.-র সঙ্গে চি. ধূ. মৃ এবং কালো প্রলেপযুক্ত মৃৎভাণ্ডের নিকট সাদৃশ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে উত্তর-গাঙ্গেয় অববাহিকার অধিবাসীরাই ছিলেন মধ্য-গাঙ্গেয় অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অগ্রদূত। নতুন বসতিস্থাপনকারীরা হয়তো মধ্য-গাঙ্গেয় অববাহিকার কোন কোন এলাকায় তাম্র-প্রস্তর যুগের কিছু বিচ্ছিন্ন বসতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। নবাগতরা হয়তো দখল করে নিয়েছিলেন আদিবাসিন্দাদের জমি-জায়গা। আগুয়ান বসতিস্থাপনকারীদের অধিপতিরা গ্রামের জমি নিজেরাই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন; বাদ পড়েছিলেন শুধু তাঁরাই যাঁরা তাঁদের স্বকুলভুক্ত নন, এবং যাঁরা স্বকুলেরই সম্পত্তিচ্যুত ও হতদরিদ্র মানুষ। অধিপতিদের অগ্রণী ভূমিকা, উদ্যোগ এবং সংগ্রামী গুণাবলির জন্য তাঁদের স্বজনরা হয়তো সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিখণ্ড বা ভূমির একটা ভালো অংশই তাঁদের উপহার দিতেন। পরবর্তী বৈদিক কালে জনক ও দুর্যোধনের মতো প্রথম সারির রাজারাও[৪১] লাঙলে হাত লাগাবেন বলে ধরে নেওয়া হতো এবং এই যুগের শেষদিক অবধি গোটা কুলকেই ধরা হতো জমির অধিকারী বলে। এমনকি বেদোত্তর কালেও রাজা হলকর্ষণ অনুষ্ঠান করতেন। পালি ভাষায় একে বলা হয় 'বপ্প-মঙ্গল'।[৪২] থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ রাজারা এখনও এই অনুষ্ঠান পালন করেন। কিন্তু স্পষ্টতই এই পর্বে কিছু কিছু রাজন্য, পুরোহিত ও সেট্‌ঠি/গহপতি [ শ্রেষ্ঠী/গৃহপতি ] ভূ-খণ্ড অধিকার করতে শুরু করেন। অবশ্য নৃতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অভিক্ষেপের মাধ্যমেই শুধু এই আত্মসাৎ-প্রক্রিয়া অনুমান করা যায়।

এমনকি বেদোত্তর কালের ভূমি-স্বত্ব সম্বন্ধেও আমাদের কোন স্পষ্ট

৪১. মহাভারত, ৩।২৪১।২৯-৩০।

৪২. জাতক, ১ম, পৃ ৫৭, 'পালি-ইংলিশ ডিকশনারি'-তে উদ্ধৃত।

ধারণা নেই। স্মৃতি-গ্রন্থগুলোয় সম্পত্তি বিভাগের কথা আছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে কখনোই জমির কথা বলা হয়নি। গৌতম দৃঢ়ভাবেই বলেছেন যে, জীবিকা রূপে যা কিছু গণ্য ('যোগক্ষেম') তা কখনও বিভাজ্য নয়।[৪৩] জমি অবশ্যই এর মধ্যে পড়ে। গৌতমের শাখার কিছু প্রভাব উত্তরকালেও ছিল। কয়েকটি স্মৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সগোত্র ব্রাহ্মণদের অধিকৃত জমি ও জল সহস্র পুরুষ অবধি অবিভাজ্য।[৪৪] প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই নিয়ম হয়তো প্রাচীন সমাজে সাধারণভাবে প্রযোজ্য কোন নিয়মের অবশেষ মাত্র। প্রাগ্-মৌর্য যুগে জমির সাধারণ স্বত্বের ধারণার উপর জৈমিনিও জোর দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'মীমাংসা-সূত্রে' বলেছেন যে ধরিত্রী সকলেরই, আর তাই এটি দানসামগ্রী হতে পারে না।[৪৫] ব্যবহারিক প্রয়োজনে হয়তো প্রধান কুলগুলোর মধ্যে কিছুকাল অন্তর ভূমি-বণ্টন করা হতো, কারণ হয় তাঁদের কুলের আয়তন বাড়ত, নয়তো তাঁরা বিভক্ত হয়ে যেতেন উপ-কুলে। সম্ভবত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরিবারগুলোর ক্ষেত্রেই এরকম হতো, কারণ পালি রচনায় একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার দেখা যায়: ভূমিস্বত্বসম্পন্ন কোন শূদ্রের কথা সেখানে নেই। পক্ষান্তরে, ক্ষত্রিয়দের রাজস্ব ভোগ এবং ব্রাহ্মণ সেট্‌ঠি ও গহপতিদের ভূমি ও গ্রামের অধিকারী হওয়ার কথা শোনা যায়। কর্তা বা কুলপতি হিসেবে তাঁরা যেসব পরিবারের তত্ত্বাবধান করতেন, তাদের হয়েই তাঁরা সম্ভবত জমির অধিকারী হতেন। ধর্মসূত্রের ব্যবহার-বিধি থেকে অনুমান করা যায়, কুলপতি-শাসিত পরিবারে তিন-চার পুরুষের লোক থাকতেন, অর্থাৎ পরিবার ছিল খুবই বড়। এই ধরনের পরিবারে ব্যক্তিগত বা নিজস্ব সম্পত্তির ধারণা খুব একটা বদ্ধমূল হয় না। ভাগীদাররা যেমন যৌথভাবে ভূ-সম্পত্তি ও গ্রামের সাধারণ সম্পদ নির্বিশেষে ভোগ-দখল করতেন, তেমনি তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন এইসব সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম-শক্তির নির্বিশেষ অধিকারী। প্রতি গ্রামের শ্রমজীবী বা দাসবর্গীয় লোকদের বলা হতো শূদ্র। তাঁদের উপর উচ্চতর তিন বর্ণের থাকত এক সাধারণ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এইভাবে স্পষ্টই এমন এক সমাজের সূচনা দেখা যায় যার ভিত্তি হলো শূদ্র-শ্রম।

শূদ্রেরাই যে ছিলেন সেবক শ্রেণী, সে-কথা পরবর্তী বৈদিক যুগের রচনায় নিহিত আছে মাত্র। কিন্তু এই যুগের ধর্মসূত্রে সুস্পষ্টভাবে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে শূদ্রদের কর্তব্য হলো উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা এবং এইভাবেই আশ্রিতদের ভরণ-পোষণ করা।[৪৬] আশা করা হতো, কৃষি ও কারুকর্মের সাহায্যে তিনি নিজের সংসার চালাবেন। গৌতম আমাদের জানাচ্ছেন যে শিল্পবৃত্তির সাহায্যে শূদ্র জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।[৪৭]

৪৩. ২৮।৪৬। ৪৪. ধর্মকোশ, ১ম, ১২৩১। ৪৫. ৬।৭।৩।

৪৬. আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।১।১-৭; গৌতম ধ. সূ. ১০।৫৪-৫৭।

৪৭. শিল্পবৃত্তিশ্চ। ১০।৬০।

মনে হয়, শূদ্র সম্প্রদায়ের একাংশ তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, চিত্রকর ইত্যাদির কাজ করতেন। পালি রচনায় এইসব শিল্পের উল্লেখ থাকলেও[৪৮] শিল্পীদের বর্ণের কোন উল্লেখ নেই। গহপতি[৪৯] (সাধারণত ভূ-সম্পত্তিবান্ সংসারের কর্তা, মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার বৈশ্যের অনুরূপ)-র বর্ণনায় এক জায়গায় বলা হয়েছে যে তিনি কারুকর্ম ও শিল্পের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করেন।[৫০] ঐশ্বর্যশালী লোকেরাই যদি গহপতি হন তাহলে এমনও হতে পারে যে কিছু অবস্থাপন্ন শূদ্র হস্তশিল্পীও গহপতি ছিলেন। যেমন কামার চুন্দ, যিনি গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর শ্রমণদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন;[৫১] কিংবা চোখে-পড়ার মতো ধনী কুমোর সদ্দালপুত্ত, যাঁর পাঁচশ হাঁড়িকুড়ির দোকান ছিল, বহু কুমোর যাঁর অধীনে কাজ করতেন।[৫২] সহস্র কর্মকারের গ্রাম-প্রধানের ক্ষেত্রেও একথা সত্য হতে পারে। ইনি এঁর কন্যার সঙ্গে বোধিসত্ত্বের বিবাহ দিয়েছিলেন।[৫৩] ঐ ধরনের হস্তশিল্পীদের ক্ষেত্রে গহপতি শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও, এমনও হতে পারে যে সম্পত্তির দৌলতেই তাঁদের কেউ কেউ ঐ পর্যায়ে উঠেছিলেন।

কারুশিল্প ও শিল্পীদের ইতিহাসে এখন যাওয়া যাবে না। এটি এক পৃথক্ আলোচনার বিষয় হতে পারে। কয়েকটি মুখ্য বিষয় কিন্তু লক্ষ করা যায়। শূদ্রবর্ণভুক্ত হস্তশিল্পীরা প্রাগ্-মৌর্যদের কৃষি-অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ধাতুশিল্পীরা যে শুধু ছুতোর ও কামারদের জন্যে কুড়ুল, হাতুড়ি, করাত, বাটালি ইত্যাদি তৈরি করতেন তা-ই নয়,[৫৪] কৃষকদের জন্যে তাঁরা জোগাতেন লাঙলের ফাল, কোদাল ও এইরকম নানান যন্ত্রপাতি।[৫৫] এর ফলেই কৃষকরা নাগরিকদের জন্যে উদ্বৃত্ত খাদ্যের জোগান দিতে পারতেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে এই আমলেই প্রথম নগরজীবন[৫৬] ও প্রসার্যমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা দিতে থাকে। হস্তশিল্পীরা যথেষ্ট পরিমাণে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন না করলে এটা সম্ভব হতো না। প্রধান প্রধান নগরে ছিল কারুশিল্পের সংগঠিত বৃত্তিগোষ্ঠী ('গিল্ড')। বৃত্তিগোষ্ঠীর প্রধানদের সঙ্গে রাজার এক বিশেষ ধরনের সম্পর্ক থাকত। রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত কিছু হস্তশিল্পী ছিলেন রাজার অনুগ্রহভাজন।[৫৭] পাণিনির ব্যাকরণের

৪৮. মেহতা, 'প্রি-বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ১৯৪-২০৪।

৪৯. জৈন রচনায় 'গাভাবৈ' নামে পরিচিত।

৫০. সিপ্পাধিট্ঠানা। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য়, পৃ ৩৬৩।

৫১. দীঘ নিকায়, ২য়, পৃ ১২৬।

৫২. উবাসগে-দসাও, পৃ ১৮৪।

৫৩. জাতক, ৩য়, পৃ ২৮১।

৫৪. ঐ, ৫ম, পৃ ৪৫।

৫৫. মেহতা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৮ ৯৯।

৫৬. সাবত্থি [শ্রাবস্তী]-র মতো বড় নগর ছিল কুড়িটা। তার মধ্যে ছ-টি বুদ্ধের পরিনির্বাণের স্থান হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। (দীঘ, ২য়, পৃ ১৪৭)।

৫৭. শ্রীমতী রিস ডেভিডস, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২০৬।

'বৃত্তি' (ব্যাখ্যাগ্রন্থ)-মতে এঁদের বলা হতো 'রাজ-শিল্পী'। এঁদের মধ্যে 'রাজ-নাপিত' এবং 'রাজ-কুলাল' (রাজার কুমোর)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৮] পরবর্তীকালের একটি জাতক-কাহিনীতেও এর সমর্থন মেলে। সেখানে 'রাজ-কুম্ভকার' ও 'রাজ-মালাকারে'র কথা আছে।[৫৯] সেট্‌ঠি ও গহপতিদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন কিছু কারুশিল্পী। জনৈক সেট্‌ঠির ছিল নিজস্ব 'তুন্নকার' (দর্জি), যিনি তাঁরই অধীনে তাঁরই সংসারের জন্যে কাজ করতেন।[৬০] গহপতিদের তাঁতিরও উল্লেখ আছে। তাঁরা এঁদের সুতো যোগান দিতেন।[৬১] কিন্তু অধিকাংশ কারুশিল্পীই সম্ভবত ঐ জাতীয় কোন প্রভুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। স্বাধীন হস্তশিল্পীর দৃষ্টান্তরূপে আমরা উল্লেখ করতে পারি ছুতোর[৬২] এবং কামারদের[৬৩] গ্রামের, বা নগরবাসী কারু-শিল্পীদের।[৬৪] সম্ভবত, গ্রাম-প্রধানদের পৃষ্ঠপোষণের মাধ্যমে, কারুশিল্পী-দের গ্রামগুলোর উপর রাজা এক ধরনের শিথিল নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। যেমন, সহস্র কর্মকারদের গ্রাম-প্রধান 'জেট্‌ঠক'-কে বলা হয়েছে 'রাজার প্রিয়' ('রাজ-বল্লভো')।[৬৫] কারুশিল্পীদের যেসব বিচ্ছিন্ন পরিবার গ্রামে বাস করতেন এবং কৃষকদের চাহিদা মেটাতেন, তাঁদের উপর এরকম কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। পাণিনি এঁদের 'গ্রামশিল্পী' বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৬] সম্ভবত গ্রামেই কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতি এবং নাপিত থাকতেন, কিন্তু 'যজমানী' প্রথা-মতো তাঁরা তাঁদের গ্রাহকদের সঙ্গে বাঁধা থাকতেন না। পাণিনির মতে, ছুতোর ছিলেন দু-ধরনের। 'গ্রামতক্ষ' দৈনিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, গ্রামে তাঁর গ্রাহকদের বাড়িতে কাজ করতেন; আর 'কৌটতক্ষ' কাজ করতেন তাঁর নিজের বাড়িতে।[৬৭] ইনি ছিলেন "স্বতন্ত্র কর্মজীবী, কারও নিয়োগাধীন ('প্রতিবন্ধ') নন।"[৬৮] একটি 'জাতক'-গাথায় জনৈক ভ্রাম্যমাণ কর্মকারের উল্লেখ আছে; যেখানেই ডাকা হতো সেখানেই তিনি তাঁর চুল্লি নিয়ে যেতেন।[৬৯] হস্তশিল্পী-দের নিজস্ব যন্ত্রপাতি থাকত এবং কতকক্ষেত্রে তাঁরা উপকরণও পেতেন অবাধে। এইভাবে আমরা এক ব্রাহ্মণ সূত্রধরের কথা পাই যিনি জীবিকার্জন করতেন কাঠ দিয়ে শকট বানিয়ে।[৭০] কুম্ভকারদের ক্ষেত্রেও হয়তো এইরকমই হতো, মাটি ও জ্বালানি তাঁরা পেতেন বিনামূল্যেই। তন্তুবায় ও ধাতুশিল্পী-

৫৮. পাণিনির বৃত্তি, ৬।২।৬৩।
৫৯ জাতক, ৫ম, পৃ ২৯০ ও ২৯২।
৬০ ঐ, ৬ষ্ঠ, পৃ ৩৮।

৬১. গহপতিকস্‌স তন্তুবায়েহি। জাতক, ৩য়, পৃ ২৫৮-৫৯। স্পষ্টতই এ ধরনের গহপতি ব্যবসার পণ্য-উৎপাদনের জন্যই বোধহয় তাদের নিয়োগ করতেন।

৬২. জাতক, ৪র্থ, পৃ ১৫৯।
৬৩. ঐ, পৃ ২৮১।
৬৪. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২০৮।
৬৫. জাতক, ৩য়, পৃ ২৮১।
৬৬. ৬।২।৬২।
৬৭ পাণিনি, ৫।৪।৯৫।
৬৮. ঐ, ৫।৪।৯৫ টীকা।
৬৯. জাতক, ৬ষ্ঠ, পৃ ১৮৯।
৭০ ঐ, ৪র্থ, পৃ ২০৭

দের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন হতো না। যাই হোক, সাধারণভাবে হস্তশিল্পীরা যাঁদের হয়ে কাজ করতেন, তাঁরা প্রভু নন[৭১], নেহাতই গ্রাহক। গ্রীস ও রোমে কিন্তু হস্তশিল্পে দাসদের নিয়োগ করা হতো। রাষ্ট্র সাধারণভাবে হস্তশিল্পীদের উপর এক ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রমের বোঝা চাপিয়ে দিত। এ-ই ছিল রাষ্ট্র-প্রযুক্ত একমাত্র নিয়ন্ত্রণ। নিয়ম বাঁধা ছিল যে করের বদলে মাসে একদিন তাঁদের রাজার জন্য কাজ করে দিতে হবে।[৭২] এছাড়া ধর্মসূত্রের বিধিবিধান থেকে মনে হয়: যেসব শূদ্র কাজ করতেন কারু ও শিল্পী হিসেবে তাঁরা ছিলেন স্বাধীন; কারণ, তাঁরা যদি কাজ করে নিজেদের ভরণ-পোষণে অসমর্থ হন তবেই তাঁদের এইসব বৃত্তিতে যেতে বলা হয়েছে।[৭৩] কাজ অর্থে গৃহস্থালি- বা কৃষি-কর্ম।

প্রাগ্‌-মৌর্য যুগে হস্তশিল্পীদের কীভাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো তা খুব স্পষ্ট নয়। মনে হয়, কিছু কিছু হস্তশিল্পী বড় বড় পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজ-নাপিত, 'রাজ-কুলাল' (রাজার কুমোর) এবং বড় বড় বণিকদের সঙ্গে যুক্ত আরও কিছু কারুশিল্পী সম্বন্ধে একথা বলা যায়। কর্মকার, সূত্রধর প্রমুখ অন্যান্য হস্তশিল্পী নগরের উপকণ্ঠে তাঁদের নিজ নিজ গ্রামে বাস করতেন। স্পষ্টত, উপনগরবর্তী গ্রামের হস্তশিল্পীরা নিজেদের কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য উৎপাদন করতেন। সেগুলো তাঁরা নিয়ে যেতেন নগরের বাজারে, যাতে গ্রাম-নগর দু-জায়গার লোকেরই কাজে লাগে। সদ্দাল-পুত্তের অধীনে বহু কুমোর সমেত পাঁচশ কুমোর-শালা ছিল—অবশ্যই গ্রাম- ও নগর-বাসীদের পাত্র যোগানোর উদ্দেশ্যে। জনসাধারণকে নিশ্চয়ই শোভন উ. কা. পা. মৃৎভাণ্ডের জন্য, এবং সম্ভবত অন্যান্য বহু নিকৃষ্ট ধরনের মাটির জিনিস—যেমন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন লাল মৃৎভাণ্ডের—জন্যও দাম দিতে হতো। এক গ্রাম-ব্যবসায়ীর কথা পাওয়া যায় যিনি কোন নগর-বণিকের কাছে পাঁচশ লাঙল গচ্ছিত রেখেছেন।[৭৪] এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে এসব লাঙল কৃষকদেরই ব্যবহারের জন্য। কৌশাম্বীতে উ. কা. পা. পর্বের পরবর্তী একাধিক স্তরে, কুড়ুল, বাটালি, ছুরি, ক্ষুর, পেরেক, কাস্তে ইত্যাদি ২৫০টি লোহার করণী আবিষ্কার হয়েছে।[৭৫] এর অনেকগুলোকেই

৭১. গৃহজাত দাসের কারুকর্মের উল্লেখ আছে 'দীঘ নিকায়', ১ম, পৃ ৫১-র। কিন্তু তা গার্হস্থ্য সেবারও ইঙ্গিত হতে পারে। আরেকটি সূত্রে বলা হয়েছে, জনৈক ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ে দাস ও ভৃত্য নিয়োগ করেছিলেন (জাতক, ৪র্থ, পৃ ১৬)।

৭২. শিল্পিনো মাসি মস্যেকৈকং কর্ম কুর্যুঃ। গৌতম ধ সূ ১০।৩১; বশিষ্ঠ ধ সূ. ১৯।২৮।

৭৩. গৌতম ধ. সূ. ১০।৫৩ ৫৫; তুলনীয়: ঘোষাল, 'ইণ্ডিয়ান কালচার', ১৪, পৃ ২৬।

৭৪. জাতক, ২য়, পৃ ১৮১।

৭৫. জি. আর. শর্মা, 'দি এক্‌স্‌ক্যাভেশনস অ্যাট কৌশম্বী', ১৯৫৭-৫৯, পৃ ৪৫-৪৬।

প্রাক্‌-খৃস্টপূর্ব ৩০০ কালপর্বে ফেলা যায়। সম্ভবত কৃষকদের ব্যবহারের জন্যই এগুলো তৈরি। তাঁরা এগুলো কিনতেন নগদে বা দ্রব্যের বিনিময়ে। কৃষকদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে তৃতীয় এক ধরনের হস্তশিল্পী গ্রামেই বাস করতেন। তাঁদের গ্রাহকরা হয়তো জিনিস দিয়ে দামই মেটাতেন। কিন্তু যজমানীপ্রথা কতটুকু চালু ছিল তা পরিষ্কার নয়। এ ব্যাপারে সাহিত্য-নির্ভর তথ্যসূত্র খুব একটা কাজ আসে না। সম্ভবত, বসতি স্থাপনের ধাঁচ ও গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার প্রকৃতির উপর আলোকপাত করবে গ্রামীণ প্রত্নতত্ত্বের অগ্রগতি। ইতোমধ্যে আমরা হয়তো এমন প্রস্তাব করতে পারি যে বুদ্ধের যুগে, গ্রামীণ বসতিপুঞ্জের মাঝখানে থাকত নগর বা হস্তশিল্পীদের গ্রাম। তাঁরাই কৃষকদের কারুকর্মগত প্রয়োজন মেটাতেন। তার দাম দেওয়া হতো দুভাবে—নগদে ও দ্রব্যে। করের পরিবর্তে হস্তশিল্পীদের রাজার কাজ করে দিতে হতো। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁদের জীবিকা-অর্জনের অন্যনিরপেক্ষ উৎস ছিল, কিন্তু কর দেওয়ার মতো উপার্জন তাঁদের ছিল না।

বৃহত্তর শূদ্র জনসাধারণ, মনে হয়, কৃষিকর্মেই নিযুক্ত ছিলেন। ধর্মসূত্রে কৃষিকর্ম বৈশ্যদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে।[৭৬] এঁরা ছিলেন স্বাধীন ভূ-সম্পত্তিবান্‌ কৃষক, উৎপন্নের একটা অংশ তাঁরা কর বাবদে দিতেন রাষ্ট্রকে।[৭৭] মনে হয় মুখ্যত কৃষক হিসেবে এবং গৌণত ব্যবসায়ী হিসেবে, বৈশ্যরাই ছিলেন বেদোত্তর কালের প্রধান করদাতা। শূদ্রদের যে কোন ভূমি-রাজস্ব দিতে হতো না, এর থেকেই দেখা যায় যে তাঁরা ছিলেন ভূমিহীন শ্রমজীবী। আপস্তম্ব বলেছেন, শূদ্ররা পা ধুইয়ে দিয়ে জীবনযাপন করেন, তাঁদের কর দিতে হয় না।[৭৮] এর নিহিতার্থ হলো: অসেবক শূদ্ররা করদাতা হতে পারতেন। কিন্তু এই ধর্মসূত্রের একটি প্রাচীনতর পুঁথিতে 'পাদাবনেক্তা' পদটি নেই।[৭৯] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শূদ্রদের কর-মুক্তিকে ন্যায়-সঙ্গত করার জন্য শব্দটি পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাধারণভাবে ভূমি রূপে কোন করযোগ্য সম্পত্তি শূদ্রদের ছিল না, আর তাই তাঁদের অধিকাংশকেই কাজ করতে হতো অন্যদের জমিতে। 'মজ্‌ঝিম নিকায়ে'র একটি অংশ থেকে এটা খুবই পরিষ্কার হয়ে যায়। সেখানে চার বর্ণের আয়ের একটি শ্রেণীবিভাগ করা আছে: ব্রাহ্মণের জীবিকা দান, ক্ষত্রিয়ের ধনুর্বাণ চালনা, বৈশ্যের কৃষি ও গবাদি পশুপালন, আর শূদ্রের হলো কাস্তের ব্যবহার ও কাঁধে ঝোলানো দণ্ডে ফসল বওয়া।[৮০]

৭৬. গৌতম ধ. সূ. ১০।৪৭; তুলনীয়: আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১১।২৮, হরদত্তের টীকা সমেত।

৭৭. বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১।৪২।

৭৮. শূদ্রাশ্চ পাদাবনেক্তা। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১০।২৬।১৫।

৭৯. বুহ্‌লার-এর শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী 'জি' পুঁথি।

৮০. সুদ্দস্স সন্ধনম্‌...অসিতব্যাভঙ্গিম্‌। মজ্‌ঝিম নিকায়, ২য়, পৃ ১৮০।

দাসত্বের লক্ষণ প্রথম দেখা দেয় বৈদিককালে; বেদোত্তর পর্বে এর রূপান্তর ঘটে নানাভাবে। বৈদিক দাসত্ব মূলত নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা নিযুক্ত হতেন গৃহকর্মে। বুদ্ধের যুগে পুরুষরাও এর মধ্যে পড়তেন, কারণ 'দাসকম্মকরপোরিস' পদটি বহুব্যবহৃত। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, এইসব দাস উৎপাদন-কর্মেও নিযুক্ত হতেন। সম্ভবত তাঁদের সংখ্যাও গিয়েছিল বেড়ে, আর এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো নতুন উৎপাদন-ব্যবস্থা। তার ভিত্তি ছিল লৌহপ্রযুক্তি-মূলক কৃষি, কারুশিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতি, নগরের সংখ্যাবৃদ্ধি ও ছাপ-মারা রুপো ও তামার মুদ্রা ব্যবহার। প্রথম বৃহৎ আঞ্চলিক রাষ্ট্র মগধ এবং ঐ ধরনের সব রাজ্য যে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যেত, তার ফলেও হয়তো দাসদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে থাকতে পারে। খৃপূ পঞ্চম শতক থেকে মুদ্রার ব্যবহার অর্থসঞ্চয়ের শর্তাদি সৃষ্টি করল এবং তার ফলে সমাজের কোন কোন অংশ হয়ে পড়ল দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত। সুদের হার সংক্রান্ত ব্যবস্থা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ধর্মসূত্রে। সেখানে শূদ্রদের জন্য সবচেয়ে চড়া হারের বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনকি বৌদ্ধধর্মেও কোন রেহাই দেওয়া হয়নি, কারণ সেখানেও ঋণগ্রস্তদের জন্য সঙ্ঘের দরজা বন্ধ এবং তাঁদের ঋণ শোধ করার ব্যাপারে সঙ্ঘ অটল। বৌদ্ধ রচনায় দেখা যায়, ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণীরা দাসে পরিণত হতেন। অর্থের লেন-দেন শুধু যে ঋণ-দাস সৃষ্টি করল তা-ই নয়, দাস কেনা-বেচারও সহায়ক হলো—বিশেষত এই পর্বে উত্তর ভারতে গড়ে-ওঠা নগরগুলোয়। সুতরাং উৎপাদনের কাজে দাসরা দেখা দিতে শুরু করেন এমন এক পর্বে ও পরিস্থিতিতে যখন দেখা যাচ্ছিল অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ, ধাতুমুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার এবং ভারতে কিছুটা পরিমাণে বাজার-অর্থনীতি।

আদি পালি রচনায় বহু জায়গায় ঠিক শূদ্রের উল্লেখ নেই, কিন্তু দাস ও কম্মকর (ভাড়া-করা শ্রমিক)-দের চাষ-আবাদের কাজে লাগানোর কথা আছে। ভূমিহীন শূদ্রদেরই যে কম্মকর রূপে নিয়োগ করা হতো তাতে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। দাসদের অধিকাংশই যে শূদ্রবর্ণজাত ছিলেন তারও নিদর্শন দেখা যায়। 'সুদ্দো বা সুদ্দ-দাসো বা' শব্দগুচ্ছ থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথম তিন বর্ণের তালিকার পর শূদ্রদের অবস্থান নির্দেশ করার জন্য বুদ্ধ এই কথা বলেছেন।[৮১] 'সুদ্দ-দাসো বা' পদের অর্থ 'শ্রমজীবীর দাস' করলে ভুল হবে।[৮২] পরিষ্কারভাবেই, এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি সমাবস্থান-সূচক কর্মধারয়ের উদাহরণ, এর অর্থ: যিনি শূদ্র তিনিই দাস। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং সেট্‌ঠি (অন্যত্র দেখানো হয়েছে যে তাঁদের দাস ছিল) বাদ দিয়ে শূদ্রকেই এখানে বেছে নেওয়া হবে দাসের অধিকারী রূপে—এমন ভাবা অসম্ভব। সুতরাং ওল্ডেনবার্গ ঠিকই অনুমান করেছেন, এই উক্তিতে শূদ্র ও

৮১. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ১০৪।

৮২. টি. ডব্লু. রিস ডেভিডস, 'সেক্রেড বুকস অফ দ বুদ্ধিস্টস', ২য়, পৃ ১২৮।

দাসের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি।[৮৩] এও তাৎপর্যপূর্ণ যে শূদ্রের সঙ্গে দাসদের অভিন্ন করার বিষয়টি সর্বপ্রথম পাওয়া যাচ্ছে একটি আদি পালি রচনায়, ধর্মসূত্রে নয়। ধর্মসূত্র থেকে কেবল পরোক্ষেই এমন অনুমান করা যায়। মৌর্যোত্তর যুগে এসে তবেই মনু এই অবস্থা ঘোষণা করলেন স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায়।

দাসত্ব শুধু শূদ্রবর্ণের লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। এমন কি 'গাম ভোজক' (গ্রামের মোড়ল),[৮৪] মন্ত্রী,[৮৫] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও উচ্চ-কুলজাত ব্যক্তি-কেও দাসে পরিণত করা যেত।[৮৬] কিন্তু তাঁদের অধীনতার প্রকৃতি হতো ভিন্ন। যাই হোক, ঐ ধরনের লোকের সংখ্যা হতো নগণ্য, অধিকাংশ দাস-শ্রমিকই আসতেন শূদ্রবর্ণ থেকে।[৮৭] ঋণ, ক্রয়, নিজ ইচ্ছা এবং ভীতিজাত[৮৮] দাসত্ব উচ্চ বর্ণের লোকের চেয়ে বরং নিম্নবর্গের মানুষের কাছেই প্রত্যাশিত। যেমন, ইসিদাসী নামে এক শকট-চালকের কন্যাকে দাসী হিসেবে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন জনৈক বণিক, কারণ তাঁর পিতা ধার শোধ দিতে পারেননি।[৮৯] কিন্তু 'জাতক'-এর কাহিনীতে কোথাও যুদ্ধে ধৃত দাসের উল্লেখ নেই। এই যুগে যে দাসের সংখ্যা সীমিত ছিল, এটা তারই ইঙ্গিত।[৯০]

কিছু দাস, বিশেষত স্ত্রীলোকদের, লাগানো হতো গৃহকর্মে।[৯১] ছোট-ছোট জোতেও দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক কাজ করতেন,[৯২] যদিও প্রায়শই তাঁদের কাজ ছিল বৃহত্তর ভূমিখণ্ডে। গোড়ার দিকের পালি রচনায়, মগধের বড় বড় খামারের অন্তত দুটি দৃষ্টান্ত আছে; প্রত্যেকটির আয়তন হাজার 'করীস' (চাইল্ডার্স-এর মতে ৮০০০ একর) করে।[৯৩] আর কাশীর একটি ক্ষেতের

৮৩. 'ৎসাইটশ্রিফ্‌ট্‌ ড্যের ডয়েটশেন মোর্গেন্‌লান্ডিশেন গেসেলশাফ্‌ট্‌', ৫১, পৃ ২৮৬। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত লিখেছেন যে বৌদ্ধ রচনায় দাসদের কোথাও শূদ্র বলে অভিহিত করা হয়নি। পূর্বোক্ত, পৃ ২৭২)। এই ক্ষেত্রে স্পষ্টই তার বিপরীত ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

৮৪. জাতক, ১ম, পৃ ২০০। ৮৫. ঐ, ৬ষ্ঠ, পৃ ৩৮৯।

৮৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, "স্লেভারি ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া", 'ক্যালকাটা রিভিউ' (১৯৩০), ৮ম সংখ্যা, পৃ ২৫৭।

৮৭. বসু, 'সোশ্যাল অ্যান্ড রুর‍্যাল ইকনমি অফ নর্থ ইন্ডিয়া', ২য়, পৃ ৪২৩।

৮৮. জাতক ৬ষ্ঠ, পৃ ২৮৫ (গাথা); বিনয় পিটক, ৪র্থ, ২২৪।

৮৯. দ্র. ইসিদাসী থেরী, 'পালি ডিকশনারি অফ প্রপার নেমস্‌', ১ম, পৃ ৩২৩।

৯০. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০৮।

৯১. দাসী ভারঃ, পাণিনি ৬।১।৪২; সূয়গডম্‌ ১।১।৪।৮; জাতক, ৩য়, পৃ ৫৯, ৯৮-৯৯।

৯২. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া', ১ম, পৃ ২০৭; বিনয় পিটক, ১ম, পৃ ২৪০; তুলনীয়: সূয়গডম্‌ ২।১।১৩, এখানে বড় ও ছোট ক্ষেতের উল্লেখ আছে। শাক্য ও কোলীয়রা দাস ও কর্মকরদের নিয়োগ করতেন তাঁদের ক্ষেতে জল সেচের কাজে (জাতক, ৫ম, পৃ ৪১৩)।

৯৩. জাতক, ৩য়, পৃ ২৯৩; ৪র্থ, পৃ ২৭৬।

কথা আছে যা পাঁচশ লাঙল দিয়ে চাষ হতো।[৯৪] এ সবই ছিল ব্রাহ্মণদের। পাঁচশ বা হাজার হয়তো প্রথাগত সংখ্যা, কিন্তু এতে যোত্র (জোতজমি)-সংবদ্ধতার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মৌর্য যুগে কৃষিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা তুঙ্গে পৌঁছয়। বৃহত্তর যোত্রে নিশ্চয়ই যথেষ্ট সংখ্যক দাস ও কর্মকর ছাড়া কাজ করা যেত না।

নিয়োগকর্তাদের তুলনায় দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিকের সংখ্যা কী ছিল সে সম্পর্কে আমাদের প্রায় কোন ধারণাই নেই। এমনকি যেখানে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় সেই আট্টিকা-র ক্ষেত্রেও, স্বাধীন এবং দাস লোকসংখ্যার অনুপাত সম্পর্কে মতৈক্যে উপনীত হওয়া খুবই কঠিন।[৯৫] খুব সম্ভব মগধের যুদ্ধবিগ্রহ—বিশেষ করে অঙ্গ এবং অবন্তীর মতো তুলনামূলকভাবে অ-ব্রাহ্মণ্য এলাকার বিরুদ্ধে—দাসদের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য এ-বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সংবাদ পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে। একটি 'সুত্তে' বলা হয়েছে, দাস-দাসী গ্রহণে বিরত থাকে এমন লোকের সংখ্যা অল্পই।[৯৬] ব্রাহ্মণ্য তত্ত্ব অনুযায়ী শূদ্রদের কাজই হলো উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা। ব্রাহ্মণ[৯৭], ক্ষত্রিয়[৯৮] এবং সেট্‌ঠি ও গহপতিরা[৯৯] যে দাস ও শ্রমিক নিয়োগ করতেন তাতে মোটামুটিভাবে এই তত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মসূত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা দাসের সঙ্গে দাস বিনিময় করতে পারতেন কিন্তু বেচতে পারতেন না।[১০০] এসব থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে দাস-ব্যবস্থা যথেষ্ট মাত্রায়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আট্টিকা-র অবস্থার সঙ্গে কোনভাবেই এর তুলনা করা যায় না। সেখানে খৃঃপূঃ পঞ্চম শতকে দাসের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।[১০১]

শূদ্রবর্ণের লোকের জীবন ধারণের অবস্থা সম্বন্ধে ধর্মসূত্রে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। গৌতম বিধান দিয়েছেন, শূদ্র ভৃত্যরা উচ্চতর বর্ণের লোকের পরিত্যক্ত জুতো, ছাতা, কাপড়, মাদুর ইত্যাদি ব্যবহার করবে।[১০২] 'জাতকে'র একটি কাহিনীতেও একই চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, ইঁদুরে-কাটা পোশাক দাস ও কর্মকরদের ব্যবহারের জন্য।[১০৩] গৌতম আরও বলেছেন যে শূদ্রভৃত্যরা খাবে উচ্ছিষ্ট।[১০৪] 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে' শিষ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাত্রের ভুক্তাবশেষ কোন অদীক্ষিত আর্যের কাছে বা তাঁর গুরুর শূদ্র দাসের কাছে রেখে আসতে।[১০৫] এর থেকে স্পষ্টই বোঝা

৯৪. সুত্তনিপাত, ১।৪।
৯৫. ভেস্টারমান, 'দ স্লেভ সিস্টেম্‌স্‌ অফ গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান অ্যান্টিক্যুইটি', পৃঃ ৮-৯।
৯৬. সুত্তনিপাত, ৫।৪৭২। ৯৭. জাতক, ৪র্থ, পৃঃ ১৫; মজ্‌ঝিম নিকায়, ২য়, পৃঃ ১৮৬।
৯৮. জাতক, ৫ম, পৃঃ ৪১৩। ৯৯. বিনয় পিটক ১ম, পৃঃ ২৪৩, ২৭২; ২য়, পৃঃ ১৫৪।
১০০. আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।৭।২০।১৫; বশিষ্ঠ ধ. সূ. ২।৩৯; গৌতম ধ. সূ. ৭।১৬।
১০১. ভেস্টারমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯। ১০২. জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসঃ কূর্চানি। ১০।৫৮।
১০৩. জাতক, ১ম, পৃঃ ৩৭২ (প্রত্যুৎপন্ন বস্তু-অংশ)। ১০৪. ১০।৫৯।
১০৫. অন্তর্ধানে বা শূদ্রায়। আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।১।৩।৪০, 'উজ্জ্বলা'-টীকা সমেত।

যায়, ভুক্তাবশেষ খাবেন শূদ্রভৃত্য। 'হিরণ্যকেশী গৃহসূত্রে'ও এর সমর্থন মেলে। সেখানে বলা হচ্ছে, পাঠশেষে তিনদিনব্যাপী ব্রতপালনের সময়ে, কোন ছাত্র তাঁর ভুক্তাবশেষ শূদ্রকে দেবেন না।[১০৬] গৃহভৃত্যদের যে ভুক্তাবশেষ দেওয়া হতো, সম্ভবত তার জন্যই একটি বিশেষ শব্দের উল্লেখ করেছেন পাণিনি।[১০৭] 'বিনয় পিটকে'র একটি অংশ থেকে আমরা জানতে পারি, জনৈক বণিকের অসুস্থ স্ত্রী তাঁর বমি-করা ঘি জমিয়ে রেখেছিলেন, যাতে দাস ও কম্মকরদের পায়ে মাখার বা প্রদীপ জ্বালানোর জন্য তা ব্যবহার করা যায়।[১০৮] পাঁচশ লোক বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুগমন করেছিলেন, তাঁদের ভুক্তাবশেষ খাওয়ার আশায়—এমন ঘটনাও লিপিবদ্ধ আছে।[১০৯] এইসব থেকে দেখা যায়, শূদ্র ভৃত্য যে তাঁর প্রভুর ভুক্তাবশেষ খাবেন সেটা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না।

আপস্তম্ব এক মহতী বাণীতে বলেছেন: কোন লোক নিজেকে ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে কষ্টে রাখতে পারেন, কিন্তু কখনোই তাঁর দাস-কর্মকরকে (ভাড়া-করা শ্রমিক, যিনি তাঁর কাজ করে দেন) ঐভাবে রাখবেন না।[১১০] কিন্তু এই সদুক্তিটি গুরুত্ব-সহকারে নেওয়া হতো বলে বিশ্বাস হয় না। অবশ্য এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে সম্পন্নতর পরিবারে দাসদের খাওয়া ভালো ছিল, ব্যবহারও ছিল সদয়। দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিকদের হয়তো অভুক্ত রাখা হতো না, কিন্তু সাধারণত যে-খাদ্য তাঁদের দেওয়া হতো তা অবশ্যই তাঁদের প্রভুদের চেয়ে নিকৃষ্ট। যেমন এক ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু গর্ব করেছেন যে এমনকি তাঁর দাস ও ভৃত্যরাও ভাত-মাংস খান এবং কাশীতে তৈরি কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার করেন।[১১১] এর থেকে দেখা যাচ্ছে, ঐ জাতীয় লোককে সাধারণত নিকৃষ্ট খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়া হতো। বুদ্ধও একই ধরনের দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, অন্যান্য বাড়িতে যেখানে দাস ও কম্মকরদের ভাত ও কাঁজি খাওয়ানো হয়, সেখানে তাঁর পিতৃগৃহে তাঁরা পান ভাত, মাংস ও দুধ।[১১২] 'দাস-পরিভোগ' এই কটূক্তির পুনরাবৃত্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে দাসরা একটি নির্দিষ্ট ধরনের খাদ্যই পেতেন।[১১৩] যেসব দরিদ্র ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতেন, তাঁদের খাদ্যই ছিল কাঁজি।[১১৪] 'জাতক'-

১০৬. ১।২।৮।১-২। ১০৭. আগরওয়ালা, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৪।

১০৮. বরমেতং সপ্পি দাসানাং বা কম্মকারানাং বা পাদভাঞ্জনং বা পাদীপকরণে বা আসিত্তম্। বিনয় পিটক, ৪র্থ, পৃ ২৭২। ১০৯. বিনয় পিটক, ১ম, পৃ ২২০।

১১০. কামমাত্মানং ভার্যাং পুত্রং বোপরুন্ধ্যান্ন ত্বেব দাসকর্মকরম্। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।৪।৯।১১।

১১১. দাসকম্মকরাপি নো সালিমংসোদনং ভুঞ্জন্তি, কাসিকবট্ঠং নিবাসেন্তি। জাতক, ১ম, পৃ ৩৫৫ (প্রত্যুৎপন্ন বস্তু-অংশ)।

১১২. কণজকং ভোজনং দিয্যতি। অঙ্গুত্তর নিকায় ১ম, পৃ ১৪৫।

১১৩. ঐ, ১ম, পৃ ৪৫১, ৪৫৯। ১১৪. ঐ, ৩য়, পৃ ৪০৬-০৭।

কাহিনীতে এক কুম্ভকারের সাময়িকভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের উল্লেখ আছে। সারাদিন মাটি আর কাদা নিয়ে কাজ করার পর তিনি "কাদা-মাখা গায়ে খড়ের গাদার ওপর বসে খোসা-ছাড়ানো জই-এর গোলা জলে ডুবিয়ে খাচ্ছিলেন।"[১১৫]

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যাঁরা জীবনধারণ করেন তাঁদের জীবন খুব কষ্টের: এই শব্দবন্ধ 'জাতকে' প্রায়ই পাওয়া যায়।[১১৬] একজায়গায় জনৈক শ্রমিক—যিনি বোধিসত্ত্ব স্বয়ং—তাঁর দুরবস্থার জন্য বিলাপ করেছেন এই ভাষায়, "আমি পারিশ্রমিক হিসেবে এক 'মাসক' বা আধ-'মাসক' পাই, আর তাই দিয়ে মা-কে প্রায় কোনমতেই প্রতিপালন করতে পারি না।"[১১৭] বলা হয়েছে, ঘেসেড়ার দৈনিক আয় দুই 'মাসক'। কাটা ঘাস বাজারে বেচে তিনি এ-ই পেতেন।[১১৮] 'মাসক' সম্ভবত এই পর্বের কোনো ছাপ-মারা তামার মুদ্রা। আদি পালি রচনার অর্থকথা অনুযায়ী, প্রচলিত মুদ্রা-মানের ক্রমে এই মুদ্রাটির মান এতই নীচে যে এটিকে প্রায় নগণ্য ভাবা হতো।[১১৯] পরবর্তী-কালের 'মাসক'-এর মান ছিল রুপোর 'পণে'র একের-ষোল ভাগ;[১২০] কিন্তু প্রাগ্-মৌর্য যুগের রুপোর 'পণে'র সঙ্গেও একই অনুপাত ছিল কিনা সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। এই পর্বে, পাঁচ 'মাসক' হলে তবেই তার কিছু মূল্য আছে বলে ধরা হতো।[১২১] কিন্তু কোন বেতনজীবীকে এটুকুও দেওয়া হতো না। এই জন্যই 'গঙ্গমাল জাতক'-কাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না।[১২২] সেখানে রয়েছে যে জনৈক জল-বাহক এবং তাঁর স্ত্রী আধ-'মাসক' করে দিয়ে এক 'মাসক' সঞ্চয় করেছিলেন, আর তা-ই নিয়েই তাঁর দুজনে মিলে নগরের উৎসবে আনন্দ করার কথা ভেবেছিলেন। নীতি-কাহিনীর ক্ষেত্রে যেমন হয়, বোধিসত্ত্ব রাজা উদয় যখন এই জল-বাহককে অপরিমেয় অর্থ দিতে চাইলেন তখনও তিনি তাঁর সামান্য আধ-'মাসক' ছাড়তে রাজি হলেন না। শেষ অবধি তিনি অর্ধেক রাজত্ব লাভ করলেন, কিন্তু বাসনার দোষ উপলব্ধি করে নির্বাণলাভের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। স্পষ্টতই, এই কাহিনীর নীতিশিক্ষা হলো: মাত্র আধ-'মাসক' নিয়েও কেউ

১১৫. ঐ, ৬ষ্ঠ, পৃ ৩৭২।

১১৬. পরেসং ভতিং কত্বা কিচ্ছেন জীবতি। জাতক, ১ম, পৃ ৪৭৫; ২য়, পৃ ১৩৯; ৩য়, পৃ ৩২৫, ৪০৬, ৪৪৪।

১১৭. জাতক, ৩য়, পৃ ৩২৬।

১১৮. নগরদ্বারে বিকিণিত্বা মাসকে গহেত্বা। জাতক, ৩য়, পৃ ১৩০।

১১৯. দ্র. মাসক, 'পালি-ইংলিশ ডিকশনারি'।

১২০. এস. কে. চক্রবর্তী, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়ান নুমিসমাটিক্স', ৫-৬।

১২১. 'দ বুক অফ দ ডিসিপ্লিন', ১ম, পৃ ৭১-৭২। (সেক্রেড বুকস অফ দা বুদ্ধিস্টস, খণ্ড ১০-এ আই. বি. হর্নার-অনূদিত)।

১২২. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪২৮।

সন্তুষ্ট থাকতে পারেন, যদিও সেটুকু ত্যাগ করাও হবে আদর্শস্থানীয়। 'গাথা'য় যেমন আছে : "তৃপ্তি দেয় না অল্প বাসনা, অধিক কেবলই বাড়ায় যাতনা।"[১২৩] ফিক-এর হিসেব অনুযায়ী, জাতক-কাহিনীগুলোয় দিন-মজুরদের বেতন তাঁদের জীবনধারণের পক্ষে আদৌ পর্যাপ্ত ছিল না। মোটের উপর তাঁর কথা ঠিক বলেই মনে হয়। শূদ্রদের যে বিরাট অংশ ভাড়া-করা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য হতে পারে।

দাসবর্গের বিভিন্ন উপবর্গের মধ্যে খুব বেশি প্রভেদ ছিল বলে মনে হয় না। একটি জৈন রচনায় দাস, ভৃত্য ('পেসস') ও ভারবাহী পশুদের একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।[১২৪] পালি রচনাদিতে দাস, 'পেসস' ও 'কম্মকর'দের বহুল উল্লেখ আছে।[১২৫] 'পেসস'রা ছিলেন বার্তাবহ বা ভৃত্য, যাঁদের ছোটখাটো কাজে পাঠানো হতো। আমরা আগেই দেখেছি, দাস ও কম্মকর-দের যে-ধরনের কাজে নিয়োগ করা হতো,[১২৬] অথবা তাঁদের যে-ধরনের খাবার দেওয়া হতো,[১২৭] তার মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না। পরে দেখানো হবে, অপরাধ করলে তাঁদের শাস্তিও হতো একই ধরনের। এমন কিছুই নেই যাতে দেখা যায়, ভাড়া-করা শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থান ছিল গৃহভৃত্যদের নীচে।[১২৮] সম্ভবত দাস ও কম্মকরদের পার্থক্য ছিল প্রভুদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের প্রকৃতিতে। দাসদের ভাবা হতো প্রভুর সম্পত্তি,[১২৯] উত্তরাধিকার সূত্রে এঁদের পাওয়া যেত ও ভোগ করা যেত।[১৩০] কম্মকরদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন হতো না। চূড়ান্ত দাসত্বের অবস্থা নির্দেশ করত একটি চিহ্ন, সম্ভবত কামানো মাথায় একটি শিখা।[১৩১] এক জায়গায় অবশ্য দাসদের সঙ্গে কম্মকরদেরও সেট্‌ঠির সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হয়েছে।[১৩২] এটি হলো ভাড়া-করা শ্রমিকদের দাস-পর্যায়ে অবনমন প্রবণতার ইঙ্গিত। একটি জাতক-কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, দাসরা তাঁদের প্রভুদের বাড়িতেই বাস করতেন, আর কম্মকররা সন্ধ্যায় ফিরে যেতেন নিজের ঘরে।[১৩৩] কিন্তু সাধারণভাবে এই রীতি কতদূর প্রচলিত ছিল তা আমরা জানি না। ভাড়া-করা শ্রমিকদের

১২৩. অপ্পাপি কামা ন অলং, বহূহি পি ন তপ্পতি। জাতক, ৩য়, পৃ ৪৪৬-৫০।

১২৪. সূয়গডম্, ১, ৪।২।১৮।

১২৫. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ১৪১ ; অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য়, পৃ ২০৭-০৮ ; ৩য়, পৃ ৩৭ ; ৪র্থ, পৃ ২৬৬, ৩৯৩।

১২৬. গৌতম ধ সূ. ২০।৪।

১২৭. জাতক, ৩য়, পৃ ৩০০।

১২৮. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২০৩ টী. ৮-এ উদ্ধৃত উল্লেখপঞ্জি এ-মত সমর্থন করে না।

১২৯. সুত্ত নিপাত, ৭৬৯ ; ওবৈয়, শ্লোক ৬ ; উত্তরাধ্যয়ন সূত্র ৩।১৭ ; সূয়গডম্ ২।৭।১।

১৩০. গৌতম ধ.সূ. ২৮।১৩। ১৩১ জাতক, ৬ষ্ঠ, পৃ ১৩৫। ১৩২. ঐ, ৩য়, পৃ ১২৯।

১৩৩. ...অত্তনো বসনট্‌ঠানং গন্ত্বা। জাতক, ৩য়, পৃ ৪৪৫।

জীবন অবশ্য কখনও কখনও দাসদের চেয়েও কঠিন হতো।[১৩৪] দাস বা স্থায়ী গৃহভৃত্যদের জীবিকা-অর্জনের যে-নিশ্চয়তা ছিল, ভাড়া-করা শ্রমিকদের তা ছিল না। গৌতম বিধান দিয়েছেন, যে-শূদ্র নিজেকে কোন আর্যের রক্ষণাধীন করেছেন, কাজকর্মে অক্ষম হয়ে পড়লে সেই আর্য অবশ্যই তাঁকে প্রতিপালন করবেন।[১৩৫] কিন্তু এই প্রবচনের সঙ্গে প্রয়োগের সঙ্গতি থাকত না, কারণ একটি গাথায় বলা আছে : লোকে জীর্ণ ভৃত্যকে হস্তিনীর মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।[১৩৬]

কম্মকর ও ভটক[১৩৭] (বেতনজীবী)-এর মধ্যে, মনে হয়, কিছু পার্থক্য ছিল। 'বিনয় পিটকে' কম্মকরের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : কোন 'ভটক', যিনি 'আহতক'। 'পালি-ইংরিজি অভিধানে'র সংকলয়িতারা 'আহতক' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'প্রহৃত'। এর মানে দাঁড়ায়, কম্মকর হলেন এমন একজন কর্মী যাঁকে প্রহার করা চলে। এই সংজ্ঞা অদ্ভুত শোনায়, এমনকি দাসের ক্ষেত্রেও এরকম কথা বলা নেই। 'আহতক' শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত 'আহত'[১৩৮] শব্দের নয়, 'আহৃত' শব্দের সজাত; যার অর্থ : 'কৃত' বা 'আনীত'।[১৩৯] এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে কম্মকরদের সঙ্গে তাঁদের প্রভুদের যোগ ছিল বিশেষ ধরনের। সম্ভবত, ঋণশোধে অক্ষমতা, অথবা প্রভুর জমিতে বসবাস করার দরুন কম্মকররা তাঁদের প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়তেন। মনে হয় তাঁদের অবস্থা ছিল আধা-দাসের মতো; কখনও কখনও তাঁদের এমনকি সম্পত্তির অংশরূপেও গণ্য করা যেত। সুতরাং, প্রাগ্-মৌর্য যুগের কম্মকররা ছিলেন স্বাধীন শ্রমিক, কাজ ও বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ, এবং বিরোধের ক্ষেত্রে বেতন স্থির করে দিতেন বিশেষজ্ঞরা[১৪০]—এই মতের সপক্ষে প্রায় কোন প্রমাণই নেই। বরং 'ভৃতক'দের অবস্থা সম্পর্কে একথা আরও ভালোভাবে প্রযোজ্য; নিজ নিজ নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধীনতার উপাদান ছিল অপেক্ষাকৃত অল্পই। 'ভৃতক'দের জীবিকানির্বাহ হতো বেতন অর্থাৎ 'ভৃতি' দিয়ে। পাণিনি শব্দটির উল্লেখ করেছেন, 'পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ' বা শুধুই বেতন অর্থে।[১৪১] মনে হয়, নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই 'ভৃতক'দের ভাড়া করা হতো।[১৪২] একটি আদি জৈন রচনা অনুযায়ী ভৃতকরা ছিলেন চার ধরনের: (১) 'দিবসভয়গ',

১৩৪. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২০৫। ১৩৫. গৌতম ধ. সূ. ১০।৬১।

১৩৬. যাবতাসীংসতী পোসো তাবদ্ এব পবীণতি; অট্ঠাপারে জহন্তি। জাতক, ৩য়, পৃ ৩৮৭। ১৩৭. "ভতক"-ও লেখা হয়।

১৩৮. 'পালি-ইংলিশ ডিকশন্যারি'তে "আহতক"-এর এই ব্যুৎপত্তিই গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩৯. "আহিতক" (অর্থাৎ, বন্ধক দেওয়া) থেকে বিকল্প ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণের নিয়মসম্মত নয়।

১৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইকনমিক লাইফ অ্যাণ্ড প্রগ্রেস ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৯৪।

১৪১. পাণিনি ১।৩।৩৬ ; ৩।২।২২। ১৪২. ঐ, ৫।১।৮০।

যাঁরা দৈনিক পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করতেন, (২) 'জত্তভয়গ', যাঁদের নিয়োগ করা হতো যাত্রাকালে, (৩) 'উচ্চত্তভয়গ', প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ করে দেওয়ার চুক্তিতে নিযুক্ত, এবং (৪) 'কব্বালভয়গ', যতটা কাজ করা হলো সেই অনুযায়ী যাঁদের পারিশ্রমিক দেওয়া হতো (যেমন, মাটি খোঁড়ার কাজ)।[১৪৩] চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কিছু কিছু হস্তশিল্পীকেও হয়তো ভৃতকরূপে নিয়োগ করা হতো। পরবর্তীকালের একটি জাতক-এ গোলামের ('অত্তনো পুরিসা') সঙ্গে 'ভতকে'র পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথম-জনকে বলা হতো প্রভুর ধানক্ষেতের বিভিন্ন অংশের ওপর নজর রাখতে। একই কাজের জন্য 'ভতক' পেতেন বেতন ('ভতি'), কোনরকম শস্যহানি হলে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতো।[১৪৪] একটি গাথায় বলা আছে : 'পুরিস' যাঁর বাড়িতে খাচ্ছেন তাঁরই স্বার্থেই তিনি সর্বদা কাজ করবেন।[১৪৫] 'দাস-কম্মকরপোরিস' এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার থেকে দেখা যায় 'অত্তনো পুরিস' (গোলাম) হয় দাসরূপে নয়তো ভাড়া-করা শ্রমিকরূপে[১৪৬] কাজ করতেন, এবং এই ধরনের বিভিন্ন শ্রমিকের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না।

বুদ্ধের যুগে বেতনের বিনিময়ে লোক ভাড়া-করা একটি বহুপ্রচলিত ঘটনারূপে দেখা দেয়। বেতনজীবীর প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা অনেক ক'টি শব্দ পাই, যেমন 'পেস্স', 'ভতক', 'পুরিস' ও 'কম্মকর'। কিন্তু পালি রচনায় 'দাস' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 'কম্মকর' শব্দটিও পুনরাবৃত্ত হয়েছে। 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'ও এই একই প্রথা চোখে পড়ে,[১৪৭] এবং কৌটিল্যের 'অর্থ-শাস্ত্র' ও অন্যান্য যেসব সংস্কৃত রচনায় 'কর্মকর' শব্দটির প্রয়োগ আছে সেখানেও এই ধারাই অব্যাহত। এই সবকিছু থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে 'দাস' ও 'কম্মকর' ছিলেন একই সামাজিক পর্যায়ভুক্ত। আর্থিকভাবে অবশ্য বেতন-উপার্জন বিষয়টি দেখা যায় শুধু সমাজ-বিকাশের এক উচ্চতর পর্যায়ে, কারণ এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বিচার ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলোয় বেতন বা বেতনজীবীর কোন সবর্গ শব্দ নেই। সংস্কৃত-য় বেতনের প্রতিশব্দ দেখা যায় বেদোত্তর পর্বে। ঐ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও তেমন বিকাশ হয়নি, এবং বেশি উদ্বৃত্তও উৎপন্ন হতো না। এইসব সীমাবদ্ধতা একবার অতিক্রান্ত হওয়ার পর তবেই দেখা দিল বেতন-ব্যবস্থা। বেতন যদিও দ্রব্যেই দেওয়া যেত, ভারতে কিন্তু সাধারণভাবে বেতন-ব্যবস্থা চালু হয় ক্রমবর্ধমান মুদ্রার ব্যবহার এবং একটি বিশেষ মাত্রায় বিপণন প্রথা শুরু হওয়ার পর, কারণ তার ফলেই শ্রম-ক্রয় সম্ভব হলো।

১৪৩. থাণাঙ্গ ৪।২৭১, অভয়দেবসূরির টীকা সমেত। ১৪৪. জাতক, ৪র্থ, পৃ ২৭৬-৭৮।

১৪৫. যস্সেব ঘরে ভুঞ্জেয্য ভোগং তস্সেব অত্থং পুরিসো চরেয্য। জাতক, ৬ষ্ঠ, পৃ ৪২৬।

১৪৬. জাতক, ৪র্থ ; অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম, পৃ ২০৬ ; বিনয় পিটক, ১ম, পৃ ২৪০।

১৪৭. আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।৪।৯।১১।

আগেই যেমন দেখানো হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে কিছু বিমূর্ত ধারণা জড়িত। যেমন, (১) শ্রমশক্তি ক্রয়, (২) ক্রেতার ইচ্ছা অনুযায়ী শ্রম-সময়ের ব্যবহার, (৩) ব্যয়িত শ্রম-সময় এবং কৃতকার্যের প্রকৃতি/ধরন অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ, (৪) ঐ জাতীয় পরিমাণভিত্তিক বেতন সম্বন্ধে কোন এক ধরনের চুক্তি এবং (৫) উৎপাদক ও উৎপন্নের পৃথক্‌করণ এবং এমন এক পরিবার তা ভোগ করে উৎপাদক যার অন্তর্ভুক্ত নন।[১৪৮] বেদোত্তর কালে মধ্যগাঙ্গেয় অববাহিকায় আবির্ভূত হলো এমন সব সম্পন্ন পরিবার যাদের প্রয়োজন হলো শ্রম ভাড়া করার, কেননা তাদের সম্পদ কাজে লাগাবার পক্ষে তাদের পরিবারের শ্রম ছিল অপ্রতুল। এর ফলেই ঐ সময়ে ঐ এলাকায় শ্রম ভাড়া করার শর্তাদি সৃষ্টি হলো। এর সঙ্গে যুক্ত হলো আরও একটা কারণ। এমন অনেক হতদরিদ্র লোক পাওয়া গেল, যাঁরা যুদ্ধ অথবা সামাজিক বশ্যতার কারণে এমন অবস্থায় পড়ে ছিলেন যে তাঁদের পারিবারিক উৎস থেকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন না। প্রায় খৃপূ ৫৫০ থেকে মগধ যে অবিরত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, তা-ও দাসত্ব ও পরাধীন শ্রমের একটা বড় উৎস হয়ে থাকতে পারে। একবার যেই প্রচুর সংখ্যক দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক পাওয়া গেল, তখন যে শুধু মজুরি-শ্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিবিধ বিধান রচনা করতে হলো তা-ই নয়, এমন এক সমাজ-বিন্যাস সৃষ্টি, সনাক্ত ও রক্ষণা-বেক্ষণের বিধি-বিধানও রচনা করতে হলো যা দাস ও শ্রমিকের যোগানও নিশ্চিত করে। যাঁরা দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন, তাঁরাই পরিচিত হলেন শূদ্র বলে।

নিয়োগকর্তা ও নিযুক্তদের সম্পর্ক-বিধায়ক কয়েকটি বিধান থেকে শূদ্রদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়। প্রাক্-মৌর্যযুগের কৃষি ও পশুপালন-প্রধান অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যই হলো, এই ধরনের নিয়ম একদিকে প্রভু এবং অন্যদিকে কৃষি-শ্রমিক ও পশুপালকদের সম্পর্ক নির্দেশ করে। আপস্তম্বের বিধান অনুযায়ী চাষের কাজে নিযুক্ত ভৃত্য যদি কাজ ছেড়ে দেন তাহলে তাঁকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হবে।[১৪৯] কোন পশুচারক যদি গো পালন পরিত্যাগ করেন, তাঁর জন্যও একই ব্যবস্থা।[১৫০] আরও বিধান দেওয়া হয়েছে যে এ-রকম ক্ষেত্রে গবাদি পশুর ভার অন্য কোন পশুচারকের উপর ন্যস্ত হবে।[১৫১] পশুচারকের অবহেলার ফলে গবাদি পশুর কোন ক্ষতি হলে তাঁকেই তার জন্য দায়ী করা হয়েছে।[১৫২] গৌতম এই সব ব্যবস্থার কোন উল্লেখ করেননি, কিন্তু তিনি বিধান দিয়েছেন : গবাদি পশু যদি কারও ক্ষতি করে তবে যাঁর উপর তার ভার রয়েছে—তিনি গো-স্বামীই হোন বা পশুচারকই হোন—তাঁকেই দোষের ভাগী হতে হবে।[১৫৩] এই ধর্মশাস্ত্রকারদের কেউই পশুচারক বা কৃষি-শ্রমিকদের প্রতি তাঁদের প্রভুদের

১৪৮. এম. আই. ফিনলে, 'দি এনশেণ্ট ইকনমি', পৃ ৬৫-৬৬। ১৪৯. ২।১১।২৮।২।
১৫০. ঐ, ৩। ১৫১. ঐ, ৪। ১৫২. ঐ. ৬। ১৫৩. ১২।১৬-১৭।

দায়িত্বের কোন উল্লেখ করেননি। সুতরাং এই বেতন-অর্জনকারীরা প্রভুদের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থাতেই ছিলেন।

ধর্মসূত্রে শূদ্রদের উপর যেসব অর্থনৈতিক বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে তাঁদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তা আরও কিছু আলোকপাত করে। মাসের মধ্যে একদিন রাজার জন্য বাধ্যতামূলক সেবার কাজ যে হস্ত-শিল্পীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল আগেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। গৌতম বিধান দিয়েছেন, কন্যার বিবাহে এবং ধর্মতন্ত্র অনুযায়ী কোন আচারে নিযুক্ত থাকলে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য ছলে বা বলে শূদ্রের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করা যায়।[১৫৪] বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং সম্ভবত ব্রাহ্মণবর্ণেরও যেসব লোক তাঁদের বর্ণাচার পালন করেন না, সামাজিক মর্যাদার ক্রম-অনুযায়ী তাঁদেরও এই রীতির অধীন করা যেত—অবশ্য যখন কোন শূদ্রকে পাওয়া যেত না শুধু তখনই।[১৫৫] এই বিধানে শূদ্র গোষ্ঠীর কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে উচ্চতর বর্ণের সদস্যদের। আর কোন ধর্মসূত্রে এই নিয়ম পাওয়া যায় না, যদিও 'মনুস্মৃতি'তেও সম-জাতীয় বিধান আছে।[১৫৬] এই অংশ হয়তো পরবর্তী প্রক্ষেপ। শূদ্রদের পরিপূর্ণ শোষণ করার যে প্রবণতা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল, এখানে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরাধিকার বিধিতে শূদ্রার পুত্রের ভাগ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক বিধান আছে। বৌধায়নের মতে, বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-জাত সন্তানদের ক্ষেত্রে চারভাগ পাবেন ব্রাহ্মণ, তিনভাগ ক্ষত্রিয়, দুভাগ বৈশ্য, একভাগ শূদ্র পুত্র।[১৫৭] ঐ ধরনের একটি ক্ষেত্রে বশিষ্ঠ শূদ্রাপুত্রকে বাদ দিয়ে কেবল উচ্চতর তিন বর্ণের পুত্রদেরই ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।[১৫৮] অন্যান্যদের মত উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন, শূদ্রাপুত্রকে পরিবারের সদস্যরূপে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু উত্তরাধিকারী রূপে নয়।[১৫৯] বৌধায়নের ধর্মসূত্রে[১৬০] এই বিধান শুধু ব্রাহ্মণ পিতা এবং শূদ্রা মাতার নিষাদ পুত্রের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।[১৬১] গৌতম স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাষায় বিধান দিয়েছেন, ব্রাহ্মণের শূদ্রপুত্রের কোন উত্তরাধিকার নেই। তাঁর মতে কোন ব্রাহ্মণ যদি অপুত্রক অবস্থায় মারা যান এবং তাঁর শূদ্রা স্ত্রীর পুত্র যদি অন্তেবাসী (ছাত্র)-র মতো বাধ্যও হন, তাহলেও সেই পুত্র তাঁর মৃত পিতার সম্পত্তি থেকে শুধু জীবনধারণের

১৫৪. দ্রব্যাদানং বিবাহসিদ্ধ্যর্থং ধর্মতন্ত্রসংযোগে চ শূদ্রাৎ। গৌতম ধ.সূ. ২৭।২৪, হরদত্তের টীকা সমেত।

১৫৫. অন্যত্রাপি শূদ্রাদ্ বহুপশোহীনকর্মণঃ। ঐ. ২৮।২৫, হরদত্তের টীকা সমেত।

১৫৬. মনু ১১।১৩।

১৫৭. বৌধায়ন ধ.সূ. ২।২।৩।১০।

১৫৮. বশিষ্ঠ ধ.সূ. ১৮।৪৭-৫০।

১৫৯. শূদ্রাপুত্র এব ষষ্ঠো ভবতীত্যাহুরিত্যেতে দায়াদবান্ধবাঃ। বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১৭।৩৮।

১৬০. বৌধায়ন ধ. সূ. ২।২।৩।৩২।

১৬১. ঐ, ২।২।৩।১০।

উপযোগী বৃত্তিমাত্র পেতে পারেন।[১৬২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মসূত্রকারদের মধ্যে কেবল বৌধায়নই ব্রাহ্মণের শূদ্রপুত্রকে একটা ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আর বশিষ্ঠ ও গৌতম করেছেন বিরোধিতা। সম্ভবত বৌধায়নের এই উদারতার কারণ হলো, দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ। ব্রাহ্মণ্যবাদ সেখানে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেনি। উপরন্তু এইসমস্ত বিধান থেকে দেখা যায়, এসবই কেবল ব্রাহ্মণদের শূদ্রপুত্রদের সম্পর্কে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর শূদ্রপুত্রদের ক্ষেত্রেও এই উত্তরাধিকারবিধি প্রযোজ্য কিনা সে-কথা পরিষ্কার নয়, যদিও তার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। এই বিধানগুলোর সমর্থন-সূচক এমন কোন নিদর্শন নেই যার সাহায্যে এগুলোর প্রকৃত প্রয়োগ জানা যেতে পারে। যাই হোক, শূদ্র সাধারণের একটা প্রান্তিক অংশের উপরেই শুধু এইসব বিধান কার্যকর হতো, কারণ শূদ্রার সঙ্গে উচ্চতর বর্ণের নিয়মিত বিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না।

প্রাগ্-মৌর্য যুগে শূদ্রদের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করতে গেলে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে দাস শ্রেণী হিসেবে শূদ্রদের চরিত্র-লক্ষণের দিকে। এই সময়েই তার প্রথম সুস্পষ্ট সূচনা। দাসবর্ণের অন্যথা বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এই সেবাকর্মই এনে দিল সমরূপতা। দাস-শ্রেণীভুক্ত রূপে বৈশ্য কৃষকদের[১৬৩] সঙ্গে শূদ্ররাও প্রাথমিক উৎপাদকের ভূমিকা পালন করতেন এবং এইভাবেই তাঁরা তৈরি করতেন সমাজ-বিকাশের বস্তুগত ভিত্তি। কৃষি-শ্রমিক রূপে তাঁরা মগধ ও কোসলের ঘন বনাকীর্ণ এলাকাকে চাষের আওতায় আনতে সাহায্য করেন। এইসব এলাকা ছোট-বড় জোতে বিভক্ত এবং দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিকরা সেখানে কাজ করেন—বিভিন্ন রচনায় এই বলেই তার উল্লেখ আছে।[১৬৪] পরে দেখা যাবে, নতুন বসতিতে অহল্যা ভূমি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে শূদ্র শ্রমিক নিয়োগের রীতি সমর্থন করেছেন কৌটিল্য। এছাড়া হস্তশিল্পী হিসেবে প্রযুক্তির বিকাশে শূদ্রের অবদান ছিল, তাঁরা পণ্যসামগ্রীও উৎপাদন করতেন। এর ফলেই ক্রমশ গড়ে ওঠে বহু সংখ্যক নগর ও তার প্রবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্য।

উচ্চতর বর্ণের যেসব লোক শূদ্রদের নিয়োগ করতেন, তাঁদের সঙ্গে কিন্তু শূদ্রদের জীবনযাত্রার মান এক ছিল না। পালি রচনাদিতে বার বার 'ক্ষত্তিয়', ব্রাহ্মণ এবং 'গহপতি'-দের বলা হয়েছে 'মহাসাল' (ধনবান্)।[১৬৫] অর্থাৎ

১৬২. শূদ্রাপুত্রোঽপ্যনপত্যস্য শুশ্রূষুশ্চেল্লভেত বৃত্তিমূলমন্তেবাসিবিধিনা। গৌতম ধ.সূ. ২৮।৩৭

১৬৩. গৌতম বিধান দিয়েছিলেন, বৈশ্য ও শূদ্র শ্রম করে লাভ করবে। নির্বিষ্টং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ। গৌতম ধ. সূ. ১০।৪২।

১৬৪. তুলনীয়: কোসম্বী, "এনশেণ্ট কোসল অ্যাণ্ড মগধ", 'জার্নাল অফ দ বোম্বে ব্রাঞ্চ অফ দ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি', ২৭, পৃ ১৯৫-২০১।

১৬৫. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ, পৃ ২৩৯ ; জাতক, ১ম, পৃ ৪৯। আক্ষরিক অর্থে শব্দটি দিয়ে

'দাস', 'পেস্‌স', 'কম্মকর', 'পুরিস' এবং 'ভতক'-রা তেমন ভাগ্যবান ছিলেন না। কিছু ধনী শূদ্র হস্তশিল্পী হয়তো সম্পন্ন 'গহপতি' ছিলেন, কিন্তু অর্থব্যবস্থা যেহেতু ছিল মূলত কৃষিনির্ভর এবং অধিকাংশ শূদ্রই ছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়[১৬৬] ও সেট্‌ঠিদের[১৬৭] হাতে, তাঁদের জীবিকানির্বাহ করতে হতো এমন এক বেতনের উপর যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের কোন বক্তব্যই থাকত না। বলা হয় যে, 'জনসাধারণের বড় অংশই ছিলেন সু-উপায়ী কৃষক বা হস্তশিল্পী, তাঁদের অধিকাংশেরই নিজস্ব জমি ছিল।'[১৬৮] বৈশ্য বা গৃহপতি শ্রেণীর বেলায় একথা প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু শূদ্রদের বেলায় নয়; অন্যের জমিতে কাজ করেই তাঁদের জীবনধারণ করতে হতো। তাঁরা যে এই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হতেন, সে শুধু তাঁদের জাতির জন্য নয়, দরিদ্র পরিবারে জন্মের জন্যও বটে। ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দাবি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধদের একটি যুক্তির সূত্রে এই বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন শূদ্র যদি ধনী হয়ে ওঠেন তাহলে তিনি ভৃত্য হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন শুধু আরেকজন শূদ্র নয়, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যকেও।[১৬৯] সাধারণত এ-ধরনের ক্ষেত্রে—যার সংখ্যা হতো অল্পই—সামাজিক মর্যাদা ও উচ্চ আর্থিক অবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের নিরসন হতে পারত সামাজিক মানে তাঁকে উন্নীত করে। পরবর্তীকালে বিদেশী শাসক-প্রধানদের ক্ষত্রিয় বর্গভুক্ত করার জন্য ব্রাহ্মণরা এই নীতিই অবলম্বন করতেন। সুতরাং যে-শূদ্রেরা ভাগ্যের দাক্ষিণ্য লাভ করতেন তাঁরা সম্ভবত উচ্চ সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতেন।

উৎপাদক জনসমষ্টি হিসেবে শূদ্রেরা ছিলেন সমসাময়িক গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির দাস ও 'হেলট'দেরই সদৃশ। যাঁরা স্বাধীন নন তাঁদের কাজের উপরে তত্ত্বত যেমন গ্রীক নাগরিকদের দাবি ছিল, ভারতীয় দ্বিজ ও আর্যদেরও তেমনি দাবি ছিল শূদ্রদের শ্রমশক্তির উপর। কিন্তু কয়েকটি দিক দিয়ে শূদ্রদের আর্থিক অবস্থা ছিল আলাদা। শূদ্র কৃষি-শ্রমিক ও শূদ্র হস্তশিল্পী—বিশেষত শেষোক্তরা—গ্রীস ও রোমের দাসদের মতো, তাঁদের নিয়োগকর্তাদের চূড়ান্ত দয়াধীন ছিলেন না। করযোগ্য হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট না হলেও শূদ্রদের কিছু সম্পত্তি থাকত, কিন্তু তার অন্য বাধাবন্ধও ছিল। গ্রীসের

বোঝায় 'বিরাট শালা সম্পন্ন'। বিহারে প্রচলিত কথায় ধনী ব্যক্তি বোঝাতে এই ধরনের শব্দ এখনও ব্যবহার করা হয়।

১৬৬. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৯। গৌতমের মতে (১০।৫-৬), কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ-জীবিতা ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈধ, যদি তিনি নিজেই সে কাজ না করেন।

১৬৭. দৃষ্টান্তের জন্য ফিশের, "দ প্রব্লেম অফ দ সেট্‌ঠি ইন বুদ্ধিস্ট জাতকজ", আর্কিভ ওরিয়েন্টালনি', ২২, পৃ ২৩৮-২৬৫ দ্র.।

১৬৮. রিস ডেভিডস, 'বুদ্ধিস্ট ইন্ডিয়া', পৃ ১০২।

১৬৯. মজ্‌ঝিম নিকায়, ২য়, পৃ ৮৪-৮৫।

দাসদের সঙ্গে এখানেই তাঁর অমিল।[১৭০] যেমন শূদ্রদের উপর এই নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে উচ্চবর্ণ প্রভুর দুর্দিনে, তাঁকে তাঁর নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে প্রভুর ভরণ-পোষণ করতে হবে।[১৭১] আরও বলা হয়েছে যে বৈশ্য ও শূদ্র আপদ থেকে ত্রাণ পাবেন ধন দিয়ে।[১৭২] 'দাস-ভোগ' পদের ব্যবহার থেকে দেখা যায় এমনকি দাসদেরও সম্পত্তি ছিল,[১৭৩] যদিও তা রাখার জন্য হয়তো তাঁদের প্রভুর অনুমতি নিতে হতো। সম্ভবত এই সমস্ত কারণেই উৎপাদনের সংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে দাসত্বের চেয়ে বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে বর্ণপ্রথা, শ্রম-শক্তির প্রধান উৎসরূপে যা মূলত শূদ্রশ্রেণীর উপরেই নির্ভর করত। স্পষ্টতই গ্রীসের চেয়ে অনেক বেশি এলাকা ও জনসংখ্যার ক্ষেত্রে এই প্রথা কার্যকর ছিল, কিন্তু দাস ও 'হেলট'দের মতো অবস্থায় শূদ্রদের দিয়ে কাজ করানোর কোন প্রয়োজন হয়নি।

এই যুগে শূদ্রদের রাজনৈতিক ও আইনগত অবস্থান, মনে হয়, তাঁদের আর্থিক অবস্থারই অপর পিঠ। পরবর্তী বৈদিক পর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁদের যে গুরুত্ব ছিল এখন অবস্থা তার বিপরীত—এই যুগের রাজনৈতিক সংগঠনে তাঁদের আর সেই স্থান ছিল না। আপস্তম্বের মতে, নগর ও গ্রামের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রূপে রাজা কেবল আর্যদেরই—অর্থাৎ উচ্চতর তিন বর্ণের সদস্যদেরই—নিয়োগ করতে পারতেন।[১৭৪] তাঁদের অধীনে কর্মরত নিম্নতর আধিকারিকদেরও একই যোগ্যতা লাগত।[১৭৫]

আপস্তম্ব এই বিধানও দিয়েছেন যে রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকবেন কেবল বিশুদ্ধ ও সত্যবাদী আর্যরা, তাঁরাই হবেন রাজার মন্ত্রণাদাতা ও বিচারক।[১৭৬] এইসব উল্লেখে 'আর্য' শব্দটিকে সঠিকভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রথম তিন বর্ণের সদস্য বলে।[১৭৭] কোন শূদ্রকে কোনদিন আর্য বলে গণ্য করা হয়নি, 'দ্বিজত্বে'র কথা তো ওঠেই না।[১৭৮] কিন্তু এমনকি এই যুগেও 'আর্য' শব্দটির ব্যবহার যে কোন জাতিগত ('রেসিয়াল') ভেদের সূচক, তেমন ভাবা ভুল।[১৭৯] যেমন পাণিনি যে 'আর্য-কৃত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন[১৮০] স্পষ্টতই তার অর্থ এমন একজন যাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।[১৮১] একটি বৌদ্ধ রচনায় বলা হয়েছে কম্বোজ ও যবনদের মধ্যে

১৭০. ক্রীট-এর কৃষি-দাসদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করতে হবে। তাঁরা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারতেন। দাসীদের কন্যাপণের অধিকার সেই দিয়ে সুরক্ষিত হতো। ভেস্টারমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬।

১৭১. গৌতম ধ. সূ. ১০।৬২-৬৩।

১৭২. ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ ধনেন বৈশ্যশূদ্রৌ। বশিষ্ঠ ধ. সূ. ২৬।১৬।

১৭৩. বিনয় পিটক, ৩য়, পৃ ১৩৬।

১৭৪. গ্রামেষু নগরেষু চ আর্যাঞ্ছুচীন্ সত্যশীলান্ প্রজাগুপ্তয়ে নিদধ্যাৎ। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১০।২৬।৪। ১৭৫. ঐ, ২।১০।২৬।৫। ১৭৬. ঐ, ২।১০।২৫।১২-১৩।

১৭৭. ঐ, ২।১০।২৫।১৩-র হরদত্ত-কৃত টীকা।

১৭৮. হপকিন্স, 'কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২৪০। ১৭৯. ঐ।

১৮০. পাণিনি, ৪।১।৩০। ১৮১. আগরওয়ালা, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯।

আর্যরা দাস হয়ে যান, দাসরা হন আর্য।[১৮২] এর থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আর্যরা ছিলেন স্বাধীন, আর এর বিপরীতে দাসরা পরাধীন। সুতরাং আর্য ও শূদ্রদের রাজনৈতিক পার্থক্য ছিল, মনে হয়, গ্রীস ও রোমের নাগরিক ও অ-নাগরিকদেরই মতো। শূদ্রদের যেহেতু পরাধীন বলে গণ্য করা হতো তাই প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে তাঁদের যুক্ত করা অনুচিত বলেই ভাবা হতো। এর থেকে তাই মনে হয়, তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে নিম্নতর শ্রেণীগুলোর কোন প্রভাবই ছিল না। যেমন, একটি জৈন তথ্যসূত্রে, রাজসভায় উপস্থিত বহু ধরনের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু গহপতি (অর্থাৎ বৈশ্য) বা শূদ্রের কথা নেই।[১৮৩] মনে হয়, বৈশ্যদের সাধারণত মন্ত্রণাদাতা হিসেবে নিয়োগ করা যেত না। অবশ্য পালি রচনা অনুযায়ী যেসব সেট্‌ঠি রাজার কাছ থেকে 'সেট্‌ঠিছত্ত' (শ্রেষ্ঠী-ছত্র) পেতেন,[১৮৪] তাদের হয়তো কিছু কিছু প্রশাসনিক কাজ দেওয়া হতো। একটি জাতক-কাহিনীতে বলা হয়েছে, দরজির ছেলেকে কোষাধ্যক্ষ ('ভাণ্ডাগারিক') করা হয়েছিল।[১৮৫] কিন্তু এজাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল।

বলা হয় যে, এযুগের অন্যতম শক্তিশালী এক রাজবংশ ছিল শূদ্রকুলজাত এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় শূদ্রেরা সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্জন করেন।[১৮৬] একথা যদি নন্দরাজাদের নীচকুলে জন্মের ইঙ্গিত হয় একমাত্র তবেই সত্য বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু একথা এই অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয় যে রাজনৈতিক ক্ষমতা শূদ্রদের হাতেই চলে গিয়েছিল, কারণ নন্দদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রদের রাজনৈতিক বাধানিষেধও ঘুচে গিয়েছিল—এর সপক্ষে কোন নিদর্শনই নেই।

এই পর্বের গণ-রাজ্যে শূদ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে যথার্থই বলা হয়েছে যে "'সংঘ-গণে'র শাসক-সভা গঠিত হতো ক্ষত্রিয় অভিজাতদের নিয়ে। ব্রাহ্মণ এবং গহপতিদের চেয়েও উঁচুতে ছিল এদের স্থান, নিম্নতর শ্রেণীগুলির কথা বলাই বাহুল্য।"[১৮৭] 'গৌতম ধর্মসূত্রে'র একটি শ্লোকের ভিত্তিতে জায়সবাল বলেছেন, রাজা যে 'পৌর' (নগর বা রাজধানী সংক্রান্ত) সংস্থার পরামর্শ নিতেন, তার সদস্য হতে পারতেন শূদ্রেরাও।[১৮৮] যদি ধরে নেওয়া যায় যে 'পৌর' ছিল এক যৌথ সংস্থা, তাহলেও শূদ্রদের ক্ষেত্রে জায়সবাল যে-ব্যাখ্যা করেছেন, মস্করীর টীকায় তার সমর্থন মেলে না। মস্করী 'পৌর' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'সমানস্থানবাসী', অর্থাৎ একই জায়গায় বাসিন্দা।[১৮৯]

১৮২. দীঘ নিকায়, ২য়, পৃ ১৪৯। ১৮৩. সূয়গডম্‌ ৩।১।৯।

১৮৪. ফিশের, 'আর্কিভ ওরিয়েন্টালনি', ১২, পৃ ২৬১। ১৮৫. জাতক, ৪র্থ, পৃ ৪৩।

১৮৬. রায়চৌধুরী, 'অ্যান অ্যাডভান্সড্‌ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ৭১।

১৮৭. ঘোষাল, "দ কনস্টিটিউশনাল সিগনিফিকান্স অফ সংঘ-গণ ইন দ পোস্ট-বেদিক পিরিয়ড", 'ইণ্ডিয়ান কালচার', ১২, পৃ ৬২।

১৮৮. 'হিন্দু পলিটি', ২য়, পৃ ৬৯-৭০। ১৮৯. গৌতম ধ. সূ. ৬।১০-এর টীকা।

বিচার সভায় সাক্ষীরূপে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে, বৌধায়ন, কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম বাদে, সমস্ত বর্ণের লোককেই এই অধিকার দিয়েছেন।[১৯০] উচ্চতর বর্ণের বিবাদের ক্ষেত্রে সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে শূদ্রদের উপর তিনি কোন নিষেধাজ্ঞা দেননি। 'বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে'ও একই ব্যবস্থা দেখা যায়।[১৯১] গৌতমের মতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য শূদ্রকেও ডাকা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর টীকাকারদের মতে এমন হতে পারে শুধু তখনই যখন উপযুক্ত গুণসম্পন্ন কোন দ্বিজ পাওয়া যাচ্ছে না।[১৯২] কার বিবাদের ক্ষেত্রে সাক্ষীরূপে উপস্থিত হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে—দ্বিজ, না নিজ বর্ণের ক্ষেত্রে—সেকথা স্পষ্ট নয়। মনে হয়, এখানে প্রথম পরিস্থিতির কথাই বলা হচ্ছে। বশিষ্ঠ অবশ্য স্পষ্টই বলেছেন যে সবর্ণ দ্বিজরা তাঁদের নিজ শ্রেণীর লোকের জন্যই সাক্ষী-রূপে উপস্থিত হতে পারেন: সৎ শূদ্ররা পারে সৎ শূদ্রদের জন্য এবং অন্ত্যজরা অন্ত্যজদের জন্য।[১৯৩] স্পষ্টত, সৎ শূদ্র হলেন তাঁরাই যাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্য বিধানই মেনে চলতেন। এর থেকে মনে হয়, সৎ শূদ্রদের বিবাদে অসৎ শূদ্রদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতো না। এই জন্যই পরবর্তী ধর্মসূত্রকার গৌতম ও বশিষ্ঠের রচনায় উচ্চবর্ণের বিবাদে শূদ্রসাক্ষী বর্জনের প্রবণতা দেখা যায়। এই সৎ-অসৎ শূদ্রভেদ কার্যত মানা হতো কিনা তা নির্ধারণ করার কোন উপায়ই আমাদের নেই, কিন্তু ধর্মসূত্রে পরিব্যাপ্ত বর্ণ-ভিত্তিক বিধিবিধান প্রণয়নের মনোভাবের সঙ্গে এর সঙ্গতি আছে। লক্ষণীয় যে, এই যুগে গ্রীসে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য দাসদের পায়ের তলায় বেত্রাঘাত করা বা পীড়নযন্ত্রে বেঁধে রাখা যেত।[১৯৪] কিন্তু, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ধর্মসূত্রে ঐ ধরনের কোন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা নেই।

গৌতম বিধান দিয়েছেন যে, বিচিত্র বর্ণের লোক এবং কৃষক, বণিক, পশুপালক, কুসীদজীবী ও কারুশিল্পীদের বৃত্তিগোষ্ঠী ধর্মবিধির অবিরোধে তাঁদের নিজস্ব প্রথা অনুযায়ী কার্য-পরিচালনা করতে পারবেন।[১৯৫] অর্থাৎ, শূদ্র শ্রেণীর যেসব অংশ কারুশিল্পীদের বৃত্তিগোষ্ঠীতে বা জাতিবর্গে সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন তাঁদের আভ্যন্তরীণ বিষয় পরিচালনার জন্য তাঁরা নিজস্ব নিয়মই অনুসরণ করতে পারতেন। অবশ্য অন্য বর্ণের লোকের সঙ্গে স্বত্বঘটিত বা অপরাধ সংক্রান্ত বিবাদে জড়িয়ে পড়লে তাঁরা হয়তো বিধিগত বৈষম্যের ভাগী হতেন। যেমন আমরা আগেই দেখেছি যে স্বত্বসংক্রান্ত বিধিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পিতার শূদ্রপুত্রের ভাগ সবচেয়ে কম, বা আদৌ থাকেই না।[১৯৬]

১৯০. চত্বারো বর্ণাঃ পুত্রিণঃ সাক্ষিণঃ স্যুঃ। বৌধায়ন ধ. সূ. ১।১০।১৯।১৩।
১৯১. সর্বেষু সর্ব এব বা। বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১৬।২৯।
১৯২. 'অপি শূদ্রঃ' প্রসঙ্গে মস্করী ও হরদত্ত। গৌতম ধ. সূ. ১১।১১।৩।
১৯৩. ...শূদ্রাণাং সন্তঃ শূদ্রাশ্চান্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ। বশিষ্ঠ ধ সূ. ১৬।৩০।
১৯৪. ভেস্টারমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭।
১৯৫. গৌতম ধ. সূ. ১১।২০-২১।
১৯৬. পৃ ১০৬-০৭ দ্র.।

অপরাধ সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও ধর্মসূত্রে বিধিগত সমতার কোন ব্যবস্থা নেই। গৌতমের বিধান অনুযায়ী কোন ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে গালি দেন তাহলে তাঁকে অর্থদণ্ড দিতে হবে, কিন্তু কোন শূদ্রকে গালি দিলে তাঁর কিছুই হবে না।[১৯৭] উপরন্তু শূদ্র যদি দ্বিজকে গালি দেন, অথবা মুষ্ট্যাঘাত করেন, তাহলে যে-অঙ্গ দিয়ে তিনি সে-অপরাধ করেছেন তা ছেদন করা যেতে পারে।[১৯৮] আপস্তম্ব সরাসরিই বলেছেন, শূদ্র যদি ধার্মিক আর্যকে গালি দেন তাহলে তাঁর জিহ্বা ছেদন করা হবে।[১৯৯] সম্মানীয় ব্যক্তিদের গালি দেওয়া এবং গৌণ মিথ্যাভাষণ জনিত পাপক্ষালনের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে সেখানেও শূদ্রদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। শূদ্রদের বলা হয়েছে সাতদিন উপবাস করতে।[২০০] পক্ষান্তরে, উচ্চতর তিন বর্ণের লোকের শুধু তিনদিন দুধ, ঝাল, আচার ও নুন না খেলেই চলবে।[২০১] সবশেষে আপস্তম্ব ও গৌতম বলেছেন যে, কোন শূদ্র যদি বচনে, আসনে, শয়নে বা পথে দ্বিজের সমান স্থান গ্রহণ করে, তাহলে তাকে দণ্ডাঘাত করা হবে।[২০২]

ব্যভিচার-ঘটিত বিধানে শূদ্রদের জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আপস্তম্বের বিধান অনুযায়ী কোন শূদ্র যদি আর্যা, অর্থাৎ প্রথম তিন বর্ণের রমণীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হন, তাহলে তাঁকে বধ করা হবে।[২০৩] আর যদি এই অবৈধ সহবাসের ফলে কোন সন্তানের জন্ম না হয়, তাহলে সেই রমণীকে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে শোধন করে নেওয়া যাবে।[২০৪] কিন্তু ঐ একই লেখক বলেছেন যে, কোন আর্য যদি শূদ্রার সঙ্গে একই অপরাধে লিপ্ত হন তবে তাঁকে নির্বাসিত করা হবে।[২০৫] চুরির ক্ষেত্রে, গৌতমের বিধান অনুযায়ী, সবচেয়ে কম অর্থদণ্ড দিতে হবে শূদ্রকে ; উচ্চতর বর্ণের অপরাধী-দের ক্ষেত্রে তার পরিমাণ বেড়ে যায়। যেমন শূদ্রকে যদি অপহৃত সম্পত্তির

১৯৭. ব্রাহ্মণস্তু ক্ষত্রিয়ে পঞ্চাশৎ, তদর্ধং বৈশ্যে, ন শূদ্রে কিঞ্চিৎ। গৌতম ধ.সূ. ১২।১১-১৩।

১৯৮. শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধায়াভিহত্য বাগ্দণ্ডপারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাৎ। গৌতম ধ. সূ. ১২।১।

১৯৯, জিহ্বাচ্ছেদনং শূদ্রস্য আর্যং ধার্মিকম্ আক্রোশতঃ। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১০।২৭।১৪।

২০০. নারীদের জন্যও এই বিধান দেওয়া হয়েছে। আপস্তম্ব ধ. সূ ১।৯।২৬।৪।

২০১. ঐ, ১।৯।২৬।৩।

২০২ বাচি পথি শয্যায়ামাসন ইতি সমীভবতো দণ্ডতাদানম্। আপস্তম্ব ধ.সূ. ২।১০।২৭। ১৫ ; গৌতম ধ. সূ ১২।৭।

২০৩. বধ্যঃ শূদ্র আর্যায়াম্। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১০।২৭-৯।

২০৪. ঐ, ২।১০।২৭।১০।

২০৫. নাশ্য আর্যঃ শূদ্রায়াম্। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১০।২৭-৮।

আটগুণ দণ্ড দিতে হয়; ব্রাহ্মণকে দিতে হবে চৌষট্টি গুণ।[২০৬] শূদ্ররা এর বেশি দণ্ড দিতে অপরাগ : এর মধ্যে হয়তো তারই ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এই নিয়মে আগেই ধরে নেওয়া হয় যে উচ্চবর্ণের লোকদের নৈতিকতার মানও হবে উচ্চতর, এবং তাঁরা যে চুরি করবেন তা আদৌ প্রত্যাশিত নয়। প্রথম তিন বর্ণের লোকেই শুধু অধিকারিক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন—এই ব্যবস্থার সঙ্গে চৌর্য-সংক্রান্ত নিয়মটি সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ অধিকারিকদের প্রধান কাজই ছিল তস্করদের হাত থেকে লোককে রক্ষা করা।[২০৭]

এইসব অপরাধ-ঘটিত বিধানের প্রয়োগ প্রসঙ্গে 'মজ্‌ঝিম নিকায়ে'র একটি অংশে দেখা যায় যে ব্যভিচার ও চুরির ক্ষেত্রে অপরাধীদের বর্ণ-নির্বিশেষে শাস্তি দেওয়া হতো।[২০৮] সুতরাং এ ব্যাপারে ধর্মসূত্রের বৈষম্যমূলক নিয়মগুলোকে গুরুত্ব না দিলেও চলে। কিন্তু অ-ব্রাহ্মণ্য তথ্যসূত্রেও দেখা যাচ্ছে যে অপরাধী দাস, কম্মকর ও অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমজীবীরা তাঁদের প্রভুদের হাতে দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতেন। যেমন, প্রহারের দুটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি, যার বলি হয়েছেন দাসীরা।[২০৯] একটি ক্ষেত্রে অপরাধ হলো কাজে অবহেলা,[২১০] অন্যক্ষেত্রে প্রভুকে নিজ বেতন এনে না-দেওয়া।[২১১] এমন একজন দাসের উল্লেখ অবশ্য আছে যাঁর পিঠ চাপড়ানো হয়েছিল আর লেখা ও হাতের কাজ শেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনিও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতেন যে তুচ্ছতম বিচ্যুতির জন্যেও 'প্রহৃত, কারারুদ্ধ, শলাকাবিদ্ধ হতে হবে এবং দাসের যোগ্য খাবার খেয়ে থাকতে হবে।'[২১২]

আইনত যাঁরা দাস নন, দৈহিক শাস্তির ব্যাপারটা যে শুধু তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। বৌদ্ধ নিকায়-গ্রন্থে এঁদের সঙ্গে 'পেস্‌স' ও 'কম্মকর'দেরও প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে। অশ্রুসিক্ত মুখে কাঁদতে কাঁদতে দণ্ড ও ভয়ের তাড়নায় তাঁরা রাজার অধীনে কাজ করেন।[২১৩] জৈন রচনার একটি উপমা থেকে জানা যায় যে, 'প্রেষ্য' (বার্তাবহ বা ভৃত্য)-দের কাজ করানো হয় দণ্ডাঘাত করে।[২১৪] আপাত-নির্দোষ কর্মীদের প্রতিই যদি এরকম

২০৬. অষ্টপাধ্যং স্তেয়কিল্বিষং শূদ্রস্য ; দ্বিগুণোত্তরাণীতরেষাং প্রতিবর্ণম্‌। গৌতম ধ. সূ. ১২।১৫-১৬।

২০৭. আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১০।২৬।৬-৮।

২০৮. এবং সন্তে ইমে চত্তারো বণ্ণা সমসমা হোন্তি। ২য়, পৃ ৮৮।

২০৯. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২০৫।

২১০. ঐ।

২১১. জাতক, ১ম, পৃ ৪৯২।

২১২. ঐ, ১ম, পৃ ৪৫১।

২১৩. দণ্ড-তজ্জিতা ভয়-তজ্জিতা অস্সুমুখা রুদমানা পরিকম্মানি করোন্তি। মজ্‌ঝিম নিকায়, ১ম, পৃ ৩৪৪ ; সংযুক্ত নিকায়, ১ম, পৃ ৭৬ ; অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য়, পৃ ২০৭-০৮ ; ৩য়, পৃ ১৭২ ; তুলনীয় দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ১৪১।

২১৪. সূয়গডম্‌, ১।৫।২।৫।

ব্যবহার করা হয়, তাহলে দোষীদের ভাগ্য এর চেয়ে ভালো হবে বলে আদৌ আশা করা যায় না। 'সূয়গডম্'-এর নিম্নোদ্ধৃত অংশটির আলোচ্য বিষয় হলো বেতনভুক্ কর্মীর ন্যূনতম অপরাধে প্রদেয় কঠোরতম শাস্তি। "লোকে (প্রভু) সময়ে সময়ে তাঁর পরিবারস্থ গৃহভৃত্য, যেমন, দাস বা বার্তাবহ বা ভাড়া-করা চাকর বা 'ভাগিল্ল-ভাগিক'[২১৫] বা পরজীবী ইত্যাদিদের কঠোর-ভাবে শাস্তি দেবেন, যথা: দণ্ড দেওয়া, চুল ছিঁড়ে নেওয়া, আঘাত করা, লোহার খাঁচায় বেঁধে রাখা, বেড়ি পরানো, গোড়ালিতে আংটা আটকে দেওয়া, বন্দী করে রাখা, হাত-পা-য় জোড়া শেকল পরানো ও ভেঙে দেওয়া, হাত-পা-কান-নাক-ঠোঁট-মাথা বা মুখ (?) কেটে ফেলা,[২১৬] পা-য় ছেঁদা করা, চোখ-দাঁত-জিভ উপড়ে দেওয়া, ফাঁসি দেওয়া ঝাঁটা মারা, ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলা, শূলে চড়ানো, ক্ষত সৃষ্টি করা, ক্ষতে অম্ল ঢেলে দেওয়া, ঘাস-কাটা যন্ত্র দিয়ে প্রচণ্ড মারা, সিংহ (!) বা ষাঁড়ের লেজে বেঁধে রাখা, কাঠের আগুনে পোড়ানো, কাক-শকুন দিয়ে খাওয়ানো, অন্ন ও জল বন্ধ করে দেওয়া, আজীবন বন্দী করে রাখা—ইত্যাদি যে কোন এক ভয়ংকর উপায়ে তাকে মেরে ফেলবে।"[২১৭]

উল্লিখিত অংশে নীতিহীন ব্যক্তিদের আচরণই বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা স্পষ্টতই জৈনধর্মাবলম্বী নন, আর সেইজন্যই এই বিবরণ অতিরঞ্জনমুক্ত না-ও হতে পারে। কিন্তু নিঃসন্দেহেই দেখা যাচ্ছে যে, দাস ছাড়াও, অন্যান্য বহু ধরনের যেসব কর্মচারী নিয়োগ করা হতো, প্রভু তাঁদেরও বহুবিধ নির্দয়

২১৫. যে-কাজের জন্য ভাড়া করা হয়েছে তার উৎপন্নের (যেমন, কৃষির ষষ্ঠ ভাগ যিনি পান। 'সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট', ৪৫, পৃ ৩৭৪, টী. ৯।

২১৬. 'বেয়গচ্ছহিয়' ও 'অঙ্গচ্ছহিয়' - এই দুটি শব্দ অনুবাদ করতে ইয়াকবিকে বেগ পেতে হয়েছে। ঐ পৃ ৩৭৫, টী. ১।

২১৭. জা বি য সে বাহিরিয়া পরিসা ভবই, তং জহাদাসে ইবা পেসে ই বা ভয়এ ই বা ভাইল্লে ই বা কম্মকরএ ই বা ভোগপুরিসে ই বা তেসিং পি য ণং অন্নয়ংরসি অহালহুগংসি অবরাহংসি সয়মেব গুরুয়ং দণ্ডং নিবত্তেই, তং জহাইমং দণ্ডেহে, ইমং মুণ্ডেহ; ইমং তজ্জেহ ইমং তালেহ, ইমং অদুয়বন্ধনং করেহ ইমং নিয়লবন্ধনং করেহ ইমং হড্ডিবন্ধনং করেহ, ইমং চারগবন্ধনং করেহ, ইমং নিয়লজুয়ল সংকোধিয়মডিয়ং করেহ, ইমং হথ-চ্ছিন্নবং করেহ, ইমং পায়চ্ছিন্নং করেহ, ইমং কন্নচ্ছিন্নং করেহ, ইমং নক্কওট্ঠসীসমুহ-চ্ছিন্নয়ং করেহ, বেয়গচ্ছহিয়ং অঙ্গচ্ছহিয়ং পক্খাফোডিয়ং করেহ, ইমং নয়ণুপ্পা-ডিয়ং করেহ, ইমং দংসণুপ্পাডিয়ং বসণুপ্পাডিয়ং জীবভুপ্পাডিয়ং ওলম্বিয়ং করেহ, ঘসিয়ং করেহ, ঘোলিয়ং করেহ, সূলাইয়ং করেহ, সূলভিন্নয়ং করেহ, খারবত্তিয়ং করেহ, বজ্ঝবত্তিয়ং করেহ, সীহপুচ্ছিয়গং করেহ, বসভপুচ্ছিয়গং করেহ, দবগ্গিদড্ঢয়ঙ্গং কাগণিমংসখাবিয়ঙ্গং ভত্তপাণনিরুদ্ধগং ইমং জবজ্জীবং বহবন্ধনং করেহ, ইমং অন্নয়রেন অসুভেণং কুমারেণং মারেহ। সূয়গডম্ ২।২।২০। ইয়াকবি-র অনুবাদ, সূয়গডম্ ২।২।৬৩। সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট, ১৬, পৃ ৩৭৪-৭৫।

শাস্তি দিতেন। এগুলো থেকে বোঝা যায় যে সেবক-শ্রেণীর দোষীদের ক্ষেত্রে দৈহিক শাস্তিদান প্রচলিত ছিল, যদিও শূদ্র বর্ণের হস্তশিল্পীদের হয়তো এই লাঞ্ছনা সইতে হতো না। গ্রীসেও হয়তো গৌণ দুষ্কর্মের জন্য দাসদের দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হতো; কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিরা এই অবমাননা থেকে রেহাই পেতেন।[২১৮]

ধর্মসূত্রের বিধিতে সর্বপ্রথম বিভিন্ন বর্ণের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন হারে 'বৈরদেয়' প্রবর্তন করা হয়েছে। বৈদিক যুগে এই ধরনের পার্থক্য ছিল না। তিনটি ধর্মসূত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে যথাক্রমে একসহস্র, একশত ও দশটি গাভী দণ্ড দিতে হবে, প্রতি ক্ষেত্রেই একটি করে ঋষভ (ষাঁড়) সমেত।[২১৯] বৌধায়ন বলেছেন যে এই দণ্ড রাজার প্রাপ্য,[২২০] কিন্তু রাজার জায়গায় আপস্তম্ব ব্রাহ্মণকেই পছন্দ করেন বলে মনে হয়।[২২১] যাই হোক, কোন ক্ষেত্রেই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গকে 'বৈরদেয়' দিতে হতো না। নিহত ব্যক্তির বর্ণ অনুযায়ী হত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তও হতো বিভিন্ন। গৌতমের মতে, ক্ষত্রিয়কে হত্যা করলে অপরাধী ছ বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনের অঙ্গীকার করবেন, বৈশ্য ও শূদ্রকে হত্যার জন্য যথাক্রমে তিন ও এক বছর।[২২২] বশিষ্ঠ অবশ্য বৈশ্যের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের কাল বাড়িয়ে করেছেন ছ বছর এবং ক্ষত্রিয় বা শূদ্রের ক্ষেত্রে তিন বছর।[২২৩] কিন্তু বার্নেল যাকে এই পর্বের রচনা বলে মনে করেন সেই 'সামবিধান ব্রাহ্মণে'[২২৪] প্রথম তিন বর্ণের হত্যাজনিত পাপ-স্খলনের জন্য একই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া হয়েছে; কিন্তু শূদ্র-হত্যার জন্য ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।[২২৫] বৈরদেয়-র ক্ষেত্রে প্রথম পার্থক্য করা হয় শূদ্র এবং 'ত্রৈবর্ণিক'-এর মধ্যে—এর থেকে সম্ভবত এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। পরে এটিকে চরম রূপ দেওয়া হয়, বিভিন্ন বর্ণের লোকের হত্যার জন্য বিভিন্ন হারে দণ্ডের ব্যবস্থা করে। বৈরদেয় সংক্রান্ত যে-বিধি প্রায় সমস্ত ধর্মসূত্রেই পাওয়া যায় তার নিশ্চয়ই কিছু বাস্তব ভিত্তি ছিল। শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন হারের বৈরদেয় শুধু সেই সমাজেই পাওয়া যায় যা আর জনগোষ্ঠীয় নয়। কিন্তু শূদ্রদের ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত এবং কীভাবে এই নিয়ম পালন করা হতো, বিচারালয়ের কোন সিদ্ধান্ত না থাকায় সে-বিষয়ে কিছু স্থির করা যায় না।

শূদ্র-বধ এবং হংস, ভাস, ময়ূর, চক্রবাক, প্রচলাক (বহুরূপী কৃকলাস), বায়স, উলূক, ভেক, ডেরিক (গন্ধগোকুল), কুকুর ইত্যাদি বধের জন্য একই

২১৮. ভেঙ্কটরমন, পূর্বোক্ত পৃ ১৭।

২১৯. বৌধায়ন ধ. সূ. ১।১০।১৯।১ ও ২; আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।৯।২৪।১-৪; গৌতম ধ. সূ. ২২।১৪-১৬। ২২০. ১।১০।১৯।১।

২২১. ১।৯।২৪।১, হরদত্তের টীকা সমেত। ২২২. ২৩।১৪-১৬। ২২৩. ২০।৩১-৩৩।

২২৪. সাম. ব্রা., ভূমিকা, পৃ [১০]। ২২৫. ঐ, ১।৭।৫-৬।

প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন আপস্তম্ব ও বৌধায়ন।[২২৬] আধুনিক গণতান্ত্রিক মনে এটাই সবচেয়ে বীভৎস ঠেকে। শূদ্র এবং পশু-পাখির জীবন এক করে দেখার এই যে প্রান্তবাদী মত, তা হয়তো সার্বজনীন স্বীকৃতি পায়নি,[২২৭] কারণ ঐ বিধানকর্তারাই ব্যবস্থা দিয়েছেন যে শূদ্রকে হত্যা করলে বৈরদেয় রূপে একটি বৃষ ও দশটি গাভী দিতে হবে।[২২৮] কিন্তু আদি ব্রাহ্মণ্য বিধিতে যে শূদ্রদের জীবনের উপর খুবই কম গুরুত্ব দেওয়া হতো সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এইভাবে বেদোত্তর কালে সাধারণভাবে জনগোষ্ঠীয় সমাজের পরিবর্তে বর্ণভিত্তিক সমাজ স্থাপিত হওয়ার পর, প্রশাসনের কাজে শূদ্রবর্ণের আর কোন স্থানই রইল না। সম্ভবত, প্রশাসনিক কাজে তাঁদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল এবং অতি সামান্য অপরাধের জন্যও তাঁদের দৈহিক শাস্তি দেওয়া শুরু হলো। এক অর্থে এ-ই ছিল স্বাভাবিক, কারণ তাঁদের অর্থদণ্ড দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিধিতে শূদ্রদের ক্ষেত্রে যে-শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে, উচ্চতর বর্ণের জন্য প্রস্তাবিত শাস্তির অনুপাতে বস্তুত তা অনেক বেশি কঠোর। কিন্তু এ থেকে অন্তত একটা জিনিস বোঝা যায় : শূদ্রদের ব্যক্তিগত তথা সম্পত্তিগত অধিকার ছিল।[২২৯] প্রাচীন গ্রীসে যেমন দাসদের হত্যা করলে কোন শাস্তি হতো না, শূদ্রের ক্ষেত্রে তেমন নয়।

প্রাগ্-মৌর্য যুগে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থানও পরিবর্তিত হলো আরও অবনতির দিকে। শূদ্রের জন্ম আদিপুরুষের পদযুগল থেকে[২৩০]—এই প্রাচীন কল্পকথার উপরেই বিধানকর্তারা জোর দিলেন এবং আপাতভাবে এর ভিত্তিতেই শূদ্রের উপর আরোপ করলেন সঙ্গ, খাদ্য, বিবাহ ও শিক্ষা বিষয়ে বহুসংখ্যক সামাজিক বিধিনিষেধ। এর ফলে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে উচ্চবর্ণের লোক এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা, শূদ্রদের পরিত্যাগ করলেন। বৌধায়ন বিধান দিয়েছেন, 'স্নাতক' কোন জাতিচ্যুত ব্যক্তি, স্ত্রী বা শূদ্রের সঙ্গে পথ চলবেন না।[২৩১] গৌতমের একটি উক্তির টীকায় হরদত্ত বলেছেন, এখানে 'স্নাতক' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়।[২৩২] তার মানে বৈশ্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। এ-ছাড়াও অভিপ্রেত ফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি আচার ছিল এই যে, ফলার্থী ব্রহ্মচারী কোন নারী বা শূদ্রের সঙ্গে কথা বলবেন না।[২৩৩] 'পতিত' ব্যক্তির—অর্থাৎ অসম

২২৬. আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।৯।২৫।১৩ ; বৌধায়ন ধ. সূ. ১।১০।১৯।৬।

২২৭. এও কৌতূহলজনক যে গোহত্যা ও শূদ্রহত্যার জন্য সাম. ব্রা. ১।৭।৭-এ প্রায় একই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

২২৮. পৃ ১১৫ দ্র.।

২২৯. ঘোষাল, 'ইণ্ডিয়ান কালচার', ১৪, পৃ ২৭।

২৩০. বশিষ্ঠ ধ. সূ. ৪।২। বৌধায়ন ধ. সূ ১।১০।১৯।৫-৬।

২৩১. ২।৩।৬।২২ :

২৩২. ৯।১-এর টীকা। সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট, ২, পৃ ২১৬।

২৩৩. বৌধায়ন ধ. সূ. ৪।৫।৪ ; তুলনীয় : ভারদ্বাজ গৃ.সূ ৩।৬ ; কৌশিকসূত্র ৩।৪।২৪।

বর্ণের (স্পষ্টতই উচ্চবর্ণের) স্ত্রীলোকের গর্ভজাত শূদ্রের পুত্রের[২৩৪]—যাবতীয় সংসর্গকেই ভাবা হতো অবাঞ্ছিত। অবশ্যই এর উদ্দেশ্য ছিল শূদ্র ও উচ্চতর বর্ণের মধ্যে সামাজিক যোগের সুযোগ কমিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বাড়িয়ে দেওয়ার স্পষ্ট এক প্রবণতা ধর্মসূত্রে দেখা যায়। আপস্তম্ব ও বৌধায়নের মতে, শূদ্র কোন ব্রাহ্মণের কাছে অভ্যাগত হয়ে এলে প্রথমেই তাঁকে কিছু কাজ করতে দেওয়া হবে; সে-কাজ হয়ে গেলে তবেই তাঁকে খেতে দেওয়া যেতে পারে।[২৩৫] ব্রাহ্মণ স্বয়ং অতিথিটিকে খাওয়াবেন না বা অভ্যর্থনা করবেন না। সে-কাজ করবেন তাঁর দাসেরা। তাঁরাই এই উদ্দেশ্যে রাজভাণ্ডার থেকে অন্ন নিয়ে আসবেন।[২৩৬] গৌতমের মতে শুধু যজ্ঞের সময় ছাড়া ব্রাহ্মণের বাড়িতে কোন অব্রাহ্মণ অতিথি হতে পারবেন না।[২৩৭] ঐ সময়েই শুধু, দয়া করে, তাঁর ভৃত্যদের সঙ্গে বৈশ্য ও শূদ্রদের খাওয়ানো হবে।[২৩৮] 'বৈশ্বদেব' অনুষ্ঠানের সময় অবশ্য চণ্ডাল, কুকুর ও কাককেও একটা ভাগ দেওয়া হবে, যদি তারা অনুষ্ঠানের শেষে আসে।[২৩৯] এই যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণের জন্য বেশ কয়েক-জন দেবতাকে আহ্বান করা হতো। মনে হয়, এই যজ্ঞে রক্ষিত হয়েছিল কিছু সমষ্টিগত ও জনগোষ্ঠীয় বৈশিষ্ট্য, নতুন শ্রেণী-বৈষম্যকে যা অতিক্রম করে যেত।

গৌতম বলেছেন, কোন শূদ্রের যদি আশি বছর বয়স হয় এবং তিনি একই পুরবাসী হন, তাহলে অল্পবয়স্কের কর্তব্য হবে তাঁকে সম্মান দেখানো।[২৪০] বয়সের উপর গুরুত্ব আরোপ হলো একটি জনগোষ্ঠীয় প্রথা, শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও তা অব্যাহত ছিল। অবশ্য আর্য যদি শূদ্রের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ হন তাহলেও তাঁকে সম্মান জানানো ছিল শূদ্রের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য।[২৪১] বর্ণ অনুসারে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের যেসব বিভিন্ন রীতি ধর্মসূত্রে বিধিবদ্ধ আছে, তাতে সমাজে শূদ্রের দাসসুলভ অবস্থাই প্রতিফলিত হয়। আপস্তম্ব বলেছেন যে, ব্রাহ্মণ অভিবাদন জানাবেন তাঁর ডান হাত কান অবধি বাড়িয়ে, ক্ষত্রিয় বাড়াবেন বুক অবধি, বৈশ্য কান অবধি, আর শূদ্র পা অবধি।[২৪২] বিভিন্ন বর্ণের লোকের মঙ্গল ও শারীরিক কুশলতা বিষয়ে প্রশ্নের জন্য বিভিন্ন শব্দ নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন, ক্ষত্রিয়ের স্বাস্থ্যের জন্য 'অনাময়', শূদ্রের জন্য 'আরোগ্য'।[২৪৩] এও বলা হয়েছে যে ক্ষত্রিয় বা

২৩৪. অসমানায়াং চ শূদ্রাৎ পতিতবৃত্তিঃ। গৌতম ধ. সূ. ৪।২৭।

২৩৫. শূদ্রমভ্যাগতং শূদ্রোচেদাগতস্তং কর্মণি নিযুঞ্জ্যাৎ। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।২।৪।১৯; বৌধায়ন ধ. সূ. ২।৩।৫।১৪।

২৩৬. আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।২।৪।২০। ব্রাহ্মণদের জন্য রাজাকে এই ভাণ্ডার রাখতে হতো।

২৩৭. ৫।৪৩।

২৩৮. অন্যান্ ভৃত্যৈঃ সহানৃশংসার্থম্। ৫।৪৫।

২৩৯. আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।৪।৯।৫; বৌধায়ন ধ. সূ. ৩।৫।১১; বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১১।৯।

২৪০. ৬।১০।

২৪১. অবরোপ্যার্থ শূদ্রেণ। ঐ, ৬।১১।

২৪২. ১।২।৫।১৬।

২৪৩. আপস্তম্ব ধ সূ. ১।৪।১৪।২৬-২৯; গৌতম ধ সূ. ৫।৪১-৪২।

বৈশ্যকে কেউ তাঁদের নাম ধরে সম্ভাষণ করবেন না, ব্যবহার করবেন সর্বনাম।[২৪৪] এর অর্থ, কেবল শূদ্রকেই তাঁর নাম ধরে ডাকা যায়। দ্বিজ শ্রেণীর অবস্থান ছিল এতই উঁচুতে যে তাঁর সঙ্গে ঐ ধরনের ঘনিষ্ঠতা দেখানো যেত না। আদি পালি রচনায় নিম্নশ্রেণীর লোকে কখনোই ক্ষত্রিয়দের নাম ধরে বা মধ্যমপুরুষে সম্বোধন করেননি।[২৪৫] রাজা উদয়কে নাপিত গঙ্গমাল তাঁর কুলনাম ধরে ডাকলে, রাজমাতা ক্রোধে চীৎকার করে ওঠেন, "এই নীচবংশজাত অপবিত্র ক্ষৌরকার-পুত্র এতখানি আত্ম-বিস্মৃত হয়েছে যে, সে আমার ক্ষত্রিয়-জাতীয় মহীপতি পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করছে।"[২৪৬]

শূদ্রের স্পর্শে খাদ্য কলুষিত হয়ে ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য হয়ে যায়—এই ধারণা প্রথম দেখা যায় ধর্মসূত্রে। আপস্তম্বের মতে, কোন অপবিত্র ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের ব্যক্তির স্পর্শে খাদ্য কলুষিত হলেও অভোজ্য হয় না।[২৪৭] কিন্তু অপবিত্র শূদ্র যদি তা নিয়ে আসেন তবে আর খাওয়া চলে না।[২৪৮] কোন কুকুর বা 'অপপাত্র'—যার মধ্যে পড়েন চণ্ডাল ও 'পতিত' (জাতিচ্যুত)—দৃষ্টি দিলেও সে-খাদ্য একইভাবে অভোজ্য হয়ে যায়।[২৪৯] আরেকটি বিধান অনুসারে, শূদ্র যদি আহার গ্রহণের সময়ে ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ আহারে নিবৃত্ত হবেন, কারণ শূদ্রের স্পর্শে তিনি কলুষিত হয়ে গেছেন।[২৫০] আপস্তম্ব এ-বিষয়ে আরও রক্ষণশীল বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, স্বধর্মে বর্তমান হলেও কোন শূদ্রের নিবেদিত খাদ্য অভোজ্য।[২৫১] 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'র একটি প্রাচীনতর পুঁথিতে অবশ্য 'শূদ্রবর্জম্' শব্দটি নেই। এর অর্থ ধরা হয় খাদ্য গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা।[২৫২] দেখা যাচ্ছে যে, আদি পর্বে এই জাতীয় মত প্রচলিত ছিল না, তখন শুধু অপবিত্র শূদ্রের খাদ্যই বর্জন করা হতো। তা হলেও, শূদ্রের নিবেদিত খাদ্য যে ব্রাহ্মণ পরিহার করবেন, এ-বিষয়ে সমস্ত ধর্মসূত্রই একমত।[২৫৩] হরদত্তের টীকা সমেত 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'র একটি অংশ[২৫৪] পড়লে দেখা যায় ব্রাহ্মণকে আপৎকালে শূদ্রের খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য স্বর্ণ ও অগ্নি স্পর্শ করিয়ে সেই খাদ্য শোধন করে নিতে হবে এবং যে-মুহূর্তে তাঁর কোন

২৪৪. সর্বনাম্না স্ত্রিয়ো রাজন্যবৈশ্যৌ চ ন নাম্না। আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।৪।১৪।২৩।

২৪৫. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩।

২৪৬. জাতক, ৩য়, পৃ ৪৫২।

২৪৭ ১।৫।১৬।২১।

২৪৮. ঐ, ১।৫।১৬।২২।

২৪৯. আপস্তম্ব ধ. সূ ১।৫।১৬।৩০, হরদত্তের টীকা সমেত।

২৫০. ঐ, ১।৫।১৭।১।

২৫১. সর্ববর্ণানাং স্বধর্মে বর্তমানানাং ভোক্তব্যং শূদ্রবর্জমিত্যেকে। ঐ, ১।৬।১৮।১৩।

২৫২. বুহ্‌লার-এর বর্গীকরণ অনুযায়ী পুঁথি 'জি ইউ', আপস্তম্ব ধ. সূ., ভূমিকা, পৃ [৩]।

২৫৩. আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।৮।১৮।২ ; বৌধায়ন ধ. সূ. ২।২।৩।১ ; বশিষ্ঠ ধ. সূ ১৪।২-৪।

২৫৪. তস্যাপি ধর্মোপনতস্য। ১।৬।১৮।১৪।

বিকল্প বৃত্তির ব্যবস্থা হবে সেই মুহূর্তে তা পরিত্যাগ করতে হবে।[২৫৫] গৌতম অবশ্য ঐ জাতীয় কোন শর্ত ছাড়াই বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে[২৫৬] শূদ্রের খাদ্যগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পশুপালক, কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক, পরিবারের পরিচিত ব্যক্তি ও পরিচারকের থেকে তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন।[২৫৭] কিন্তু শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করে স্বীয় ভরণপোষণের অনুমতি গৌতম তাঁকে দেননি।[২৫৮] উপরন্তু, একমাত্র তিনিই বিধান দিয়েছেন যে, কোন স্নাতক (অর্থাৎ. হরদত্তের মতে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়) শূদ্রের জলে আচমন করবেন না।[২৫৯] কতকক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের শূদ্রান্ন বর্জন সংক্রান্ত বিধিগুলি বলবৎ করতে চাওয়া হয়েছে নানাভাবে ভীতিপ্রদর্শন ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। বশিষ্ঠের মতে, যোগ্যতম ব্রাহ্মণ তিনিই যাঁর উদরে শূদ্রান্ন নেই।[২৬০] স্বাভাবিকভাবেই, ঐ দোষে দুষ্ট ব্রাহ্মণ বঞ্চিত হবেন তাঁর আয়ের প্রধান উৎস, যজ্ঞীয় দক্ষিণা থেকে। ঐ একই লেখক এও বলেছেন যে, উদরে শূদ্রান্ন নিয়ে কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে তাঁকে গ্রাম্য-শূকর রূপে অথবা ঐ শূদ্রকুলেই জন্মগ্রহণ করতে হবে।[২৬১] এছাড়াও, যে-ব্রাহ্মণের অঙ্গ শূদ্রান্নের রসে পুষ্ট, তিনি প্রত্যহ বেদপাঠ করতে পারেন, হোমযাগও করতে পারেন, কিন্তু কখনোই তিনি ঊর্ধ্বগতি লাভ করবেন না। আবার শূদ্রান্ন ভোজনের পর তিনি যদি স্ত্রী-সহবাস করেন, তাহলে তাঁর পুত্ররাও হবেন শূদ্র এবং তিনিও স্বর্গার্হ (স্বর্গবাসের যোগ্য) হবেন না।[২৬২] বৌধায়ন বিধান দিয়েছেন, কোন ব্যক্তি যদি শূদ্রান্ন ভোজন ও শূদ্রাগমন-জনিত অপরাধ করেন, তবে তাঁর পাপক্ষালন হতে পারে এক সপ্তাহ প্রত্যহ সাতবার প্রাণায়াম করলে।[২৬৩] একই কারণে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সিদ্ধ যব (বার্লি) ভক্ষণের বিধানও তিনি দিয়েছেন।[২৬৪] এইসব প্রায়শ্চিত্তকে কিন্তু তৎকালীন অবস্থার প্রকৃত নিদর্শক বলে গণ্য করা উচিত হবে না। প্রথমটি রয়েছে চতুর্থ 'প্রশ্নে' (অধ্যায়ে): একটি মত অনুযায়ী যা অনেক পরবর্তীকালের রচনা, খৃস্টীয় দশম শতকের।[২৬৫] আর দ্বিতীয়টি আছে তৃতীয় 'প্রশ্নে': ব্যুহলার-এর মতে এটি মূলগ্রন্থে পরবর্তী প্রক্ষেপ।[২৬৬]

ধর্মসূত্র থেকে ধারণা হয় যে আদর্শ ব্রাহ্মণ সাধারণত শূদ্রের—বিশেষত, অপবিত্র শূদ্রের—খাদ্য পরিহার করতেন।[২৬৭] কিন্তু এই নিষেধ বলবৎ করার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে তার উদ্ভব সম্ভবত পরবর্তীকালে, এবং আলোচ্য পর্বে তা, মনে হয়, কার্যকর ছিল না। ক্ষত্রিয়

২৫৫. আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।৬।১৮।১৫। ২৫৬. বৃত্তিশ্চেন্নান্তরেণ শূদ্রাৎ। ১৭।৫।

২৫৭. পশুপালক্ষেত্রকর্ষককুলসঙ্গতকারয়িতৃপরিচারকা ভোজ্যান্নাঃ। ১৭।৬।

২৫৮. ৭।২২। ২৫৯. ৯।১১। ২৬০. ৬।২৬। ২৬১. ৬।২৭-২৯।

২৬২. ঐ। ২৬৩. ৮।১।৫। ২৬৪. বৌধায়ন ধ. সূ. ৩ ৬।৫।

২৬৫. হুলৎস্, 'দ বৌধায়নধর্মশাস্ত্র', ভূমিকা, পৃ [৯]। ২৬৬. ঐ।

২৬৭. নিরুক্ত ৩।১৬ র ব্রাহ্মণ ও বৃষল-এর বৈপরীত্যের উপর জোর।

বা বৈশ্যের উপর যে ঐ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি তা স্পষ্ট। যেমন, 'বৈশ্যদেব' অনুষ্ঠানে প্রথম তিন বর্ণভুক্ত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে শূদ্রকে অন্ন-প্রস্তুত কর্মে নিয়োগ করা যেত।[২৬৮] খাদ্য যাতে দূষিত হয়ে না যায়, তার জন্য রান্নার সময়ে তাঁকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হতো। এই কারণেই তাঁকে কেটে ফেলতে হতো মাথার চুল, দাড়ি, গায়ের লোম ও নখ। প্রতি পক্ষের অষ্টমীতে বা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে এ-কাজ করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও তাঁকে স্নান করতে হতো কাপড় পরেই।[২৬৯] সাধারণ-ভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে আর্যের অধীনে কর্মরত শূদ্র প্রতিমাসেই চুল দাড়ি কামিয়ে ফেলবেন কারণ, বৌধায়নের মতে, তাঁদের আচমনের রীতি ছিল আর্যদেরই মতো।[২৭০] ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই সর্বাধিক শুচিতা প্রত্যাশিত; কিন্তু সেখানেও যখন শূদ্রকে অন্ন প্রস্তুতির অনুমতি দেওয়া হতো, তখন দেখাই যাচ্ছে যে সাধারণত তাঁর অন্ন উচ্চবর্ণের লোকে (হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাহ্মণরা বাদে) গ্রহণ করতেন। এমনকি পরবর্তী একটি 'জাতকে'ও বলা হয়েছে যে দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক পাচকের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারেন।[২৭১] একটি ক্ষেত্রে অবশ্য জনৈক ক্ষত্রিয় পিতা তাঁর দাসী-স্ত্রীর গর্ভ-জাত কন্যার সঙ্গে আহার করেননি। কিন্তু এই অংশটি আছে এক পরবর্তী 'জাতকে'র বর্তমান কাহিনীর মধ্যে,[২৭২] আর তাই আমাদের আলোচ্য পর্বের ক্ষেত্রে না-ও প্রযোজ্য হতে পারে। আদি পালি রচনায় অবশ্য অশুচি ব্যক্তির স্পৃষ্ট খাদ্য, বিশেষত তাঁদের ভুক্তাবশেষ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা, এবং এই বিধি-ভঙ্গের শাস্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলি পাওয়া যায়।[২৭৩] কিন্তু এমন কিছু নেই যাতে দেখা যাবে এগুলো বিশেষ করে শূদ্রদের জন্যই বিহিত। এর কারণ সম্ভবত এই যে জনগোষ্ঠী ও কুল ভেঙে বর্ণবিভাগ হওয়ার পরেও কিছুকাল একটি প্রাচীন ইন্দো-ইওরোপীয় প্রথার প্রভাব রয়ে গিয়েছিল। প্রথমটি হলো: বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে কুলভুক্ত সব লোকই সর্বসাধারণের আহারে যোগ দিতে পারবেন।[২৭৪] দূষণপ্রথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল তখনই, যখন উচ্চ-বর্ণের লোক তাঁদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দৃঢ় ও স্থায়ী করার উপায়রূপে এই প্রথাকে ব্যবহার করলেন।

২৬৮. ···আর্যাধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্তারঃ স্যুঃ। আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।২।৩।১-৪। পরের একটি পুঁথিতে এই অংশটি নেই (বুহ্‌লার এর বর্গীকরণ অনুযায়ী 'জি')। অন্ন প্রস্তুত করা থেকে শূদ্রদের বাদ রাখার জন্যই পরবর্তীকালে এটি অপসারণ করা হয়।

২৬৯ ঐ, ২।২।৩।৬-৮।

২৭০. ১।৫।১০।২০; 'সি টি' (Ct) পুঁথিতে (হুলৎস্-এর বর্গীকরণ অনুযায়ী) এই অংশটি পাওয়া যায় না। পুঁথিটি দক্ষিণী দলের, উত্তরী পুঁথিগুলোর চেয়ে আরও আদিরূপের পাঠ থেকে সংকলিত ('দ বৌধায়নধর্মশাস্ত্র', ভূমিকা, পৃ [৮])।

২৭১ জাতক, ৫ম, পৃ ২৯৩। ২৭২. ঐ, ৪র্থ, পৃ ১৪৫-৪৬।

২৭৩ ফিক, 'সোশ্যাল অর্গানাইজেশন অফ নর্থ-ইস্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৪৭।

২৭৪. সেনার্ট, 'কাস্ট ইন ইণ্ডিয়া', পৃ ১৮২-৮৩।

বর্ণের কথা বিবেচনা করেই ধর্মসূত্রের বিবাহ-সংক্রান্ত নিয়মগুলি রচিত। এই যুগে আট রকমের বিবাহ-পদ্ধতি দেখা যায়। তার মধ্যে 'গান্ধর্ব' (প্রণয়-ঘটিত বিবাহ) এবং 'পৈশাচ' (প্রলুব্ধ করে বিবাহ, অবশ্য তাতে এক ধরনের সম্মতিও থাকে) বিবাহ শুধু বৈশ্য ও শূদ্রদের ক্ষেত্রেই সিদ্ধ বলে ধরা হতো। বৌধায়নের মতে, প্রথমটি বৈশ্যের জন্য, দ্বিতীয়টি শূদ্রের।[২৭৫] এই মতের সমর্থনে তিনি বলেছেন যে বৈশ্য ও শূদ্ররা যেহেতু কৃষি ও সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাই তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না।[২৭৬] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণের রমণীরা যেহেতু নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করতেন, তাই স্বামীদের উপর তাঁরা হতেন তুলনায় কম নির্ভরশীল। জীবিকা অর্জনের অপারগতার দরুন উচ্চবর্ণের রমণীরা হতেন বেশি নির্ভরশীল, কিন্তু সমাজে মান্য।

বৈবাহিক সম্পর্কের স্থায়িত্বও বর্ণানুযায়ী হবে বলে ধরা হতো। বশিষ্ঠের মতে বর্ণ যতই উচ্চ হবে বিবাহও হবে ততই স্থায়ী। যেমন বলা হয়েছে যে, স্বামী গৃহত্যাগ করলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের সন্তানবতী স্ত্রী অপেক্ষা করবেন পাঁচ বছর, বৈশ্যের স্ত্রী চার বছর এবং শূদ্রের স্ত্রী তিন বছর। নিঃসন্তান হলে এই অপেক্ষার কাল ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে কমে যাবে এক বছর, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকের ক্ষেত্রে দু বছর।[২৭৭] ফলত, শূদ্রাকে অপেক্ষা করতে হবে মাত্র এক বছর। এই নিয়ম নিম্নবর্গের রমণীদের তুলনায়-স্বাধীন অবস্থারই সূচনা করে। তাঁদের বৈবাহিক বন্ধন সহজেই ছিন্ন করা যেত।

কিন্তু উচ্চতর বর্ণের স্বামীরা তাঁদের শূদ্রা স্ত্রীদের সমপর্যায়ী বলে গণ্য করতেন না। বশিষ্ঠ বলেছেন, কৃষ্ণবর্ণা কোন শূদ্রা রমণীকে ভোগার্থে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করা চলতে পারে,[২৭৮] ধর্মপত্নীরূপে নয়।[২৭৯] ঐ একই সূত্রের অন্য শ্লোকে আর্যকে শূদ্রবর্ণের স্ত্রীবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যদি অবশ্য তার সঙ্গে যথোপযুক্ত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা না হয়। বশিষ্ঠ স্বয়ং কিন্তু ব্যাপারটি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেননি,[২৮০] কারণ ঐ ধরনের বিবাহের ফলে কুলের অপকর্ষ ঘটে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ হয় না।[২৮১]

২৭৫. ১।১১।২০।১৩।

২৭৬. অরক্ষিতকলত্রা হি বৈশ্যশূদ্রা ভবন্তি, কর্ষণশুশ্রূষাধিকৃতত্বাৎ। বৌধায়ন ধ. সূ. ১।১১।২০।১৪ ১৫। বুহ্‌লার-এর অনুবাদ—বৈশ্য ও শূদ্র তাঁদের স্ত্রীদের বিষয়ে বিচার-শীল ('পার্টিকুলার') নন—এই বাক্যের অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশ করে না। (সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ইস্ট, ১৪, পৃ ২০৭)। ২৭৭. বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১৭।৭৮।

২৭৮. কৃষ্ণবর্ণা যা রামা রমণায়ৈব ন ধর্মায়। বশিষ্ঠ ধ সূ. ১৮।১৮।

২৭৯ ঐ। তুলনীয়: ঘোষাল, 'ইন্ডিয়ান কালচার', ১৪, পৃ ২২।

২৮০. শূদ্রামপ্যেকে মন্ত্রবর্জং তদ্‌বৎ, তথা ন কুর্যাৎ। বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১।২৫ ২৬।

২৮১. অতো হি ধ্রুবঃ কুলাপকর্ষঃ প্রেত্য চাস্বর্গঃ। বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১।২৭। প্রাচীন টিউটনদের মধ্যে কোন স্বাধীন মানুষ দাসীকে বিবাহ করলে স্বয়ং দাসে পর্যবসিত হতেন। লান্ট-মান, 'দি অরিজিন অফ দি ইনইকুয়ালিটি অফ দ সোশ্যাল ক্লাসেস', পৃ ২৮২।

আপস্তম্বের মতে, ব্রাহ্মণ কোন শূদ্রা রমণীর সঙ্গে সহবাস করবেন বা কোন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের পরিচর্যা করবেন এটা কাম্য নয়।[২৮২] আপস্তম্ব ও বৌধায়ন উভয়েই শূদ্রবর্ণের রমণীর সঙ্গে সম্পর্কিত পুরুষের জন্য শুদ্ধি-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়েছেন।[২৮৩] কিন্তু 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে'র অংশদুটি আছে চতুর্থ 'প্রশ্নে' (অধ্যায়ে)। আগেই দেখানো হয়েছে যে, এই 'প্রশ্ন'টি পরবর্তী প্রক্ষেপ। সুতরাং ঐসব প্রায়শ্চিত্ত আলোচ্য পর্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—একথায় গুরুত্ব না দিলেও চলে। শূদ্রা স্ত্রী বর্জনীয়া—এই মতের সঙ্গে বশিষ্ঠের গোড়ার দিকের একটি বিধান মেলে না। সেখানে বলা হয়েছে যে বর্ণ-ক্রমশ ব্রাহ্মণের তিনটি স্ত্রী থাকতে পারে, ক্ষত্রিয়ের দুটি আর বৈশ্য ও শূদ্রের একটি।[২৮৪] স্পষ্টতই প্রথম দুই বর্ণের লোকে শূদ্রার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারতেন। সুতরাং শুধু ভোগার্থেই শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণীয়া—এই মতের উৎপত্তি হয়তো পরবর্তীকালে। তাছাড়া এও সুস্পষ্ট যে বহু সংখ্যক স্ত্রী প্রতিপালন করতে পারতেন একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই। তাই, উচ্চবর্ণের লোকের মধ্যে বহুবিবাহের রীতি যেমন তাঁদের সচ্ছল আর্থিক অবস্থার অনুগ, শূদ্রদের একবিবাহও[২৮৫] তেমনি তাঁদের আর্থিক দুরবস্থারই সংগত।

ধর্মসূত্রে নিম্নবর্ণের রমণী বিবাহের অনুমোদন থাকলেও প্রতিলোম সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু তীব্র বিরাগ দেখা যায়।[২৮৬] গৌতমের মতে, অসম বর্ণের রমণীর গর্ভজাত শূদ্রের পুত্রকে 'পতিত' বলে গণ্য করা হবে।[২৮৭] মুখ্যত ঐ ধরনের বিবাহ এবং সম্পর্ক থেকেই আদি স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে প্রায় বারোটি মিশ্রবর্ণের ('বর্ণসংকর') উৎপত্তি সন্ধান করা হয়েছে। যেমন ক্ষত্রিয়ের গর্ভজাত শূদ্রের সন্তানকে বলা হতো ক্ষত্তা, বৈশ্যের গর্ভজাত সন্তানকে মাগধ।[২৮৮] শূদ্র ও ব্রাহ্মণীর পুত্রকে চিহ্নিত করা হতো চণ্ডাল বলে।[২৮৯] গৌতমের মতে, শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সন্তানকে যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ ও শূদ্র বলা হবে।[২৯০] ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার পুত্রকে বলা হয়েছে নিষাদ।[২৯১] শূদ্রার গর্ভজাত নিষাদের

২৮২. ১।৯ ২৭।১-১১।

২৮৩ আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।৯।২৬।৭ ; ২৭ ১১ বৌধায়ন ধ. সূ. ৪।২।১৩, ৬।৫-৬।

২৮৪. বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১।২৪। বৌধায়ন ১।৮।১৬।১-৪ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে চারজন স্ত্রীর অনুমতি দিয়েছেন, ক্ষত্রিয়ের তিন, বৈশ্যের দুই ও শূদ্রের এক।

২৮৫. বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন দুজনেই শূদ্রের জন্য একজন স্ত্রী বিহিত করেছেন। বশিষ্ঠ অবশ্য বৈশ্যের জন্যও একই বিধান রেখেছেন।

২৮৬. সাধারণত এ যুগের 'জাতি'রা সবর্ণ বিবাহই করতেন। ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৫১।

২৮৭. ৪।২৭। ২৮৮. বৌধায়ন ধ সূ. ১।৯।১৭।৭। ২৮৯. ঐ ; বশিষ্ঠ ধ.সূ. ১৮।১।

২৯০. ৪।২১ ; তুলনীয় : বৌধায়ন ধ.সূ. ২।৩।৩০।

২৯১. বৌধায়ন ধ. সূ. ২।২।৩।২৯ ; গৌতম ধ. সূ. ৪।১৬ ; বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১৮।৮।

পুত্রকে বলা হয় পুক্কস, আর শূদ্র ও নিষাদ বর্ণের রমণীর পুত্রের নাম কুক্কুটক।[২৯২] ক্ষত্রিয় ও শূদ্রার মিলনের ফলে যে-সন্তান তাঁর নাম উগ্র;[২৯৩] আর বৈশ্য ও শূদ্রার সন্তানকে ধরা হয় রথকার বলে।[২৯৪] বিভিন্ন বর্ণের এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধর্মসূত্রের মতে শূদ্র ও উচ্চতর বর্ণের মধ্যে 'অনুলোম' এবং 'প্রতিলোম' বিবাহকেই বর্ণসংকরের উৎপত্তির বহুপ্রজ উৎস বলে গণনা করা হতো। এঁদের মধ্যে অনেককেই অস্পৃশ্যের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এইসব বর্ণসংকরের অধিকাংশই পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আর কিছু নয়। সম্পূর্ণ এক কাল্পনিক উৎপত্তির কাহিনী দিয়ে এদের মূল তথা স্বীকৃত চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।[২৯৫] তাহলেও, কালক্রমে নতুন নতুন বর্ণ গঠনের ক্ষেত্রেও সম্ভবত এই ব্যাখ্যার প্রভাব পড়ে, কারণ এরকম ঘটনা সাম্প্রতিককালেও ঘটেছে।[২৯৬]

আদি গৃহ্যসূত্রগুলোর কোথাওই উপনয়ন-অনুষ্ঠান থেকে শূদ্রদের বর্জন করার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে' বলা হয়েছে যে উপনয়ন ও বেদপাঠে শূদ্রের অধিকার নেই।[২৯৭] মনে করা হতো, কোন শূদ্রের, বিশেষত চণ্ডালের উপস্থিতিই বেদমন্ত্র-আবৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ার যথেষ্ট কারণ।[২৯৮] এমত অবস্থায় বৌধায়ন ও গৌতম অনধ্যায়ের পক্ষপাতী।[২৯৯] গৌতম আরও বলেছেন যে কখনোই একই নগরে অধ্যয়ন করা উচিত নয়।[৩০০] নগর শব্দটির ব্যাখ্যা করে মস্করী বলেছেন, শূদ্র-প্রধান নগর।[৩০১] একমাত্র গৌতমই বলেছেন যে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ করা হবে, এবং সেই মন্ত্র স্মরণ রাখলে তাঁর দেহ করা হবে দ্বিখণ্ডিত।[৩০২] এই ভয়ংকর বিধান, মনে হয়, মনুর প্রান্তবাদী মনোভাবেরই প্রতিফলন;[৩০৩] আর তাই 'গৌতম-স্মৃতি'তে এটি প্রক্ষেপ রূপেই ধর্তব্য। তাহলেও, এমনকি এই পর্বেও শূদ্রদের বেদশিক্ষা দান সংক্রান্ত ধারণার তীব্র বিরোধিতা করা হচ্ছিল—সে-কথা স্পষ্ট।

'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'র একটি অংশে অবশ্য শূদ্রদের বেদশিক্ষার অনুকূলে মত দেওয়া হয়েছে। বেদশিক্ষার জন্য আচার্যকে ছাত্রের দক্ষিণাদান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে 'উগ্র' কিংবা শূদ্রের কাছ থেকে তিনি সর্বদাই তা

২৯২. বৌধায়ন ধ. সূ. ১ ৯।১৭।১৩-১৪। ২৯৩. ঐ, ১।৯।১৭ ৫।

২৯৪. ঐ, ১।৯।১৭।৬। ২৯৫. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৯।

২৯৬. এই ধরনের কয়েকটি জনগোষ্ঠী আছে ছোটনাগপুরে, আর এই ধরনের কয়েকটি জাতি আছে পূর্ব নেপালে।

২৯৭ অশূদ্রাণাম্ অদুষ্টকর্মণামুপায়নং বেদাধ্যয়নমগ্ন্যাধেয়ং ফলবন্তি চ কর্মাণি। ১।১।১।৬।

২৯৮. ঐ. ১।৩।৯।৯; শাঙ্খায়ন গৃ. সূ. ৪।৭ ৩৩।

২৯৯. বৌধায়ন ধ সূ. ১ ১১।২১।১৫; গৌতম ধ.সূ. ১৬।১৯।

৩০০ গৌতম ধ.সূ ১৬।৪৬। ৩০১. তত্র শূদ্রাদিভূয়িষ্ঠে অনধ্যয়ঃ।

৩০২. উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ, ধারণে শরীরভেদঃ। ১২।৪-৬। ৩০৩. ৮।২৭০-২৭২।

গ্রহণ করতে পারেন।[৩০৪] শূদ্রের যখন বেদপাঠে অধিকার ছিল এ হয়তো সেই প্রথম দিকের অবস্থারই ইঙ্গিত। কিন্তু পরে শুধু গৌতম বা বশিষ্ঠই নন, স্বয়ং আপস্তম্বও শূদ্রকে এই অধিকার দিতে অস্বীকার করেছেন। যেহেতু বেদই ছিল ধর্মের আকরগ্রন্থ, তাই স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসেবেই বশিষ্ঠ ঘোষণা করেছেন যে, শূদ্রেরা ধর্মের উপদেশ বা বিষয়বস্তু কোনটাই জানার যোগ্য নন।[৩০৫] মনে হয় এই বিধানের উদ্দেশ্য ছিল, যে-ধর্মবলে শূদ্রদের শাসন করা হয় সে সম্বন্ধে তাঁদের সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখা।

আপস্তম্ব ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, নারী ও শূদ্রেরা 'অথর্ববেদে'র একটি পরিশিষ্ট পাঠ করতে পারবেন।[৩০৬] বলা হয়েছে যে এই অংশে আছে নৃত্য-গীত, প্রাত্যহিক কলাবিদ্যা ও শিক্ষার অন্যান্য বিভাগ।[৩০৭] গৌতমের একটি বাক্যের টীকায় মস্করীও অনুরূপ শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্র উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, নিষাদকে যেন হস্তীশিক্ষণ কলায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত করা হয়।[৩০৮] এইসব থেকে মনে হয় যে শূদ্রেরা শিল্প ও কারু-শিক্ষা পেতে পারতেন, কিন্তু বৈদিক শিক্ষার (যাকে মোটামুটিভাবে অক্ষর-শিক্ষা বলা যায়) অনুমতি তাঁদের ছিল না। ধর্মসূত্রে তাই অক্ষর-শিক্ষা ও প্রযুক্তি-শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথমটি দ্বিজবর্ণভুক্তদের ও দ্বিতীয়টি শূদ্রদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে। এও বলা হয়েছে যে বেদ কৃষি বিনাশ করে, এবং কৃষি বেদবিনাশিনী।[৩০৯] এ-ধরনের একটি বিধানের প্রভাব শুধু যে শূদ্রদের উপরেই পড়বে তা নয়, যেসব বৈশ্য চাষবাস করেন স্বভাবতই তাঁদের উপরেও পড়বে। এই রীতি বাস্তবে কতটা কার্যকর ছিল তা আমরা জানি না। পরবর্তীকালে একটি 'জাতকে' আছে যে দুটি চণ্ডাল বালক বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছদ্মবেশে তক্ষশিলা গিয়েছিল। অনবধানতাবশত নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলায় তারা ধরা পড়ে যায় এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়।[৩১০] তাহলেও অন্যান্য 'জাতক'-কাহিনীতে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের ছাত্র-তালিকায় বণিক, বস্ত্রকার,[৩১১] এমনকি ধীবরের পুত্রও আছেন।[৩১২] সুতরাং বাস্তবে, এই পর্বে শূদ্রদের শিক্ষা অর্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল না।

ধর্মসূত্র অনুযায়ী শূদ্রদের বৈদিক শিক্ষা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে, স্বাভাবিক-ভাবেই, যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠানে তাঁরা যোগ দিতে পারতেন না, কারণ বৈদিকমন্ত্র

৩০৪ ···সর্বদা শূদ্রত উগ্রতো বাচার্যার্থস্যাহরণং ধার্ম্যমিত্যেকে। আপস্তম্ব ধ সূ. ১।২।৭।১৯-২১।

৩০৫. ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ···ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্মম্। বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১৮।১৪।

৩০৬. আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।১১।২৯।১১-১২, হরদত্তের টীকা সমেত।

৩০৭. সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট, ২, পৃ ১৬৯। ৩০৮. গৌতম ধ. সূ. ৪।২৬।

৩০৯. বেদঃ কৃষিবিনাশায় কৃষি বেদবিনাশিনী। বৌধায়ন ধ. সূ. ১।৫।১০।৩০।

৩১০. জাতক, ৪র্থ পৃ ৩৯১-৯২। ৩১১. ঐ, ৪র্থ, পৃ ৩৮। ৩১২. ঐ, ৩য়, পৃ ১৭১।

ছাড়া সেগুলো করা অসম্ভব। 'আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে'র একটি বিধানের[৩১৩] ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে 'মধুপর্ক' অনুষ্ঠানকালে উচ্চারিত বেদমন্ত্র শূদ্ররা শুনতে পারেন।[৩১৪] অনুরূপভাবে জৈমিনি উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, বাদরি নামে এক প্রাচীন শিক্ষক বলেছেন, চতুর্বর্ণের প্রত্যেক ব্যক্তিই যজ্ঞ করতে পারেন।[৩১৫] তিনি স্বয়ং কিন্তু এই ধারণা সমর্থন করেন নি,[৩১৬] মনে হয়, তিনি তাঁর যুগের প্রভাবশালী মতেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বৈদিক যজ্ঞের জন্য শূদ্র কখনোই পবিত্র অগ্নি প্রজ্বালন করতে পারবেন না।[৩১৭] তিনি কোন সংস্কার কর্মেরও অধিকারী নন।[৩১৮] বৈদিক যজ্ঞাদি থেকে তাঁকে এমনভাবে বর্জন করা হলো যে কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি ও দৃষ্টিও পরিহার্য।[৩১৯] শূদ্ররা সাধারণত প্রচলিত অভিবাদন 'নমঃ' ব্যবহার করতে পারতেন না,[৩২০] বিশেষ অনুমতি পেলে তবেই তা পারতেন।[৩২১] গৌতম অবশ্য কয়েকজন প্রামাণিক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা শূদ্রকে 'পাকযজ্ঞ' (সাধারণ গৃহ্য আচার) নামে কিছু নির্বাচিত ক্ষুদ্র বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদনের অনুমতি দিয়েছেন।[৩২২] বোধায়ন অন্যান্যদের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে তাঁদের মতে, জলে অবগাহন স্নান সকল বর্ণের জন্যই বিহিত, কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে শরীরে জল-সিঞ্চন শুধু দ্বিজদেরই জন্য বিশেষরূপে বিহিত।[৩২৩]

যুক্তি দেওয়া হয় যে এইসব নানান যজ্ঞ ও অনুষ্ঠান না-করাই ছিল শূদ্রদের এক বিশেষ অধিকার, এইসব দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন।[৩২৪] কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে সুবিধাজনক মনে হচ্ছে, তৎকালীন প্রভাবশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সেটাই ছিল এক অসুবিধা: কারণ যজ্ঞ যাঁরা করেন না তাঁদের সামাজিক অবস্থান যেত নেমে।[৩২৫]

গৌতম বিধান দিয়েছেন, শূদ্র অবশ্যই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করবেন।[৩২৬] উদ্ধৃতি দিয়ে হরদত্ত দেখিয়েছেন যে, অপর এক টীকাকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শূদ্র শুধু গার্হস্থ্য-জীবনই যাপন করতে পারেন, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-জীবন নয়।[৩২৭] মনে হয়, পরবর্তীকালে নিয়ম হয়ে ওঠে যে, ব্রাহ্মণ যাপন

৩১৩. ১।২১।১২ (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ); ১।২৪।১২-১৫ (সেক্রেড বুকস্ অফ দি ইস্ট অনুবাদ)।

৩১৪. হপকিন্স, 'মিউচুয়াল রিলেশনস্ অফ দ ফোর কাস্টস ইন মনু', পৃ ৮৬, টী. ১।

৩১৫. জৈমিনি মীমাংসা সূত্র, ৬।১।২৫-২৭। ৩১৬. ঐ, ৬।১।৩৩ ইত্যাদি।

৩১৭. আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।১।১।৬।

৩১৮. শূদ্রমিত্যসংস্কার্যো বিজ্ঞায়তে। বশিষ্ঠ ধ. সূ. ৪।৩।

৩১৯. পারস্কর গৃ. সূ, ২।৮।৩। ৩২০. গৌতম ধ. সূ. ১০।৬৪। ৩২১. ঐ।

৩২২. ১০।৬৫। ৩২৩. ২।৪।৭।৩। ৩২৪. দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৫।

৩২৫. দত্ত তাঁর বই-এর পৃ ১৭৭-৭৮ এ এ-তথ্য প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করেছেন।

৩২৬. ১০।৫৫। ৩২৭. নাশ্রমান্তরা প্রাপ্তিরিতি। গৌতম ধ. সূ. ১০।৫৫-র টীকা।

করবেন জীবনের চারটি আশ্রম, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিন, নাগরিক দুই এবং শূদ্র এক।[৩২৮] সর্বদাই যে এরকম হতো তা হয়তো নয়, কিন্তু শূদ্রের বৃত্তি হলো উচ্চবর্ণের সেবা—এর সঙ্গে তাঁদের প্রতি এই বৈষম্যের সঙ্গতি আছে। কারণ, শুধু গৃহস্থ হিসেবেই শূদ্রের পক্ষে সে-কাজ করা সম্ভব হতো।

শূদ্রের অবশ্য শ্রাদ্ধকর্মে অধিকার ছিল।[৩২৯] কিন্তু গৌতম ও বশিষ্ঠ বিধান দিয়েছেন যে, 'সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে তাঁর অশৌচ থাকবে এক মাস।[৩৩০] বশিষ্ঠের মতে, ব্রাহ্মণ রাজন্য ও বৈশ্যের ক্ষেত্রে অশৌচের সময় হলো যথাক্রমে দশ, পনের ও কুড়ি দিন।[৩৩১] গৌতম অবশ্য ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের এই সময় কমিয়ে করেছেন যথাক্রমে চার দিন ও আট দিন।[৩৩২] দীর্ঘতম সময় ধরে অশৌচ পালন করতে (যদি করতেন) শূদ্রদের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হতো। জীবিকা অর্জনে অপারগ হয়ে তিনি বাধ্য হতেন উত্তমর্ণ বা প্রভুর কৃপাপ্রার্থী হতে। এমনকি আধুনিক যুগেও দেখা গেছে যে কালাশৌচের সময় দরিদ্র শূদ্ররা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু একদিক থেকে শূদ্রদের অবস্থা ছিল একটু উন্নত। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের শবদেহও ছুঁতে পারবেন না—এতটা অশুচি অন্তত তাকে ভাবা হতো না। এমনকি ব্রাহ্মণের শবদেহও তিনি শ্মশানে বহন করে নিয়ে যেতে পারতেন,[৩৩৩] পারতেন সেখানে চিতা স্পর্শ করতে।[৩৩৪]

উচ্চতর তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই সবচেয়ে নিষ্ঠাভরে ধর্মীয় কর্তব্যপালন করবেন—এটাই প্রত্যাশিত। তাই বৌধায়ন বিধান দিয়েছেন: যে-ব্রাহ্মণ দুবেলা সন্ধ্যাহ্নিক করেন না, তাঁকে দিয়ে রাজা শূদ্রের কাজ করাবেন।[৩৩৫] হাতের কাজ করলেও ব্রাহ্মণের মর্যাদাহানি হতো। বৌধায়ন বলেছেন, যে-ব্রাহ্মণ গো-পালন করেন, বাণিজ্য করে জীবিকা অর্জন করেন, কারুকর্মী, নট, ভৃত্য বা কুসীদজীবীর কাজ করেন, তাঁকে শূদ্র বলে গণ্য করা উচিত।[৩৩৬] আরও এক ধাপ এগিয়ে গৌতম বলেছেন, অনার্য (অর্থাৎ শূদ্র)-র জীবিকা গ্রহণ করবেন যে-আর্য, তিনি অবনমিত হবেন সেই পর্যায়েই।[৩৩৭] এই অংশের ভাষ্যে হরদত্ত মনে করেন, কোন ব্রাহ্মণ যদি অনার্যের কৃত্য পালন করেন

৩২৮. মাক্স মুলার, 'দ হিবার্ট লেকচরস্', পৃ ৩৪৩। ৩২৯. গৌতম ধ. সূ. ১০।৫৩।

৩৩০. ঐ. ১৪।২ ৪; বশিষ্ঠ ধ. সূ. ৪ ৩০। ৩৩১. বশিষ্ঠ ধ. সূ. ৪।২৭-২৯।

৩৩২ ১৪।২-৪। অন্যদের মতে বৈশ্যের ক্ষেত্রে অশৌচের কাল একপক্ষও স্থায়ী হতে পারে (ঐ)।

৩৩৩. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 'ইন্ডো-আরিয়ানস্', ২য়, পৃ ১৩১-৩২।

৩৩৪. আশ্বলায়ন গৃ. সূ. (সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট অনুবাদ), ৪।২।১৯-২১। এখানে 'বৃষল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ৩৩৫. বৌধায়ন ধ. সূ. ২।৪।৭।১৫।

৩৩৬, ঐ, ১।৫।১০।২৪; তুলনীয়: বশিষ্ঠ ধ. সূ. ২।২৭।

৩৩৭. আর্যানার্যয়োর্ব্যতিক্ষেপে কর্মণঃ সাম্যম্। ১০।৬৭।

তাহলে তিনি আর শূদ্রের সেবা থাকবেন না। আশ্চর্য এই যে, তিনি আরও বলেছেন, কোন শূদ্র যদি আর্যের কাজ করেন, তাহলে অন্যান্য অনার্য বৃত্তিধারী যেন তাঁকে অবজ্ঞা না করেন। সাধারণভাবে আর্যদের স্থান যেহেতু ছিল উচ্চতর, তাই মনে হয় ঐভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শনের কোন অবকাশই ছিল না। উচ্চতর বর্ণের লোক, বিশেষত ব্রাহ্মণরা, কায়িক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখতেন: ঐ ধরনের নিয়মগুলো তারই ইঙ্গিত। এর ফলেই, কায়িক শ্রম করে জীবিকা-অর্জন করতে হলে তাঁরা নেমে যেতেন শূদ্রের পর্যায়ে।[৩৩৮] 'বিনয় পিটকে' কৃষি, বাণিজ্য এবং গো-পালন উঁচু ধরনের কাজ বলে গণ্য।[৩৩৯] স্পষ্টতই, এগুলোয় বৈশ্যের কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। অপরপক্ষে ছুতোর ও ঝাড়ুদারদের নীচজাতীয় লোক বলে গণ্য করা হতো।[৩৪০] একই রচনায় পাঁচটি নীচজাতীয় কাজের ('হীনসিপ্পানি') উল্লেখ আছে—'নলকার' (যিনি বাঁশের কাজ করেন), 'কুম্ভকার' (যিনি মাটির কাজ করেন), 'পেসকার' (যিনি বোনার কাজ করেন), 'চম্মকার' (যিনি চামড়ার কাজ করেন) এবং 'নহাপিত' (যিনি চুল দাড়ি কাটার কাজ করেন)।[৩৪১] অন্যত্র অবশ্য 'নলকার', 'কুম্ভকার', 'পেসকার', এবং 'নহাপিতে'র কাজকে সাধারণ কারু-কর্মের তালিকায় রাখা হয়েছে।[৩৪২] দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চম কারুকর্ম, অর্থাৎ চর্মকারের কাজকে, সবাই ঘৃণার চোখে দেখতেন।

এইসব বৃত্তির সামাজিক মর্যাদার কথা আলাদা-আলাদা করে বিবেচনা করলে দেখা যায়, কুম্ভকারদের সম্পর্কে সাধারণত বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়নি।[৩৪৩] এক জায়গায় কিন্তু কুম্ভকারদের কাজকে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৪৪] নাপিত, মনে হয়, উপহাসের পাত্রই ছিলেন।[৩৪৫] তাই, থের (ভিক্ষু) হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নাপিত উপালিকে থেরী (ভিক্ষুণী)-রা কঠোর তিরস্কার করে বলেছিলেন, তাঁর কাজ হলো চুল ধোয়া ও ময়লা পরিষ্কার করা।[৩৪৬] কিছু কিছু কারুকর্মকে নীচু চোখে দেখার যে প্রবণতা ছিল এগুলো তারই ইঙ্গিত। শূদ্রদের নানান শাখা-প্রশাখার লোকে যেহেতু এইসব বৃত্তি অবলম্বন করতেন, তাই কালক্রমে শূদ্রবর্ণের যাবতীয় বৃত্তিই হয়ে গেল কলঙ্কচিহ্নিত। শূদ্রের ক্রিয়াকর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'দীঘ নিকায়ে'র

৩৩৮. ব্রাহ্মণরা কায়িক শ্রম করে বেঁচে আছেন এমন দৃষ্টান্ত 'জাতক'-এ আছে।

৩৩৯. বিনয় পিটক, ৪র্থ, পৃ ৬।

৩৪০. ঐ। বিনয় পিটক অর্থকথা-র (পৃ ৪৩৯) 'কোট্ঠককম্মম্' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'তচ্ছকম্ম' বলে; হর্নার কিন্তু এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার-রক্ষীর কাজ। সেক্রেড বুক্স্ অফ দ বুদ্ধিস্টস, ১১, পৃ ১৭৫।

৩৪১. বিনয় পিটক, ৪র্থ, পৃ ৭।

৩৪২. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ৫১।

৩৪৩. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৬০।

৩৪৪. লামক-কম্ম। জাতক, ১ম, পৃ ৩৫৬।

৩৪৫ জাতক, ৩য়, পৃ ৪৫২ ৫৩।

৩৪৬. কসবতো মলমজ্জনো নিহীনজচ্চো। বিনয় পিটক, ৪র্থ, পৃ ৩০৮।

একটি অংশে ব্যবহৃত একটি শব্দবন্ধ—"লুদ্দাচার খুদ্দাচার তি"[৩৪৭]—থেকে একথা স্পষ্ট। এর অর্থ: শূদ্র হলেন তাঁরাই যাঁরা মৃগয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃত্তিজীবী। একটি জৈন রচনাতেও কুকুর, চোর, ডাকাত, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি শব্দের মতো, 'বৃষল', 'গৃহদাস' (জন্মসূত্রে দাস), 'নীচকুলজাত হতভাগ্য' ইত্যাদি শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে ঘৃণাব্যঞ্জক পদ হিসেবে।[৩৪৮]

আদি পালি রচনায় প্রায়শই পাঁচটি ঘৃণ্য বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়: চণ্ডাল, নিষাদ, বেণ, রথকার ও পুক্কুস।[৩৪৯] বলা হয়েছে, যে তাঁরা 'নীচকুল'[৩৫০] বা 'হীনজাতি'[৩৫১]। নিম্নশ্রেণীর বাণিজ্য, কারুকর্ম ও জাতির এই তালিকা মোটের উপর প্রাগ্-মৌর্য যুগের ক্ষেত্রেই সত্য বলে মনে হয়। কারণ শ্রমণদের বুদ্ধ বিশেষভাবে বুঝিয়েছিলেন, তাঁরা যেন ভিক্ষুদের পূর্বের 'জাতি', 'সিপ্প', 'কম্ম' ইত্যাদি উল্লেখ করে অপমানসূচক কথা বলে সঙ্ঘে ভেদ সৃষ্টি না করেন।[৩৫২]

বৌদ্ধ রচনার কয়েকটি ঘৃণ্য জাতির সঙ্গে মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অস্পৃশ্য শাখাগুলোর মিল আছে। বৌদ্ধ ও জৈন রচনা অনুসারে চণ্ডাল ও পুক্কুসরা শূদ্রবর্ণভুক্ত নন।[৩৫৩] কিন্তু ধর্মসূত্রগুলোয় সেইসব মিশ্র জাতির তালিকায় তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাঁদের দেহে শূদ্র রক্ত আছে বলে ভাবা হতো। পতঞ্জলির মতে, পাণিনি সম্ভবত 'চণ্ডাল' ও 'মৃতপ' (শবের প্রহরী)-দেরও ধরেছেন সেইসব শূদ্রের মধ্যেই যাঁরা নগর ও গ্রামের বাইরে বাস করেন ও যাঁদের স্পর্শে ব্রাহ্মণদের কাঁসার পাত্র কলুষিত হয়ে যায়।[৩৫৪]

চণ্ডালরা, মনে হয়, আদতে ছিলেন এক আদিম জনগোষ্ঠী। তাঁদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার থেকেই তা স্পষ্ট।[৩৫৫] একটি জৈন রচনায় অন্যান্য জনগোষ্ঠী, যেমন, শবর, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, গৌড় ও গান্ধারদের সঙ্গে এঁদেরও উল্লেখ আছে।[৩৫৬] কিন্তু কালক্রমে চণ্ডালদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হলো। আপস্তম্বের মতে কোন চণ্ডালকে স্পর্শ ও দর্শন করাও

৩৪৭. দীঘ নিকায়, ৩য়, পৃ ৯৫।

৩৪৮. আয়ারঙ্গ সুত্ত, ২।৪।১।৮; তুলনীয়: দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ৯২-৯৩।

৩৪৯. মজ্ঝিম নিকায়, ৩য়, পৃ ১৬৯-৭৮; ২য়, পৃ ১৫২, ১৮৩-৮৪। ৩৫০, ঐ।

৩৫১. বিনয় পিটক, ২য়, পৃ ৬; তুলনীয়: অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় পৃ ৮৫; সংযুত্ত নিকায়, ১ম, পৃ ৯৩। ৩৫২. বিনয় পিটক, ৪র্থ, পৃ ৪-১১।

৩৫৩. সংযুত্ত নিকায়, ১ম, পৃ ১০২, ১৬৬; সূয়গডম্ ১৷৯৷২ ৩; ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ২০-৩০।

৩৫৪. শূদ্রাণামনিরবাসিতানাম্। পাণিনি ২.৪।১০; মহাভাষ্য, ১।৪৭৫।

৩৫৫. জাতক, ৪র্থ, পৃ ৩৯১-৯২।

৩৫৬. সূয়গডম্ (সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট অনুবাদ), ২।২।২৭।

পাপ।[৩৫৭] তাঁর 'ধর্মসূত্রে'র দুটি প্রাচীনতর পুঁথিতে অবশ্য এই অংশটি পাওয়া যায় না।[৩৫৮] এর থেকেই দেখা যায় যে অস্পৃশ্যতার ধারণা প্রকট হতে শুরু করে আরও পরে, সম্ভবত প্রাক্-মৌর্য যুগের শেষদিকে। পরবর্তীকালে গৌতমের রচনায়ও অনুরূপ একটি বিধান আছে। তাঁর মতে কোন চণ্ডাল যদি কারও দেহ অপবিত্র করে তবে সবস্ত্র স্নান করে শুদ্ধ হওয়া যায়।[৩৫৯]

পালি রচনায় চণ্ডালরা স্পষ্টতই অস্পৃশ্যরূপে চিহ্নিত। পরবর্তী একটি 'জাতক'-কাহিনীতে চণ্ডালদের বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর হীনতম মানুষ হিসেবে।[৩৬০] যে-বাতাস চণ্ডালদের দেহ স্পর্শ করেছে তার স্পর্শও দূষ্য বলে গণ্য করা হতো।[৩৬১] চণ্ডালদর্শনই ছিল অমঙ্গলের পূর্বাভাস।[৩৬২] তাই বারাণসীর এক সেট্‌ঠি-কন্যা চণ্ডাল দেখে নিজের চোখ ধুয়ে ফেলেন, কারণ সেই ঘৃণ্য ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রেই চোখ কলুষিত হয়ে গিয়েছিল।[৩৬৩] যে-খাদ্য বা পানীয়ে চণ্ডালের চোখ পড়েছে তা খাওয়া চলবে না।[৩৬৪] এমনকি অজ্ঞাতসারে তাঁর খাদ্য খেলেও সমাজচ্যুত হতে হতো। বলা হয়েছে, চণ্ডালের উচ্ছিষ্টের স্পর্শে দূষিত খাদ্য খেয়ে জাতি খুইয়েছিলেন ষোল হাজার ব্রাহ্মণ।[৩৬৫] এমন এক ব্রাহ্মণের কথাও আছে যিনি ক্ষুধার তাড়নায় চণ্ডালের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন ও পূর্বজাতির লোকদের ঘৃণা থেকে নিস্তার পেতে আত্মহত্যা করেন।[৩৬৬] একটি 'জাতকে'র গল্পে জনৈক চণ্ডাল নগরে প্রবেশ করলে লোকে তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে দেয়।[৩৬৭] উত্তরকালের জৈন রচনায়ও অনুরূপ কাহিনী আছে। বলা হয়েছে যে বারাণসীর জনৈক মাতঙ্গ নেতার দুই পুত্র যখন প্রেমের দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে গায়ক ও নর্তকদের একটি দল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন উচ্চবর্ণের লোকে পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত করে তাঁদের প্রচণ্ড প্রহার করেন এবং নগর থেকে বহিষ্কার করে দেন।[৩৬৮] সাধারণত উচ্চতর বর্ণের সব লোকই চণ্ডালদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করতেন, কিন্তু বিশেষভাবে তাঁদের ঘৃণা করতেন ব্রাহ্মণরা: 'জাতকে'র উল্লেখগুলো থেকে এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়।

চণ্ডালদের যখন ব্রাহ্মণ্য সমাজে অঙ্গীভূত করে নেওয়া হলো, তখন এই আত্তীকরণের ফলে তাঁদের পুরনো জীবনযাপন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ছেদ

৩৫৭ আপস্তম্ব ধ সূ. ২।১।২।৮।

৩৫৮. ব্যুহ্‌লার-এর বর্গীকরণ অনুযায়ী 'জি ইউ' (Gu) ২, ৩ পুঁথি (পূর্বোক্ত, ভূমিকা, পৃ [৩])।

৩৫৯. ১৪।৩০। ৩৬০. জাতক, ৪র্থ, পৃ ৩৯৭। ৩৬১. ঐ, ৩য়, পৃ ২৩৩।

৩৬২. ঐ, ৪র্থ, পৃ ৩৭৬, ৩৯১। ৩৬৩. ঐ। ৩৬৪. ঐ, ৪র্থ, পৃ ৩৯০।

৩৬৫. ঐ, ৪র্থ, পৃ ৩৮৭। ৩৬৬. ঐ, ২য়, পৃ ৮২-৮৪।

৩৬৭. ঐ, ৪র্থ, পৃ ৩৭৬, ৩৯১।

৩৬৮. উত্তরাধ্যয়ন সূত্র টীকা, ১৩, পৃ ১৮৫ ক। জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৪-এ উদ্ধৃত।

পড়েনি। তাঁরা যেহেতু নিষাদ ও ব্যাধ ছিলেন, সেইজন্যই সম্ভবত তাঁদের পশু ও মানুষের মৃতদেহ সরানোর ভার দেওয়া হয়। তাঁদের সর্বদাই মৃতদেহ অপসারণ ও দাহের[৩৬৯] কাজে যুক্ত থাকতে দেখা যায়।[৩৭০] চণ্ডাল হিসেবে পরিচিত 'পণ'রাও এ-কাজ করতেন।[৩৭১] কখনও কখনও রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার কাজেও চণ্ডালদের নিয়োগ করা হতো।[৩৭২] ধর্মসূত্রে জহ্লাদরূপে তাঁদের দেখা যায় না। 'জাতকে' অপরাধীদের বেত্রাঘাত এবং অঙ্গচ্ছেদের কাজে তিনি নিযুক্ত।[৩৭৩] বলা হয়েছে যে 'জাতকে'র 'চোরঘাতক' (চোরদের জহ্লাদ) হয়তো চণ্ডাল ছিলেন।[৩৭৪] কিছু কিছু চণ্ডাল ভোজবাজি ও মল্লক্রীড়া দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন।[৩৭৫] উত্তর ভারতের যেসব যাযাবর স্থানে-স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ান তাঁদের মধ্যে এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে।

চণ্ডালরা যাপন করতেন এক দরিদ্র হতভাগ্য জীবন। পালি রচনার একটি উপমায় বলা হচ্ছে যে, ছিন্নবস্ত্র পরে, ভিক্ষাপাত্র হাতে চণ্ডাল বালক-বালিকারা গ্রাম ও নগরে ঢুকেই নম্র ভাবভঙ্গি করে ও চলে যায়।[৩৭৬] পরবর্তী একটি 'জাতক'-কাহিনী থেকে জানা যায় যে চণ্ডালদের থাকত একজোড়া রঙীন পোশাক (অবশিষ্ট জনসাধারণ থেকে তাঁদের আলাদা করার জন্য), একটি কটিবন্ধ, একটি জীর্ণ আঙরাখা ও একটি মৃৎপাত্র।[৩৭৭]

প্রচলিত কথায় চণ্ডাল শব্দটি এমন এক ব্যক্তিকে বোঝাত যিনি গুণরহিত, বিশ্বাসহীন ও নীতিহীন।[৩৭৮] ফিক যথার্থই বলেছেন, 'জাতকে' চণ্ডালদের যে-ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, পুরোহিতদের তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।[৩৭৯] কিন্তু লক্ষণীয় যে চণ্ডাল বিষয়ে অধিকাংশ উল্লেখই পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী 'জাতক'-কাহিনীতে, বিশেষত চতুর্থ খণ্ডে। সুতরাং, প্রাগ্-মৌর্য যুগের শেষদিকে বা তারও পরবর্তীকালের ক্ষেত্রেই এগুলো প্রযোজ্য।

'পুক্কস' বা 'পুক্কুস'রা মনে হয় আরেকটি আদিম জনগোষ্ঠী, যাঁরা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৩৮০] কিন্তু তাঁদের ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য

৩৬৯. রামায়ণ ১।৫৮।১০।

৩৭০ ছবছড্ডক-চণ্ডালা, জাতক অর্থকথা, ৩য়, পৃ ১৯৫।

৩৭১. অন্তগড দসাও, ৬৫।

৩৭২ জাতক, ৪র্থ, পৃ ৩৯০।

৩৭৩. ঐ ৩য়, পৃ ৪১, ১৭৯।

৩৭৪. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৩৮।

৩৭৫. ঐ, পৃ ৪৩৯-৪০।

৩৭৬. ...কলোপিহত্থো নন্তিকবাসী গামং বা নিগমং বা পবিসন্তো নীচচিত্তং য়েব উতট্ঠপেত্বা পবিসতি। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ, পৃ ৩৭৬।

৩৭৭. জাতক, ৪র্থ, পৃ ৩৭৯।

৩৭৮. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য়, পৃ ২০৬।

৩৭৯. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৮।

৩৮০. পালি রচনায় এর কোন ইঙ্গিত নেই, কিন্তু মনু (১০।৪৯) ও বিষ্ণু (১৬।৯) শিকারকেই তাঁদের জীবিকা বলে বিহিত করেছেন।

সমাজের অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়—যেমন মন্দির ও রাজপ্রাসাদ থেকে ফুল সরানোর কাজে।[৩৮১] ফুল সরানোর জন্য তাঁরা যে মন্দির প্রাঙ্গণে যেতে পারতেন তার থেকেই দেখা যাচ্ছে, চণ্ডালদের মতো তাঁদের অতটা অবনত বলে মনে করা হতো না।

'বেণ'রা ছিলেন আরেকটি আদিম জনগোষ্ঠী, তাঁদের জীবিকা ছিল শিকার ও বাঁশের কাজ।[৩৮২] পরবর্তী একটি 'জাতকে' জনৈক 'বেণুকার' বা 'বেলুকারে'র কথা আছে যিনি তাঁর ব্যবসার জন্য জঙ্গলে এক আঁটি বাঁশ যোগাড় করতে গিয়েছিলেন।[৩৮৩] ধর্মসূত্রে এই বেণদেরও উৎপত্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বৌধায়নের মতে, বৈণরা হলেন বৈদেহক (যার পিতা বৈশ্য ও মাতা ক্ষত্রিয়া) পিতা এবং অম্বষ্ঠ (যার পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা বৈশ্যা) মাতার সন্তান।[৩৮৪] অর্থাৎ, চণ্ডাল ও পুক্কুসদের মতো বেণদের শরীরেও শূদ্ররক্ত আছে বলে ভাবা হতো না। পরবর্তী একটি 'জাতক'-কাহিনীতে অবশ্য 'বেণী' শব্দটি চণ্ডালের সঙ্গে একযোগে ভর্ৎসনাসূচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে;[৩৮৫] তাহলেও এমন কিছুই নেই যাতে দেখা যায় যে চণ্ডালদের মতো বেণরাও অস্পৃশ্যরূপে গণ্য হতেন। 'বিনয় পিটকে'র অর্থকথায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে বেণ হয়ে জন্মানোর অর্থ হলো ছুতোর ('তচ্ছক') হয়ে জন্মানো।[৩৮৬] বেণ ও তক্ষক যেহেতু অভিন্ন, তাই দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে, পরবর্তী বৈদিক সমাজে যে-তক্ষকদের স্থান ছিল অত্যন্ত উঁচুতে, বৌদ্ধ রচনায় তাঁদেরই নামিয়ে দেওয়া হলো ঘৃণিত জাতির পর্যায়ে।

বৌদ্ধ রচনায় রথকারও ঘৃণিত জাতির পর্যায়ে অবনমিত হয়েছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য রচনায় তখনও তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করছিলেন। গৃহ্যসূত্রে তাঁর উপনয়নের বিধান দেওয়া হয়েছে।[৩৮৭] রিস ডেভিডস প্রস্তাব করেছেন যে রথকাররা ছিলেন এক আদিম জনগোষ্ঠী।[৩৮৮] কিন্তু একথা ঠিক বলে মনে হয় না, কারণ বৈদিক যুগে তাঁরা ছিলেন আর্য বিশ্-এরই অংশ। এমন অবশ্য হতেই পারে যে পরবর্তীকালে কিছু কিছু আদিবাসীকে রথকারদের অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়েছিল। একটি পরবর্তী 'জাতকে'র অংশবিশেষের[৩৮৯] ভিত্তিতে বলা হয়েছে, চর্মকারের কাজ নেওয়ার দরুনই

৩৮১ জাতক, ৩য়, পৃ ১৯৫. তুলনীয় ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২১।

৩৮২ বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৫৪-৫৫। ৩৮৩. জাতক, ৪র্থ, পৃ ২৫১।

৩৮৪ বৌধায়ন ধ. সূ. ১।৯।১৭।১২। ৩৮৫. জাতক, ৫ম, পৃ ৩০৬।

৩৮৬. বেণজাতি তি তচ্ছকজাতি। সেক্রেড বুকস অফ দ বুদ্ধিস্টস, ১১, পৃ ১৭৩। তুলনীয়: জাতক, ৫ম পৃ ৩০৬।

৩৮৭. বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনীত……বর্ষাং রথকারং শিশিরে বা। ভারদ্বাজ গৃ. সূ. ১।১; বৌধায়ন গৃ সূ. ২।৫-৬। তুলনীয়: জৈমিনি-মীমাংসা সূত্র ৬।১।৫০।

৩৮৮. 'ডায়ালগস অফ দ বুদ্ধ', ১ম, পৃ ১০০।

৩৮৯. জাতক, ৬ষ্ঠ, পৃ ৫১। তুলনীয়: পেতবত্থু অট্‌ঠকথা ৩।১।১৩।

রথকারের মর্যাদা কমে যায়।[৩৯০] কিন্তু রাজারা যে রথ ব্যবহার করতেন তার চাকা তৈরির কাজে তখনও রথকারদের নিয়োগ করা হতো।[৩৯১] অধিকন্তু চর্মকারদের বৃত্তি যদিও হীন বলেই গণ্য, তাহলেও স্বয়ং চর্মকারকে কিন্তু ঘৃণ্য বর্ণের তালিকায় রাখা হয়নি। বৌদ্ধ রচনাদিতে রথকারদের ঘৃণ্য জাতি হিসেবে ধরার কারণ মনে হয় যুদ্ধ সম্বন্ধে বৌদ্ধদের বিরূপ মনোভাব। রথকাররা যুদ্ধের জন্যই রথ নির্মাণ করতেন। যাই হোক, একটা ব্যাপার পরিষ্কার : রথকারদের চণ্ডাল ও পুক্কুসদের মতো নীচ পর্যায়ে অবনত করা হয়নি।

বৌদ্ধ রচনায় ঘৃণিত জাতির তালিকায় নিষাদদের অন্তর্ভুক্তির কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়। ধর্মসূত্রে তাঁদের হীন অবস্থার সঙ্গে এর সঙ্গিত আছে। এঁরা ছিলেন প্রাগ্-আর্য জনগোষ্ঠী। ক্ষুদ্রাঙ্গ, দগ্ধকাষ্ঠবৎ গাত্রবর্ণ, আরক্ত চক্ষু,[৩৯২] সু-উচ্চ হনু, ক্ষীণাগ্র নাসা, কপিশ কেশ[৩৯৩]—এই হলো তাঁদের বর্ণনা। পুরোহিত শ্রেণীর উপর অত্যাচারী বেণ রাজার দেহ থেকে তাঁদের বিচিত্র উৎপত্তির এক কিংবদন্তী আছে।[৩৯৪] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তারে তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন—এ হয়তো তারই ইঙ্গিত। এমনকি ব্রাহ্মণ্য সমাজে গৃহীত হওয়ার পরেও নিষাদরা মূলত মৃগজীবীই থেকে যান।[৩৯৫] তাঁরা তাঁদের নিজেদের গ্রামেই বাস করতেন।[৩৯৬] কিছু নিষাদ সম্ভবত পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। পাণিনির 'গণপাঠে'[৩৯৭] নিষাদ গোত্রের কথা আছে, যদিও অন্য কোন প্রামাণ্য গোত্র-তালিকায় এর উল্লেখ নেই। আদিবাসী পুরোহিতদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে ব্রাহ্মণ হিসেবে পরিগ্রহণ না করলে, অথবা আদিবাসীদের পৌরোহিত্য না করলে এটা সম্ভব হতো না।[৩৯৮] সেই সঙ্গে এও স্পষ্ট যে পরবর্তী বৈদিক সমাজে নিষাদদের যে-মর্যাদা ছিল, এই পর্বে তাঁরা নিশ্চয়ই তা হারিয়ে ফেলেন।

পালি রচনায় অন্তত কয়েকটি ঘৃণ্য জাতিকে, বিশেষত নিষাদ ও চণ্ডাল-দের, অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হতো। মিলিতভাবে অস্পৃশ্যদের বলা হতো 'অন্ত্য' বা 'বাহ্য', অর্থাৎ গ্রাম বা নগরের বাইরের অধিবাসী। 'অন্ত্য'দের

৩৯০. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৫৬। ৩৯১. অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম, পৃ ১১১-১৩।

৩৯২. মহাভারত ১২।৫৯।১০২-০৩। ৩৯৩. দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৭।

৩৯৪. মহাভারত ১২।৫৯।৯৯-১০১। বিমলাচরণ লাহা বলেছেন, এঁরা ছিলেন নিষধ, নিষাদ নয় ('ট্রাইবস্ ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ১০০), কিন্তু মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণে নিষাদের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

৩৯৫. জাতক, ২য়, পৃ ২০০; ৬ষ্ঠ, পৃ ৭১-৭২, ১৭০।

৩৯৬. ঐ, ৬ষ্ঠ, পৃ ৭১-৭২। ৩৯৭. ৪।১।১০০।

৩৯৮ কোসম্বী, 'জার্নাল অফ আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি', ৭৫, পৃ ৪৪। এ-মত নির্ভর করছে এই ধারণার উপর যে নিষাদ গোত্র ছিল ব্রাহ্মণ গোত্র, যা সন্দেহজনক।

গৌতম 'পাপিষ্ঠ' বলে ধিক্কার দিয়েছেন।[৩৯৯] সৎ শূদ্র ও 'অন্ত্যযোনি'-দের পার্থক্য করেছেন বশিষ্ঠ। শেষোক্তরা কেবল নিজেদের বিচারের ক্ষেত্রেই সাক্ষী হতে পারতেন।[৪০০] 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে' 'অন্তঃ' শব্দটি চণ্ডালদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। দেখা যায়, তাঁরা বাস করতেন গ্রামের এক প্রান্তে।[৪০১] এই রচনায়ই আছে 'বাহ্য'দের কথা, যাঁদের মধ্যে বেদমন্ত্র উচ্চারণ নিষিদ্ধ। হরদত্ত শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এঁরা 'উগ্র' ও 'নিষাদ'।[৪০২] বশিষ্ঠের বর্ণনায় অন্তবসায়ী হলেন এমন এক জাতি, বৈশ্য রমণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে যাঁদের জন্ম।[৪০৩] বলা হয়েছে, যে-ব্রাহ্মণ পিতা অন্তবসায়ীদের সঙ্গে বাস করেন, বা তাঁদের রমণীর সঙ্গে সহবাস করেন তিনি বর্জনীয়।[৪০৪] অস্পৃশ্যরা সাধারণত থাকতেন গ্রাম বা নগরের প্রান্তে তাঁদের নিজেদের বসতিতে। প্রাচীন আর্য বসতিগুলো থেকে তাঁদের বহিষ্কার করার কোন ইচ্ছাকৃত নীতির ফলেই তাঁরা এইভাবে পৃথক্ হয়ে গিয়েছিলেন—এমন নয়। বরং মনে হয়, জনগোষ্ঠীয় গ্রামের সমস্ত লোককেই ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্যের পর্যায়ে অবনমিত করেছেন।

বর্ণসংকরের ফলেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব—ধর্মসূত্রে প্রদত্ত এই ব্যাখ্যা মানা যায় না। বলা হয়েছে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর পরম্পরা হানি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ফলেই অস্পৃশ্যতার উদ্ভব।[৪০৫] কিন্তু এ-মত গ্রাহ্য নয়, কারণ এই সামাজিক ব্যাপারটি দেখা দিতে শুরু করে প্রাগ্-মৌর্য যুগে, যে-সময়ে বৌদ্ধধর্মেরও উত্থান ও বিকাশ। এমনও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, যাঁরা তখনও গো-মাংস ভক্ষণ করতেন তাঁদেরই অস্পৃশ্য পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়।[৪০৬] এর ফলে হয়তো পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু এটিকে তাঁদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা বলে মানা যায় না। 'গৌতম ধর্মসূত্রে' একটি পরবর্তী উল্লেখ[৪০৭] ছাড়া আর কিছুই নেই যাতে মনে হবে, এই পর্বে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যে-ঘৃণাব্যঞ্জক মনোভাব থেকে অস্পৃশ্যতার উদ্ভব "তা স্পষ্টতই মূল ইন্দো-আর্য রীতি-নীতির অন্তর্গত নয়। এটা দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ধার-করা। আধুনিক যুগেও দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়দের মধ্যে অস্পৃশ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।"[৪০৮] কিন্তু ব্রাহ্মণ্যীকরণের আগেই যে

৩৯৯. ৪।২৮। আরেক জায়গায় গৌতম বলেছেন, অন্ত্যকে অশুদ্ধ বস্ত্র দিতে হবে (১৪।৪২)।

৪০০. ১৬।৩০।
৪০১. ১।৩।৯।১৫।
৪০২. ১।৩।৯।১৮।

৪০৩. ১৮।৩।
৪০৪. গৌতম ধ. সূ. ২০।১; তুলনীয়: ২৩।৩২।

৪০৫. 'মডার্ন রিভিউ' (ডিসেম্বর ১৯২৩), পৃ ৭১২-১৩। এই মত আরও বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করেছেন আম্বেডকর। 'দি আনটাচেবল্স্', অধ্যায় ৯।

৪০৬. আম্বেডকর, 'দি আনটাচেবল্স্', অধ্যায় ১০।

৪০৭. ২২।১৩-য় বলা হয়েছে, গো-হত্যা উপপাতক, প্রায়শ্চিত্ত করে ক্ষালন করতে হবে।

৪০৮. দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৬-০৭; তুলনীয়: পৃ ৩১।

দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়দের মধ্যে অস্পৃশ্যতা প্রচলিত ছিল এমন কোন নিদর্শন নেই। স্মৃতিকার বৌধায়ন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের লোক। আপস্তম্বকেও কখনও কখনও এই অঞ্চলের লোক বলে ধরা হয়েছে। আহার ও মেলামেশা সংক্রান্ত ব্যাপার শূদ্রদের প্রতি তাঁদের মনোভাব বরং উত্তরাগত অন্য দুই ধর্মসূত্রকারের চেয়ে অনেক কম রক্ষণশীল। তাছাড়া আগেই দেখানো হয়েছে যে উচ্চবর্ণের লোক—যাঁদের দাবি ছিল তাঁরা আর্য—কিছু কিছু কারুকর্ম ও বৃত্তিকে হীন বলে মনে করতেন। শেষত, কয়েকটি বৃত্তি ছিল তত্ত্বগত-ভাবেই অশুচি। এর থেকেও অস্পৃশ্যতার ধারণার উৎস সন্ধান করা হয়েছে।[৪০৯] কিন্তু সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: কেন বিশেষ কয়েকটি বৃত্তিকেই গণ্য করা হলো অশুচি বলে।

আদিম জনগোষ্ঠীর লোক ছিলেন মূলত নিষাদ ও ব্যাধ। বিপরীতপক্ষে, ব্রাহ্মণ্য সমাজের লোকে বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন এক নাগরিক জীবনের। তাঁরা ধাতুর কাজ ও কৃষিবিদ্যা জানতেন।[৪১০] এই সাংস্কৃতিক ব্যবধানই হলো অস্পৃশ্যতার উৎপত্তির অন্যতম কারণ। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর অনুন্নত বস্তুগত সংস্কৃতি এবং তার ফলে তাঁদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা আছে বৌদ্ধ রচনায়: "কোন নির্বোধ যদি দীর্ঘদিন পরে মনুষ্যজন্ম লাভ করে, সে জন্মায় চণ্ডাল, নিষাদ, বেণ, রথকার ও পুক্কুস—এই নীচজাতির কোন একটিতে। ভবঘুরে, অভাবী ও নিঃস্ব জীবনে তার পুনর্জন্ম হয়। পেটের জন্য অন্ন-পান ও পেছনের কাপড় তার জোটে না...।"[৪১১] এর থেকেই মনে হয়, এইসব ঘৃণ্য জাতির জীবিকা ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং শূদ্রদের চেয়ে তাঁদের অবস্থা ছিল আরও অনেকখানি খারাপ। শূদ্ররা তাও দাস ও কম্মকর রূপে নিযুক্ত হতেন, সে হিসেবে তাঁদের জীবিকার কিছুটা নিরাপত্তা ছিল। বাস্তব জীবনে এই বৈপরীত্যের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যেই যে-ঘৃণাব্যঞ্জক মানসিকতা বেড়ে উঠছিল তা আরও তীব্র হয়। সমসাময়িক গ্রীক সমাজে যেমন,[৪১২] বেদোত্তর সমাজেও তেমনি দেখা দিতে শুরু করে কায়িক শ্রম ও বৃত্তির প্রতি ঘৃণার মনোভাব। কালক্রমে উচ্চবর্ণের লোক, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা, প্রাথমিক উৎপাদন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন, তাঁদের পদ এবং কাজ হয়ে উঠল বংশানুক্রমিক, আর তখনই তাঁদের মধ্যে জেগে উঠল কায়িক শ্রমের প্রতি ঘৃণা—শুধু তা-ই নয়, যে-হাত সেই কাজ করে ঘৃণা প্রসারিত হলো তার দিকেও।

আদিবাসীদের অতি নিম্নস্তরের বস্তুগত সংস্কৃতির এই পটভূমিকায়, কায়িক শ্রমের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হলো বস্তুবিশেষের সঙ্গে

৪০৯. ঘুরে, 'কাস্ট অ্যান্ড ক্লাশ', পৃ ১৫৯। ৪১০. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৪।

৪১১. ...ন লাভী অন্নস্স পানস্স বত্থস্স যানস্স...। মজ্ঝিম নিকায়, ৩য়, পৃ ১৬৯-৭০: অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য়, পৃ ৮৫।

৪১২. 'পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট', সংখ্যা ৬।

সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা ('টাবু') এবং অশুচিতার আদিম ধারণা। আর এ দু-এ মিলেই সৃষ্টি হলো অস্পৃশ্যতা নামক এক অনন্য সামাজিক ঘটনা। চণ্ডাল-দের কাজের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। তাঁরা কাজ করতেন মৃতদেহ নিয়ে, যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অশুচিতা ও আতঙ্কের আদিম ধারণা। এর জন্যই ঐ ধরনের লোকদের সংস্রব পরিহার করা প্রয়োজন বলে মনে হলো। পরবর্তীকালে অস্পৃশ্যতার ধারণা আরও প্রসারিত হয়। শুধু যে নিষাদ ও পুক্কুসরাই এর আওতায় পড়লেন তা-ই নয়, পড়লেন নানা কারুশিল্পী, যেমন চর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদিও। কারণ, এই আমলে চম্মকার, পেসকারের কাজকে ঘৃণ্য বলে মনে করা হলেও তাঁদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হয়নি।

সবশেষে, এই পর্বের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শূদ্রদের অবস্থায় কতখানি প্রভাব ফেলেছিল সে-নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ধর্মীয় মুক্তি প্রসঙ্গে বলতে হয় যে বৌদ্ধধর্ম তার দরজা খুলে দিয়েছিল চতুর্বর্ণের সবার জন্যই। সকলেই সংঘে প্রবেশ করে ভিক্ষু হতে পারতেন।[৪১৩] শুধু তা-ই নয়, মুক্তির দ্বার খোলা ছিল চণ্ডাল ও পুক্কুসদের জন্যেও। এঁরাও নির্বাণসুখ লাভ করতে পারতেন।[৪১৪] দস্যু অঙ্গুলিমালকে যখন বৌদ্ধ সংঘে গ্রহণ করা হলো, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, "সত্যই আমার আর্য জন্ম লাভ হলো।"[৪১৫] এর থেকে দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধরা তাঁদের সংঘে শূদ্রদের প্রবেশ করতে দিয়ে যেন তাঁদের প্রাচীন উপনয়নের অধিকার প্রত্যর্পণ করলেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাঁদের এই অধিকার-চ্যুত করেছিল। কিন্তু জনগোষ্ঠীয় উপনয়ন যেখানে প্রস্তুত করে তুলত এই পৃথিবীর বাস্তব জীবনের জন্য, সেখানে এই উপনয়ন প্রস্তুত করত জীবনের দুঃখ থেকে আত্মিক মুক্তির জন্য।[৪১৬]

জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মে কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। বুদ্ধ বলতেন, রাজা বা রাজস্বের অধিকারী যেমন রাজস্বের সবটুকু আত্মসাৎ করবেন না, ব্রাহ্মণ বা শ্রমণও তেমনি নিজেরাই সমস্ত জ্ঞানের একাধিপতি হবেন না।[৪১৭] বৌদ্ধমতে জাতি-নির্বিশেষে যে কেউই আচার্য হতে পারেন। বলা হয়েছে যে, সুদ্দ, চণ্ডাল বা পুক্কুস—যা-ই হোন না কেন, আচার্যকে সর্বদাই সম্মান দেখাতে হবে।[৪১৮] একটি 'জাতক'-কাহিনীতে আছে যে এক ব্রাহ্মণ চণ্ডালের কাছ থেকে মন্ত্র শিখে, পরে লজ্জায় তাঁর গুরুকে অস্বীকার

৪১৩. মজ্‌ঝিম নিকায়, ১ম, পৃ ২১১ ; ২য়, পৃ ১৮২-৮৪ ; সংযুত্ত নিকায়, ১ম, পৃ ৯৯ ; বিনয় পিটক, ২য়, পৃ ২০৯ ; অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ পৃ ২০২। তুলনীয় : মজ্‌ঝিম নিকায়, ৩য়, পৃ ৬০ ; ১ম, পৃ ৩৮৪ ; দীঘ নিকায়, ৩য়, পৃ ৮০-৯৮।

৪১৪. জাতক, ৩য়, পৃ ১৯৪ ; ৪র্থ, পৃ ৩০৩।

৪১৫. অরিয়ায় জাতিয়া জাতো। মজ্‌ঝিম নিকায়, ২য়, ১০৩।

৪১৬. তুলনীয় : টমসন, 'স্টাডিজ ইন এনশেণ্ট গ্রীক সোসাইটি', ২য়, পৃ ২৩৮।

৪১৭. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ২২৬-৩০। ৪১৮ জাতক, ৪র্থ, পৃ ২০০ ইত্যাদি।

করেছিলেন ; তাই তার মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।[৪১৯] এটি বৌদ্ধ মনোভাবের বৈশিষ্ট্যসূচক। আরেকটি ক্ষেত্রে এক চণ্ডাল (যিনি বোধিসত্ত্ব স্বয়ং) তাঁর এক ব্রাহ্মণ সহপাঠীকে শাস্ত্রীয় তর্কে পরাজিত করে তাকে পদাঘাত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আচার্য সে-কাজের নিন্দা করেন।[৪২০]

প্রাচীন জৈনধর্মেও তাঁদের শ্রমণ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল চতুর্বর্ণের সকলকেই, এবং চণ্ডালদের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছিল। যেমন, পরবর্তীকালের একটি জৈন আকরগ্রন্থে জনৈক রাজার কথা আছে, যিনি মাতঙ্গের কাছে মন্ত্র শেখার জন্য নিম্ন-আসন গ্রহণ করেন।[৪২১] 'উত্তরাধ্যয়ন'-এ বলা হয়েছে যে, জন্মসূত্রে 'সোবাগ' (অর্থাৎ চণ্ডাল) হরিসেন গিয়েছিলেন জনৈক ব্রাহ্মণ আচার্যের যজ্ঞভূমিতে ; এবং কৃচ্ছ্রসাধন, উত্তম জীবন, সৎ প্রয়াস, আত্মসংযম, প্রশান্তি এবং ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁকে জ্ঞান দিয়েছিলেন।[৪২২]

ব্রাহ্মণদের মতো প্রাচীন জৈন সন্ন্যাসীরা তন্তুবায় সহ অন্যান্য নিম্নবর্ণের পরিবারের খাদ্য প্রত্যাখ্যান করতেন না।[৪২৩] অনুরূপভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরাও চতুর্বর্ণের প্রতি পরিবারেই আহার্য সন্ধান করতে পারতেন এবং আমন্ত্রণ জানালে তাঁদের গৃহে খাদ্যগ্রহণও করতে পারতেন।[৪২৪] কিন্তু এইসব ধর্মের গৃহী ভক্তরা এ-বিষয়ে তাঁদের গুরুদের অনুসরণ করতেন কিনা তা জানা যায় না।

নিম্নবর্ণের লোকে যে সত্যিই বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করেছিলেন বেশ কয়েকটি নিদর্শন থেকে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। মাতঙ্গ ছিলেন চণ্ডাল-পুত্র ; তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেছিলেন, যা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরাও লাভ করতে পারেননি।[৪২৫] বলা হয়েছে, জনৈক ভিক্ষু আগে শকুনিদের খেলা শেখাতেন।[৪২৬] এক চণ্ডাল সম্ভবত পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেছিলেন, যদিও ফিক মনে করেন, "ঐ ধরনের সাধুপুরুষ বাস্তবে সত্যিই ছিলেন কিনা তা অতীব সন্দেহজনক।"[৪২৭] কিন্তু এ-বিষয়ে পালি অনুশাসনে যা আছে তাতে অবিশ্বাস করার কোন ভালো যুক্তি তিনি দেখাননি। 'থের-' এবং 'থেরী-গাথা'-রচয়িতাদের তালিকায় দুশ ঊনষাট জন থেরের মধ্যে অন্তত দশজন[৪২৮] এবং ঊনষাট জন থেরীর মধ্যে অন্তত আটজন[৪২৯] ছিলেন সমাজের

৪১৯. ঐ। ৪২০. জাতক, ৩য়, পৃ ২৩৩।
৪২১. জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ২২৯ এ উদ্ধৃত।
৪২২. উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, পৃ [ ১২ ] ইত্যাদি। ৪২৩. আয়ারঙ্গ সুত্ত ২।১।২।২।
৪২৪ বিনয় পিটক, ৩য়, পৃ ১৮৪-৮৫ ; ৪র্থ, পৃ ৮০, ১৭৭।
৪২৫. সুত্ত নিপাত, ১৩৭ ও ১৩৮।
৪২৬. 'ডিকশনারি অফ পালি প্রপার নেমস্', ১ম, পৃ ১৭৪।
৪২৭. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭-৭৮। ৪২৮. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ২৮৫ টী. ১।
৪২৯. বিমলাচরণ লাহার 'হিস্ট্রি অফ পালি লিটরেচর', ২য়, পৃ ৫০৮-১৬-য় প্রদত্ত তালিকার ভিত্তিতে সংকলিত।

সেই অংশভুক্ত, যাঁদের শূদ্র বলে গণ্য করা যায়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন নট, চণ্ডাল, পেটিকা-নির্মাতা, ব্যাধ, বারাঙ্গনা এবং ক্রীতদাসী।[৪৩০] জৈন ধর্মমণ্ডলীতে কী অনুপাতে নিম্নবর্গের লোক ছিলেন সে-বিষয়ে আলোকপাত করার মতো ঐ ধরনের তথ্য আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এও লক্ষণীয় যে, মহাবীরের প্রথম শিষ্যা ক্রীতদাসী বলে কথিত।[৪৩১] ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ ছিল প্রায়শই ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার আতিশয্যেরই প্রতিক্রিয়া। এর থেকে নিম্নবর্গের মানুষরা ছিলেন সম্পূর্ণ বঞ্চিত।[৪৩২] কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মমণ্ডলীতে কোন ক্ষেত্রেই এই মতের সপক্ষে কোন নিদর্শন মেলে না। একটি জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বৈরাগ্যের কয়েকটি কারণ হলো দারিদ্র্য, রোগ, আকস্মিক রোষ ও অপমান।[৪৩৩] শ্রমণদের উদ্দেশ্যে গৃহস্থদের এই কটূক্তিতে হয়তো কিছু সত্য থাকতে পারে, "যে-সব লোক শ্রমণ হয়ে যান তাঁরা হলেন সবচেয়ে খারাপ জাতের কর্মী, তাঁরা নিজেদের পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারেন না, নীচ বর্ণের লোক, হতভাগ্য ও অলস।"[৪৩৪] এই ধরনের লোক যাতে প্রচুর সংখ্যায় চলে না আসেন তাই বলা হয়েছে, অন্যের কাছ থেকে খাদ্য প্রাপ্তির আশায় যাঁরা শ্রমণ হন, তাঁরা বন্যধান্য-লোভী শূকর রূপে পুনর্জন্ম লাভ করবেন।[৪৩৫] একটি বৌদ্ধ রচনা থেকে জানা যায়, বিম্বিসারের সময়ে সংঘ রাজার কাছ থেকে বিশেষ আশ্রয় পেত, আর তাই কখনও কখনও বন্দী, তস্কর, বেত্রাঘাতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঋণগ্রস্ত লোক ও পলাতক দাসরা বৌদ্ধ সংঘে আশ্রয় নিতেন ও প্রব্রজ্যা লাভ করতেন।[৪৩৬] এইসব ঘটনা যখন বুদ্ধের গোচরে আনা হলো, তিনি তখন বিধান দিলেন, ঐ জাতীয় লোকদের প্রব্রজ্যা দেওয়া চলবে না। 'দীঘ নিকায়ে'র একটি অংশ থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায় যে নিম্নবর্গের লোকে বৌদ্ধ শ্রমণ হয়ে তাঁদের দুর্দশার অবসান ঘটাতে চাইতেন। 'সামঞ্ঞফল সুত্তে' রয়েছে যে, মগধের রাজা অজাতশত্রু প্রথমে জানালেন, মাহুত, অশ্বারোহী, গৃহদাসের সন্তান, পাচক, ক্ষৌরকার, স্নানাগারের পরিচর্যাকারী ভৃত্য, মোদক, মালাকার, রজক, তন্তুবায়, পেটিকা-নির্মাতা এবং কুম্ভকার তাঁদের বৃত্তি থেকে কী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।[৪৩৭] তারপর তিনি বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, সংসারত্যাগী

৪৩০. ঐ, ২য়, পৃ ৫০১-০৮ ; ৫০৮-১৬।

৪৩১. জৈন, 'লাইফ অ্যাজ ডেপিক্টেড ইন জৈন ক্যাননস', পৃ ১০৭।

৪৩২. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৮৫।

৪৩৩ পরিজুনা, রোগিণীতীআ, রোসা ও অণাঢিতা পবজ্জা। থাণাঙ্গ, ১০।৭১২।

৪৩৪. সূয়গডম্ ২।২।৫৪।

৪৩৫. ঐ, ১।৭।২৫।

৪৩৬. …কারাভেদকো চোরো…চোরো · কসাহতো কতদণ্ডকম্মো …ইণায়িকো …দাসো…। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে : পলায়িত্বা ভিক্খুসু পব্বজিতো হোতি। বিনয় পিটক, ১ম, পৃ ৭৪-৭৬।

৪৩৭. …হত্থারোহা অস্স সারোহা…দাসকপুত্তা আড়ারিকা কপ্পকা নহাপকা সূদা মালাকারা রজকা পেসকারা…। দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ৫১।

ভিক্ষুসংঘের লোকেরাও তাঁদের নিজ বৃত্তি থেকে ইহজীবনে দৃষ্টিগোচর অনুরূপ কোন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন কিনা। এর উত্তরে বুদ্ধ রাজার জীবন এবং দাস-কম্মকর জীবনের পার্থক্য পরিস্ফুট করে দিলেন। রাজার জীবন হলো বিলাসবহুল ও পরিপূর্ণ, তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অধিকারী আর দাস-কম্মকর ওঠেন আগে, শুতে যান পরে, তিনি সর্বদাই প্রভুর আদেশ পালনে তৎপর এবং সব বিষয়েই প্রভুর মতানুবর্তী হতে উৎসুক।[৪৩৮] বুদ্ধ আরও বলেন যে, দাসও রাজার মতো জীবনযাপন করতে চান, আর সেই যোগ্যতা অর্জনের জন্যই প্রব্রজিত হয়ে যান। তার পরেই তিনি প্রতি-প্রশ্ন করেছেন, "সাধারণ অবস্থায় যে লোকটির সঙ্গে আপনি দাস-কম্মকরের মতো ব্যবহার করেন, তিনি যদি সঙ্ঘে যোগ দেন তাহলে তার প্রতি আপনি কেমন আচরণ করবেন?" রাজা স্বীকার করেছেন যে তাঁর সঙ্গে সম্মানীয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মতো আচরণই তিনি করবেন এবং আসন, চীবর, পিণ্ডপাত্র, শয়ন-আসন ও ঔষধ-পথ্য দিয়ে তাঁকে সম্মান জানাবেন।[৪৩৯] বুদ্ধের এই কথা থেকে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না যে, নিম্নবর্গের লোকের কাছে ভিক্ষুজীবন শুধু যে তাৎক্ষণিক দারিদ্র্যমুক্তির সম্ভাবনা এনে দিত তা-ই নয়, পরজন্মে আরও সুখী জীবনের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাও সেখানে থাকত। ঐ একই জায়গায় বুদ্ধ রাজার বিলাসবহুল জীবনের সঙ্গে কর-দাতা কৃষক-গৃহপতির তুলনা করেছেন এবং বলেছেন যে আরও সুখী জীবন-লাভের উদ্দেশ্যচালিত হয়ে তিনিও প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।[৪৪০] এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কোন উল্লেখ নেই—এও তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে মনে হয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যাঁরা দরিদ্রতর, তাঁরা সাধারণত ঐহিক স্বার্থেই সঙ্ঘে যোগ দিতেন। শ্রমণদের জীবন তাঁদের কাছে ছিল ঈর্ষণীয়, কারণ, তাঁরা 'সুখাদ্য ভোজন করে নিবাত [ যেখানে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে না ] শয্যায় শয়ন করেন।'[৪৪১]

কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমণ্ডলীর নিয়মাবলি যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমজীবী জনসাধারণকে তাঁদের পার্থিব দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিল না। দাসকে তাঁর প্রভু মুক্তি না দিলে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করলে তাঁরা বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি পেতেন না।[৪৪২] কিন্তু দাসদের সঙ্ঘে যোগদানের ব্যাপারে, মনে হয়, বৌদ্ধ পরম্পরায় মতপার্থক্য ছিল। একদা উপদেশদানকালে বুদ্ধ অজাতশত্রুকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর

৪৩৮. দাসো কম্মকরো পুব্বুট্ঠায়ী পচ্ছা-নিপাতী কিংকরপটিস্সাবী মনাপ-চারী পিয়-বাদী মুখুল্লোককো। ঐ, ১ম, পৃ ৬০। ৪৩৯. ঐ, ১ম, পৃ ৬০-৬১।

৪৪০. কস্সকো গহপতিকো কার-কারকো রাসি-বড্ঢকো। দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ৬১।

৪৪১. সমণা সক্যপুত্তিয়া…সুভোজনানি ভুঞ্জিত্বা নিবাতেসু সয়নেসু সয়ন্তি। বিনয় পিটক, ১ম, পৃ ৭৭।

৪৪২. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ৫।

যে প্রাক্তন দাস বর্তমানে সংঘভুক্ত, রাজা কি তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি করবেন? দাস হিসেবে আবার নিয়োগ করবেন তাঁকে? উত্তরে অজাতশত্রু স্পষ্ট ভাষায় 'না' বলেন।[৪৪৩] সম্ভবত দাস-কম্মকর প্রভুদের অনুমতি ছাড়াই বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিতেন—এমন ইঙ্গিতই এর থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এরকম ঘটনা হয়তো বিরল ছিল। জৈন ধর্মমণ্ডলীতেও যাঁদের শ্রাবক হওয়ার অধিকার ছিল না তাঁরা হলেন দস্যু, রাজশত্রু, ঋণী, পরিচারক, ভৃত্য এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিত ব্যক্তি।[৪৪৪] এ জাতীয় প্রায় কোন লোকেরই বৌদ্ধ সংঘেও প্রবেশাধিকার ছিল না।

তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো সুস্থায়ী করার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে অন্যান্য কিছু কিছু উপায়ে দাসদের অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করা হয়। যেমন, ধর্মসূত্রে দাস নিয়ে ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবল ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে।[৪৪৫] তাঁরাও অবশ্য দাসের সঙ্গে দাস বিনিময় করতে পারতেন।[৪৪৬] কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে এমনকি তাঁদের সাধারণ ভক্তদের ক্ষেত্রেও মানুষ নিয়ে ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৪৪৭] তা সত্ত্বেও, একটি বৌদ্ধ রচনায় বলা আছে যে, আর্য শিষ্যরা তাঁদের দাস-কম্মকর ও পরিসেবকদের সংখ্যা বাড়িয়েই চলেন।[৪৪৮] দেখা যাচ্ছে, সাধারণ শিষ্যরা অন্য কোন উপায়ে তাঁদের দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারতেন। ভিক্ষুরা দাস রাখতেন না। 'জাতক'-কাহিনীর একটি অংশ[৪৪৯] সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তার অর্থ হলো: ভিক্ষুদের দাসরা অসুস্থ প্রভুদের জন্য সুখাদ্য আনতে নগরে যান।[৪৫০] কিন্তু একথা বলা হচ্ছে অংশটির ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে।[৪৫১] এখানে কোন দাস বা অন্য ভৃত্যের কথা নেই, আছে অন্যান্য ভিক্ষুদের কথা, যাঁরা তাঁদের অসুস্থ ভাইদের পরিচর্যা করতেন। তাঁদেরই এখানে সম্বোধন করা হয়েছে 'আবুসো' বলে। সাধারণত ভিক্ষুদের ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রয়োগ করা হতো।[৪৫২]

তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে যাতে অধীনস্থ বেতনভুকদের প্রতি বদান্যতা ও দয়ার মনোভাব জাগে, তার জন্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে একথা বারবার প্রচার করা হতো। যেমন, 'দীঘ নিকায়ে'র একটি অংশে বলা হয়েছে, নিয়োগকারীরা যেন তাঁদের দাস-কম্মকরদের সঙ্গে শিষ্ট আচরণ করেন। যে-কাজে তাঁরা অশক্ত, সে-কাজ যেন তাঁদের করতে দেওয়া না হয়। তাঁদের খাদ্য ও

৪৪৩. ঐ, ১ম, পৃ ৬০। ৪৪৪. থাণাঙ্গ, ৩।২০২; জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৪।

৪৪৫. আপস্তম্ব ধ. সূ. ১।৭।২০।১১-১২।

৪৪৬. মনুষ্যাণাং চ মনুষ্যৈঃ। ঐ, ১।৭।২০।১৫; বশিষ্ঠ ধ. সূ. ২।৩৯।

৪৪৭. অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য়, পৃ ২০৮; কেসাবাণীজ্জে…। উবাসগে দসাও, পৃ ৫১।

৪৪৮. দাসকম্মকরপোরিসেহি বড্ঢতি। অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম, পৃ ১৩৭।

৪৪৯. জাতক, ৩য়, পৃ ৪৯। ৪৫০. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪১৪।

৪৫১. জাতক, ৩য়, ইংরিজি অনুবাদ, পৃ ৩৩; মূল, পৃ ৪৮। ৪৫২. ঐ।

বেতন দিতে হবে, অসুখের সময় শুশ্রূষা করতে হবে, মাঝে মাঝে ছুটি দিতে হবে এবং প্রভুরা কোন বিশেষ সুখাদ্য খেলে, তাঁদেরও ভাগ দিতে হবে। অপরপক্ষে, ভৃত্যরা তাঁদের বেতন নিয়েই তুষ্ট থাকবেন, সন্তোষজনকভাবে কাজ করবেন এবং প্রভুর সুনাম রক্ষা করবেন।[৪৫৩] অশোকও তাঁর প্রজাদের এই জাতীয় অনুশাসনই দিয়েছিলেন। 'জাতকে'ও দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব যখন প্রভু, দাসরা তখন ভালো ব্যবহার পাচ্ছেন।[৪৫৪] একটি জৈন রচনায় বলা হয়েছে যে সম্পদ শুধু স্বজন ও রাজন্যবর্গের জন্যই সঞ্চয় করলে চলবে না, দাস-দাসী, কম্মকর-কম্মকরীদের জন্যেও তা করতে হবে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে, শেষোক্তরাও তাঁদের নিয়োগকর্তাদের কাছে ভালোভাবে প্রতিপালিত হওয়ার যোগ্য।[৪৫৫] এই নতুন সমাজ-গঠনকে সংহত করার জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল ঐ ধরনের নির্দেশ। রাষ্ট্র এবং সুপরিস্ফুট শ্রেণীসমূহের আবির্ভাব সেই সমাজ-গঠনেরই লক্ষণ, কারণ জনগোষ্ঠীয় সমাজে সম্পদ ছিল মূলত স্বজনদের মধ্যে বিতরণের জন্য।

নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে কী পরিমাণ লোক এইসব অ-সনাতনী সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-অনুগামী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমাদের কোন যথাযথ ধারণা নেই। হস্তশিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।[৪৫৬] আজীবিক সম্প্রদায় কোনভাবে কুম্ভকার জাতির সঙ্গে বিশেষ করে যুক্ত ছিলেন এবং এই বর্ণের লোকেদের কাছেই এই সম্প্রদায় বিশেষ আবেদন রেখেছিলেন।[৪৫৭] সে যাই হোক, কোন সংস্কারপন্থী ধর্মই কিন্তু নিম্নবর্গের অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। বৌদ্ধ সঙ্ঘে ঐ জাতীয় লোকের অনুপাত ও গুরুত্ব নগণ্য ছিল বলেই মনে হয়। সাম্যের তত্ত্ব সত্ত্বেও অতীতের দায়ভাগ হিসেবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে অভিজাত-তন্ত্রের (জন্ম, মেধা ও অর্থ—এই তিন রূপেই) প্রতি এক লক্ষণীয় প্রবণতা থেকেই গিয়েছিল।[৪৫৮] বুদ্ধের আবির্ভাবের ফলে ভারতের সামাজিক বিন্যাসে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি[৪৫৯]—একথা বলা হয়তো অতিশয়োক্তি; কিন্তু, যে-বর্ণব্যবস্থা শূদ্রদের সঙ্গে সেবক শ্রেণীকে অভিন্ন করে দিয়েছিল তার মূল ভিত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধরা স্পষ্টতই প্রায় কোন প্রশ্নই তোলেননি। যেমন, অন্য তিন বর্ণের চেয়ে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি খণ্ডন করতে গিয়ে গৌতম [বুদ্ধ] যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, কুল হিসেবে ক্ষত্রিয় হলেন উচ্চতর, ব্রাহ্মণ নিম্নতর। কিন্তু বৈশ্য বা শূদ্রের চেয়ে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব

৪৫৩. দীঘ নিকায়, ৩য়, পৃ ১৯১।

৪৫৪. জাতক, ১ম, পৃ ৪৫১।

৪৫৫ আয়ারঙ্গ সুত্ত ১।২।৫।১।

৪৫৬. চুন্দ কামারের ঘটনা, 'ডিকশনারি অফ পালি প্রপার নেম্‌স্', ১ম, পৃ ৮৭৬-৭৭।

৪৫৭. বাশাম, 'হিস্ট্রি অ্যান্ড ডকট্রিন্‌স্ অফ দি আজীবিকস', পৃ ১৩৪।

৪৫৮. ওল্ডেনবার্গ, 'বুদ্ধ', পৃ ১৫৫-৫৯। ৪৫৯. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২।

সম্বন্ধে তিনি কোন প্রশ্নই তোলেননি।[৪৬০] সুতরাং বৌদ্ধধর্মে শুধু এটুকুই দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল যে নির্বাণের সন্ধানে বর্ণের কোন মূল্যই নেই।[৪৬১] খৃস্টধর্মের মতো, এই পর্বের কোন ধর্মীয় সংস্কারপন্থী আন্দোলনেও দাসত্বের ভিত্তিকে কখনোই আক্রমণ করা হয়নি, চেষ্টা করা হয়নি শূদ্রদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাধানিষেধ দূর করার।

আমাদের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শূদ্রদের অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটে বেদোত্তর কালে। অবশিষ্ট যেটুকু জনগোষ্ঠীয় অধিকার তাঁদের ছিল, সেটুকু থেকেও তাঁরা তখন বঞ্চিত হলেন, এবং বাঁধা পড়লেন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নানারকম বাধানিষেধের বন্ধনে। উচ্চতর তিন বর্ণের চেয়ে তাঁদের সুস্পষ্টভাবে পৃথক্ করে ফেলা হলো, কেড়ে নেওয়া হলো বৈদিক যজ্ঞ, উপনয়ন, শিক্ষা তথা প্রশাসনিক পদে নিয়োগের অধিকার, এবং সর্বোপরি, দ্বিজাতির দাস, কৃষি-শ্রমিক ও হস্তশিল্পী রূপে কাজ করার নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হলো তাঁদের। যদিও বৈশ্যদের মতো শূদ্ররাও উৎপদানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাহলেও অধিকাংশ বৈশ্যের মতো তাঁরা কর-প্রদায়ী কৃষক ছিলেন না। বৈশ্যদের এবং উচ্চতর দুই বর্ণের কয়েকটি বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান ছিল একই, সুতরাং এদিক দিয়েও তাঁরা ছিলেন শূদ্রদের থেকে পৃথক্। বস্তুত আদি বৌদ্ধ ও জৈন রচনাবলিতে নিম্নবর্গের যে-চিত্র আছে, সারগতভাবে তার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। বৌদ্ধ রচনায় বারবার প্রথম তিন বর্ণের লোকদের ধনাঢ্য বলা হয়েছে,[৪৬২] কিন্তু বাদ রাখা হয়েছে শূদ্র, দাস ও কম্মকরদের। বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও গহপতি উপাসকদের সভা[৪৬৩] পরিদর্শন করেছিলেন বুদ্ধ, কিন্তু শূদ্রদের সভার কোন উল্লেখ নেই।

যদি বলা হয় যে, যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান এবং উচ্চতর তিন বর্ণের আহারস্থান থেকে শূদ্রদের দূরে রাখা হতো শুধু আনুষ্ঠানিক শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতার ধারণা থেকে,[৪৬৪] সেকথাও অগভীর। জোর দিয়ে বলা উচিত যে, ঐ জাতীয় কোন ধারণা গড়ে উঠতে পারে কেবল তখনই, যখন সমাজের একটা বড় অংশকে বংশানুক্রমিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীতে পর্যবসিত করা হয়েছে, এবং কায়িক শ্রম করেন বলে ক্রমে ক্রমে তাঁরা অশুচি বলে গণ্য হয়েছেন। নিম্নবর্গের শ্রমের প্রতি এই ঘৃণার মনোভাবই শেষ পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা-প্রথায় পরিণত হয়।

৪৬০. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ১১-১৪। ৪৬১. ফিক, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১।

৪৬২. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ, পৃ ২০৯; সংযুক্ত নিকায়, ৪র্থ, পৃ ২০৯; জাতক, ১ম, পৃ ৪৯।

৪৬৩. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য়, পৃ ৩০৭-০৮।

৪৬৪. দত্ত, 'অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অফ কাস্ট ইন ইণ্ডিয়া', পৃ ১০০। এমনকি এই পর্বেও শূদ্ররা বৈশ্বদেব যজ্ঞ উপলক্ষ্যে উচ্চতর বর্ণের জন্য অন্ন প্রস্তুত করতেন।

ধর্মসূত্রে—বিশেষত বশিষ্ঠ ও গৌতমের রচনায়—শুচিতা, খাদ্য এবং বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে, বৈশ্যকে শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে আনার এক প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। বৌদ্ধ রচনাতেও সেই প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। বুদ্ধ বলেছেন, সম্ভাষণ, অভ্যর্থনা, অভিগমন এবং আচরণের নিরিখে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা বৈশ্য ও শূদ্রের চেয়ে অগ্রমর্যাদার অধিকারী।[৪৬৫] একটি বৌদ্ধ রচনায় দেখা যাচ্ছে, শুধু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদেরই গোত্র আছে।[৪৬৬] একটি 'জাতকে'র প্রত্যুৎপন্ন-বস্তু অংশে দাবি করা হয়েছে, বুদ্ধরা কখনই বৈশ্য বা শূদ্র হয়ে জন্মান না, তাঁরা জন্মান কেবল উচ্চতর অন্য দুই বর্ণে।[৪৬৭] এটি অবশ্য মূল 'জাতকে'র অংশ নয় এবং একে পরবর্তী সংযোজন বলে ধরা যেতে পারে। জৈন আচার্যদের জন্ম সম্বন্ধেও অনুরূপ মত প্রকাশ করা হয়েছে। ভাবা হতো, তাঁরা কখনোই নীচ, হীন, অধঃপতিত, দীন, দরিদ্র অথবা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন না।[৪৬৮] অবশ্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ধর্মদ্রোহ-জনিত বৈরিতার কারণেই, মনে হয়, তাঁদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তালিকার অন্যান্যদের মোটামুটি নিম্নবর্গের লোক বলেই ধরা যায়। বৈশ্যকে শূদ্রের সঙ্গে এক করে দেখার প্রবণতা সম্ভবত আমাদের আলোচ্য পর্বের শেষদিকেই শক্তিশালী হতে থাকে। নির্ধন বৈশ্যদের শূদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়ে হয়তো শূদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়েছিল, কিন্তু তার ফলে আলোচ্য পর্বে তাঁদের মর্যাদার কোন পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনুরূপভাবে, কোন সংস্কারপন্থী ধর্মই তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি; শূদ্রদের সম্পর্কে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিধিগত বাধানিষেধ মূলত আগের মতোই রয়ে গিয়েছিল।

এই সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে শূদ্রদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায়। কিন্তু তার ভিত্তিতেও এই মত মানা যায় না যে, "অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোন কঠোর সংগ্রাম ছিল না" এবং সমাজবিন্যাস ছিল সুসমঞ্জস।[৪৬৯] 'বশিষ্ঠ সংহিতা'র একটি অংশে শূদ্রদের এইসব লক্ষণের কথা আছে: তাঁরা আড়ালে নিন্দা করেন, মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুর, ছিদ্রান্বেষী, ব্রাহ্মণদূষক এবং সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন।[৪৭০] সাধারণভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার

৪৬৫. মজ্ঝিম নিকায়, ২য়, পৃ ১২৮; তুলনীয় : ২য় পৃ ১৪৭ ইত্যাদি।

৪৬৬ সুত্ত নিপাত, ৩১৪-১৫।

৪৬৭. জাতক, ১ম, পৃ ৪৯; তুলনীয় : ললিতবিস্তর ১।২০।

৪৬৮. অন্তকুলেষু বা পন্ত⋯ তুচ্ছ⋯ দরিদ্দ⋯ কিবিণ⋯ ভিক্খাগ⋯ মাহণ⋯। কল্পসূত্র ২।১৭, তুলনীয় : ২২।

৪৬৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইকনমিক লাইফ অ্যান্ড প্রগ্রেস ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৩০২, ৩০৯-১০।

৪৭০. দীর্ঘবৈরমসূয়াং চাসত্যং ব্রাহ্মণদূষণম্। পৈশুন্যং নির্দয়ত্বং চ জানীয়াৎ শূদ্রলক্ষণম্॥ বশিষ্ঠ ধ. সূ. ৬।২৪।

প্রতি, এবং বিশেষত তার ভাবাদর্শগত নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্মণদের প্রতি শূদ্রদের বৈরী মনোভাবের ইঙ্গিতই সম্ভবত এর থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আগেই দেখানো হয়েছে যে প্রভুদের প্রতি দাস ও কম্মকরদের চেয়ে, তাঁদের প্রতি প্রভুরাই ছিলেন অনেক বেশি নির্মম ও বৈরীভাবাপন্ন।[৪৭১] দাস-বিদ্রোহের যে একমাত্র নিদর্শন 'বিনয় পিটকে' পাওয়া যায়,[৪৭২] তা মৃদু প্রকৃতির। বলা হয়েছে, কোন এক সময়ে কপিলবস্তুর দাসরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান। কয়েকজন শাক্য রমণী জঙ্গলে ভিক্ষুদের খাওয়াতে গিয়েছিলেন, দাসরা তাঁদের লুণ্ঠন ও ধর্ষণ করেন।[৪৭৩]

নিম্নবর্গের লোক সাধারণত প্রতিবাদের যে-পন্থা অবলম্বন করতেন, তা হলো প্রভুদের কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া। শুধু করভার-পীড়িত গহপতি-রাই নন,[৪৭৪] কারুশিল্পী ও দাসদের বেলাও তা-ই হতো। পরবর্তী একটি 'জাতক'-কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, আগে থেকে দাম নিয়ে আদেশ মতো কাজ না-করার জন্য কাঠের মিস্ত্রির এক বসতির সমস্ত লোককেই ক্ষতিপূরণ করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু "প্রাচ্যদেশীয় নিরুদ্বিগ্নতা"য় তাঁদের "ভাগ্যকে মেনে নেওয়া"র বদলে তাঁরা গোপনে এক বিরাট নৌকা তৈরি করেন ও সপরিবারে দেশান্তরে যাত্রা করেন। রাতে গঙ্গা দিয়ে গোপনে নৌকা বেয়ে তাঁরা সমুদ্রে গিয়ে পড়েন ও শেষ অবধি ওঠেন এক উর্বর দ্বীপে।[৪৭৫] মনে হয়, কাজ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছিল দাসদের প্রচলিত প্রথা। পলাতক দাসের কোন নিদর্শন নেই[৪৭৬]—শ্রীমতী রিস ডেভিডস-এর এ-কথা ভুল। 'জাতকে' অন্তত দুটি দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে দাসরা পালিয়ে মুক্ত হয়েছেন।[৪৭৭] পলাতক দাসদের বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের উল্লেখও পাওয়া যায়।[৪৭৮] পরবর্তী একটি 'জাতকে' দেখা যায়, যজ্ঞে বলির জন্য উদ্দিষ্ট লোকেরা তাঁদের জীবন রক্ষার জন্য এক অত্যাচারী পুরোহিতের অধীনে শৃঙ্খলিত দাস হয়ে কাজ করতে স্বীকৃত হয়েছেন।[৪৭৯] দাসরা যাতে পালিয়ে না যান সেজন্য কখনও কখনও তাঁদের শেকলে বেঁধে রাখা হতো—এ হয়তো তারই ইঙ্গিত। বৌদ্ধ পরম্পরা অনুযায়ী আজীবিক গুরু মক্‌খলি গোসাল ছিলেন পলাতক দাস। এটা হয়তো সত্য না-ও হতে পারে;[৪৮০] কিন্তু দাসদের পালানোর সম্ভাবনা যে ছিল সেই ধারণাই এখানে নিহিত। একটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রভুর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় দাস ও

৪৭১. পৃ ১১৫-১৬ দ্র।

৪৭২. ৪র্থ, পৃ ১৮১-৮২।

৪৭৩. সাকিয়াদাসকা অবরুদ্ধা হোন্তি ...সাকিয়ানিয়ো অচ্ছিন্দিংসু চ...। বিনয় পিটক, ৪র্থ, পৃ ১৮১-৮২।

৪৭৪. জাতক, ৫ম, পৃ ৯৮-৯৯।

৪৭৫ জাতক, ৪র্থ, পৃ ১৫৯, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২১০।

৪৭৬. 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২০৫।

৪৭৭. জাতক, ১ম, পৃ ৪৫১-৫২, ৪৫৮।

৪৭৮. বিনয় পিটক, ১ম, পৃ ৭৪-৭৬।

৪৭৯. জাতক, ৬ষ্ঠ, পৃ ১৩৮।

৪৮০. বাশাম, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭।

কর্মকররা তাঁর তৈজসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেলেন।[৪৮১] এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দেখি, সাধারণত কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েই শ্রমিক শ্রেণীর লোকে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। গ্রীস ও রোমের ধাঁচের দাস-বিদ্রোহ এখানে হয়নি। ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, বর্ণ-সংকরের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যরাও আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করতে পারেন ; এই অধিকার ক্ষত্রিয়দের তো সর্বদাই ছিল।[৪৮২] কেবল আপৎকালেই উচ্চতর তিন বর্ণের লোক অস্ত্রধারণ করতে পারবেন[৪৮৩]—এর থেকে মনে হয়, স্মৃতি-কারের মনে এমন এক সম্ভাবনার কথা ছিল, যখন শূদ্রেরা হয়তো সবলে বর্ণসীমা অপসারণের চেষ্টা করবেন। কপিলবস্তুর মৃদু দাস-বিদ্রোহ ছাড়া ঐ জাতীয় কোন প্রয়াসের নিদর্শন অবশ্য নেই, কিন্তু বশিষ্ঠের বিধান থেকে বোঝা যায়, শূদ্রদের উপর নানা বাধানিষেধ আরোপ করার ফলে উচ্চবর্ণের লোকে আশংকা করতেন, শূদ্ররা বিদ্রোহ করতে পারেন।

৪৮১. জাতক, ৬ষ্ঠ, পৃ ৬৯ ( প্রত্যুৎপন্ন বস্তু )।

৪৮২. বৌধায়ন ধ. সূ. ২।২।৪।১৮। আত্মত্রাণে বর্ণসংবর্গে..., বশিষ্ঠ ধ. সূ. ৩।২৪-২৫ ; 'বি' (B) পুঁথিতে 'বর্ণসংবর্গে' শব্দটি আছে। ফুহ্রার ( 'বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র', ভূমিকা, পৃ ৫ ) এটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। অন্যান্য পুঁথিতে 'বর্ণসংবর্গে' ও 'বর্ণসংকরে' পদদুটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৮৩. গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে যোদ্ধা হিসেবে দাসদের ব্যবহার ছিল না। ভেস্টারমান, 'দ স্লেভ সিস্টেমস্ অফ গ্রীক অ্যান্ড রোমান অ্যান্টিকুইটি', পৃ ৩৭।

# পঞ্চম অধ্যায়

# রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও দাসবর্গ

( আনু. খৃপূ ৩০০ - খৃপূ ২০০ )

মৌর্য যুগে শূদ্রদের অবস্থা পর্যালোচনা করার প্রধান উৎস কৌটিল্যের 'অর্থ-শাস্ত্র'। মেগাস্থেনেসের বিবরণের বিভিন্ন অংশ ও অশোকের উৎকীর্ণ প্রস্তলেখ দিয়ে এটি পরিপূরণ করা যায়। কিন্তু 'অর্থশাস্ত্রে'র রচনাকাল ও প্রামাণিকতা নিয়ে যে-পরিমাণ বিতর্ক হয়েছে, সম্ভবত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আর কোন বিষয় নিয়েই তেমন হয়নি।[১] একপক্ষ খুব প্রত্যয়সহকারে মনে করেন এটি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের রচনা; অপরপক্ষ আবার এই মত প্রচণ্ড-ভাবে অস্বীকার করেন এবং বইটিকে খৃস্টীয় প্রথম বা তৃতীয় শতকের রচনা বলে ধরে থাকেন। পুরো বিতর্ক নিয়ে আবার আলোচনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে হয় কয়েকটি বিষয়ে মতামত দেওয়া দরকার। বিরুদ্ধপক্ষের বিভিন্ন যুক্তির অন্যতম প্রধান দুর্বলতা এই যে তাদের ধরনটা নেতিবাচক। 'অর্থশাস্ত্রে'র শেষে একটি শ্লোকে পরিষ্কার বলা আছে যিনি নন্দবংশ ধ্বংস করেছিলেন এই শাস্ত্র তাঁরই রচনা।[২] পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ও জৈন সাহিত্যেও এই কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতি-র লেখকদের সম্বন্ধে এরকম জীবনী-সংক্রান্ত উল্লেখের খুবই অভাব দেখা যায়। সেদিক দিয়ে এই শ্লোকটি বিশেষভাবে মূল্যবান্। তাছাড়া কৌটিল্য যে অন্য কোন সময়ের লোক এই ধরনের বিকল্প তথ্যের ইঙ্গিত কোন লিখিত উৎসে নেই।

'অর্থশাস্ত্র' যে খৃস্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে লেখা হয়েছে তা দেখানোর জন্য কতক নতুন প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে।[৩] যুক্তি হিসেবে বলা হয়, কৌটিল্য জ্ঞানের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন সেখানে বিভিন্ন ব্যব-হারিক বিজ্ঞান দর্শন থেকে আলাদা হতে শুরু করেছিল এবং এই প্রক্রিয়াটিকে খৃস্টীয় যুগের গোড়ার দিকের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ধার্য করা যায়।[৪] কিন্তু কৌটিল্য যে-ক'টি প্রধান বিভাগ উল্লেখ করেছেন, যেমন কল্প (যজ্ঞীয় আচার-অনুষ্ঠান), ব্যাকরণ ও নিরুক্ত (শব্দতত্ত্ব), চর্চার বিষয় হিসেবে সেগুলো

১. 'দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি', পৃ ২৮৫-৮৬ তে এ-বিষয়ে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি পাওয়া যাবে। কঙ্গলে ও ট্রাউটম্যান আরও বেশি রচনার তালিকা দিয়েছেন।

২. অর্থশাস্ত্র ১৫।১।

৩. ভি. কালিয়ানোভ. "ডেটিং দি অর্থশাস্ত্র", 'পেপার্স্ প্রেজেণ্টেড বাই দ সোভিয়েত ডেলিগেশন অ্যাট দ টোয়েণ্টিথার্ড ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ওরিয়েণ্টালিস্টস', পৃ ৪০-৫৪।

৪. ঐ, পৃ ৪৪-৪৫।

যে প্রাগ্-মৌর্য যুগেও ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আরও লক্ষণীয় যে, 'অর্থশাস্ত্রে' লোকায়ত (বস্তুবাদ) দর্শন-পদ্ধতির উল্লেখের ফলে এটিকে পরবর্তী কোন সময়ের রচনা বলে ধরা যায় না।[৫] লোকায়ত প্রস্থান সম্ভবত প্রাগ্-বৌদ্ধ যুগের[৬] এবং নিঃসন্দেহে প্রাগ্-মৌর্য, কারণ গোড়ার দিকের বৌদ্ধ সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।[৭]

এরকমও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, 'অর্থশাস্ত্র' সংকলনের অর্থই হলো তার আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল এবং একমাত্র কয়েকশ বছর ধরেই তা গড়ে উঠতে পারে।[৮] কৌটিল্য নিজেই ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন এবং তাঁর নিজের ক্ষেত্রে কম করে দশজন পূর্বসূরির কথা বলেছেন।[৯] প্রাগ্-মৌর্য যুগে এ ধরনের এক দীর্ঘ ঐতিহ্যের সাক্ষ্য ধর্মসূত্র থেকে পাওয়া যায়। একটি গণনা অনুযায়ী অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের পরিমাণ 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে'র $\frac{1}{15}$ ভাগ, 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে'র $\frac{1}{12}$, 'গৌতম ধর্মসূত্রে'র $\frac{1}{6}$ এবং 'বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে'র $\frac{1}{6}$।[১০] এর থেকে 'অর্থ' বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যায় এবং তা শেষ পর্যন্ত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামে একটি অন্যনিরপেক্ষ গ্রন্থ রচনার দিকে নিয়ে যায়।

এও বলা হয় যে 'অর্থশাস্ত্রে'র নীতি, অর্থাৎ চরমপন্থা বাদ দিয়ে মধ্যম মার্গ অনুসরণের বিষয়টি 'মধ্যান্ত-বিভঙ্গ'[১১]-নামক দর্শনগ্রন্থে পাওয়া যায়। এটিকে খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের রচনা বলে ধরা যায়। কিন্তু 'মজ্ঝিমা পটিপদা' নামে পরিচিত মধ্যম-মার্গ মতবাদের বিস্তার 'বিনয়-পিটকে'র মূল-গ্রন্থের মতোই প্রাচীন।[১২] তার একেবারে প্রথম বাণীতেই দেখানো হয়েছে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের কৃচ্ছ্রসাধন ও বিলাসব্যসন—এই দুই চরমপন্থা ত্যাগ করার শিক্ষা দিচ্ছেন।

শেষত, এও মনে করা হয়, 'অর্থশাস্ত্রে' যে-ধরনের উৎপাদন-সম্পর্ক, সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা আছে তা মেগাস্থেনেসের বিবরণ ও অশোকের উৎকীর্ণ প্রস্তরলেখ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের চেয়ে বিকাশের অনেক উন্নত পর্যায়ের এবং এই পর্যায়টি খৃস্টীয় প্রথম ও তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী পর্বেরই লক্ষণযুক্ত বলে মনে হয়।[১৩] কিন্তু এই ধরনের মতের সপক্ষে

৫. ঐ, পৃ ৪৫।

৬. আর. গার্বে, 'হেস্টিংস এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স', ৮ম, পৃ ১৩৮; তুলনীয় . রুবেন, 'আইনফ্যুহরুং ইন ডি ইন্ডিয়েনকুন্ডে', পৃ ১২৬।

৭. দীঘ নিকায়, ১ম, পৃ ১৩০; মজ্ঝিম নিকায়, ২য়, পৃ ১৬৫।

৮. কালিয়ানোভ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬।

৯. অর্থশাস্ত্র ১।২, ৮।

১০. কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'ইন্ডিয়ান কামেরালিজম' পৃ ৫০।

১১. কালিয়ানোভ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৮।

১২. বিনয় পিটক, ১ম, পৃ ১০. সংযুত্ত নিকায়, ৫ম, পৃ ৪২১।

১৩. কালিয়ানোভ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২।

প্রমাণ, মনে হয়, খুবই ক্ষীণ। 'অর্থশাস্ত্র' থেকে উৎপাদন-সম্পর্ক বিষয়ে প্রধান যে-তথ্য পাওয়া যায় তা হলো অর্থব্যবস্থার সব বিভাগেই বিরাট মাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। কৌটিলীয় রাষ্ট্র শুধু ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও খনির কাজই নিয়ন্ত্রণ করত না, এ ছাড়াও কৃষিতে নিযুক্ত অধীক্ষকরা দাস ও কর্মকরদের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সময়ে ঐ একই উদ্দেশ্যে কামার, ছুতোর, খনক ইত্যাদিও নিয়োগ করতেন।[১৪] মেগাস্থেনেস থেকে স্ত্রাবো যে-অংশ উদ্ধৃত করেছেন সেখানে এই বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা জানতে পারি রাষ্ট্রের উচ্চস্থানীয় কর্মচারীরা বিভিন্ন নদীর ব্যবস্থাপনা ও জলসেচের দেখাশোনা করা ছাড়াও ভূমি পরিমাপ করতেন ও ভূমির সঙ্গে যুক্ত বৃত্তি, যেমন কাঠুরে, ছুতোর, কামার ও খনি-শ্রমিকদের তত্ত্বাবধান করতেন।[১৫] একইভাবে 'অর্থশাস্ত্রে' সমাজব্যবস্থার যে কাঠামো দেওয়া হয়েছে তা ব্রাহ্মণ্য ধাঁচেই তৈরি।

অর্থশাস্ত্রীয় রাষ্ট্রনীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অন্য সব কর্তৃত্বের উৎসের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয় রাজকীয় ক্ষমতাকে।[১৬] কম করেও প্রায় তিরিশটি বিভাগের মাধ্যমে প্রজাদের এই কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের সাধারণ নীতি প্রধানত অশোকের প্রস্তরলেখ দিয়ে সমর্থিত হয়। তিনি ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তাঁর অধীনে ছিল মোটামুটি সুসংগঠিত এক আমলাতন্ত্র। এও লক্ষণীয় যে, রাজাই রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ক্ষমতার প্রতিনিধি—এই ঝোঁক আলেকসাণ্ডারের সাম্রাজ্যেও দেখা দিয়েছিল এবং সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে গড়ে-ওঠা হেল্লেনীয় রাষ্ট্রগুলিতেও ঐ ঝোঁকটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৭] অতএব মেগাস্থেনেস থেকে উদ্ধৃত করে স্ত্রাবো সঠিকভাবেই ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে হেল্লেনীয় মিশরের ঐ একই পদমর্যাদার কর্মচারীদের তুলনা করেছেন।[১৮] কৌটিল্য দাবি করেছেন যে তিনি তাঁর সমসাময়িক রাষ্ট্রগুলিতে প্রচলিত প্রথা পর্যালোচনা করেছিলেন।[১৯] অতএব তাঁর রাজকীয় ক্ষমতাকে মহিমান্বিত করার ব্যাপারটি, মনে হয়, যুগ-ভাবনাকেই প্রতিফলিত করে।

কিন্তু অন্যান্য অনেক রচনার মতো পরবর্তী সময়ে 'অর্থশাস্ত্রে'রও যে পাঠ-পরিবর্তন হয়ে থাকতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না। তাই সমস্যা হলো প্রাথমিক সারবস্তুর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে কী কী সংযোজন হয়েছে তা খুঁজে বার করা।[২০] মনে হয়, মৌর্য যুগের প্রকৃত স্মৃতি বহন করছে 'অর্থ-

১৪ অর্থশাস্ত্র ২।২৪।

১৫. ম্যাক্‌ক্রিনড্‌ল, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া…মেগাস্থেনেস অ্যাণ্ড আরিয়ান', পৃ ৮৬, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৩৪।

১৬. অর্থশাস্ত্র ৩।১।

১৭. কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রী, "রয়্যাল পাওয়ার ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়া", 'দ প্রসিডিং অফ দি ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস' (১৯৪৪), পৃ ৪৬।

১৮. ম্যাক্‌ক্রিনড্‌ল, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া…ক্লাসিক্যাল লিটরেচর', পৃ ৫৩, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৫০।

১৯ অর্থশাস্ত্র ২।১০।

২০. কালিয়ানোভ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৪।

শাস্ত্রে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিকরণ। বর্তমান অধ্যায়ে প্রধানত সে দুটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

সুদূর দক্ষিণ বাদ দিয়ে মৌর্য সাম্রাজ্য কার্যত বিস্তৃত ছিল সারা ভারতে এবং কৌটিল্যের কাছ থেকে এক বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক দিগন্তরেখার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলেও 'অর্থশাস্ত্রে' নির্ধারিত বিধিব্যবস্থা সম্ভবত উত্তর ভারতের অবস্থারই প্রতিফলন। স্থানীয় ও গোষ্ঠী-স্বার্থকে দাবিয়ে শুধু সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য 'অর্থশাস্ত্রে' যেসব ব্যবস্থা আছে হয়তো তার সবই পুরো সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নানারকম বিশদ নির্দেশ অথবা অহল্যাভূমিকে লাঙলের আওতায় নিয়ে আসার নীতি বোধহয় সীমাবদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রেরই ধারে-কাছে।

শূদ্রবর্গের কার্যকলাপ নির্দিষ্ট করার জন্য কৌটিল্য ধর্মসূত্রের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, শূদ্রের জীবিকা অর্জনের উপায় হলো দ্বিজাতির সেবা।[২১] কিন্তু কারুশিল্পী, নর্তক, অভিনেতা ইত্যাদি বৃত্তির মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের প্রতিপালন করতে পারেন,[২২] অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে এইসব বৃত্তি স্বাধীন, এতে দ্বিজাতির সেবা বোঝায় না।

কৌটিল্য যে ধর্মসূত্রের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তার থেকে মনে হতে পারে শূদ্রেরা তখনও বেঁচে থাকার জন্য উচ্চবর্ণের প্রভুদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন। কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্রে'র দ্বিতীয় অধিকরণের একটি অংশের ভিত্তিতে বলা হয়, শূদ্রেরা চাষী ও কৃষক হয়ে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয় ঐ অংশটির এই ব্যাখ্যা সন্দেহজনক। কৌটিল্য বিবরণ দিয়েছেন, গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য একশ থেকে পাঁচশ পরিবারের এক-একটি গ্রামকে দু-চার মাইল তফাতে বসানো উচিত এবং এই ধরনের গ্রামের অধিবাসী হওয়া উচিত প্রধানত শূদ্র ও 'কর্ষক'।[২৩] আমাদের মতে 'শূদ্র' ও 'কর্ষক' পদ দুটি[২৪] দ্বন্দ্বসমাসবদ্ধ এবং ইঙ্গিত দেয় শূদ্রেরা কৃষক ছিলেন না। কয়েকজন বিদ্বান্ শূদ্রকে কর্ষকের বিশেষণরূপে গণ্য করেন[২৫] এবং

২১. অর্থশাস্ত্র ১৷৩। 'শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা বার্তা' এই বাক্যাংশে 'বার্তা' শব্দটি কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য— এই তিন বৃত্তি অর্থে ব্যবহার হয়নি (শামশাস্ত্রী যেমন মনে করেছেন, ইংরিজি অনুবাদ, পৃ ৭)। এর অর্থ জীবিকা (জয়মঙ্গলা টীকা), 'জার্নাল অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ', ২০, পৃ ১১। ২২. অর্থশাস্ত্র ১৷৩।

২৩. শূদ্রকর্ষকপ্রায়ং কুলশতাবরং পঞ্চশতকুলপরং গ্রামং ক্রোশ-দ্বিক্রোশসীমানমন্যোন্যারক্ষং নিবেশয়েৎ। অর্থশাস্ত্র ২৷১।

২৪. আই. জে. সোরাবজী, 'সাম নোট্স্ অন দি অধ্যক্ষপ্রচার, বুক টু অব দ কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্'। দ্র 'শূদ্রকর্ষকপ্রায়ম্', অর্থশাস্ত্র ২৷১; জে. জে. মেয়ার, 'ডাস আল্ট্-ইণ্ডিশে বুশ ফম ভেল্ট উন্ড স্টাটলেবেন', অর্থশাস্ত্রের জার্মান অনুবাদ, ২৷১।

২৫. টি গণপতি শাস্ত্রী-সম্পাদিত অর্থশাস্ত্র, ১ম, পৃ ১০৯, শ্যামশাস্ত্রী-কৃত অনুবাদ ২৷১; কাংলে-র অনুবাদ।

মনে করেন বসতি স্থাপনের জন্য শূদ্র কৃষকদের দরকার পড়েছিল। 'শূদ্র-কর্ষকপ্রায়' এই শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়েছে, কারণ 'অর্থ-শাস্ত্রে'র আর অন্য কোন অংশে এটি পাওয়া যায় না। 'আদি পুরাণে'র ২১ অধ্যায়ে বসতিগুলোর বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য 'শূদ্রকর্ষকভূয়িষ্ঠাঃ' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে।[২৬] আমাদের মতে এসব ক্ষেত্রে কর্ষক হচ্ছে বৈশ্যের অনুকল্প, কারণ পুরাণটির ঐ একই অধ্যায়ে বৈশ্য ও শূদ্রদের দুটি আলাদা পর্যায় বলা হয়েছে। যাঁরা বাণিজ্য, কৃষি ও গো-পালন করে জীবন নির্বাহ করেন তাঁদের যথারীতি বৈশ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে; শূদ্র বলা হয়েছে তাঁদের যাঁরা কারুশিল্পী এবং অ-কারুশিল্পী,[২৭] অর্থাৎ গৃহভৃত্য, কৃষিশ্রমিক ইত্যাদি রূপে বৈশ্যদের সেবা করেন। 'আদি পুরাণে'র শ্লোকগুলি নিঃসন্দেহে কৌটিল্যের ভিত্তিতেই রচিত, কারণ এখানেও বিধান দেওয়া হয়েছে একটি গ্রামের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি ও কম যথাক্রমে পাঁচশ ও একশ পরিবার হওয়া উচিত।[২৮] অতএব তামিল-মলয়লম ভাষ্যে শূদ্র ও কর্ষককে দুটো আলাদা শব্দ ধরে নিয়ে 'অর্থশাস্ত্রে'র অংশটির যে-ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সঠিক বলেই মনে হয়।[২৯] অন্যদিকে যোগঘম-র ভাষ্যে শূদ্রকে কর্ষকের বিশেষণরূপে গণ্য করা হয়েছে।[৩০] তার থেকে মধ্যযুগের অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায়, যখন শূদ্রদের কৃষক হিসেবে দেখা হতো। যোগঘম পরিষ্কার-ভাবে বলেন যে বৈশ্য কৃষকদের সংখ্যা ছিল খুব কম।[৩১] নিঃসন্দেহে এটি মধ্যযুগের ঘটনা যখন বৈশ্য কৃষকগোষ্ঠী কার্যত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[৩২] প্রাচীনকালে গুপ্তযুগ পর্যন্ত বৈশ্য কৃষকরা ছিলেন প্রধান করদাতা। অতএব কৌটিল্যের নির্দেশ শূদ্রদের অবস্থানের কোন মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করে না। এটি শুধু শূদ্রদের বিভিন্ন ভূমিকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অর্থাৎ দাস, হস্তশিল্পী এবং কৃষিশ্রমিক হিসেবে অহল্যাভূমিকে কর্ষণযোগ্য করা ও নতুন গ্রাম স্থাপন করা।

বিভিন্ন নতুন বসতিতে শূদ্র অধিবাসীদের কৃষিকর্ম ছাড়াও অন্যান্য

২৬. শূদ্রকর্ষকভূয়িষ্ঠাঃ সারামা সজলাশয়া। আদি পুরাণ ১৬।১৬২-৬৫।

২৭. বৈশ্যশ্চ কৃষিবাণিজ্যপশুপাল্যোপজীবিতাঃ, তেষাং শুশ্রূষণাচ্ছূদ্রাস্তে দ্বিধা কারু-কারবঃ। ঐ, ১৮৪।

২৮. শূদ্রকর্ষকভূয়িষ্ঠাঃ…গ্রামঃ কুলশতেনেষ্টো নিকৃষ্টঃ সমধিষ্ঠিতঃ, পরস্তৎপঞ্চশত্যা স্যাৎ সুসমৃদ্ধকৃষীবলঃ। ঐ, ১৬।১৬৪-৬৫।

২৯. আর. পি. কঙ্গলে, 'দ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র', ২য় ভাগ, পৃ ৬২, টী. ২-এ উদ্ধৃত; ১ম ভাগ, মুখবন্ধ, পৃ ২, ৫-৬ ও দ্র.।

৩০. 'আ ফ্র্যাগমেণ্ট অফ দ কৌটিল্য'স অর্থশাস্ত্র অ্যালিয়াস রাজসিদ্ধান্ত উইথ দ ফ্র্যাগমেণ্ট অফ দ কমেণ্টারি নেম্‌ড্ নীতিনির্ণীতি অফ আচার্য যোগঘম অ্যালিয়াস মুগ্ধবিলাস', মুনি জিন বিজয় সম্পাদিত, পৃ ২। ৩১. বৈশ্যাকর্ষকাঃ স্বল্পাঃ। ঐ।

৩২. খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে এর সূচনা হয়েছিল।

কাজে নিয়োগ করা যেত। বলা হয়েছে যে, প্রধানত শূদ্র-অধ্যুষিত নতুন বসতিই নিশ্চিত ফল দেওয়ার ও রাষ্ট্র আরোপিত সবরকম ভার বহনের ক্ষমতা রাখে।[৩৩] 'নয়চন্দ্রিকা'-ভাষ্য অনুযায়ী 'ভাগ' শব্দটি দিয়ে বোঝায় চাষবাস ছাড়াও শূদ্রদের মাল বওয়া ও দুর্গ তৈরির কাজে নিয়োগ করা যেত।[৩৪] শূদ্র-অধ্যুষিত বসতি সংখ্যাগত শক্তির সুবিধা ভোগ করে—একথাও বলা হয়েছে।[৩৫] নতুন জমিকে চাষবাসের উপযুক্ত করা, বা পুরনো জায়গায় পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে যেসব অঞ্চলে জনস্ফীতি আছে সেখান থেকে শূদ্রদের নিয়ে আসতে হবে অথবা বিদেশী রাজ্য থেকে তাঁদের চলে আসতে উৎসাহিত করা হবে।[৩৬] জনপদে বিভিন্ন নিম্নতম বর্ণের অসংখ্য লোক থাকা চাই—তা-ও বলা হয়েছে।[৩৭] এই সব কিছু থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শূদ্রের সংখ্যা বেশ ভালোই ছিল। বোধহয় এই বর্ণের লোক ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর দেশের অন্যান্য অংশে যেখানে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্য কৃষকরাই প্রধানত বসবাস করতেন সেখানে ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য দেয়-র প্রধান দায় হয়তো, ঘোষাল যেমন বলেছেন, শূদ্রদের উপর পড়ত না।[৩৮]

সম্ভবত শূদ্র জনসংখ্যার প্রধান অংশকে কৃষিশ্রমিক ও দাসরূপে নিয়োগ অব্যাহত ছিল। ধর্মসূত্র থেকে জানা যায়, দাসত্বের প্রকৃতি ছিল গৃহগত। কৌটিল্যই প্রধান এবং একমাত্র ব্রাহ্মণ-লেখক যিনি কৃষিজাত উৎপাদনের কাজে দাসদের বেশ ভালোমাত্রায় নিযুক্ত থাকার প্রমাণ দিয়েছেন।[৩৯] গোড়ার দিকে পালি রচনায় মাত্র তিনটি বড় কৃষিক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয়, মৌর্য যুগে এই ধরনের ক্ষেত্র ছিল অসংখ্য। সেখানে সরাসরি সীতাধ্যক্ষের (কৃষি-অধীক্ষক) অধীনে ভাড়া-করা শ্রমিক ও দাসদের কাজ করানো হতো। এইসব লোককে সীতাধ্যক্ষ চাষবাসের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস যোগান দিতেন এবং তারজন্য ছুতোর, কামার ও অন্য হস্তশিল্পীদের তলব করতেন।[৪০] এই তথ্য অনেকটা সমর্থন করেন মেগাস্থেনেস। ভূমি ও কারুশিল্পীদের কাজ তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রাজ-কর্মচারীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।[৪১] আরিয়ান বলেছেন কৃষি-

৩৩. তস্যাং চাতুর্বর্ণ্যাভিনিবেশং সর্বভোগসহত্বাদবরবর্ণপ্রায়া শ্রেয়সী বাহুল্যাৎ ধ্রুবত্বাচ্চ। অর্থশাস্ত্র ৭।১১। "অবরবর্ণপ্রায়" শব্দটিকে নয়চন্দ্রিকা-য় (পৃ ৩৩) ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'শূদ্রপ্রায়'।

৩৪. কর্ষণভারবহনদুর্গকরণাদিবিনিয়োগঃ, তদ্‌যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। নয়চন্দ্রিকা, পৃ ৩৩।

৩৫. অর্থশাস্ত্র ৭।১১।

৩৬. পরদেশাপবাহনেন স্বদেশাভিষ্যন্দবমনেন বা। অর্থশাস্ত্র ২।১।

৩৭. অবরবর্ণপ্রায়ঃ। অর্থশাস্ত্র ৬।১। ৩৮. 'হিন্দু রেভিনিউ সিস্টেম', পৃ ৫৫।

৩৯. অর্থশাস্ত্র ২।২৪। ৪০. ঐ।

৪১. ম্যাকক্রিনডল্‌, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া…মেগাস্থেনেস অ্যান্ড আরিয়ান', পৃ ৮৬, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৩৪।

অধীক্ষকদের কথা,[৪২] যাঁরা বোধ হয় সীতাধ্যক্ষের কাজই করতেন। স্ট্রাবো জানিয়েছেন, তৃতীয় জাতিভুক্ত রাখাল ও শিকারীরা যাযাবর জীবন যাপন করতেন এবং বন্য জন্তু ও পাখিদের ক্ষেত থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁরা রাজার কাছ থেকে শস্য অনুদান পেতেন।[৪৩] মনে হয় এঁরা ছিলেন যাযাবর আদিম গোষ্ঠীর মতন ( 'সর্পগ্রাহাদিকাঃ', অর্থাৎ সাপ ও অন্যান্য জন্তু ধরায় নিযুক্ত ব্যক্তি )[৪৪] সীতাধ্যক্ষ যাঁদের চাষবাসের কাজে লাগিয়েছিলেন।[৪৫] অতএব মৌর্য রাষ্ট্র ছিল দাস ও কর্মকর, হস্তশিল্পী ও আদিম জনগোষ্ঠী ( যাঁরা স্পষ্টতই শূদ্র শ্রেণীভুক্ত )—তাঁদের সবার এক বিরাট নিয়োগকর্তা। আর এ-ক্ষেত্রে এই যুগের কৃষিজ উৎপাদন-সংস্থানের সঙ্গে গ্রীস ও রোমের প্রচলিত সংস্থানের কিছুটা মিল আছে।

কৌটিল্যের বিধান অনুযায়ী যেসব জমিতে বীজ বপন করা যায় না ( স্পষ্টতই শ্রমশক্তির অভাবে ) সেরকম জমি যাঁরা উৎপন্নের অর্ধেক নিয়ে চাষ করবে তাদের ইজারা দেওয়া যেতে পারে।[৪৬] যারা শারীরিক পরিশ্রম করে জীবনধারণ করে, আর সেজন্য নিজের কাছে চাষের উপযুক্ত বীজ ও বলদ থাকে না, তারা ঐ ধরনের জমি চাষ করতে পারে, কিন্তু উৎপন্নের মাত্র $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{5}$ অংশ নিজের কাছে রাখতে পারবে। মনে হয়, রাষ্ট্রই তাঁদের বীজ ও বলদ যোগান দিত।[৪৭] এই নীতি ব্যাখ্যা করে কৌটিল্য বলেন, নিজেরা কষ্ট না করে ভাগচাষীদের যত বেশি সম্ভব ততটাই রাজাকে দেওয়া উচিত।[৪৮] কিন্তু ঐ কষ্ট কী ধরনের হতে পারে তা তিনি নির্দেশ করেননি। মনে হয় ভাগচাষীদের কিছু পাথুরে মাটির জমিও দেওয়া হতো, তার জন্য তাঁদের রাষ্ট্রকে কিছুই দিতে হতো না।[৪৯] নিঃসন্দেহে দু ধরনের ভাগচাষী ছিলেন—একদল শস্যের অর্ধেক ও অন্যরা তার $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{5}$ অংশ নিজেদের কাছে রাখতেন। ভাষ্যকার ভট্টস্বামী প্রথমোক্তদের "গ্রাম্যকুটুম্বিনঃ" বলে অভিহিত করেছেন।[৫০] দুর্গনিবেশ ( রাজধানী স্থাপন ) অংশে কৌটিল্যের ব্যবস্থা অনুযায়ী, ক্ষেতের কাজ ও অন্যান্য বৃত্তির প্রয়োজন মেটানোর জন্য 'কুটুম্বী'দের বসতি রাজধানীর সীমানায় স্থাপন করা উচিত।[৫১] বলা হয়েছে, তারা ফুল, ফল, শাকসব্জীর বাগান ও ধানক্ষেতে[৫২] কাজ করবে

৪২. ম্যাক্‌ক্রিনড্‌ল্‌, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া··· ক্লাসিক্যাল লিটরেচর', পৃ ৫৩, টী ৪।

৪৩. ঐ, পৃ ৪৮, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৪১।

৪৪. ভট্টস্বামীর মতে 'রজ্জুবর্তক' ছিলেন শ্বপাক ও অন্যান্য, আর 'সর্পগ্রাহাদিক' ছিলেন শবর ও অন্যান্য। 'জার্নাল অফ দ বিহার অ্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি', ১২, পৃ ১৪৩।

৪৫. অর্থশাস্ত্র ২।২৪।

৪৬. ঐ।

৪৭. ঐ। ভট্টস্বামীর টীকা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩৭।

৪৮ অর্থশাস্ত্র ২।২৪।

৪৯. অন্যত্র কৃচ্ছ্রেভ্যঃ। ঐ।

৫০. ভট্টস্বামীর টীকা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৩৭।

৫১. কর্মান্তক্ষেত্রবশেন বা কুটুম্বিনাং সীমানং স্থাপয়েৎ। অর্থশাস্ত্র ২।৪।

৫২. তাঁর অনুবাদে শ্যামশাস্ত্রী বলেছেন এসব জমি তাঁদের ভাগ করে দেওয়া হতো (*allotted*), কিন্তু মূলে এর সমর্থনসূচক কোন কথাই নেই।

এবং আদেশ মতো প্রচুর শস্য ও পণ্য সংগ্রহ করবে। এই প্রসঙ্গে 'কুটুম্বিনঃ' শব্দটিকে টি. গণপতি শাস্ত্রী নিম্নতম বর্ণভুক্ত ('বর্ণাবরাণাম্') মানুষ বলে ব্যাখ্যা করেছেন,[৫৩] আর শ্যামশাস্ত্রী বলেছেন শব্দটির অর্থ শ্রমজীবীদের পরিবার।[৫৪] অতএব কুটুম্বীরা ছিলেন সম্ভবত শূদ্র ভাগচাষী ও ক্ষেত-মজুর। শব্দটির এই প্রয়োগ খানিকটা অস্বাভাবিক, কারণ অধিকাংশ সূত্রে 'কুটুম্বিনঃ'-এর সহজ অর্থ পরিবারের প্রধান।[৫৫] কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে এই শব্দটির বিশিষ্ট অর্থ আছে।

পুরনো বসতিতে উচ্চবর্ণের সম্পন্ন ব্যক্তিরা সম্ভবত বিশাল সংখ্যায় শূদ্র, ক্ষেতমজুর, দাস ও হস্তশিল্পী নিয়োগ করতেন। চাষীদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা যাঁর কাজ সেই 'গোপ'কে নিবন্ধভুক্ত করতে হতো প্রত্যেক গ্রামের মোট অধিবাসীর এবং তার সঙ্গে সমাজের ছ'টি উৎপাদক শাখার—যথা, কর্ষক (চাষী), গোরক্ষক (পশুপালক বা গবাদি পশুর অধিকারী), বৈদেহক (ব্যবসায়ী), কারু (হস্তশিল্পী), কর্মকর এবং দাস[৫৬]—সংখ্যা। মনে হয় দুটি নিম্নবর্ণভুক্ত মানুষ এই তালিকায় আছেন—প্রথম তিন দল বৈশ্যের অন্তর্ভুক্ত, বাকি তিনটি শূদ্রের। বিভিন্ন উৎপাদক জাতিকে মেগাস্থেনেস এই বিন্যাসে রাখেননি। একদিকে কৌটিল্যের বৈশ্য কৃষক (কর্ষক) মোটামুটিভাবে মেগাস্থেনেস-উল্লিখিত চাষী জাতির সঙ্গে মেলে।[৫৭] বৈশ্য ব্যবসায়ী ও শূদ্র হস্তশিল্পী ও শ্রমিকদের সঙ্গে মেগাস্থেনেসের তৃতীয় জাতির মিল আছে, যাঁরা ব্যবসা, পণ্যদ্রব্য ফেরি ও দৈহিক শ্রমের কাজে নিযুক্ত।[৫৮] মেগাস্থেনেস আরও বলেছেন, এঁদের মধ্যে কিছু লোক কর দেন ও রাষ্ট্রের জন্য কিছু নির্দিষ্ট কাজ করেন।[৫৯] এই বক্তব্যের প্রথম অংশ সম্ভবত ব্যবসায়ীদের এবং দ্বিতীয় অংশ হস্তশিল্পী ও শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। 'অর্থশাস্ত্রে' শূদ্ররা, মনে হয়, কর না-দেওয়ার দলে পড়েন এবং 'গোপ' তাঁদের সংখ্যার হিসেব রাখেন।[৬০] করপ্রদায়ী গ্রামে, যাঁরা রাষ্ট্রকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম ('বিষ্টি') দেন তাঁদের একটি তালিকা রাখতে হতো।[৬১] 'অর্থশাস্ত্রে'র একটি অংশের ভাষ্যে ভট্টস্বামী আভাস দিয়েছেন, এক ধরনের গ্রাম ছিল যেখান থেকে করের পরিবর্তে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম যোগান দেওয়া হতো এবং সেখানকার অধিবাসীদের দুর্গ

৫৩. ১ম, পৃ ১৩০। ৫৪. ইংরিজি অনুবাদ, পৃ ৫৪।
৫৫. 'হিন্দু রেভিনিউ সিস্টেম', পৃ ২০০, টী ২। ৫৬. অর্থশাস্ত্র ২।৩৫।
৫৭. ম্যাকক্রিনড্‌ল্, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া…মেগাস্থেনেস অ্যাণ্ড আরিয়ান', পৃ ৮৩-৮৪, খণ্ড-উদ্‌ধৃতি ৩৩।
৫৮. ম্যাকক্রিনড্‌ল্, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া…ক্ল্যাসিক্যাল লিটরেচর', পৃ ৫৩, স্ত্রাবো, খণ্ড-উদ্‌ধৃতি ৪৬।
৫৯. ঐ। ৬০. অর্থশাস্ত্র ২।৩৫। ৬১. ঐ।

ইত্যাদি তৈরির কাজে নিয়োগ করা হতো।[৬২] গণপতি শাস্ত্রী সঠিকভাবেই বলেছেন যে এই ধরনের কাজের ভার ছিল কর্মকরদের উপর,[৬৩] কারণ অন্যান্যদের সঙ্গে দাস ও কর্মকরদের সবসময় বাধ্যতামূলক শ্রমের উপযোগী বলে গণ্য করা হতো। অর্থাৎ তাঁরা কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতেন না।[৬৪] এই সব কিছু থেকে বোঝা যায় যে রাজভূমিতে নিযুক্ত ভাগচাষী ছাড়া শূদ্রদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর দিতে হতো না। সাধারণত তাঁদের নিয়োগ করা হতো ক্ষেতমজুর ও দাস হিসেবে, স্বাধীনভাবে জীবন ধারনের কোন উপায় তাঁদের ছিল না।

পশুপালকদের কাজের অবস্থা সম্বন্ধে কৌটিল্য কিছু তথ্য দিয়েছেন। মনে হয় রাষ্ট্র প্রচুর সংখ্যায় গোপালক নিয়োগ করত এবং তাঁরা সাধারণত গো-অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।[৬৫] তিনি তাঁদের বেতন স্থির করেছেন তোলা মাখনের $\frac{১}{১০}$ অংশ।[৬৬] কিন্তু তাঁদের কাজ সম্পর্কে তিনি খুবই সাবধানী। গোপালকদের দায়িত্বের উপর জোর দিয়ে কৌটিল্য বিধান দিয়েছেন, কোন গোপালকের জন্য যদি জন্তুর ক্ষতি হয় তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।[৬৭] প্রাগ্-মৌর্য যুগের ধর্মশাস্ত্রে এই চরম ব্যবস্থার কোন উল্লেখ নেই এবং এর কারণ বোধ হয় পশু-সম্পদের উপর বিরাট অর্থনৈতিক গুরুত্ব-দান বা বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের শিক্ষার ফল, অথবা দুই-ই।

এরপরে আমরা কারুশিল্পীদের নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ ও বেতন বিষয়ে 'অর্থশাস্ত্রে'র সাক্ষ্য থেকে শূদ্রদের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে যা জানা যায় তা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। চাষবাসে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগে যে-হস্তশিল্পীদের সমবেত করা হতো তাঁদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বয়ন,[৬৮] খনন,[৬৯] ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণ,[৭০] অস্ত্রনির্মাণ,[৭১] ধাতুকর্ম[৭২] ইত্যাদিতে মনে হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আরও অনেকে নিযুক্ত হতেন। প্রথমদিকে তাঁতির মতো হস্তশিল্পীকে 'গহপতি'র কাছে কাজ করতে দেখা যায়, কিন্তু এখন তাঁরা বিপুল সংখ্যায় রাষ্ট্র-নিযুক্ত।[৭৩] হস্ত-শিল্পীদের সম্ভবত নিজেদের যন্ত্রপাতি ছিল, কিন্তু কাঁচামালের যোগান দিত রাষ্ট্র। এই ধরনের কারুকর্মে দাস নিয়োগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কর্মকররা যে খনির কাজ চালাতেন তার মধ্যেও তাঁরা ছিলেন না।[৭৪]

৬২. অর্থশাস্ত্র ২।১৫। 'এতাবন্তো বিষ্টি···দুর্গাদিকর্মোপযোগিভিঃ। ভট্টস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৮। ৬৩. ১ম, পৃ ৩৪৪।

৬৪. ···দাসকর্মকরবর্গশ্চ বিষ্টিঃ। অর্থশাস্ত্র ২।১৫।

৬৫. ঐ, ২।২৯। ৬৬. ঐ, ৩।১৩।

৬৭. স্বয়ং হন্তা ঘাতয়িতা হর্তা হারয়িতা চ বধ্যঃ। ঐ, ২।২৯।

৬৮. ঐ, ২।২৩। ৬৯ ঐ, ২।১২। ৭০, ঐ, ২।১৫।

৭১. ঐ, ২।১৮। ৭২. ঐ, ২।১৭। ৭৩. ঐ, ২।২৩।

৭৪. ঐ, ২।১২।

কিন্তু হস্তশিল্পীদের রাষ্ট্রীয় নিয়োগ, মনে হয়, সীমাবদ্ধ ছিল মূলত রাজধানী আর হয়তো বা প্রধান প্রধান নগরে, যেখানে তাঁদের সংখ্যা ছিল ভালোই। বলা হয়েছে, হস্তশিল্পীরা বাস করতে পারে রাজপ্রাসাদের উত্তরে, রাজধানীর বিভিন্ন কোণে শ্রমিকগোষ্ঠী ও অন্যান্যদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করা উচিত।[৭৫] এও জানানো হয়েছে, রাজপ্রাসাদের পশ্চিমদিকে বসতি হওয়া উচিত শূদ্রজাতীয়দের এবং কারুশিল্পীদের যারা উল ও তুলোর সুতো, বাঁশের মাদুর, চর্ম, বর্ম, শস্ত্র ও তার আবরণ তৈরির কাজ করে।[৭৬] সম্ভবত এঁদের মধ্যে কিছু লোক সূত্রাধ্যক্ষ বা বয়ন-অধীক্ষকের অধীনে কাজ করতেন,[৭৭] আর অন্যরা ছিলেন অস্ত্রাগার-অধ্যক্ষের অধীনে।[৭৮] মেগাস্থেনেস জানিয়েছেন, যাঁরা অস্ত্রশস্ত্র ও জাহাজ তৈরি করতেন তাঁরা বেতন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পেতেন রাজার কাছ থেকে এবং সে-কাজ করতেন তাঁর জন্যই।[৭৯] এছাড়াও নগরে শিল্পজাত উৎপাদন সংক্রান্ত সবকিছু দেখাশোনা করার জন্য পাঁচজনের একটি সমিতি ছিল।[৮০] এই সব কিছু থেকে বোঝা যায়, কারুশিল্পীদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিয়োগ ছিল প্রধানত নগরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মেগাস্থেনেস আরও বলেন যে রাষ্ট্রের বড় বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কাঠুরে, ছুতোর, কামার ও খনি-শ্রমিকদের কাজের তত্ত্বাবধান করতেন।[৮১] তার মানে এও হতে পারে, যেসব কারুশিল্পী নগরের বাইরে থাকতেন কিন্তু কাজ করতেন রাষ্ট্রের জন্য তাঁদের উপর এক ধরনের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ছিল।

'অর্থশাস্ত্র'ই প্রাচীনতম ভারতীয় গ্রন্থ যেখানে নিয়োগকর্তা ও নিযুক্তদের সম্পর্ক বিষয়ক সাধারণ নিয়মাবলি দেওয়া আছে। হস্তশিল্পীদের উপদ্রবের উৎস বলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ''কারুক-রক্ষণম্''-অংশে তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিধান দেওয়া আছে। স্থান, কাল ও কাজের ধরন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি হস্তশিল্পীকে রাখতেই হবে। ''আপদ-বিপদ'' ছাড়া অন্য কোন কারণে তা না পারলে বেতনের এক পাদ [ এক-চতুর্থাংশ ] নাশ ছাড়াও তার সঙ্গে বেতনের দ্বিগুণ দণ্ড ও তদুপরি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৮২] কার্যকালে নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি বেতন নাশ ও তার দ্বিগুণ দণ্ড।[৮৩] আগাম

৭৫. ঐ, ২।৪।

৭৬. ততঃ পরমূর্ণাসূত্রবেণুচর্মবর্মশস্ত্রাবরণকারবশূদ্রাশ্চ পশ্চিমাং দিশামধিবসেয়ুঃ। ঐ, ২।৪।

৭৭. ঐ, ২।২৩।

৭৮. ঐ, ২।১৮।

৭৯. ম্যাক্‌ক্রিনড্‌ল্‌, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া···ক্ল্যাসিক্যাল লিটরেচর', পৃ ৫৩, স্ত্রাবো. খণ্ড-উদ্‌ধৃতি ৪৬।

৮০. ম্যাক্‌ক্রিনড্‌ল্‌, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া··· মেগাস্থেনেস অ্যাণ্ড আরিয়ান', পৃ ৮৭, খণ্ড-উদ্‌ধৃতি ৩৪।

৮১. ঐ, পৃ ৮৬, খণ্ড-উদ্‌ধৃতি ৩৪।

৮২. অর্থশাস্ত্র ৪।১।

৮৩ ঐ।

বেতন নিয়ে যে-ভৃত্য কাজে অবহেলা করে তার অর্থদণ্ড হবে ১২ 'পণ' এবং কাজ শেষ না-হওয়া অবধি তাকে খাটানো হবে।[৮৪] অবশ্য সে যদি এমন কোন কারণে কাজ করতে অক্ষম হয় যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে তাহলে এরকম অর্থদণ্ড হবে না।[৮৫] অন্যদিকে হস্তশিল্পীদের স্বার্থরক্ষার জন্যও কৌটিল্য কয়েকটি বিধিবিধানের কথা বলেছেন। যেমন হস্তশিল্পীদের কর্মগুণের অপকর্ষ ঘটিয়ে বা জিনিসপত্র কেনা-বেচায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে যারা তাঁদের প্রাপ্য আয় থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করবে তাদের এক হাজার 'পণ' অর্থদণ্ড হবে।[৮৬] যে-নিয়োগকর্তা তাঁর শ্রমিকদের থেকে কাজ নেবেন না তাঁর অর্থদণ্ড হবে ১২ 'পণ'।[৮৭] যদি তিনি পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই কাজ নিতে অস্বীকার করেন তাহলে কাজ শেষ হয়েছে ধরে নেওয়া হবে।[৮৮] যেসব হস্তশিল্পী বৃত্তিগোষ্ঠী (গিল্ড)-তে সংগঠিত কৌটিল্য তাঁদের একটি সুবিধা দিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার উপরেও তাঁরা অতিরিক্ত সাত রাত সময় পেতে পারেন।[৮৯]

বেতন স্থির করার সাধারণ নীতিটি ব্যাখ্যা করে কৌটিল্য বলেন যে কাজের সময় ও গুণ অনুযায়ী বেতন স্থির করা উচিত। এর থেকে অবশ্যই সমাজ-বিকাশের এক উন্নত পর্যায় সূচিত হয় যেখানে কাজে প্রযুক্ত সময়, দক্ষতা ও শ্রমের গুরুত্ব খুব ভালোভাবে স্বীকৃত। কৌটিল্য আরও বলেন যে, কারু-শিল্পী, কুশীলব, চিকিৎসক, পাচক ও অন্যান্য কর্মীদের বেতন হবে অন্য জায়গায় নিযুক্ত ঐ একই ধরনের লোকের সমান অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যা ঠিক করবেন তা-ই।[৯০] ভৃত্য তার প্রতিশ্রুত বেতন পাবে। কিন্তু একজন কর্ষক (অর্থাৎ কৃষি-শ্রমিক) পাবে উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{১০}$ অংশ, গোপালক তোলা মাখনের $\frac{১}{১০}$ অংশ, যদি-না প্রথমেই তা ঠিক করে নেওয়া হয়।[৯১] এখানে ভাগচাষী ও সাধারণ কৃষি-শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। প্রথমোক্তরা রাজভূমির শস্যের $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৪}$ ভাগ পাওয়ার অধিকারী, দ্বিতীয়রা পাবেন শস্যের মাত্র $\frac{১}{১০}$ অংশ।

কৌটিল্যের মতে, সাক্ষীদের প্রদত্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বেতন সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করা হবে। সাক্ষীর অভাবে নিয়োগকর্তাকে প্রশ্ন করা হবে।[৯২] এ-ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার বিচার করা হবে না—এই ঘটনায় স্পষ্টতই প্রভুর দোষ প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি দেখা যায় প্রভু বেতন দেননি, তাহলে তাঁর অর্থদণ্ড হবে বেতনের দশগুণ অথবা ছ 'পণ'। এছাড়াও বেতন আত্মসাৎ করলে অর্থদণ্ড হবে বেতনের পাঁচগুণ বা বারো 'পণ'।[৯৩]

৮৪. ঐ, ৩।১৪। ৮৫. ঐ। ৮৬. ঐ, ৪।২।
৮৭. ভর্তুকাররতো ভৃতকস্যাকুর্বতো বা দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। ঐ, ৩।১৫।
৮৮. ঐ। ৮৯. ঐ, ৩।১৪।
৯০ কারুশিল্পিকুশীলবচিকিৎসকবাগ্জীবনপরিচারকাদিরাশাকারিকবর্গস্তু যথাঽন্যস্তদ্বিধঃ কুর্যাৎ, যথা বা কুশলাঃ কল্পয়েয়ুঃ, তথা বেতনং লভেৎ। ঐ, ৩।১৩।
৯১. ঐ, ৩।১৩। ৯২. ঐ। ৯৩. ঐ।

এই বিভিন্ন নিয়মের ভিত্তিতে দুটি ভিন্ন বেতনের হার পাওয়া যায়, অর্থাৎ ⅘ 'পণ' বা ২⅘ 'পণ'। অতএব মনে হয় শ্রমিকের দৈনিক বেতন ⅘ 'পণ' থেকে ২⅘ 'পণে'র মধ্যেই ছিল। এক জায়গায় কৌটিল্য বলেছেন, কৃষি-শ্রমিকরা জীবনধারণের উপকরণ ছাড়াও ১¼ 'পণ' মাসিক বেতন পাবেন। পরে দেখানো হবে, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের উচ্চ শ্রেণী থেকে নিয়োগ করা হতো, এঁদের বেতনের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কারুশিল্পীদের বেতনের এক বিরাট ব্যবধান দেখা যায় 'অর্থশাস্ত্রে'। ঋত্বিক্, আচার্য, মন্ত্রী, পুরোহিত এবং সেনাধ্যক্ষদের সবচেয়ে বেশি বেতন দেওয়া হয়েছে: (মাসিক) ৪৮,০০০ 'পণ'।[৯৪] নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতন সুপারিশ করা হয়েছে ২৪,০০০, ১২,০০০ বা ৮,০০০ 'পণ'[৯৫]; কিন্তু কারুশিল্পীদের ক্ষেত্রে ১২০ 'পণ'।[৯৬] অবশ্য এ বিষয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো 'বর্ধকি'কে—মনে হয়, ইনি ছিলেন প্রধান ছুতোর—চিকিৎসক ও সারথির মতো ২,০০০ পণ বেতন দেওয়া হয়েছে।[৯৭] 'গ্রামভৃতক' (গ্রামের উচ্চপদস্থ কর্মচারী)[৯৮] এবং গুপ্তচরদের নেতৃত্ব দেন যে-ভৃত্য তাঁদের দুজনের প্রতি বিবেচনা দেখানো হয়েছে। তাঁরা পান যথাক্রমে ৫০০ 'পণ' ও ২০০ 'পণ'।[৯৯] সবচেয়ে কম বেতন—৬০ 'পণ'—সুপারিশ করা হয়েছে চতুষ্পদ ও দ্বিপদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ভৃত্য, বিবিধ কাজের কর্মচারী, রাজকীয় ব্যক্তিদের সহকারী, দেহরক্ষী এবং 'বিষ্টিবন্ধক' (বেগার শ্রম জোগাড়ের আড়কাঠি)-দের জন্য।[১০০] মাসিক ভিত্তিতে বেতন দেওয়া হতো ধরে নিলে একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক হার দাঁড়ায় দু 'পণ'। কিন্তু আগে যে দৈনিক ⅘ 'পণে'র হার হিসেব করা হয়েছে তার থেকে এ-ই বোঝাতে পারে যে ব্যক্তিস্বত্বাধিকারীরা ২ 'পণে'র চেয়েও কম বেতন দিতেন।

সমাজের সবচেয়ে খারাপ আয়ের দলে ছিলেন হস্তশিল্পী ও বেতনভুক্ শ্রমিকরা। কিন্তু 'পণে'র ক্রয়ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন তথ্য না-থাকায় তাদের জীবনধারণের মান সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা করা যায় না। রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত দাস ও কর্মকরদের সাহায্যের জন্য ভাণ্ডার-অধীক্ষক তাঁদের 'অন্নের কণিকা' দেবেন—কৌটিল্য অবশ্য এই ব্যবস্থাও দিয়েছেন।[১০১] এইভাবে বিতরণের পর অবশিষ্টাংশ দেওয়া উচিত মণ্ড তৈরিতে নিযুক্ত পাচকদের।[১০২]

৯৪. ঐ, ৫।৩। ৯৫. ঐ। ৯৬. ঐ। ৯৭ ঐ।

৯৮. 'গ্রামভৃতক'কে সাধারণ গ্রামসেবক হিসেবে নেওয়া যায় না—শ্যামশাস্ত্রী (ইংরিজি অনুবাদ, পৃ ২৭৭) যেমন মনে করেন; তাঁর বেতন—৫০০ পণ—থেকেই দেখা যায় তিনি ছিলেন খানিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম-কর্মচারী।

৯৯. অর্থশাস্ত্র ৫।৩। ১০০. ঐ।

১০১. কণিকাঃ দাসকর্মকরসূপকারাণামতোঽন্যদৌদনিকাপূপিকেভ্যঃ প্রযচ্ছেৎ। ঐ, ২।১৫। 'কণিকা' অর্থে এখানে স্পষ্টতই শস্যের ভাঙা কণা। ঝাড়াই-এর পর শ্রমিকদের এই ভাঙা কণাই দেওয়া হতো। ১০২. ঐ।

এই পাচকরা দাস হতে পারেন, কারণ তাঁরা প্রাগ্‌-মৌর্য যুগেই রান্নার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। দুষ্ট (খারাপ হয়ে যাওয়া) সুরা নিয়ে কী করা যায় সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এই পানীয় দাস ও কর্মকরদের বেতন হিসেবে দেওয়া উচিত কারণ তাঁরা নীচু ধরনের কাজ করেন।[১০৩] একজন সাধারণ আর্য ও শূদ্রের খাদ্য-তালিকার মধ্যে কৌটিল্য পার্থক্য করেছেন। আর্যের বরাদ্দ হওয়া উচিত এক প্রস্থ বিশুদ্ধ এবং গোটা চালের ভাত, ১/৬৪ প্রস্থ নুন, ১/৪ প্রস্থ সূপ এবং ১/১৬ প্রস্থ মাখন বা তেল। একজন 'অবরে'র পাওয়া উচিত ঐ একই পরিমাণ ভাত ও নুন কিন্তু ১/৬ প্রস্থ সূপ এবং আর্যের জন্য যে-পরিমাণ তেলের সুপারিশ করা হয়েছে[১০৪] তার মাত্র অর্ধেক। 'অবরে'র বেলায় মাখনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে 'অবর' মানে নিম্নবর্ণের ('নিকৃষ্টানাম্‌') মানুষ এবং তিনি শূদ্র। কিন্তু আর্য অর্থে উচ্চতর বর্ণের সাধারণ মানুষ,[১০৫] কারণ উচ্চতর পর্যায়ের আর্য, যেমন রাজা, রানী ও সেনাধ্যক্ষদের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।[১০৬] এইসব থেকেই দেখা যায়, শূদ্রদের নিকৃষ্ট মানের খাদ্য খেতে দেওয়া হতো।

মনে হয় মৌর্য যুগে শূদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থানে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। এই প্রথম শূদ্ররা রাজভূমিতে ভাগচাষী রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু রাষ্ট্র সম্ভবত অনেক বেশি মাত্রায় শূদ্রদের কৃষিজ উৎপাদনে দাস ও কর্মকর হিসেবে নিয়োগ করত। নিম্ন বর্ণের মানুষ, যাঁরা কোন কৃষকের অধীনে বা স্বাধীনভাবে কাজ করে গ্রামে বাস করতেন তাঁদের বেগার শ্রম দিতে হতো। এই বেগার শ্রমের পরিমাণ হতো ধর্মসূত্রের যুগের চেয়ে অনেক বেশি, যখন এটি ছিল প্রধানত হস্তশিল্পীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[১০৭] এই ব্যবস্থা এতই ছড়িয়ে পড়েছিল যে 'বিষ্টিবন্ধক' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী বাধ্যতামূলক শ্রমের সংগ্রাহকরূপে কাজ করতেন।[১০৮] যদিও শ্রমিক ও হস্তশিল্পী হিসেবে সমাজে শূদ্রদের আয় ছিল সবচেয়ে কম তাহলেও বেতন বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটি হয়তো তাঁদের অবস্থার উন্নতি করতে সাহায্য করেছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের জীবনযাত্রার মানের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না। বোধ হয় শূদ্র ভাগচাষীরা ছিলেন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম।

১০৩ দাসকর্মকরেভ্যো বা বেতনং দদ্যাৎ। অর্থশাস্ত্র ২।২৫, গণপতি শাস্ত্রীর ভাষ্য সমেত, ১ম, পৃ ২৯২।

১০৪. পুংসঃ ষড়্‌ভাগঃ সূপঃ অর্ধস্নেহমবরাণাম্‌। 'পুংসে'র পরিবর্তে শ্যামশাস্ত্রী বিকল্প পাঠ দিয়েছেন 'প্রস্থ', গণপতি শাস্ত্রী তা সঠিক পাঠ বলে গ্রহণ করেছেন। তুলনীয়: প্রাণ নাথ 'ইকনমিক কণ্ডিশন ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ১৫০-৫১।

১০৫. ভট্টস্বামী তাঁকে 'মধ্যমপ্রতিপত্তিক সাধুপুরুষ' বলে অভিহিত করেছেন। 'জার্নাল অফ দ বিহার অ্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি', ১১, পৃ ৯১।

১০৬ অর্থশাস্ত্র ২।১৫। ১০৭. টি. ডব্লু. রিস ডেভিডস, 'বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৪৯।

১০৮. অর্থশাস্ত্র ৫।৩।

ধর্মসূত্রের মতো, উচ্চ প্রশাসনিক পদ থেকে শূদ্রদের বাদ দেওয়ার কোন পরিষ্কার বিধান কৌটিল্য দেননি। কিন্তু রাজার আসন ও উচ্চ রাজপদের উপযুক্ত যোগ্যতা বিষয়ে তাঁর তালিকা থেকে দেখা যায়, এই সমস্ত পদকে উচ্চ তিন বর্ণের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত রূপে দেখা হতো। তিনি বলেন, পরাক্রান্ত ও নীচ জাতীয় রাজার চেয়ে অভিজাত রাজাকেই লোকে দুর্বল হলেও স্বভাবতই মান্য করবে।[১০৯] অতএব তাঁর মত অনুযায়ী রাজার মহাকুলীন হওয়া উচিত।[১১০] তিনি বলেছেন, যেমন চণ্ডালদের (জন্য সংরক্ষিত) কূপ শুধু তাদেরই কাজে লাগে তেমনি নীচকুলজাত রাজা শুধু নীচকুলের মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, আর্যদের নয়। এখানে নীচ কুলজাত রাজা সম্পর্কে কৌটিল্যের অপছন্দ থেকে দেখা যায়, তিনি শূদ্রমাতৃক রাজার অধীনে কাজ করতে সম্মত হতেন না। অতএব মৌর্যদের শূদ্র উৎপত্তি নিয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়, যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়েছে।[১১১] চন্দ্রগুপ্ত যে ক্ষত্রিয় বর্ণের মোরিয় কুলভুক্ত ছিলেন কার্যত তা নিশ্চিত।[১১২]

'অর্থশাস্ত্রে' অমাত্যরা ছিলেন উচ্চতম পর্যায়ের কর্মচারী। এঁদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হতো পুরোহিত, মন্ত্রী, সংগ্রাহক ('সমাহর্তা'), সেনাধ্যক্ষ ('সন্নিধাতা'), অন্তঃপুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, রাজদূত এবং চব্বিশটিরও বেশি বিভাগের অধীক্ষক।[১১৩] কিন্তু কৌটিল্য ও অন্যান্য যেসব চিন্তাবিদের কথা তিনি উদ্ধৃত করেছেন তাঁরা অমাত্যদের যোগ্যতা বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে যে-বিধান দিয়েছেন তা হলো উচ্চকুলে জন্ম। তাই ব্যাপারটি বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে, যেমন "পিতা ও পিতামহ ছিলেন অমাত্য", 'অভিজন' ও 'জানপদোভিজাতঃ'।[১১৪] এই ধরনের যোগ্যতায় শূদ্রদের কোন সুযোগ হতো কিনা সন্দেহ আছে। আরিস্ততল যেমন বলেছেন, সুজন্ম আর কিছুই নয়, বনেদী সম্পদ ও গুণের সমবায়[১১৫]—নিম্নবর্ণের মধ্যে তা পাওয়া যেত না বললেই হয়। উপদেষ্টা ও কর-নির্ধারকদের পেশাদার শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন মেগাস্থেনেস। তাঁরা অল্পসংখ্যক হলেও রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা ও বিচার-বিভাগের উচ্চতম পদগুলো নিজেদের একচেটিয়া দখলে রেখেছিলেন।[১১৬] অন্যত্র তিনি বলেছেন, যাঁরা সবচেয়ে অভিজাত ও ধনী তাঁরা রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্দেশে যোগ দিতেন, বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন ও রাজার সঙ্গে মন্ত্রণায় বসতেন।[১১৭] স্বজাতির বাইরে বিবাহ, বৃত্তি

১০৯ ঐ, ৮।২। ১১০. ঐ, ৬।১।

১১১ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল পলিটি', পৃ ১৮৫-৭। জায়সবাল, 'মনু অ্যাণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ১৭১।

১১২. 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ২৬৭।

১১৩. অর্থশাস্ত্র ১।৮ ও ৯। ১১৪. ঐ। ১১৫. 'পলিটিক্স', পৃ ১৬০।

১১৬. ম্যাক্‌ক্রিনড্‌ল্‌, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া…মেগাস্থেনেস অ্যাণ্ড আরিয়ান', পৃ ৮৫, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৩৩। ১১৭. ঐ, পৃ ১০৮, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৫৬।

বা ব্যবসা বদল বা একাধিক কাজ করা তাঁদের নিষিদ্ধ।[১১৮] তাঁরা যে এক বিশিষ্ট জাতি ছিলেন তা এই বিধিবিধান থেকেই সুস্পষ্ট। এইসব থেকেই দেখা যায়, নীচবর্ণের মানুষদের পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের আমলাতন্ত্রে পৌঁছনোর পথ খোলা ছিল না।

গুপ্তচর-ব্যবস্থা ছিল মৌর্য প্রশাসন-যন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেখানে কিন্তু শূদ্রদের স্থান দেওয়া হয়েছিল। কৌটিল্যের বিধান অনুযায়ী অন্যান্যদের মধ্যে শূদ্রদেরও ভ্রাম্যমাণ চর হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে।[১১৯] এও বলা হয়েছে যে স্নানের জল সংগ্রাহক, কেশ-প্রক্ষালক, শয্যা রচনাকারী, ক্ষৌরকার, প্রসাধক, জলের ভৃত্য, নট, নর্তক ও গায়কের সংগ্রাহক হিসেবে যাঁরা নিযুক্ত হবেন তাঁরা যেন রাজার আধিকারিকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি নজর রাখেন।[১২০] স্পষ্টতই এঁদের মধ্যে অনেকেই শূদ্র ছিলেন বলে মনে হয়। গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করা এবং তার ফলে প্রতি মুহূর্তে প্রভুদের সংস্পর্শে আসার দরুন তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়ার ব্যাপারে ঐ ভৃত্যদেরই সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করা হতো। এ-ছাড়াও, কৌটিল্যের কথা অনুযায়ী, কর্ষক, গোপালক ও জঙ্গলের আদিবাসী সহ প্রায় সব ধরনের লোককে শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য চর হিসেবে নিয়োগ করা উচিত। এই ব্যবস্থায় শূদ্রদেরও ধরা হয়েছে।[১২১] নিম্ন-বর্গের লোকে দূতের কাজও করতেন, কারণ কৌটিল্য বলেন, অস্পৃশ্য হলেও দূত অবধ্য।[১২২]

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'অর্থশাস্ত্রে' শূদ্রদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যবস্থা। বিভিন্ন ধর্মসূত্র থেকে ধারণা হয়, সাধারণত একমাত্র ক্ষত্রিয় এবং আপৎকালীন অবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যরা অস্ত্র ধরতে পারতেন। সৈন্যবাহিনীকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশরূপে সংজ্ঞার্থ দিয়ে কৌটিল্য এও বলেন, সবচেয়ে চমৎকার হলো ক্ষত্রিয়দের নিয়ে গঠিত বংশানুক্রমিক সেনাবাহিনী।[১২৩] কিন্তু ব্রাহ্মণ সেনাবাহিনী তাঁর পছন্দ নয়, (কারণ) প্রণিপাতের মাধ্যমে তাদের জয় করা যায়।[১২৪] অন্যদিকে পরিমাণগত শক্তির কারণে তিনি বৈশ্য ও শূদ্রদের বাহিনী পছন্দ করেন।[১২৫] কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ-যুগে নীচু দুই বর্ণ থেকে সেনা নিয়োগ করা হতো কিনা তা সঠিক বলা যায় না। মেগাস্থেনেস পরিষ্কার বলেছেন, পশুজীবীদের (মোটামুটি-ভাবে বৈশ্যদের সঙ্গে তুলনীয়) সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের নিরাপত্তা বিধান ছিল সৈন্যদের কাজ।[১২৬] আরিয়ান ও

১১৮. ঐ, পৃ ৮৫-৮৬, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৩৩। ১১৯ অর্থশাস্ত্র ১।১২।
১২০. ঐ। ১২১ ঐ।
১২২ ...অন্ত্যাবসায়িনোঽপ্যবধ্যাঃ। অর্থশাস্ত্র ১।১৬।
১২৩. ঐ। ১২৪. ঐ, ৯।২। ১২৫. বহুলসারং বা বৈশ্যশূদ্রবলমিতি। ঐ।
১২৬. ম্যাক্‌ক্রিনড্‌ল, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া...মেগাস্থেনেস অ্যাণ্ড আরিয়ান', পৃ ৮৩-৮৪, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৩৩।

স্ত্রাবো দুজনেই বলেন, যুদ্ধে নিযুক্ত মানুষদের নিয়ে ভারতীয় জনগণের পঞ্চম জাতি তৈরি হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের খরচে তাঁদের ভরণপোষণ করা হতো।[১২৭] অশোকের প্রস্তরলেখে 'ভটময়েষু' শব্দের ব্যবহার থেকেও সিদ্ধান্ত করা যায় যে সৈন্যদেরও একটি শ্রেণী ছিল।[১২৮] মেগাস্থেনেস থেকে জানা যায়, সেনাবাহিনীর একটি বিভাগ ভৃত্যের যোগান দিত যাঁরা নানারকম কাজ করতেন, যেমন সামরিক যন্ত্রবাদকের কাজ, ঘোড়ার দেখাশোনা এবং যন্ত্র-কুশলী ও তাঁর সহকারীর কাজ।[১২৯] আরিয়ান সেই ভৃত্যদের কথাও উল্লেখ করেছেন যাঁরা সৈন্য ছাড়াও তাঁদের ঘোড়া, হাতি ও রথের দেখাশোনা করতেন।[১৩০] সম্ভবত নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে নীচু কাজের জন্য ভৃত্য ও পরিচারক হিসেবে শূদ্রদের নিয়োগ করা হতো, পুরোদস্তুর সৈন্য হিসেবে নয়। অবশ্য কৌটিল্যের নিয়মের এই অর্থ হতে পারে যে আপৎকালে বৈশ্য ও শূদ্রদের বাহিনীভুক্ত করা যেত। বিভিন্ন নতুন বসতিতে আদিম জনগোষ্ঠী, যেমন বাগুরিক, শবর, পুলিন্দ ও চণ্ডালদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হতো।[১৩১]

আইন ও বিচার পরিচালনায় কৌটিল্য বর্ণবিধির নীতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর মতে, পতিত চণ্ডাল ও নীচ বৃত্তির মানুষ তাঁদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের বিষয় ছাড়া অর্থ-সংক্রান্ত বিবাদে সাক্ষী হতে পারবে না।[১৩২] তিনি এও বিধান দিয়েছেন যে কোন ভৃত্য তার প্রভুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে না।[১৩৩] একইভাবে আহিতক (বন্ধকী শ্রমিক) ও দাস তাদের প্রভুদের হয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে না।[১৩৪] বিভিন্ন বর্ণের মানুষের জন্য বিচারালয় থেকে বিভিন্নভাবে সতর্ক করার ব্যবস্থাও কৌটিল্য দিয়েছেন। সব-চেয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করা হবে শূদ্রকে, তার মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলস্বরূপ ভয়াবহ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব পরিণামের কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে।[১৩৫] এ-বিষয়ে অর্থদণ্ড হবে শুধু শূদ্রের এবং বিচারালয় তাকে শপথবন্ধ করবে। অন্য তিন উচ্চতর বর্ণের ক্ষেত্রে কিন্তু এসবের কোন উল্লেখ নেই।[১৩৬] এর ঠিক পরেই আরেকটি বিধান আছে যেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কৌটিল্য সাক্ষীদের ১২ 'পণ' অর্থদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩৭] এর থেকে মনে হতে

১২৭. ঐ, পৃ ২১৭, আরিয়ান, খণ্ড-উদ্ধৃতি ১২; 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া…ক্ল্যাসিক্যাল লিটরেচর', পৃ ৫৩, স্ত্রাবো, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৪৭।

১২৮. শিলালেখ ৪ (শাহবাজগঢ়ী) ১।১২।

১২৯. ম্যাকক্রিনডল, 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া…মেগাস্থেনেস অ্যাণ্ড আরিয়ান', পৃ ৮৮, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৩৪।

১৩০. ঐ, পৃ ২১৭, খণ্ড-উদ্ধৃতি ১২।

১৩১. অর্থশাস্ত্র ২।১।

১৩২. অর্থশাস্ত্র, ৩।১।

১৩৩. ঐ।

১৩৪. ঐ।

১৩৫. ঐ, ৩।১১।

১৩৬. …অন্যথাবাদে দণ্ডশ্চানুবন্ধঃ। ঐ। শ্যামশাস্ত্রী তাঁর অনুবাদে (পৃ ২০০) 'অনুবন্ধঃ' শব্দটি ছেড়ে গেছেন।

১৩৭. অর্থশাস্ত্র ৩।১১।

পারে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থাটি রাখা হয়েছিল শুধুই শূদ্র সাক্ষীর জন্য। মেগাস্থেনেস বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত-পা কেটে ফেলা হয়।[১৩৮] এই ব্যবস্থা বোধহয় নীচু বর্ণের লোকের ক্ষেত্রে বা বিশেষ কোন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে কৌটিল্য বিভিন্ন ধর্মসূত্রের বর্ণবিভেদকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর কথা অনুযায়ী চার বর্ণ ও 'অন্তাবসায়ী' (অস্পৃশ্য)-দের মধ্যে নিম্ন বর্ণের কোন মানুষ যদি উচ্চ বর্ণের কোন মানুষের নিন্দা করে তাহলে, উচ্চ বর্ণের মানুষ নিম্ন বর্ণের মানুষকে অপমান করলে যে অর্থদণ্ড হয়, তার চেয়ে বেশি অর্থদণ্ড দিতে হবে।[১৩৯] কোন শূদ্র ব্রাহ্মণকে যে-অঙ্গ দিয়ে আঘাত করবে তা ছেদ করা হবে—এই নিয়মও 'অর্থশাস্ত্রে' আছে।[১৪০] এই অংশটি কৌটিল্যের লেখা কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, কারণ এটি বরং মনুর প্রান্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মেলে। অন্য একটি বিধানে কৌটিল্য বলেন, কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ব্যাভিচার করলে তার শাস্তি হবে যথাক্রমে সর্বোচ্চ অর্থদণ্ড, সর্বস্ব অধিকৃতি ও কটাগ্নি দহন (মাদুর জড়িয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা)।[১৪১] কোন শ্বপাক যদি আর্যা রমণীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তাঁকে বধ করা হবে এবং মহিলাটির নাসাকর্ণ ছেদন করা হবে।[১৪২] এইসব চরম ব্যবস্থা যে শূদ্র ও শ্বপাকদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতো তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ এমনকি কোন শ্বপাকীর সঙ্গে ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে কৌটিল্য অপরাধীকে (তপ্তশলাকা দিয়ে) কবন্ধ-চিহ্নিত করার ও নির্বাসনের বিধান দিয়েছেন।[১৪৩]

কয়েক জাতীয় খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে কৌটিল্যের নিষেধবিধি সব বর্ণের মানুষের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। যেমন, কেউ যদি ব্রাহ্মণকে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করান তাহলে তার শাস্তি হবে উচ্চতম অর্থদণ্ড : ঐ একই অপরাধে কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের শাস্তি হবে যথাক্রমে মধ্যম, নিম্নতম এবং ৫৪ 'পণ' অর্থদণ্ড।[১৪৪] আত্মসাৎ বা অপহরণের ক্ষেত্রে চরম-

১৩৮. ম্যাকক্রিনড্‌ল্, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া: মেগাস্থেনেস অ্যাণ্ড আরিয়ান', পৃ ৭০, খণ্ড-উদ্ধৃতি ২৭।

১৩৯. অর্থশাস্ত্র ৩।১৮। ১৪০. ঐ, ৩।১৯।

১৪১. ব্রাহ্মণ্যামগুপ্তায়াং ক্ষত্রিয়স্যোত্তমঃ, সর্বস্বং বৈশ্যস্য, শূদ্রঃ কটাগ্নিনা দহ্যেত। অর্থশাস্ত্র ৪।১৩।

১৪২. এই অংশটি গণপতি শাস্ত্রী শ্যামশাস্ত্রীর থেকে অন্যভাবে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম জন করেছেন : শ্বপাকস্যার্যাগমনে বধঃ (২য়, পৃ ১৮১), দ্বিতীয় জন করেছেন : শূদ্র-শ্বপাকস্য ভার্যাগমনে বধঃ (অর্থশাস্ত্র ৪।১৩, পৃ ২৩৬)। 'আর্যা' শব্দটি প্রয়োগে গণপতি শাস্ত্রীই ঠিক বলে মনে হয়। শব্দটি ম্যুনিখ পুঁথিতেও আছে (অনুবাদ, পৃ ২৬৪)। কঙ্গলে (১ম, পৃ ১৪৯) গণপতি শাস্ত্রীকেই অনুসরণ করেছেন।

১৪৩. অর্থশাস্ত্র ৪।১৩। ১৪৪. ঐ।

তম শাস্তি হবে গৃহভৃত্যের। ঐ একই অপরাধে কোন আধিকারিক বা কর্মচারীর অর্থদণ্ড হবে, কিন্তু ভৃত্যের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড।[১৪৫]

উত্তরাধিকার বিধিতে কৌটিল্য প্রাচীন বর্ণবিভেদই রক্ষা করেছেন। বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক মিশ্রণে জাত সন্তান, যেমন সূত, মাগধ, ব্রাত্য ও রথকার পৈতৃক সম্পত্তিতে তাদের অংশের অধিকারী হবে, যদি সে-সম্পত্তি পর্যাপ্ত হয় তবেই।[১৪৬] কৌটিল্য আরও বিধান দিয়েছেন: যেসব সন্তান উপরে উল্লিখিতদের চেয়েও নিকৃষ্ট তারা কোন অংশের অধিকারী হবে না, কিন্তু জীবনধারণের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর নির্ভর করতে পারবে।[১৪৭] ফলে আয়োগব, ক্ষত্তা, নিষাদ, পুল্কস ও চণ্ডাল স্বভাবতই ভাগ থেকে বাদ পড়ে যান। কিন্তু এর তুলনায় পারশবের (শূদ্রার গর্ভে জাত ব্রাহ্মণ সন্তান) অবস্থা ভালো। বলা হয়েছে, যদি কোন ব্রাহ্মণের সন্তান না হয় তাহলে পারশব পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবে।[১৪৮] বাকি দুভাগ তার জীবিত সপিণ্ডদের উপর বর্তাবে, তারা না থাকলে তার আচার্য অথবা অন্তেবাসী (ছাত্র) পাবেন।[১৪৯] এর থেকে হয়তো এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোন ব্রাহ্মণ পিতার যদি কোন সন্তান না থাকে তাহলে এমনকি তাঁর শূদ্রা-স্ত্রীজাত সন্তানদের যথেষ্ট ভাগ দেওয়া হতো। কোন ব্রাহ্মণের যদি চতুর্বর্ণের প্রত্যেক স্ত্রীরই সন্তান হয় সে-ক্ষেত্রে কৌটিল্য ধর্মসূত্রের অংশ-বিভাগ নীতি মেনে নিয়েছেন।[১৫০] ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পিতা দুই বা তিন জাতির স্ত্রী থেকে সন্তান লাভ করলে সেখানেও তিনি ঐ নীতিই সম্প্রসারিত করেছেন। সব ক্ষেত্রেই সবচেয়ে কম ভাগ পাবেন শূদ্র সন্তান।[১৫১]

'অর্থশাস্ত্রে' শূদ্রের নাগরিক মর্যাদা ও সেই তুলনায় দাসের অবস্থান সম্বন্ধে খানিক বিবেচনা করা দরকার। বিভিন্ন ধর্মসূত্রকারের মতো কৌটিল্য পরিষ্কারভাবে আর্যকে স্বাধীন মানুষ রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, কোন অবস্থাতেই আর্যকে দিয়ে দাসত্ব করানো যাবে না।[১৫২] এরই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে তিনি ধার্য করেছেন যে, কোন শূদ্র যদি জাত-দাস ও নাবালক না হয় কিন্তু 'আর্যপ্রাণ' (জন্ম-আর্য) হয় তাহলে তাঁর স্বজন তাঁকে বিক্রি করলে বা বন্ধক রাখলে তাঁদের ১২ 'পণ' দণ্ড হবে এবং এই কেনা-বেচায় যুক্ত প্রত্যেকে কঠোর শাস্তি পাবেন।[১৫৩] এর অর্থ শূদ্রা-গর্ভজাত তিন উচ্চতর বর্ণের সন্তানদের[১৫৪] ক্রয় বা চুক্তির মাধ্যমে দাসত্ব করানো যাবে না; বোধ হয় অন্যান্য পদ্ধতিতে তাঁদের ঐ দাসে পরিণত করা

১৪৫. ঐ, ২।৫। ১৪৬. ঐ, ৩।৬। ১৪৭. ঐ।
১৪৮. ঐ। ১৪৯. ঐ। ১৫০. ঐ।
১৫১. ঐ। ১৫২. ঐ, ৩।১৩।
১৫৩. উদরদাসবর্জমার্যপ্রাণমপ্রাপ্তব্যবহারং শূদ্রং বিক্রয়াধানং নয়তঃ স্বজনস্য দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।
১৫৪. তুলনীয়: জায়সবাল, 'মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ২৪২।

যাবে, যেমন, বৈধদণ্ড, যুদ্ধবন্দীত্ব, স্বেচ্ছায় দাসত্ব স্বীকার ইত্যাদি।[১৫৫] এই কারণে কৌটিল্য যুদ্ধে ধৃত 'আর্যপ্রাণ'দের দিয়ে দাসত্ব করানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব, তাঁর বিধি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিন উচ্চবর্ণভুক্তের নাবালক শূদ্র-সন্তান বাদে চতুর্থবর্ণভুক্ত অন্যান্যদের দাসে পরিণত করা যায়।[১৫৬] এমনকি এই বিশেষ জাতীয় শূদ্রদের ক্ষেত্রেও (যাঁদের সংখ্যা ছিল খুব অল্প) দাসে পরিণত করার অর্থদণ্ড সবচেয়ে কম—১২ 'পণ', যেটি বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর বেড়ে চলে।[১৫৭]

কিন্তু কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন ঘরে শোচনীয় অবস্থা বা অর্থদণ্ড বা ঋণ শোধে অসামর্থ্য, এমনকি আর্যের জীবনও বন্ধক রাখা যেত।[১৫৮] এই সমস্ত গচ্ছিত লোকের ('আহিতক') জন্য কৌটিল্য বেশ কয়েকটি উদার নিয়মের বিধান দিয়েছেন। বন্ধকী লোকটির আত্মীয়স্বজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে মুক্ত করবেন—এই রকমই ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কোন অশুদ্ধ কাজে নিয়োগ করা যাবে না। যদি কোন গচ্ছিতা রমণী, নগ্ন অবস্থায় স্নানরত প্রভুর পরিচর্যা করেন বা প্রভু যদি তাঁর সতীত্ব নাশ, দুর্ব্যবহার বা শারীরিক আঘাত করেন তাহলে সেই প্রভুর আর ঐ রমণীর (ক্রয়-) মূল্যের উপর কোন অধিকার থাকবে না। ফলে সে-রমণী সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা ফিরে পাবেন। কোন আহিতিকা যুবতীকে ধর্ষণের ক্ষেত্রে প্রভুর ক্রয়মূল্য অধিকৃত হওয়া ছাড়াও তাঁকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ('শুল্ক') দিতে হবে ঐ যুবতীকে এবং সেই 'শুল্কে'র দ্বিগুণ দিতে হবে রাষ্ট্রকে। সেবিকা রূপে নিযুক্তা কোন গচ্ছিতা দাসীর সঙ্গে যদি তাঁর প্রভুর অবৈধ সংসর্গ হয় তবে তাঁর শাস্তি হবে প্রথম মাত্রার অর্থদণ্ড। ঐ একই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, উচ্চকুলজাত উপচারকের প্রতি বলপ্রয়োগ করলে তিনি অপক্রমণের (ছেড়ে চলে যাওয়ার) অধিকারী হবেন।[১৫৯] এই অংশটির অনুবাদের সময় শ্যামশাস্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে 'দাস' ও 'আহিতকে'র মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, তাঁদের দুজনের জন্য নির্বিচারে 'দাস' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।[১৬০] কিন্তু কৌটিল্যের বিভিন্ন উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, দাস ও আহিতক ছিলেন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা পর্যায়ের কর্মচারী। তাঁর বিধান অনুযায়ী দাস ও আহিতক (প্রভুর হয়ে) কারও সঙ্গে চুক্তি করলে তা অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হবে।[১৬১] তিনি এও বলেছেন, লোকে

১৫৫. অর্থশাস্ত্র ৩৷৩-এ দাসত্বের মোট ন'টি উৎস নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আরও অন্য ধরনের দাসত্বও হয়তো ছিল।

১৫৬. অর্থশাস্ত্র ৩৷১৩। ১৫৭. ঐ।

১৫৮. অথবা আর্যমাধায় কুলবন্ধনার্যাণমাপদি নিষ্ক্রয়ং চাধিগম্য বালং সাহায্যদাতারং বা পূর্বং নিষ্ক্রীণীরন্। অর্থশাস্ত্র ৩৷১৩। কঙ্গলে-র পাঠ অনুসৃত।

১৫৯. সিদ্ধমুপচারকস্যাভিপ্রজাতস্য অপক্রমণম্। অর্থশাস্ত্র ৩৷১৩।

১৬০. ইংরিজি অনুবাদ, পৃ ২০৬। ১৬১ অর্থশাস্ত্র ৩৷১।

যাতে তাদের দাস ও আহিতকদের দাবি-দাওয়ার প্রতি মনোযোগ দেয় রাজার তা দেখা উচিত।[১৬২] কৌটিল্য আরও বিধান দেন, দাস, পরিচারক বা আহিতকের কাছে যদি কোন রমণী নিজেকে সমর্পণ করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে।[১৬৩] শ্যামশাস্ত্রী স্বীকার করেছেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে 'আহিতক' ও 'দাস' আলাদা এবং তাঁকে তিনি 'গচ্ছিত' বা ভাড়া-করা লোক বলে অভিহিত করেছেন।[১৬৪] যেহেতু দাসকর্মকরকল্প-প্রকরণে আহিতক ও দাস গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, সেইজন্য ধরে নেওয়া হয়েছে প্রথমোক্তদের প্রতি প্রযোজ্য বিভিন্ন উদার নিয়ম দাসদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[১৬৫] কিন্তু উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাবে কৌটিল্যের এইসব নিয়ম বন্ধকী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; তাঁদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক এবং সম্ভবত আর্যবর্ণভুক্ত। উপরে উল্লিখিত নিয়মাবলি থেকে এও বোঝা যায়, প্রভুরা সাধারণ দাসদের দৈহিক আঘাত ও গঞ্জনা দিতে এবং অশুদ্ধ কাজে নিয়োগ করতে পারতেন।

দাসদের মুক্তি বিষয়ে কৌটিল্যের কিছু বিধান, মনে হয়, শুধু দাসে-পরিণত আর্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিধি অনুযায়ী কোন মানুষ আত্মবিক্রয় করলে তাঁর সন্তানকে আর্য (স্বাধীন) বলে গণ্য করা হবে।[১৬৬] কোন ব্যক্তি তাঁর প্রভুর কাজের ক্ষতি না করে আয় করতে পারেন ও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন। এইভাবে তিনি ক্রয়মূল্য শোধ করে আর্যত্ব ফিরে পাবেন।[১৬৭] যুদ্ধে-ধৃত কোন 'আর্যপ্রাণ' মুক্তিপণ শোধ দিয়ে মুক্তি অর্জন করতে পারেন।[১৬৮] উপযুক্ত মুক্তিপণ পাওয়ার পরেও কোন দাসকে আর্য বলে স্বীকৃতি না দিলে ১২ 'পণ' অর্থদণ্ড হবে।[১৬৯] এই জাতীয় সব ঘটনায়ই, আগে যাঁর আর্যত্ব ছিল শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই তা ফিরে পাওয়ার প্রশ্নটি আসতে পারে, শূদ্রের ক্ষেত্রে নয়। খুব বেশি হলে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ব্যবস্থা শূদ্রার গর্ভজাত তিন উচ্চতর বর্ণের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

দাসবর্গীয় লোকের মুক্তি বোঝাতে কৌটিল্য দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর্যদের ক্ষেত্রে 'আর্যত্বম্' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু যখন অনার্য দাসদের মুক্তি দেওয়া হবে তখন ব্যবহার করা হয়েছে 'অদাস' পদটি। উদাহরণত বলা হয়েছে, যদি কোন দাসীর গর্ভে প্রভুর সন্তান হয় তাহলে মা ও সন্তান দুজনকেই মুক্ত বলে গণ্য করা হবে।[১৭০] যদি পরিবার প্রতি-পালনের জন্য মা-ও দাসী হিসেবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাঁর মা,

১৬২ ঐ, ২।১। ১৬৩. ঐ, ৪।১৩।

১৬৪. অর্থশাস্ত্র-অনুবাদ, ৩।১ ও ২।১।

১৬৫. জায়সবাল, 'মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ২০৯।

১৬৬. আত্মবিক্রয়িণঃ প্রজামার্যাং বিদ্যাৎ। অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।

১৬৭. অর্থশাস্ত্র ৩।১৩। ১৬৮. ঐ। ১৬৯. ঐ।

১৭০. সমাতৃকমদাসং বিদ্যাৎ। অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।

ভাই ও বোন মুক্তি পাবেন ( 'অদাসাঃ স্যুঃ' )।[১৭১] মনে হয় এ'রা মুক্ত হওয়ার পর আর দাস থাকতেন না, কিন্তু আর্যও হতে পারতেন না। এও লক্ষণীয় যে গোড়ার দিকে বিভিন্ন পালি গ্রন্থে দাসমুক্তিও জন্য 'ভুজিস্স'[১৭২] শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে, আর্য শুধু যবনদের মধ্যেই দাস হতে পারেন এবং তার বিপরীতও হয়।

আর্য দাসদের ক্রয়মূল্য দিয়ে মুক্তি পাওয়ার নিয়মটি অনার্য দাসদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হতো কিনা তা বলা শক্ত। বোধহয় মূল্য দেওয়ার পরেও শূদ্র দাসদের মুক্তি প্রভুর বিবেচনার উপর নির্ভর করত। কিন্তু তাঁদেরও কখনও কখনও মুক্ত করা হতো, কারণ বিধান দেওয়া হয়েছে, যাঁরা স্বেচ্ছায় দাসত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা বাদে একবার মুক্ত হয়েছেন এরকম কোন দাস বা দাসীর জীবন বিক্রয় বা বন্ধক রাখার অর্থদণ্ড ১২ 'পণ'।[১৭৩] মনে হয় এমনকি একজন সাধারণ দাসও সম্পত্তি রাখতে পারতেন, প্রভু তার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে পারতেন না।[১৭৪] স্বাভাবিকভাবেই এর সাহায্যে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন।

দাসদের প্রতি আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌটিল্য কয়েকটি নিয়ম প্রণয়ন করেছেন যা শূদ্রদাস ও সেই সঙ্গে হয়তো উচ্চবর্ণের দাসদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতো। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, আটের চেয়ে কমবয়সী ও স্বজনহীন কোন দাসকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন নীচকর্মে নিয়োগ করা যাবে না এবং বিদেশে বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া যাবে না।[১৭৫] একইভাবে কোন গর্ভবতী দাসীকে তাঁর সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা না করে বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া চলবে না।[১৭৬] আবার বিনা কারণে কোন প্রভু তাঁর দাসকে বন্দী করে রাখতে পারবেন না।[১৭৭] জনপদ নিবেশ-প্রকরণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : লোকে যাতে তাঁদের দাস ও আহিতকদের দাবির প্রতি মনোযোগ দেন রাজা সেজন্য তাঁদের বাধ্য করবেন।[১৭৮] দাস ও ভৃত্যদের সঙ্গে সদয় আচরণ করা উচিত— এই মর্মে অশোক বারবার যে অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন এটি তারই মতো শোনায়।[১৭৯]

কিন্তু কৌটিল্যের বিভিন্ন উদার বিধির অধিকাংশই আহিতক ও প্রাক্তন-আর্য দাস প্রসঙ্গে, যাঁদের সংখ্যা নিশ্চয়ই ছিল সামান্য। এইসব বিধির অল্প কয়েকটিই বৃহত্তর সংখ্যক সাধারণ দাসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহে শূদ্র। এই বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভুল সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে কৌটিল্যের নীতি পরোক্ষভাবে দাসত্ব বিলোপ করে এবং

১৭১. ঐ ৩।১৩, গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ-অনুসরণে।

১৭২. দ্র. "ভুজিস্স," 'পালি-ইংলিশ ডিকশনারি'।

১৭৩. অর্থশাস্ত্র ৩।১৩। ১৭৪. ঐ। ১৭৫. ঐ। ১৭৬. ঐ।

১৭৭. ঐ। ১৭৮. ঐ, ২।১।

১৭৯. শিলালেখ ৯ ( গির্নার ), পঙ্ক্তি ৪ ; স্তম্ভলেখ ২ ( গির্নার ), পঙ্ক্তি ২।

তিনি তাঁর দেশবাসীকে এক মুক্ত মানুষের জাতিতে পরিণত করার নীতি প্রবর্তন করেছিলেন।[১৮০] তাঁর বিভিন্ন উদার বিধি থেকে প্রধানত এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, প্রাক্তন-আর্য দাসদের (অনার্য যা শূদ্রদাসদের থেকে যাঁরা আলাদা) অবস্থান সংরক্ষাই ছিল তাঁর ভাবনার বিষয়। এ-ই স্বাভাবিক, কারণ সাক্ষ্য, ব্যভিচার ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধির ক্ষেত্রে কৌটিল্য শূদ্র ও অন্য তিন উচ্চতর বর্ণভুক্তদের মধ্যে একটি ভেদরেখা টেনেছিলেন বলে মনে হয়।[১৮১] ধর্মসূত্রের মতো কৌটিল্য স্পষ্টভাবে আর্য ও শূদ্রের পার্থক্য করেননি, তবু প্রমাণ-পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি পরিষ্কারভাবে 'আর্য' ও 'অবরে'র মধ্যে প্রভেদ করেছেন।[১৮২] আর 'অবর' শব্দটির অর্থ যে শূদ্র—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দাসত্ব বিষয়ে কৌটিল্যের যেসব বিশদ বিধি ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তার থেকে দেখা যায় মৌর্য ভারতে দাসের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। মেগাস্থেনেস থেকে উদ্ধৃত করে আরিয়ান বলেন, ভারতীয়রা কোন দাস নিয়োগ করতেন না।[১৮৩] কিন্তু এ-মত অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে ওনেসিক্রিতোস-এর বিবরণ থেকে, স্ত্রাবো যাঁকে আরও নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন, কারণ তিনি মেগাস্থেনেসকে মিথ্যাবাদীদের দলে রেখেছেন।[১৮৪] ওনেসিক্রিতোস বলেন, মৌসিকানস নামক দেশের[১৮৫] (যার মধ্যে আধুনিক সিন্ধু প্রদেশের অনেকখানি অন্তর্ভুক্ত ছিল) অধিবাসীদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁদের মধ্যে দাস রাখার চল ছিল না। তাঁর কথা অনুযায়ী, দাসের পরিবর্তে তাঁরা নিয়োগ করতেন পূর্ণযৌবন যুবকদের, ক্রীটীয়রা যেমন 'আফামিওতাই'[১৮৬] ও লাকেদেমোনীয়রা 'হেলট' নিয়োগ করতেন।[১৮৭] এর থেকে বোঝা যায় মৌসিকানোই-এর মধ্যেও এক শ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁরা পুরো সমাজের 'হেলট' হিসেবে কাজ করতেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কোন মালিক ছিল না। শূদ্রের কাজই হলো দাস ও ভাড়া-করা লোক হিসেবে

১৮০. জায়সবাল, 'মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ২০৯। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল পলিটি', পৃ ১৮৪-৮৭।

১৮১. পৃ ১৬০-৬২ দ্র.।

১৮২ অর্থশাস্ত্র ২।১৫। অর্থশাস্ত্র ১।১৪-য় 'আর্য' ও 'নীচ' ভেদ করা আছে।

১৮৩. ম্যাকক্রিনড্ল্, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া·· মেগাস্থেনেস অ্যান্ড আরিয়ান', পৃ ২১১-১৩, খণ্ড-উদ্ধৃতি ১০।

১৮৪ ঐ, পৃ ১৮-১৯।

১৮৫. ম্যাকক্রিনড্ল্, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া···ক্ল্যাসিক্যাল লিটরেচর', পৃ ৫৮, স্ত্রাবো, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৫৪।

১৮৬. 'হেলট'দের মতো তাঁরাও জমির সঙ্গে বাঁধা থাকতেন।

১৮৭. ম্যাকক্রিনড্ল্, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া···ক্ল্যাসিক্যাল লিটরেচর', পৃ ৪১, স্ত্রাবো, খণ্ড-উদ্ধৃতি ৩৪।

তিন উচ্চতর বর্ণের সেবা করা—এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই সমর্থন পাওয়া যায় এই প্রথায়।

বিভিন্ন ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় : মৌর্য সাম্রাজ্যে দাসের সংখ্যা বেশ ভালোই ছিল। বিম্বিসার থেকে অশোক পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় তিন শতাব্দী ধরে মগধের নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতির ফলে নিশ্চয়ই আদিবাসী অঞ্চল থেকে মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকায় কাজ করার জন্য প্রচুর সংখ্যায় দাস এসেছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধে অশোক বন্দী করেছিলেন ১৫০,০০০ লোককে।[১৮৮] কিন্তু ৬০০,০০০ লোক নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত যে সারা দেশ পর্যুদস্ত করেছিলেন তিনি হয়তো আরও বেশি সংখ্যায় বন্দী পেয়েছিলেন। কৌটিল্য[১৮৯] ও অন্যান্য সূত্রে 'ধ্বজাহৃৎ' বা যুদ্ধবন্দী ছিল দাসদের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এর থেকে সঙ্গতভাবে ধরে নেওয়া যায়, প্রতিটি যুদ্ধের অর্থ ছিল প্রচুর সংখ্যক দাস দখলে আনা। ব্যাপারটি বোঝা যায়, কারণ উ.কা.পা মৃৎভাণ্ড / লৌহযুগ পর্যায়ের আগে, ঘন জঙ্গল থাকায় মধ্য-গাঙ্গেয় পলি-অঞ্চলের ফলপ্রসূ ব্যবহার অবরুদ্ধ হয়ে ছিল। অন্যদিকে, মনে হয়, এই পর্যায়ের প্রাথমিক অবস্থায় অধিক বসতি ছিল অ-পলি, প্রান্তীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে। তার জন্য ঐসব অঞ্চল ছিল কৃষি-শ্রমিক যোগান দেওয়ার পক্ষে বেশি উপযুক্ত। মগধের হাতে কোশল ও বৈশালীর পরাজয়ের সময়ে খুব অল্প সংখ্যক লোককে দাসে পরিণত করা হয়ে থাকতে পারে, যদিও তাঁদের অবস্থা ছিল আরও উন্নত। কিন্তু অঙ্গ, কলিঙ্গ, অটবি ও অবন্তী জয়ের ফলে হয়তো বেশি সংখ্যায় দাস পাওয়া গিয়েছিল, যাঁরা ছিলেন মূলত আদিবাসী ও অ-ব্রাহ্মণ যোদ্ধা। অতএব দাসত্ব-বৃদ্ধিতে যে একটি কারণের অবদান ছিল সবচেয়ে বড় তা হলো সম্ভবত যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, মৌর্য যুগে নির্দিষ্ট মান স্থির করার ফলে ছাপ-মারা মুদ্রা রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেছিল বলে মনে হয়, এবং তার প্রচলন পৌঁছেছিল তুঙ্গে। ফলত, আর্থিক লেন-দেনের পরিমাণ ক্রমেই বেড়েছিল। এর দরুন ঋণ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসের সংখ্যাও বেড়ে থাকতে পারে।

বলা হয়েছে যে, ধ্রুপদী এথেন্স, রোমান ইটালি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রেজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে "দাস সমাজ" ছিল, কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনে দাসরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন : তাঁরা ছিলেন জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি।[১৯০] যদিও আমাদের কাছে মৌর্য সাম্রাজ্য সংক্রান্ত কোন পরিসংখ্যানই নেই, তাহলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কৃষিজ উৎপাদন দাস ও শ্রমিকরাই করতেন এবং এই অর্থে নির্ভরশীল শ্রমই ছিল মৌর্য রাষ্ট্রের মূল আশ্রয়। কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত দাস-কম্মকর বিষয়ে পালি ভাষায় যা উল্লেখ পাওয়া যায় তার

১৮৮. শিলালেখ ১৩। ১৮৯. অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।

১৯০. কীথ হপকিন্স, 'কংকারাস' অ্যান্ড স্লেভ্‌স্', পৃ ৯৯ ১০০।

অধিকাংশই মৌর্য যুগের। কৌটিল্যে যা পাওয়া গেছে তার সঙ্গে এগুলো মিলিয়ে বিবেচনা করলে ন্যায্যতই ধরে নেওয়া যায় যে মৌর্যদের অধীনে কৃষিজ উৎপাদনে দাসত্বের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। মৌর্য সমাজকে দাস-সমাজ হিসেবে ধরায় কিছু দ্বিধা থাকতে পারে, কিন্তু এটিকে নিঃসন্দেহে দাসমালিকানা-মূলক সমাজ বলা যায়। দাসের সংখ্যা যদি যথেষ্ট না হতো এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা যদি তুচ্ছ হতো, তবে অশোক তাঁদের প্রতি দয়া ও বিবেচনা দেখানোর নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন না; দাসত্ব ও বেতন-শ্রমের জন্য কৌটিল্যও তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে'র একটি পুরো প্রকরণ ব্যয় করতেন না।[১৯১]

সব মিলিয়ে মৌর্য যুগে শূদ্রদের নাগরিক ও রাজনৈতিক মর্যাদার কোন মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যায় না; প্রাগ্-মৌর্য যুগে তাঁদের উপর আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বৈধ বাধানিষেধে মূলত কোন ছেদ পড়েনি। তাঁর চতুর্থ স্তম্ভ-অনুশাসনে অশোক 'রাজুক'কে তাঁর ভারপ্রাপ্ত জনপদের লোকদের মধ্যে 'ব্যবহার-সমতা' ও 'দণ্ড-সমতা' প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন।[১৯২] এই দুটি শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে "বিচার-বিভাগীয় কাজকর্মে নিরপেক্ষতা" এবং "শাস্তিদানে নিরপেক্ষতা"।[১৯৩] কিন্তু প্রাচীন বর্ণভিত্তিক বিধিগত ভেদের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, ঐ দুটি পদ এক আদর্শবাদী রাজার পক্ষে এজাতীয় প্রভেদ দূর করার প্রয়াসের সূচক। বাস্তবে কীভাবে এবং কতদূর এই নীতি কার্যকর হয়েছিল তা জানা যায় না। সম্ভবত দীর্ঘকাল-প্রচলিত সংস্কারের মুখে দাঁড়িয়ে এই ধরনের ব্যবস্থার ব্যর্থতা ছিল অনিবার্য। এছাড়া যেহেতু এটি অশোকের রাজত্বের শেষদিকে, খৃপূ ২৩৮-এ[১৯৪] প্রচার করা হয়েছিল, তাই তাঁর মৃত্যুর আগে এটি বেশিদিন প্রযুক্ত না-ও হয়ে থাকতে পারে। অতএব এই অনুশাসনে নিম্নবর্গের মানুষের কোন লাভ হয়নি, হয়তো তা কেবল ব্রাহ্মণদের বৈরিতা উদ্রেকেরই কাজে লেগেছিল।

প্রধানত অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক রচনা হিসেবে 'অর্থশাস্ত্রে' স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ধর্মসূত্রের মতো শূদ্রদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আনন্দের কথা, শূদ্রদের বিবাহ-প্রথা ও শূদ্রাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্ত্র' থেকে আমরা জানতে পারি, 'পাণিগ্রহণে'র আগে ভাবী বধূকে পরিত্যাগ করা ছিল উচ্চবর্ণের মধ্যে সিদ্ধ, কিন্তু শূদ্রদের মধ্যে সহবাসের আগে অবধি।[১৯৫] আবার এও বলা হয়েছে যে, প্রথম চার জাতীয় স্বীকৃত বিবাহের

১৯১. ৩।১৩। ১৯২. স্তম্ভলেখ ৪ (দিল্লী তোপরা), পঙ্ক্তি ১৫।

১৯৩. 'কর্পুস ইনস্ক্রিপতিওনুম ইন্দিকারুম', ১ম, পৃ ২২৫।

১৯৪. ঐ, ভূমিকা, পৃ [৩৬]।

১৯৫. বিবাহানাম্তু ত্রয়াণাং পূর্বেষাং বর্ণানাং পাণিগ্রহণাৎসিদ্ধমুপাবর্তনং শূদ্রাণাং চ প্রকর্ম-

ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদনযোগ্য নয়।[১৯৬] এর থেকে বোঝা যায়, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদিত। আগেই দেখানো হয়েছে, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহের প্রচলন ছিল।[১৯৭] তার থেকে মনে হয়, তাঁদের মধ্যে বিবাহবন্ধন-ছেদ আরও সহজ বলে মনে করা হতো। কৌটিল্য আরও বলেছেন, বিহিত বিবাহের জন্য পিতার সম্মতি প্রয়োজন, কিন্তু অবিহিত বিবাহের জন্য তার সঙ্গে মায়েরও সম্মতি চাই।[১৯৮] এর থেকে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক উপাদানের ধারাবাহিকতার ফলে তাঁদের মহিলারাও কিছুটা গুরুত্ব পেতেন।

কৌটিল্যের উল্লিখিত বিধিব্যবস্থা আদি ধর্মসূত্রগুলোয় দেখা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের অনুপস্থিত স্বামীদের জন্য তাঁদের স্ত্রীদের যে-অপেক্ষাকাল কৌটিল্য নির্দিষ্ট করেছেন তা কার্যত বশিষ্ঠের ধার্য সময়েরই সমান। সবচেয়ে কম সময়ের বিধান দেওয়া হয়েছে শূদ্রের স্ত্রীর ক্ষেত্রে।[১৯৯] এই সমস্ত বিধান থেকে দেখা যায়, শূদ্রের ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধন উচ্চতর বর্ণের মতো অত দৃঢ় বলে গণ্য করা হতো না। উচ্চবর্ণের মহিলারা পুরুষদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিলেন।

বলা হয়েছে, বর ও বধূর বয়স যথাক্রমে ষোল ও বারো[২০০] নির্ধারিণ করে কৌটিল্য যে বিধান দিয়েছেন তার উদ্দিষ্ট হলো অব্রাহ্মণ জাতি, বিশেষ করে শ্রমজীবী শ্রেণী, যাঁরা তাড়াতাড়ি সন্তান পেতে চান।[২০১] যে-প্রসঙ্গে উল্লিখিত বিধানটি এসেছে সেখান থেকে এই জাতীয় অনুমানের আদৌ কোন অবকাশ নেই। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার প্রয়োগ-সংক্রান্ত কোন উল্লেখ না থাকায় ধরা যেতে পারে যে, এই বিধান দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম-অনুযায়ী চতুর্বর্ণের আচরণ-মান স্থির হয়েছিল।

কৌটিল্য জানিয়েছেন যে অভিনেতা, ক্রীড়াবিদ্, গায়ক, মৎস্যজীবী, ব্যাধ, গো-পালক, শৌণ্ডিক, পণ্যবিক্রেতা এবং এই ধরনের অন্যান্য মানুষ সাধারণত নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যাতায়াত করতেন।[২০২] উচ্চবর্ণের

গাম্। অর্থশাস্ত্র ৩।১৫। গণপতি শাস্ত্রীর সংস্করণে আছে 'প্রকর্মণঃ' (২য়, পৃ. ৯২)। তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন 'যোনিক্ষতিমেবধীকৃত্য', অর্থাৎ কন্যার কৌমার্যনাশ। শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদে 'বিবাহ' (nuptials) শব্দটি অর্থবহ নয়। মেয়ার অনুবাদ করেছেন 'সহবাস', 'বেইশ্লাফুং', Beischlafung (পৃ. ২৯৬)।

১৯৬ অর্থশাস্ত্র ৩।৩। ১৯৭. পৃ. ১২১ দ্র। ১৯৮. অর্থশাস্ত্র ৩।২।

১৯৯. ঐ. ৩।৪। ২০০. ঐ, ৩।৩।

২০১. কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'ইণ্ডিয়ান কামেরালিজম', পৃ. ৬৬, টী. ৫।

২০২. তালাপচারচারণমৎস্যবন্ধকলুব্ধকগোপালকশৌণ্ডিকানামন্যেষাং চ প্রসৃষ্টস্ত্রীকাণাং পথ্যানুসরণমদোষঃ। অর্থশাস্ত্র ৩।৪।

মহিলাদের কার্যকলাপ ঘরের পরিসীমাতেই বদ্ধ ছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে এরকম হতো না। পরিবার প্রতিপালনের জন্য মাঠে ও চারণভূমিতে কাজ করার প্রয়োজন পড়ত বলে শূদ্রবর্ণের মহিলাদের কর্মক্ষেত্র ছিল ঘরের বাইরে। কারণ কৌটিল্যের ব্যবস্থা অনুযায়ী ভাগচাষী ও গোপালকদের স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীদের গৃহীত ঋণ শোধের জন্য দায়ী হবেন।[২০৩]

সাধারণত এই যুগে বিভিন্ন জাতির বিবাহ-প্রথা ছিল সবর্ণ। আরিয়ান জানিয়েছেন, কারিগর শ্রেণী থেকে কোন চাষী তাঁর স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন না, এবং তার বিপরীতও হতো না।[২০৪] কিন্তু কৌটিল্যের দায়বিভাগ বিধি এবং 'অন্তরাল' নামে পরিচিত মিশ্রজাতির তালিকা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় উচ্চবর্ণের মানুষ ও শূদ্রদের মধ্যেও কিছু বিবাহ হয়েছিল। নিষাদ, পারশব, চণ্ডাল, পুক্কস, শ্বপাক, ক্ষত্তা, আয়োগব, কুটক (ধর্মসূত্রের কুক্কুটক), রথকার, বৈণ্য ইত্যাদির উৎপত্তি সংক্রান্ত ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বেরই তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন।[২০৫] কৌটিল্য বলেন, বৈণ্য ও রথকারদের একই কাজ।[২০৬] তাছাড়া তিনি ঘোষণা করেন, এইসব মিশ্রজাতির লোকের নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ করা উচিত।[২০৭] তারা যেন যথাযথ বৃত্তি অনুসরণ করে সেদিকে লক্ষ রাখা রাজার কর্তব্য।[২০৮] রাজাকে তিনি এইসব বর্গের স্বীকৃতি দান ও প্রজাদের সেইভাবে পরিচালনার অনুজ্ঞাও দিয়েছেন।[২০৯] মিশ্রজাতির মধ্যে সমান দায়বিভাগ হবে এ-বিধানও দেওয়া হয়েছে।[২১০] তাঁর মতে, চণ্ডাল বাদে অন্যান্য মিশ্রজাতি ('অন্তরাল') শূদ্রের বৃত্তি অনুসারে জীবনধারণ করতে পারে।[২১১] অতএব শুধু চণ্ডালদেরই ঘৃণ্য জাতি হিসেবে গণ্য করা হতো, এবং বৌদ্ধ তালিকার রথকার, বেণ, পুক্কুস ও নেসাদদের বাদ রাখা হয়েছে।

আগেই দেখানো হয়েছে, পাণিনি, মনে হয়, চণ্ডালদের শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু কৌটিল্য তাঁদের শূদ্র বলে মনে করেন না।[২১২]

২০৩. স্ত্রী বা প্রতিশ্রাবিণী পতিকৃতম্ ঋণম্ অন্যত্র গোপালকার্ধসীতিকেভ্যঃ। অর্থশাস্ত্র ৩।১১।

২০৪. 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিক্যুয়ারি', ৫, পৃ ৯২।

২০৫ অর্থশাস্ত্র ৩।৭। কৌটিল্য 'ব্রাত্য'-র এক নতুন সংজ্ঞার্থ প্রচলন করেছেন। তাঁর মতে ব্রাত্য হলো নীচজাতীয় কোন নারীর গর্ভে চতুর্বর্ণের যে-কোন বর্ণভুক্ত অশুচি ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তান। ঐ।

২০৬. কর্মণা বৈণ্যো রথকারঃ। অর্থশাস্ত্র ৩।৭।

২০৭. ঐ। গণপতি শাস্ত্রী-ধৃত পাঠের (২য়, পৃ ৪৪) ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। শ্যামশাস্ত্রীর পাঠ আলাদা। তাতে মনে হয় সবর্ণ-বিবাহ শুধু বৈশ্যদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

২০৮. পূর্বাপরগামিত্বং বৃত্তানুবৃত্তং চ স্বধর্মান্ স্থাপয়েৎ। অর্থশাস্ত্র ৩।৭।

২০৯. ঐ, ৩।৭। ২১০. ঐ। ২১১. ঐ, গণপতি শাস্ত্রী (২য়, পৃ ৪৪)-এর অনুসরণে।

২১২. ঐ ৩।৭।

চতুর্বর্ণ-প্রথায় তাঁদের স্থান নেই। ফলে কৌটিল্যের বিচারে চতুর্বর্ণের মানুষদের পশুপাখির ক্ষতি করলে যে-অর্থদণ্ড হতো, চণ্ডাল ও অরণ্যচর জনগোষ্ঠীর পশুপাখির ক্ষতি করলে শাস্তি হবে তার অর্ধেক।[২১৩] চতুর্বর্ণের সঙ্গে কৌটিল্য 'অন্তবসায়ী'[২১৪] জাতির উল্লেখ করেছেন। মনে হয় তাঁরা চণ্ডালদের সঙ্গে অভিন্ন, কারণ গ্রামের বাইরে শ্মশানের কাছে তাঁদের বাস।[২১৫] বিধান দেওয়া হয়েছে, কোন চণ্ডাল আর্য রমণীকে স্পর্শ করলে তাঁর অর্থদণ্ড হবে একশ 'পণ'।[২১৬] এর থেকে বোঝাতে পারে, তিনি শূদ্র রমণীকে স্পর্শ করলে ঐ ধরনের কোন অর্থদণ্ড হবে না। একইভাবে চণ্ডালদের ব্যবহৃত কূপ অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবেন না।[২১৭] অতএব চণ্ডালদের নিঃসন্দেহে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করাই অব্যাহত ছিল। কিন্তু অন্যান্য মিশ্রজাতি, যেমন পারশব ও নিষাদদের ক্ষেত্রে এই একই কথা বলা যায় না। কারণ ব্রাহ্মণ পিতার অন্য কোন সন্তান না থাকলে কৌটিল্য পারশব সন্তানের ভাগ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।[২১৮] 'অর্থশাস্ত্র' থেকে চণ্ডালদের একটি নতুন বৃত্তি জানা যায়। বিধিভঙ্গকারিণী কোন মহিলাকে গ্রামের মধ্যস্থলে বেত্রাঘাত করার কাজে তাঁকে নিয়োগ করা হবে।[২১৯] যেসব পুরুষ ও মহিলা নানাভাবে আত্মহত্যা করবেন তাঁদের মৃতদেহ রাজপথ দিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়ার কথাও তাঁকে বলা যেতে পারে।[২২০]

শূদ্রদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে কৌটিল্য কিছু তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বিধান অনুযায়ী, দেব- বা পিতৃকর্মে কোন ব্যক্তি যদি বৌদ্ধ বা আজীবিকদের মতো 'বৃষল' প্রব্রজিতদের ভোজন করান তাহলে তাঁর অর্থদণ্ড হবে একশ 'পণ'।[২২১] শ্যামশাস্ত্রী 'বৃষল'কে শূদ্র বলে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু এখানে আসলে শূদ্রদের পরিবর্তে তপস্বীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণরা তাঁদের নির্বিচারে শূদ্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও অশোক কিন্তু জাতি নির্বিশেষে প্রব্রজিতদের সম্মান করেছিলেন। বলা হয়েছে, একবার এই কারণে অশোকের মন্ত্রী তাঁর সমালোচনা করলে তিনি উত্তর দেন, বিবাহ ও নিমন্ত্রণের ক্ষেত্রে জাতির প্রশ্ন ওঠে, 'ধম্ম' পালনের ক্ষেত্রে নয়।[২২২]

২১৩. চণ্ডালারণ্যচরাণামর্ধদণ্ডাঃ। অর্থশাস্ত্র ৪।১০।
২১৪. অর্থশাস্ত্র ৩।১৮। ২১৫. ঐ, ২।৪। ২১৬. ঐ, ৩।২০।
২১৭. ঐ, ১।১৪। ২১৮. ঐ, ৩।৬।
২১৯. ঐ, ৩.৩। এ-কাজের জন্য হয়তো বিশেষ করে চণ্ডালদেরই বেছে নেওয়া হয়েছিল আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত হিংস্রতার কারণে।
২২০. অর্থশাস্ত্র ৪।৭-এ 'রজ্জুনা' পাঠ ধার্য। 'ঘাতয়েৎস্বয়মাত্মানম'-এর অনুবাদে শ্যাম শাস্ত্রী লিখেছেন 'অন্যদের আত্মঘাতী করাবেন' (cause others to commit suicide)। এটি ঠিক বলে মনে হয় না।
২২১. অর্থশাস্ত্র ৩।২০।
২২২. পি. এল. নরসু, 'দি এসেন্স অফ বুদ্ধিজম', পৃ ১৩৭-এ উদ্ধৃত।

কৌটিল্যের একটি বিধান থেকে মনে হয়, কিছু কিছু শূদ্রের বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষাগত সুবিধা পাওয়া সম্ভব ছিল। অমাত্যদের চরিত্র-পরীক্ষার কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার সময়ে তিনি একটি বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তার মাধ্যমে, তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কোন আদেশ অমান্য করার প্রলোভন যাচাই করা যাবে। আদেশ পাওয়ার পরেও কোন পুরোহিত অযোগ্য ব্যক্তিকে বেদ অধ্যাপনে অস্বীকার করলে বা অনধিকারী ব্যক্তির আয়োজিত যজ্ঞের ভার গ্রহণে অসম্মত হলে ( 'অযাজ্যযাজনাধ্যাপনে' ) রাজা সেই পুরোহিতকে কর্মচ্যুত করবেন।[২২৩] রাজা অধার্মিক—এই হেতু তাঁকে উৎখাত করার জন্য কর্মচ্যুত পুরোহিত অমাত্যদের সংগঠিত করার চেষ্টা করবেন। অমাত্যরা যদি এই ধর্মীয় প্রলোভনে নতিস্বীকার না করেন, তাহলে তাঁদের বিশুদ্ধ বলে গণ্য করা উচিত।[২২৪] এই অংশটির জয়মঙ্গলা-ভাষ্যে 'অযাজ্য'কে 'শূদ্রাপুত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২২৫] অতএব এই নিয়ম থেকে যে-সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো রাজার ইচ্ছা হলে উচ্চতর বর্ণের শূদ্র-পুত্ররা যজ্ঞ বা বিদ্যাশিক্ষা করতে পারেন। এর থেকে মৌর্য যুগে শাসকের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এ-বিষয়ে প্রচলিত অবস্থানের আভাস পাওয়া যায় সম্ভবত কৌটিল্যের অন্য একটি বক্তব্য থেকে। তিনি ঘোষণা করেছেন, কোন শূদ্রার স্বামীর সংসর্গে[২২৬] অনুষ্ঠিত হলে যজ্ঞীয় পুণ্যের মূল্য হ্রাস পায় এবং সেজন্য তিনি এই জাতীয় যাজককে মর্যাদা দেওয়া উচিত নয় বলে নির্দেশ দিয়েছেন।[২২৭]

মৌর্য যুগে রাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে শূদ্রদের দাস, শ্রমিক ও হস্তশিল্পী-রূপে নিয়োগ করত। তাঁদের বেতন নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংস্থানে ভাঙনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। যেহেতু রাষ্ট্র-পরিচালিত কৃষিতে দাস ও কর্মকরেরা যথেষ্ট সংখ্যায় এগিয়ে আসেননি সেজন্য ভাগচাষীদের কাছে রাজভূমি ইজারা দেওয়ার প্রথা গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল। এই ভাগচাষীরা ছিলেন সম্ভবত নিম্নবর্গের। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অতি-বসতিপূর্ণ অঞ্চল থেকে শূদ্রদের নিয়ে এসে রাষ্ট্র নতুন নতুন জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার নীতি গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু কৃষি-শ্রমিক হিসেবে বোধ হয় ব্যবহার করা হতো ভূমিহীন শূদ্রদের। রাজনীতি ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে শূদ্ররা তখনও প্রাচীন ভেদনীতির অধীনেই ছিলেন, যদিও উচ্চবর্ণের মানুষের শূদ্র-পুত্রের ক্ষেত্রে কৌটিল্য, মনে হয়, বেশ কিছু ছাড় দিয়েছিলেন। তাঁদের দাসে পরিণত করা হতো না, তাঁরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগী হতে পারতেন,[২২৮]

**২২৩.** ঐ, ১।১০। **২২৪.** ঐ।

**২২৫.** 'জার্নাল অফ ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ', ২২, পৃ ৩২। গণপতি শাস্ত্রী 'অযাজ্য'-র ব্যাখ্যা করেছেন 'বৃষলীপতি', অর্থাৎ শূদ্রার স্বামী ( ১ম, পৃ ৪৮ )।

**২২৬.** অর্থশাস্ত্র ৩।১৪। **২২৭.** অদোষঃ ত্যক্তুমন্যোন্যম্। ঐ।

**২২৮.** এটি রথকার ও পারশবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে বৈদিক যজ্ঞ ও শিক্ষার অধিকার ভোগ করতেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন বাধানিষেধে নিপীড়িত হওয়ার ব্যাপারে শূদ্রদের বৃহত্তর অংশের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি।

বিভিন্ন নিম্নবর্গের মানুষদের সাধারণ আচরণ সম্বন্ধে 'অর্থশাস্ত্র' থেকে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। দেখা যায়, নিজেদের জীবনধারণের অবস্থায় তাঁরা ঠিক সুখী ছিলেন না। যাঁদের জাতি ও কর্মকে সমাজে হীন পর্যায়ের বলে গণ্য করা হতো ('হীনকর্মজাতিম্') তাঁদের অনেকেই কৌটিল্যের অপরাধী ও সন্দেহভাজনদের তালিকাভুক্ত। খুনী, ডাকাত, বা (গুপ্ত) ধন ও গচ্ছিত সম্পদ অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বলে তাঁদের সন্দেহ করা হতো।[২২৯] কৌটিল্য বলেন, চুরি ও ডাকাতির ক্ষেত্রে দরিদ্র স্ত্রীলোক ও নিন্দনীয় প্রকৃতির পরিচারকদেরও যাচাই করা উচিত।[২৩০] তিনি এও বিধান দিয়েছেন, কোন প্রভু নিহত হলে তিনি তাঁর পরিচারকদের উপর নির্যাতন বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন কিনা সে-বিষয়ে তাদের মধ্যে তদন্ত করা উচিত।[২৩১] এর থেকে দেখা যায়, কখনও কখনও পরিচারকরা হয়তো প্রভুদের জীবননাশের চেষ্টা করতেন। কৌটিল্য এও বিধান দিয়েছেন, যখন কোন শূদ্র নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দেবসম্পত্তি চুরি করে বা রাজার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয় তখন বিষাক্ত মলম প্রয়োগ করে তার চোখ নষ্ট করা হবে বা তাকে ৮০০ 'পণ' অর্থদণ্ড দিতে হবে।[২৩২] এর থেকে পুরোহিত বা রাজার ক্ষমতার প্রতি কিছু শূদ্রের বৈরিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। পারশবদের রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপেরও উল্লেখ আছে। রাজদ্রোহী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেইভাবেই পারশবদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিহত করতে হবে। এমন ব্যবস্থাও করা হয়েছে যে, রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করে সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিবারে কলহের সৃষ্টি করবেন যাতে শেষ পর্যন্ত সরকারীভাবে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।[২৩৩] উপরের সূত্রগুলো থেকে দেখা যায়, প্রভুদের সম্পর্কে শূদ্রবর্ণের মানুষের অনুকূল মনোভাব ছিল না। কোন শান্তিপূর্ণ প্রণালীতে তাঁদের প্রতিক্রিয়াকে চালিত করার সুযোগ না থাকায় মাঝে মাঝে তার প্রকাশ ঘটত বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে, যেমন ডাকাতি, সিঁধকাটা, মন্দিরের সম্পত্তি চুরি, প্রভুহত্যা, ব্রাহ্মণদের ভূসম্পত্তির উপর আক্রমণ

২২৯. অর্থশাস্ত্র ৪।৬। ২৩০. ঐ।

২৩১ দণ্ডস্য হৃদয়মদণ্ডং দৃষ্টবা না তস্য পরিচারকজনং বা দণ্ডপারুষ্যার্দিতমাগেৎ। অর্থশাস্ত্র ৪।৭।

২৩২. শূদ্রস্য ব্রাহ্মণবাদিনো দেবদ্রব্যমবস্তৃণতো রাজদ্বিষ্টমাদিশতো দ্বিনেত্রভেদিনশ্চ যোগাঞ্জনেনান্ধত্বমষ্টশতো বা দণ্ডঃ। অর্থশাস্ত্র ৪।১০। 'ব্রাহ্মণবাদী শূদ্র'-কে দেবদ্রব্য-অপহারক বা রাজদ্বেষী থেকে আলাদা করার কোন ন্যায্য কারণ আছে বলে মনে হয় না—এই অংশের অনুবাদে শ্যামশাস্ত্রী তা-ই করেছেন (পৃ. ২৫৫)।

২৩৩. অর্থশাস্ত্র ৫।১, গণপতি শাস্ত্রীর টীকার ভিত্তিতে।

এবং রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ। মনে হয়, এই সমস্ত কাজ তাঁদের মধ্যেকার অসন্তোষেরই লক্ষণ। কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে সংগঠিত বিদ্রোহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে মৌর্য যুগের অবস্থা সম্ভবত তার পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে খানিকটা ভালো ছিল। ধর্মসূত্রের কয়েকটি অংশ থেকে যেমন সিদ্ধান্ত করা যায়, 'অর্থশাস্ত্রে' শূদ্রদের সংগঠিত বিদ্রোহ দমনের জন্য তেমন কোন বিশেষ বিধিব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে শূদ্রদের অন্তর্ভুক্তিতে কৌটিল্যের সম্মতি থেকে—যদিও সম্ভবত কার্যে পরিণত করা হয়নি—একটা আস্থাসূচক মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই অবস্থা এসেছিল আপসরফা ও নির্মম নিয়ন্ত্রণ—তাঁর এই দ্বিমুখী নীতি থেকে।

যাই হোক, নীচু বর্গের মানুষ ও আদিবাসীরা ছিলেন অশোকের দুশ্চিন্তার কারণ। দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিকদের প্রতি বিবেচনা দেখানোর জন্য তিনি যে জোর দিয়েছিলেন তার থেকে তাঁদের প্রশমিত করার প্রয়াসের আভাস পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সীমান্তে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার এবং প্রচলিত সমাজ-কাঠামোয় তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন বৌদ্ধধর্মকে। তাঁদের 'ধম্ম' পালন করতে বলা হয়েছিল, যার অর্থ পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, সম্পত্তি ও সামাজিক অনুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ। যাঁরা (এসব) অগ্রাহ্য করেছিলেন ও অবাধ্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন অশোক তাঁদের শাস্তি দেওয়ার প্রচ্ছন্ন ভয় দেখিয়েছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য দাবি করেন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# প্রাচীন ব্যবস্থায় সঙ্কট

( আনু. খৃপূ ২০০ - আনু. ৩০০ খৃস্টাব্দ )

এই কালপর্বে শূদ্রদের অবস্থান সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ তথ্যের অধিকাংশই 'মনুস্মৃতি' থেকে পাওয়া। এর রচনাকাল খৃপূ ২০০ - ৩০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ধরা হয়।[১] কিন্তু এর বড় অংশ সম্ভবত খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের অন্তর্গত। পরে, পরিশিষ্ট ১-এ যেমন দেখানো হয়েছে, তার দশম অধ্যায়টি ( যেখানে বিভিন্ন সংকর জাতি নিয়ে আলোচনা আছে ) মূল রচনায় খৃস্টীয় পঞ্চম শতক নাগাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকতে পারে। ব্রহ্মাবর্ত ( সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী দেশ )[২] এবং ব্রহ্মর্ষিদেশ ( কুরু, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনদের সমভূমি )-কে মনু পবিত্র বলে গণ্য করেছেন।[৩] এর ভিত্তিতে প্রচার করা হয়েছে, এই ধর্মশাস্ত্রটির উৎপত্তি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ এই প্রদেশে এবং এখানেই এটিকে সর্বপ্রথম প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়।[৪] এই ধরনের মত সম্ভাব্য হলেও কোনমতেই অবধারিত নয় এবং মনুর বিধানের প্রভাব আরও অনেক বড় অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে থাকতে পারে।

মনু যে চরম ধরনের ব্রাহ্মণ্য উন্মাদনা দেখিয়েছিলেন তার ফলে তাঁর রচনায় প্রদত্ত সাক্ষ্যের মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', ভাসের নাটক,[৫] 'মিলিন্দপঞ্‌হো', 'দিব্যাবদান', 'মহাবস্তু' ও 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-এর মতো বৌদ্ধ রচনা[৬] থেকে আহৃত তথ্যের আলোকে

১. বুহলার, সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ইস্ট, ২৫, ভূমিকা, পৃ [১১৪]-[১১৮] ; তুলনীয় : জায়সবাল, 'মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ২৫-৩২ ; কাণে, 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ২য়, পৃ [১১]। কেতকর বলেছেন, 'মনুস্মৃতি' খৃ. ২৭২-৩২০-র মধ্যে রচিত ( 'হিস্ট্রি অফ কাস্ট', পৃ ৬৬ )। মূলের কিছু অংশের ক্ষেত্রে তা সত্য হতে পারে।

২. মনু ২।১৭।

৩. ঐ, ২।১৯।

৪. হপকিন্স-এর 'রিলেশন্‌স অফ ফোর কাস্ট্‌স ইন মনু', পৃ ৪-৫-এ উদ্ধৃত ইও-হান্টগেন-এর মত।

৫. ভাসকে খৃপূ ৫ম বা ৪র্থ শতকে স্থাপন করার প্রাক্তীয় মত সাধারণভাবে স্বীকৃত নয়। ভাসের কাল খৃস্টীয় ২য় বা ৩য় শতকে রাখা যেতে পারে। ( 'দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি', পৃ ২৬১ )।

৬. 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র'-র প্রথম চীনা অনুবাদ হয়েছিল খৃস্টীয় ৩য় শতকে ( সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ইস্ট, ২১, ভূমিকা, পৃ [২১] )। মূল গ্রন্থটির রচনাকাল তাই খৃস্টীয় ২য়, এমনকি ১ম শতকও ধার্য করা যায় ( নলিনাক্ষ দত্ত, 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', ভূমিকা, পৃ [১৭] )।

মনুর রচনায় শূদ্রদের অবস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখা যায়। 'পন্নবণা' নামে পরিচিত একটি জৈন রচনা হস্তশিল্পীদের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য যোগান দেয়। এটিকেও এই যুগের রচনা বলে গণ্য করা যেতে পারে।[৭] এ-যুগের স্মৃতিস্তম্ভ ও সঙ্কল্পমূলক ('ভোটিভ') প্রত্নলেখ থেকেও শূদ্রসম্প্রদায়ের অবস্থান সম্পর্কে কিছু পার্শ্বিক তথ্য পাওয়া যায়, যা সাদরে গ্রহণযোগ্য।

গোড়ার দিকে বিভিন্ন পুরাণে কলিযুগের বর্ণনা বোধ হয় এই যুগেরই প্রসঙ্গে,[৮] যখন তীব্র সামাজিক সংঘর্ষ বর্ণবিভক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং নানারকম অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীর কার্যকলাপ ও বাক্ট্রীয় গ্রীক, শক, পার্থিয় এবং কুষাণদের অনুপ্রবেশ সমাজকে দুর্বল করে তোলে। অংশত অশোকের বৌদ্ধনীতির প্রতিক্রিয়ায়, অংশত এইসব নতুন জনবর্গের আবির্ভাবের ফলে মনু ব্রাহ্মণ্য সমাজকে সংরক্ষিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এর জন্য শূদ্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার বিধান দেওয়া ছাড়াও বিদেশী আগন্তুকদের বর্ণসমাজে অন্তর্ভুক্ত করার উপযুক্ত বংশপত্রও তিনি আবিষ্কার করেছেন। এছাড়া ঐ একই উদ্দেশ্যে দণ্ডের[৯] শক্তিকে তিনি অযথা মহিমান্বিত করে তুলেছেন।

উচ্চতর জাতিদের সেবা করার জন্য ব্রহ্মা নির্দিষ্ট করেছেন শূদ্রকে—এই প্রাচীন তত্ত্বটিই মনু আবার ঘোষণা করেছেন।[১০] ব্যবসা, ঋণদান, কৃষিকর্ম ও গবাদি পশুর পরিচর্যার জন্য রাজা আদেশ করবেন বৈশ্যকে, শূদ্রের প্রতি আদেশ হবে উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা।[১১] কিন্তু আপদ্ধর্ম-অধ্যায়ে মনু ঘোষণা করেছেন, শূদ্রের উচিত ব্রাহ্মণের সেবা করা, তাতেই তার সব প্রয়োজন মিটে যাবে;[১২] না-হলে সে ক্ষত্রিয়ের সেবা করতে পারে, বা এমনকি ধনবান বৈশ্যের পরিচর্যা করে নিজের ভরণপোষণ করতে পারে।[১৩] এই সূত্রে 'অপি' (এমনকি) শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিত, কারণ, মনে হয়, এর তাৎপর্য হলো বৈশ্য কদাচিৎ শূদ্রের প্রভু হতো।[১৪] আপৎকালে শূদ্রের সেবা প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য সংরক্ষিত—এর থেকে এই ইঙ্গিত

৭. জৈন, 'লাইফ অ্যাজ ডেপিক্টেড ইন দ জেন ক্যাননস', পৃ ৩৮। 'পন্নবণা' গ্রন্থে শক, যবন, মুরুণ্ড, পহ্লব ইত্যাদির উল্লেখ আছে (১।৫৮)। তার থেকে মনে হয় এটি মৌর্যোত্তর যুগের রচনা।

৮. হাজরা, 'স্টাডিজ ইন দ পুরাণিক রেকর্ডস অন হিন্দু রাইট্স অ্যান্ড কাস্টম্স', পৃ ২০৮-১০।

৯. মনু ৭।১৩-৩০।

১০. ঐ, ১।৯১।

১১. ঐ, ৮।৪১০।

১২. ঐ, ১০।১২৩; তুলনীয়: ৯।৩৩৪।

১৩. ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ...। ঐ, ১০।১২১-২২।

১৪ হপকিন্স, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৩।

পাওয়া যায়। অন্যত্র মনু বিধান দিয়েছেন, রাজা যেন বিশেষভাবে বৈশ্য ও শূদ্রদের দিয়ে তাদের নির্ধারিত কর্তব্য পালন করিয়ে নেন, যেহেতু এই দুই বর্গ তাদের কর্মত্যাগ করলে সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।[১৫] এই শ্লোকটির বিশেষ গুরুত্ব আছে, কারণ কোন পূর্ববর্তী রচনায় এটি পাওয়া যায় না। এই ধরনের ব্যবস্থা মনে হয়, এক সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট-পর্বের প্রতিফলন। 'যুগ পুরাণ' থেকেও তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সেখানে বলা আছে, এই পর্বে এমনকি মহিলারাও কৃষিকাজে যোগ দিয়েছিলেন।[১৬] কৃষক ও ব্যবসায়ীরা দুরবস্থায় পড়লে রাজা তাদের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করতেন—মনুর একটি শ্লোকের উপর কুল্লুক-এর ভাষ্য থেকে এমন অনুমান করা যায়।[১৭] জীবনধারণ কষ্টকর হলে শূদ্ররা দেশের যে-কোন স্থানে[১৭ক] ( অর্থাৎ এমনকি ম্লেচ্ছদেশেও ) বসতি স্থাপন করতে পারে—মনুর এই নিয়মও কোন এক ধরনের সংকটের নিদর্শন যা উৎপাদনশীল জনসমষ্টিকে গভীর-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং দেশান্তরী হতে বাধ্য করে। অতএব, বিদেশী আক্রমণের কারণে সামাজিক অস্থিরতা আরও বেড়ে যাওয়ায় হয়তো বৈশ্য ও শূদ্রদের দিয়ে কাজ করানোর এই মনু-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

উল্লিখিত বিভিন্ন সূত্র থেকে দেখা যায়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মভেদ ক্রমশই মুছে যাচ্ছিল। মনু নির্দেশ দিয়েছেন, আপৎকালে বৈশ্য তার নিজস্ব বৃত্তির সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে তার উচিত শূদ্রের বৃত্তি গ্রহণ করা, অর্থাৎ দ্বিজাতির মানুষদের সেবা করে জীবনধারণ করা।[১৮] 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো'-র একটি অংশ থেকে বিষয়টি সমর্থিত হয়। সেখানে কৃষিকর্ম, ব্যবসা ও পশুপরিচর্যাকে বৈশ্য ও শূদ্রদের মতো সাধারণ লোকের কাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৯] এই দুই শ্রেণীর জন্য আলাদা কোন কাজের কথা নেই।

বৈশ্যকে শূদ্রের প্রায় সমান করে তোলার প্রবণতা সত্ত্বেও স্বাধীন শূদ্র কৃষকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁদের সাধারণত ভাড়া-করা শ্রমিক ও দাসরূপে নিয়োগই অব্যাহত ছিল, কারণ মনু সেই প্রাচীন নিয়মই পুনরাবৃত্তি করেছেন : যে-কারুকর্মী, যন্ত্রকুশলী ( 'শিল্পী' ) ও শূদ্ররা

১৫. মনু ৮।৪১৮। ১৬. যুগ পুরাণ, ১৬৭।

১৭. মনু ৭।১৫৪-র 'পঞ্চবর্গম্' শব্দটি কুল্লুক ব্যাখ্যা করেছেন পাঁচ ধরনের চর বলে ( 'কর্ষকঃ ক্ষীণবৃত্তিঃ' ও 'বাণিজকঃ ক্ষীণবৃত্তিঃ' সহ )। হপকিন্স অর্থ করেছেন মন্ত্রী, রাজ্য, নগর, সম্পদ ও সেনাবাহিনী ( পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯ )। 'পঞ্চবর্গ'কে কিন্তু রাষ্ট্রের পাঁচটি অঙ্গ রূপে গ্রহণ করার কোন ন্যায্য কারণ নেই। সাধারণত তার সংখ্যা ধরা হয় সাত। ১৭ক. ২।২৪। ১৮. মনু ১০।৯৮।

১৯. অবসেসানং পুথুবেস্‌সসুদ্দানং কাসিবণিজ্জা গোরক্‌খা করণীয়া। মিলিন্দপঞ্‌হো, পৃ ১৭৮।

শারীরিক পরিশ্রম করে বেঁচে থাকে তারা কর দেওয়ার পরিবর্তে মাসে একদিন রাজার জন্য শ্রম দেবে।[২০] তিনি একটা নতুন ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন: আপৎকালে বৈশ্য তার ধানের ৳ অংশ কর দেবে, শূদ্র দেবে কায়িক শ্রম।[২১] এই প্রসঙ্গে কুল্লূক জোর দিয়ে বলেছেন, দুঃসময়েও শূদ্রদের থেকে কর আদায় করা অনুচিত।[২২] মনু যে শূদ্রদের কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন তার সমর্থন 'মিলিন্দপঞ্‌হো' থেকে পাওয়া যায়। এই রচনা থেকে জানা যায়, প্রত্যেক গ্রামে ছিলেন দাস, পুরুষ ও স্ত্রী, বেতনভোগী ('ভতক') এবং ভাড়া-করা শ্রমিক ('কম্মকর') যাঁদের করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো।[২৩] সুতরাং শূদ্ররা বৈশ্যদের মতো কৃষকরূপে রাষ্ট্রকে কর দিতেন বলে মনে হয় না। রাজার অষ্টবিধ কর্মের উল্লেখ করার সময়ে ব্যবসা, কৃষি, খনি খনন, জনশূন্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন, বন ছেদন ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন মেধাতিথি।[২৪] কিন্তু মৌর্য যুগের মতো রাষ্ট্র যে দাস ও কর্মকরদের কৃষিকর্মে নিয়োগ করত তেমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। 'মহাবস্তু'-তে এক গ্রামপ্রধানের কথা বলা হয়েছে যিনি মাঠে কাজ তদারকির জন্য দ্রুত গ্রামের বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাজার হয়ে এই কাজ করতেন কিনা তা জানা যায় না।[২৫] মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির অধিকারীরা শূদ্রদের নিয়োগ করতেন কৃষিশ্রমিকরূপে। পতঞ্জলি এক ভূস্বামীর কথা উল্লেখ করেছেন যিনি এককোণে বসে পাঁচজন ভাড়া-করা শ্রমিকের লাঙল দেওয়ার কাজ তদারকি করছিলেন।[২৬] মনুও ক্ষেত্রস্বামীর ভৃত্যদের কথা বলেছেন।[২৭] তাঁর কথা অনুযায়ী পারিবারিক সম্পত্তি ভোগের সময়ে ব্রাহ্মণপুত্রকে প্রদেয় অতিরিক্ত অংশের একটি হবে কৃষক।[২৮] ব্রাহ্মণরা যে কৃষি-শ্রমিক নিয়োগ করতেন—এটি নিঃসন্দেহে তা নির্দেশ করে।

মৌর্যোত্তর যুগে বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের প্রসঙ্গে শূদ্র কারুকর্মীদের অবস্থান আরও ভালোভাবে দেখা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের বহির্বাণিজ্যে এই যুগ ছিল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সমৃদ্ধির পর্ব। খৃস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম অর্ধে মৌসুমীবায়ু ও দ্বিতীয় অর্ধে 'রেশম পথ' আবিষ্কারের ফলে ভারত স্থলপথে মধ্য এশিয়া ও চীন এবং জলপথে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিরাট বাণিজ্য বিস্তার করেছিল। খৃস্টীয় প্রথম দুই শতকের হূন, কুষাণ, রোমান ও আর্কাসিড সাম্রাজ্য যে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা এনে দিয়েছিল তার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি হয়। দামী কাঠ, সুতিবস্ত্র, রেশম, মণি-

২০. মনু ৭।১৩৮। ২১. ঐ, ১০।১২০।

২২. ন তু তেভ্য আপদ্যাপিকরো গ্রাহ্যঃ। মনু-টীকা ১০।১২০।

২৩ মিলিন্দপঞ্‌হো, পৃ ১৭।

২৪. মনু-টীকা ৭।১৫৪। হপকিন্স মনে করেন, 'অষ্টবিধং কর্ম' রাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গের কথা স্মরণ করায় (পূর্বোক্ত, পৃ ৭০-৭১)। অষ্টবিধ কর্ম ও সপ্তাঙ্গের মধ্যে কিন্তু কোন মিল নেই। ২৫. ১ম, ৩০১। ২৬. মহাভাষ্য, ২।৩৩।

২৭. ...ভৃত্যাণামজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রিকস্য তু। মনু ৮।২৪৩। ২৮. মনু ৯।১৫০।

মাণিক্য, লৌহদ্রব্য ও সর্বোপরি লবঙ্গ এবং মরিচ ভারত থেকে রপ্তানি হয়।[২৯] কিছু কাঁচামাল, যেমন অপরিশোধিত কাঁচ, সীসা, টিন, লাল প্রবাল ও অ্যাসবেস্টস এবং তৈরি-জিনিসও আমদানি করা হতো। তার মধ্যে ছিল মদ, রোমান সংরক্ষণপাত্র ও তৈজসপত্র। কিন্তু দাম দেওয়া হতো প্রধানত রোমান মুদ্রায়।[৩০] বিন্ধ্যের দক্ষিণে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের তুলো-উৎপাদক অঞ্চলে অসংখ্য রোমান স্বর্ণমুদ্রার ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা ভরতুকি ছাড়া সম্ভবত সবচেয়ে বড় নথিভুক্ত ও আপাত-দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য বেসরকারি লেনদেন ছিল ভারত থেকে ভেসপিয়ান-এর অধীনস্থ মিশরে: বছরে ৫৫০ লক্ষ সেস্টারসেস (১৬০ লক্ষ সোনার ফ্রাঁ) মূল্যের রপ্তানি।[৩১]

প্রচুর পরিমাণে তামার ব্যবহার থেকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খৃস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত, ইন্দো-গ্রীক যুগ থেকে পরবর্তী কুষাণ যুগ অবধি প্রায় সব রাজা এবং অনেক 'জনগোষ্ঠী' ও নগর প্রচুর সংখ্যায় তাম্রমুদ্রা চালু করেছিল। তার অনেকগুলোর মধ্যে ছিল যথেষ্ট পরিমাণে টিন। সেগুলোকে ব্রোঞ্জ মুদ্রাও বলা যায়। এইসব তাম্রমুদ্রা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আর্থিক লেনদেনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি ছাড়া এসব সম্ভব হতো না।

খৃস্টীয় যুগের প্রথম তিন শতকে সমৃদ্ধ নাগরিক জীবন সংক্রান্ত প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে হস্তশিল্পের অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীক ও লাতিন বিবরণীতে বারোটি বন্দরের উল্লেখ আছে। কয়েকটি বন্দর, যেমন তমলুক, আরিকামেদু ও কাবেরীপত্তনম্ উৎখনন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৯৪৭ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন খননকার্যের মাধ্যমে অসংখ্য নগর-বসতির কথা জানা যায়। মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকায় অনেক নগর ছিল। তার অনেকগুলোই উত্তরাপথের রাস্তায় অবস্থিত, যেটি প্রথমে যমুনার ধারা অনুসরণ করে উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশিলার দিকে ঘুরে গেছে। খননকার্য থেকে জানা যায়, পশ্চিম ভারতে সাতবাহনদের অধীনে ছিল সমৃদ্ধিশালী নগর-বসতি। পূর্ব অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে নগরের আবির্ভাব হয় খৃস্টীয় প্রথম শতকে। সেগুলো অব্যাহত থাকে প্রায় তিনশ বছর। পাকিস্তান ও তার সঙ্গে আফগানিস্তান ও সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন কুষাণ নগর ও পত্তন সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এর অর্থ হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি। তার ফলে হয়তো যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক ও

২৯. মাইকেল লোবে, "আসপেক্ট্স্ অফ ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইন দ ফার্স্ট সেভেন সেঞ্চুরিজ অফ দ ক্রিশ্চান এরা", 'জার্নাল অফ দ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি', সংখ্যা ২ (১৯৭১), পৃ ১৭৬। ৩০. ঐ।

৩১. মাক্স ভেবার, 'দি এগ্রেরিয়ান সোশিওলজি অফ এনশেন্ট সিভিলাইজেশনস' (লন্ডন, ১৯৭৬), পৃ ৪১।

ভৌগোলিক গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছিল এবং শহরে হস্তশিল্পীদের সংখ্যা বেড়েছিল।

খৃস্টীয় যুগের ঠিক আগের ও পরের শতকগুলোয় হস্তশিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায় প্রত্নতত্ত্ব থেকে। তক্ষশিলার সিরকাপ নগর থেকে পুনরুদ্ধার হয়েছে নানারকম লৌহদ্রব্য।[৩২] অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানেও তা পাওয়া গেছে। এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে কর্মকারের বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। তার সমর্থন মেলে রোমান সাম্রাজ্যে ভারতীয় ইস্পাত রপ্তানি থেকে। এই ইস্পাতের উপর তাপপ্রয়োগ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা লেখা হয় গ্রীক ভাষায়।[৩৩] বারাণসীর রাজঘাট থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি লৌহদ্রব্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ ভারতে বিশুদ্ধ ইস্পাত তৈরির কৌশল বেশ ভালোভাবে জানা ছিল। লৌহ-প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র ও ব্যক্তিগত অলংকারসহ ব্রোঞ্জের জিনিসও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হতে শুরু করে। এই সময়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে সীসা, দস্তা ও নিকেল ব্যবহার করা হয়েছিল। তার ফলে ব্রোঞ্জ আরও দৃঢ় হয়।

ভারতে যথার্থ ব্রোঞ্জ যুগ আসেনি, কিন্তু তক্ষশিলা থেকে অসংখ্য ব্রোঞ্জের জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে।[৩৪] ব্যাপারটি কাংস্যকারের গুরুত্বের সাক্ষী। এই সময়ে পেতলের জিনিসের ব্যবহারও দেখা যায়,[৩৫] যার থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় পেতলের কারিগরদের আবির্ভাবের। ব্রোঞ্জ মুদ্রার বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রচুর পরিমাণে কাঁচ তৈরির ফলে নিশ্চয় এক নতুন সম্প্রদায়ের কারিগর দেখা গিয়েছিল। সিরকাপ ও আরিকামেদু থেকে পাওয়া গেছে অসংখ্য কাঁচের জিনিস, দামী পুঁতি ও বালা;[৩৬] খৃস্টীয় যুগ শুরু হওয়ার কিছু আগে ভারতীয় কারিগররা ফুঁ দিয়ে কাচ তৈরির রীতি গ্রহণ করায় এই শিল্পে এক আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটে।[৩৭] ভারতীয়রা নিঃসন্দেহে কাঁচ সংক্রান্ত প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।[৩৮] মনে হয় পশ্চিমী দেশ ও চীন থেকে কাঁচের পিণ্ড আমদানি করা হতো। সে যাই হোক, সারা ভারতে প্রাপ্ত পুঁতির নমুনা থেকে তাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় খৃস্টীয় যুগের গোড়ার কয়েক শতকে।[৩৯] মৌর্যোত্তর যুগ থেকে ২০০ খৃস্টাব্দ অবধি এম. জি. দীক্ষিত ভারতে কাঁচের প্রাচুর্যের সময় বলে বিবেচনা করেন।[৪০] যথেষ্ট সংখ্যক কাঁচ-প্রস্তুতকারীর দক্ষতা ছাড়া তা সম্ভব হতো না।

৩২. মার্শাল, 'টক্সিলা', ২য়, পৃ ৫৩৩।
৩৩. ঐ, পৃ ৫৩৪। ৩৪. আঢ্য, 'আর্লি ইণ্ডিয়ান ইকনমিকস', পৃ ৫৮-৫৯।
৩৫. ঐ, পৃ ৫৬-৫৭। ৩৬. ঐ, পৃ ৭৬-৮০। ৩৭. ঐ, পৃ ৮০।
৩৮. বি. বি. লাল, "এক্সামিনেশন অফ সাম এনশেণ্ট ইণ্ডিয়ান গ্লাস স্পেসিমেন্স", 'এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', ৮, পৃ ২৬-২৭।
৩৯. এম. জে. দীক্ষিত, 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান গ্লাস', পৃ ৫৭। ৪০. ঐ, ২য় অধ্যায়।

ভারতে উৎপন্ন ও তাঁর শৈলীযুক্ত চমৎকার হাতির দাঁতের জিনিস ( আফগানিস্তানের বেগরাম-এ প্রাপ্ত )[৪১] থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, এখানে হাতির দাঁতের কাজের কারুশিল্পী বা 'দন্তকার' ছিলেন। দেশের ভেতরেও বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি জিনিস পাওয়া গেছে। বারাণসী ছিল হাতির দাঁত খোদাই করার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কাঁচের মতো হাতির দাঁতের কাজে অগ্রগতির জন্য এই পর্ব উল্লেখযোগ্য। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের পরের কয়েক শতকে এই দুই কারুশিল্পেরই অবনতি ঘটে।

এছাড়াও সিরকাপ থেকে যেসব অলংকার পুনরুদ্ধার হয়েছে তার থেকে মণিকারদের কথা জানা যায়। যদিও মৌর্যোত্তর যুগের সোনা ও রুপোর অলংকার খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়নি,[৪২] তাহলেও সিরকাপ-এর বিভিন্ন অলংকারে যে দশ রকমের মণিমুক্তো ও অনতিমূল্যবান্ পাথর ব্যবহার হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই দশ রকম হলো—তামড়ি, অকীক, পীলু, রকস্ফটিক, পান্না, লাপিস লাজুলি, নীলকান্ত, ফিরোজা, আকুয়ামারিন ও জ্যাসপার।[৪৩] এ-যুগেই সর্বপ্রথম প্রচুর সংখ্যায় স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। তাই স্পষ্টই বোঝা যায় স্বর্ণকারদের কাজ পরিপূরণ করেছিলেন নানা ধরনের মণিকার ও রত্নকার।

বিভিন্ন ধরনের রোমান মৃৎভাণ্ডের ব্যবহার ও তার অনুকরণের জন্য এই যুগ উল্লেখযোগ্য। আরিকামেদুতে পাওয়া গেছে প্রচুর পরিমাণে মৃৎপাত্র, এই উপদ্বীপের সর্বত্রই তা ছড়িয়ে আছে। সাতবাহনদের ও কুষাণদের 'লাল' পালিশ-করা মৃৎভাণ্ড ছাড়াও, পুরনো ধরনের মৃৎভাণ্ডের অবশেষ এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত মৃৎপাত্রের উদ্ভবের পরিচয় পাওয়া যায়। মৃৎপাত্রকে রপ্তানি করার বস্তুরূপে গণ্য করা হতো না। তাহলেও ক্রমবর্ধমান নগরবাসীদের খাদ্য ও সঞ্চয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য অসংখ্য মৃৎশিল্পী শ্রেণীর অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। লাল মৃৎভাণ্ডের একটা বড় অংশে সুন্দর কারুকার্য করা হতো। স্পষ্টতই তার উদ্দেশ্য ছিল ধনী নগরবাসীদের পরিশীলিত রুচিকে পরিতুষ্ট করা। পোড়ামাটির কাজের এক অভূতপূর্ব বাজার সৃষ্টি করেছিল নাগরিকতা। সংখ্যার দিক দিয়ে তা কুষাণ-সাতবাহন পর্বে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়।[৪৪] মেঝে ও ছাদের জন্য টালি এই যুগে দেখা যায়; গোলাকৃতি কূপের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এসবের জন্য স্বাভাবিকভাবেই ক্রমে আরও বেশি সংখ্যায় মৃৎশিল্পীর প্রয়োজন পড়েছিল।

৪১. এখন এগুলো কাবুল সংগ্রহশালায় রাখা আছে।

৪২. আগ্য, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৬-৬৭।

৪৩. ঐ।

৪৪. ডি. দেসাই, "টেরাকোটা অ্যান্ড আর্বান কালচার অফ এনশেন্ট ইন্ডিয়া ( সি. ৬০০ বি. সি. - এ. ডি. ৬০০ )"। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস-এর ৩৭তম অধিবেশন, কালিকট, ১৯৭৬-এ 'শিল্প ও সমাজ' আলোচনাসভায় প্রদত্ত গবেষণাপত্রের সাইক্লোস্টাইল্ড্ প্রতিলিপি।

শেষত, সারা দেশ জুড়ে পোড়া ইঁটের কাঠামোর থেকে গৃহনির্মাণ কর্মের যে-নিদর্শন পাওয়া যায়, সেটি গৃহ-নির্মাতা, স্থপতি ও ভাস্করসহ এক বিশাল সংখ্যক ইষ্টকশিল্পীর সাক্ষ্য বহন করে। এই সময় ছিল নগর-বিকাশের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী যুগ। ফলে হয়তো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হস্তশিল্পী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, যদিও লিখিত রচনায় সক্রিয় গোষ্ঠীরূপে বা প্রত্নলেখে দাতারূপে তাঁদের কয়েকটি নাম মেলে না। সে যাই হোক, বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন নগর ও শিল্প-সংক্রান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে বেশ ভালো সংখ্যায় মৃৎশিল্পী, গৃহনির্মাতা, ইষ্টকশিল্পী, মণিকার, রত্নকার, স্বর্ণকার, লোহকার, পেতল ও ব্রোঞ্জের কাজে নিযুক্ত কর্মী, ভাস্কর এবং পোড়ামাটির শিল্পী, কাঁচ-শিল্পী ও হাতির দাঁতের কারুশিল্পীদের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়।

হস্তশিল্পীদের সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য থেকে পরোক্ষভাবে যা জানা যায়, প্রত্নলেখ ও লিখিত প্রমাণপত্র থেকে তারই সমর্থন ও পরিপূরণ হয়। শূদ্ররা কারু-বৃত্তি গ্রহণ করবে তখনই যখন তারা উচ্চবর্ণকে প্রত্যক্ষভাবে সেবা করে জীবনধারণ করতে অক্ষম[৪৫]—মনুর এই মত পরম্পরাগত, কারণ হস্তশিল্পীদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি এবং তাঁদের অবস্থার কিছু উন্নতির আভাস পাওয়া যায় মৌর্যোত্তর যুগের প্রত্নলেখ থেকে। দান হিসেবে চিহ্নিত প্রচুর সংখ্যক গুহা, স্তম্ভ, ফলক, জলাধার ইত্যাদি পাওয়া যায় গয়া, সাঁচি, ভরহুত ও নাসিক অঞ্চলে।[৪৬] ধাতুকার, সুগন্ধি-প্রস্তুতকারী, বস্ত্রশিল্পী, স্বর্ণকার এমনকি চর্মকাররাও এগুলো দান করেছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। এছাড়াও ধাতু ও হাতির দাঁতের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক, মণিকার, ভাস্কর ও মৎস্যজীবীদের প্রত্নলেখে দেখা যায় দাতারূপে।[৪৭] সুগন্ধি-প্রস্তুতকারী ও কম পরিমাণে ধাতু-শিল্পীদের বারবার উল্লেখ করা হয়েছে উদারহস্ত উপাসক হিসেবে। তাই মনে হয় তাঁরা সচ্ছল এবং হয়তো বহু সংখ্যক শাখা হয়ে উঠেছিলেন। সুগন্ধি-প্রস্তুতকারীদের মতো তন্তুবায়দের দাতারূপে অত বেশি দেখা না গেলেও মনুর সাক্ষ্য থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তাঁরা ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর হস্তশিল্পী, কারণ বিধান দেওয়া হয়েছে তাদের ১১ 'পল' দেওয়া উচিত, ব্যর্থ হলে ১২ 'পল'।[৪৮] মনে হয় এগুলো তন্তুবায়দের উৎপন্নের উপর ধার্য, উপকরণের মাধ্যমে প্রদেয় কর। মথুরা[৪৯] ও অন্যান্য নগরে গড়ে-ওঠা সুতিবস্ত্রের ব্যবসা ছিল

৪৫. মনু ১০।৯৯ ও ১০০।

৪৬. লুডর্স-এর তালিকা, নং ৫৩, ৫৪, ৬৮, ৭৬, ৯৫, ৩৩১, ৩৪৫, ৩৮১, ৪৯৫, ৮৫৭, ৯৮৬, ১০০৬, ১০৩২, ১০৫১, ১০৬১, ১১৭৭, ১২০৩-০৪, ১২১০, ১২৩০, ১২৭৩, ১২৯৮; তুলনীয়: 'ইণ্ডিয়ান কালচার', ১২, পৃ ৮৩-৮৫।

৪৭. ঐ, নং ৩২, ৫৩-৫৪, ৩৪৫, ৮৫৭, ১০০৫, ১০৯২, ১১২৯।

৪৮. 'ধর্মকোশ', ১ম খণ্ড, ভাগ ৩, পৃ ১৯২৭-এ 'ব্যাখ্যাসংগ্রহ', স্তেয়প্রকরণ, পৃ ১৭২৭-২৮ থেকে উদ্ধৃত।

৪৯. মহাভাষ্য, ৯।৯৯।

সম্ভবত তাঁদের সমৃদ্ধির কারণ। প্রত্নলেখ থেকে জানা যায়, হস্তশিল্পীদের অধিকাংশই সীমাবদ্ধ ছিলেন মথুরা অঞ্চল ও পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে। সেখানে রোমের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য তাঁদের মধ্যে সমৃদ্ধি সঞ্চার করেছিল।

প্রত্নলেখের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, হস্তশিল্পীরা সংগঠিত ছিলেন তাঁদের প্রধানের অধীনে, যিনি সম্ভবত রাজার আনুকূল্য লাভ করতেন। ফলে আনন্দের দানের কথা জানা যায়, যিনি ছিলেন শ্রীসাতকর্ণীর হস্তশিল্পীদের মুখ্যব্যক্তি।[৫০] কিন্তু লিখিত সাক্ষ্য থেকে আভাস পাওয়া যায়, এই যুগে হস্তশিল্পীদের বৃত্তিগোষ্ঠী পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় বেড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব প্রধানের অধীনে কাজ করছেন— 'মহাবস্তু'র এক জায়গায় এরকম এগারো ধরনের হস্তশিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন: মালাকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, রজক, রঞ্জক, পাত্রকার, স্বর্ণকার, রত্নকার, শঙ্খকার, শস্ত্রকার, ও পাচক।[৫১] ঐ একই সূত্রে রাজগহ-র আঠেরোটি বৃত্তিগোষ্ঠীর ('অষ্টাদশ শ্রেণি') উল্লেখ আছে। তার মধ্যে পড়েন স্বর্ণকার, সুগন্ধি-নির্মাতা, মণিকার, তৈলকার, ময়দা-প্রস্তুতকারী ইত্যাদি। এই তালিকায় ফল, মূল, ময়দা ও চিনি-বিক্রেতার কথাও আছে।[৫২] স্বর্ণকার ও মণিকার দুটি তালিকাতেই আছেন, তা হলেও মনে হয় এই সময়ে হস্তশিল্পীদের প্রায় চব্বিশটি 'শ্রেণি' ছিল।[৫৩] এও লক্ষণীয় যে 'শ্রেণি'র দ্বিতীয় তালিকাটি 'জাতক'-এ উল্লিখিত তালিকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।[৫৪] রাজা হস্তশিল্পীদের নিয়োগ[৫৫] করলেও 'শ্রেণি'র সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে তাঁদের উপর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বোধহয় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো: এ-যুগে এত রকমের হস্তশিল্পী দেখা যায় যা এমনকি 'অর্থ-শাস্ত্রে'ও পাওয়া যায় না। 'মহাবস্তু'তে রাজগহবাসী ছত্রিশ রকম শ্রমিকের একটি তালিকা আছে।[৫৬] মনে হয় এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ, কারণ এর শেষে বলা হয়েছে, যাঁদের উল্লেখ করা হলো তাঁরা ছাড়াও অন্যেরা আছেন।[৫৭] 'মিলিন্দপঞ্‌হো'-য় দীর্ঘতর একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেখামে কম করেও পঁচাত্তরটি বৃত্তির বর্ণনা আছে, তার বেশির ভাগই হস্তশিল্পীদের।[৫৮] বৌদ্ধ তালিকার অনেককে একটি জৈন রচনাতেও পাওয়া যায়। সেখানে আঠেরো রকম হস্তশিল্পীর বর্ণনা আছে। এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো: বস্ত্রকার, তন্তুবায় ও রেশমশিল্পীকে কারুকর্মের দিক দিয়ে আর্য বলে বর্ণনা

৫০. লুডর্স-এর তালিকা, নং ৩৪৬।

৫১. ২য়, পৃ ৪৬৩-৭৮।

৫২. ঐ, ৩য়, পৃ ৪৪২ ইঃ।

৫৩. মহাবস্তু, ২য়, পৃ ৪৬৩-৭৮ ও ৩য়, পৃ ৪৪২ ইঃ-র ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এই হস্তশিল্পীদের অনেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও ছিলেন।

৫৪. 'ইণ্ডিয়ান কালচার', ১৪, পৃ ৩১-৩২।

৫৫. পাণিনি ২।১।১ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৫৬. ৩য়, পৃ ৪৪২-৪৩।

৫৭. ঐ।

৫৮. মিলিন্দপঞ্‌হো, পৃ ৩৩১।

করা হয়েছে।[৫৯] এর থেকে দেখা যায়, জৈনরা এসব কাজকে অশ্রদ্ধা করতেন না। লক্ষণীয় যে মধ্যযুগের গোড়ার দিকে তন্তুবায়দের অস্পৃশ্য বলে ধরা হয়।

এইসব হস্তশিল্পীর তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ-যুগে বেশ কিছু নতুন কারুশিল্পের উদ্ভব হয়েছিল। 'দীঘনিকায়'-এ যেখানে চব্বিশটি বৃত্তির কথা আছে,[৬০] 'মিলিন্দপঞ্‌হো' থেকে সেখানে প্রায় ষাটটির কথা জানা যায়। এর মধ্যে আটটি হস্তশিল্প ধাতুর কাজের সঙ্গে জড়িত।[৬১] এর থেকে এ-বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি দেখা যায়। বস্ত্র ও রেশম বয়ন[৬২] এবং অস্ত্রশস্ত্র ও বিলাস-দ্রব্য তৈরির[৬৩] সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বৃত্তিরও মনে হয় উন্নতি হয়েছিল। এ-সবের থেকে দেখা যায় এই সময়ের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে হস্তশিল্পীদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তার অধিকাংশই, মনে হয়, লেগেছিল উচ্চতর শ্রেণীর উপকারে।

দাস ও কর্মকর যেভাবে তাঁদের প্রভুদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই হস্তশিল্পী-দের সঙ্গে তাঁদের ভোক্তাদের সে-রকম সম্পর্ক ছিল না। পতঞ্জলি থেকে তাই জানা যায়, তন্তুবায় ছিলেন স্বাধীন কর্মী।[৬৪] দাস ও কর্মকর যখন খাদ্য-বস্ত্র পাওয়ার আশায় কাজ করতেন তখন হস্তশিল্পীরা তা করতেন বেতন পাওয়ার আশায়।[৬৫]

মনু বেশ কয়েকটি বিধি প্রণয়ন করেন যা শূদ্রদের আর্থিক অবস্থাকে ব্যাহত করে। তাই তিনি বর্ণ অনুসারে সুদের বিভিন্ন হার প্রচলন করেন।[৬৬] বর্ণক্রম অনুযায়ী মাসিক সুদের হার হবে দুই, তিন, চার অথবা পাঁচ শতাংশ।[৬৭] কিন্তু এই বিধি সম্ভবত বাস্তবে কার্যকর ছিল না। একটি নাসিক প্রত্নলেখ অনুযায়ী তন্তুবায় 'শ্রেণি'তে টাকা গচ্ছিত করলে তাঁরা মাসিক ১ থেকে ¾ শতাংশ হারে সুদ দিতেন।[৬৮] তাঁদের যে শূদ্র বলে সবচেয়ে

৫৯. পন্নবণা, ১,৬১। ৬০. দীঘ নিকায়, ২য়, পৃ ৫০।

৬১. সুবন্ন-, সজ্‌ঝ-, সীস-, তিপু-, লোহ-, বট্ট-, অয়-. মণি-কার। মিলিন্দিপঞ্‌হো, পৃ ৩৩১। ৬২. পন্নবণা, ১,৬১। ৬৩. মিলিন্দপঞ্‌হো, পৃ ৩৩১।

৬৪. পাণিনি ১৪।৫৪ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৬৫. তথা যদেতদ্‌দাসকর্মকরং নামেতেঽপি স্বভূত্যর্থমেব প্রবর্তন্তে ভক্তং চেলং চ লপ্স্যামহে। পাণিনি ৩।১।২৬ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৬৬. বশিষ্ঠ ধ. সূ. ২।৪৮-এও অনুরূপ নিয়ম পাওয়া যায়। মনে হয় এটি প্রক্ষিপ্ত. কারণ অন্য তিনটি ধর্মসূত্রে এটি পাওয়া যায় না।

৬৭. মনু ৮।১৪২। কৃষ্ণ পণ্ডিত এবং মনু, বিষ্ণু ধ.সূ. (৬।২) ও অন্যান্য স্মৃতির অনুরূপ অংশের টীকাকারদের মতে, এই নিয়ম শুধু সেই ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কিছু বন্ধক দেওয়া নেই। সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট, ১৪, পৃ ১৫।

৬৮. ল্যুডর্স-এর তালিকা, নং ১১৩৩।

বেশি হারে সুদ দিতে হতো তেমন কিছু দেখা যায় না। বর্ণব্যবস্থার একজন আধুনিক সমর্থক সুদের এই বিভিন্ন হারকে ন্যায়সংগত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এই ভিত্তিতে যে সুদের হার ঋণগ্রহীতার সামাজিক পরিষেবার সংগে সমানুপাতিক।[৬৯] এর অর্থ, শূদ্রদের প্রদত্ত পরিষেবা নেহাতই নগণ্য। অথচ বাস্তবে বৈশ্যদের সংগে মিলিতভাবে তাঁরা উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে গোটা সমাজ-কাঠামোটিই ধরে রাখতেন। সুদ বিষয়ে মনুর নীতি বাস্তবে কার্যকর না হয়ে থাকলেও সুদ আদায় করার সময়ে সম্ভবত ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কিছু বিবেচনা দেখানো হতো, আর ঋণ শোধ করার জন্য শূদ্রদের বাধ্য করা হতো খেটে মরতে। যাই হোক না কেন, সাম্প্রতিককাল অবধি এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রচলিত ছিল।

মনু বিধান দিয়েছেন, শূদ্রকে ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে দেওয়া উচিত নয় কারণ সে ব্রাহ্মণদের বাধাগ্রস্ত করবে।[৭০] প্রস্তাব করা হয়েছে, এই নিষেধ শূদ্রের উদ্দেশেই একটি অতিরঞ্জিত বিবৃতি ('অর্থবাদ'),[৭১] কিন্তু মূল শ্লোকটি থেকে এই ধরনের ব্যাখ্যানের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। ইংরিজি প্রার্থনা-পুস্তকে ভৎসনা করে দরিদ্রকে "তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া"র যে-বিধান দেওয়া হয়েছে, তার সংগেও এই নিষেধটির তুলনা করা যায়।[৭২] যেহেতু আলোচ্য অংশটি আপৎকাল-অধ্যায়ে পাওয়া যায়, এটি তাই বৌদ্ধ ভিক্ষু বা বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে উদ্দিষ্ট হতে পারে; শূদ্রের চেয়ে তাঁদের ভালো চোখে দেখা হতো না। সে যাই হোক, উত্তরাধিকার-বিধি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে শূদ্রেরা সম্পত্তির অধিকারী হতেন। বৈশ্য ও শূদ্র ধনবলে বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করবে[৭৩]—এই প্রাচীন নীতি (মনু যার পুনরাবৃত্তি করেছেন) থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা যায়।[৭৪]

মনুর কথা অনুযায়ী, যে-ব্যক্তির কাছে টাকা গচ্ছিত রাখা হবে তাঁর অন্যতম গুণ হওয়া উচিত এই যে তিনি আর্য হবেন।[৭৫] এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই শূদ্রেরা বাদ পড়েন। কিন্তু খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে সাতবাহন অঞ্চলে মৃৎশিল্পী, তৈলকার[৭৬] ও এমনকি তন্তুবায়দের[৭৭] কাছে টাকা গচ্ছিত রাখা হতো। এই প্রথা প্রচলিত ছিল বৌদ্ধধর্মের গৃহী ভক্তদের মধ্যে। ভিক্ষুদের পরিধেয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগানের উদ্দেশ্যে তাঁরা এইরকম গচ্ছিত রাখতেন। কিন্তু সনাতনীরাও এই প্রথা অনুসরণ

৬৯. কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'আসপেক্‌ট্‌স্‌ অফ দ পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল সিস্টেম অফ মনু', পৃ ১৪৮। ৭০. মনু ১০।১২৯।

৭১. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'ধর্মশাস্ত্র', পৃ ১২০।

৭২. কেতকর, 'হিস্ট্রি অফ কাস্ট', পৃ ৯৮। ৭৩. মনু ৯।১৫৭।

৭৪. ঐ, ১১।৩৪। ৭৫. ঐ, ৮।১৭৯।

৭৬. লুডর্স-এর তালিকা, নং ১১৩৭। ৭৭. ঐ, নং ১১৩৩।

করতেন, কারণ একটি প্রমাণপত্র থেকে দেখা যায় যে, হুবিষ্ক-র শাসনকালে (আনু. ১০৬-১৩৮ খৃস্টাব্দ) মথুরায় ময়দা-প্রস্তুতকারীদের 'শ্রেণি'তে একজন প্রধান কিছু টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন যার মাসিক সুদ দৈনিক একশ ব্রাহ্মণের সেবায় লাগানোর কথা।[৭৮] এইসব প্রথা থেকে 'শ্রেণি'তে সংগঠিত হস্তশিল্পীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁদের কাছে গচ্ছিত টাকা দিয়ে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কিনতে পারতেন এবং তাঁদের (তৈরি) পণ্য বিক্রি করে সুদের টাকা দিতেন।

মনু বিধান দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ নির্দ্বিধায় তাঁর শূদ্র দাসের জিনিসপত্র আত্মসাৎ করতে পারেন, কারণ শূদ্র ধনের অধিকারী হতে পারে না।[৭৯] জায়সবাল মনে করেন, যে-বৌদ্ধ সংঘ প্রচণ্ড ধনী হয়ে পড়েছে এই নিয়মটি সম্ভবত তার সম্পত্তি আত্মসাৎকে বিধিসম্মত করে দেয়।[৮০] কিন্তু নিয়মটি বোধহয় যে-শূদ্রেরা দাস হিসেবে কাজ করতেন একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মনুর মতে, অনাহারের সময়েও কোন ক্ষত্রিয় কখনোই কোন ধার্মিক ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করতে পারে না, কিন্তু কোন দস্যুর বা যে তার পবিত্র কর্তব্যে অবহেলা করেছে এমন ব্যক্তির ধন অপহরণ করতে পারেন।[৮১] এর থেকে মনে হয়, যেসব ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তাঁদের অবশ্যপালনীয় আচার অনুষ্ঠানে অবহেলা করতেন তাঁদের সম্পত্তি এইভাবে কেড়ে নেওয়া হতো। সে-ক্ষেত্রে শূদ্রদের নিরাপদ বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ মনুর ব্যবস্থা অনুযায়ী, যেহেতু যজ্ঞের সঙ্গে শূদ্রের কোন সম্পর্ক নেই, দ্বিজ জাতির যজমান তাই যজ্ঞের প্রয়োজনে শূদ্রের কাছ থেকে দুটি বা তিনটি দ্রব্য নিয়ে নিতে পারেন।[৮২] এসব নিয়মে মনুর পক্ষ থেকে শূদ্রদের অর্থনৈতিকভাবে দাবিয়ে রাখার এক নির্দিষ্ট প্রচেষ্টা দেখা যায়।

মৌর্যোত্তর যুগে শ্রমিকদের বেতন ও নিম্নতর বর্ণের মানুষদের জীবনযাত্রার সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়। এক অর্থে মনু কৌটিল্যের নীতিই অনুসরণ করেছেন। তাঁর কথায়, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত কোন গো-পালক, প্রভুর অনুমতিক্রমে, দশটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো গরুটি দোহন করতে পারে।[৮৩] এ-ক্ষেত্রে ভাড়া-করা শ্রমিকের প্রতি মনু কৌটিল্যের চেয়ে বেশি উদার বলে মনে হয়,[৮৪] কারণ তিনি সবচেয়ে ভালো গরু দোহন করার অনুমতি দিয়েছেন। অধীনস্থ গবাদি পশুর প্রতি গো-পালকের দায়িত্বের উপরে মনুও গুরুত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁদের

৭৮. এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ২১, প্রত্নলেখ নং ১০। 'সমিতকরশ্রেণী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (ঐ, পঙ্‌ক্তি ১২)।

৭৯. মনু ৮।৪১৭।

৮০. 'মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ১৭১।

৮১. মনু ১১।১৮।

৮২. ঐ, ১১।১৩।

৮৩. ঐ, ৮।২৩১।

৮৪. কৌটিল্য গো-পালকের জন্য শুধু দুধের ১/১০ ভাগ নির্দিষ্ট করেছেন, কিন্তু এমন বলেননি যে তিনি সেরা গরুর দুধ দুইবেন।

কাজের বিবরণ দিয়েছেন তিনি।[৮৫] কিন্তু গবাদি পশুর ক্ষতি হলে আপস্তম্ব বা কৌটিল্যের মতো গো-পালকের যথাক্রমে বেত্রাঘাত বা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেননি। এ-বিষয়ে তিনি একটি নতুন ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাঁর কথা অনুযায়ী গ্রামের চারধারে ৪০০ হাত চওড়া এবং নগর হলে তার তিনগুণ পরিমাপের অঞ্চল চারণভূমি-রূপে আলাদা করে রাখা হবে। এই অঞ্চলের মধ্যে কোন ব্যক্তির বেড়া-না-দেওয়া জমিতে যদি গবাদি পশু গিয়ে শস্য নষ্ট করে তাহলে পশুপালককে তার জন্য দায়ী করা যাবে না।[৮৬] অতএব, এই ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা পশুপালকদের স্বার্থ কিছু পরিমাণে রক্ষা করেছেন।

শূদ্রের কাজ ব্রাহ্মণের সেবা করা—এ-কথা বলার সময়ে মনু বিধান দিয়েছেন, শূদ্রের ভরণপোষণের পরিমাণ স্থির করার ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ্য, কাজ ও কতজনকে প্রতিপালন করতে হয় তা দেখা উচিত।[৮৭] উচ্ছিষ্ট, পুরনো কাপড় ও শয্যা ভৃত্যদের দেওয়া উচিত—গৌতমের এই নির্দেশ পুনরাবৃত্ত করে তিনি যোগ করেছেন, তাদের দেওয়া উচিত শস্যের অবশেষও।[৮৮] যেসব শূদ্র গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করতেন এই নিয়মটি অবশ্যই তাঁদের বেতন নির্দেশ করে। মনু আরও বলেছেন, যারা রাজার কাজে নিযুক্ত—পরিচারক-পরিচারিকা—তাদের বেতন দেশ-কাল বিবেচনা অনুযায়ী স্থির করা উচিত।[৮৯] এই উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট শ্রমিকদের দৈনিক বেতন এক থেকে ছয় 'পণে'র মধ্যে থাকবে।[৯০] এ ছাড়াও তাদের অবস্থান অনুযায়ী তারা বিভিন্ন জিনিস, যেমন খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি পাবে।[৯১] অন্য প্রসঙ্গে 'উৎকৃষ্ট' ও 'অপকৃষ্ট' শব্দদুটি যেমন উচ্চ ও নীচ বর্ণের নির্দেশক বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখানেও তা-ই বোঝায় কিনা সে-কথা স্পষ্ট নয়।[৯২] কিন্তু পতঞ্জলি থেকে জানা যায়, একদিকে যেমন কর্মকর ও ভৃতকদের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য ছিল, অন্যদিকে তেমনই ছিল পুরোহিতদের সঙ্গে। ফলে যখন পুরোহিতরা বেতন হিসেবে গরু পেতেন তখন কর্মকরদের দৈনিক আয় ছিল মাত্র ¼ 'নিষ্ক',[৯৩] অর্থাৎ মাসে ৭½ 'নিষ্ক'। প্রস্তাব করা হয়েছে, 'নিষ্ক' ও 'কার্ষাপণ' সমমূল্য।[৯৪] কিন্তু এই মত গ্রাহ্য হলে কর্মচারীদের দৈনিক বেতন দাঁড়ায় ¼ পণ আর তার সমসাময়িক মনুর সাক্ষ্য থেকে আভাস পাওয়া যায় শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন হতো এক 'পণ', সর্বাধিক ছ 'পণ'। 'অর্থশাস্ত্রে' কর্মচারীর দৈনিক বেতন ⅗ থেকে ২⅖ 'পণে'র মধ্যে উঠানামা করে, অর্থাৎ এক থেকে চারগুণ।[৯৫] কিন্তু এসব সূত্র থেকে 'পণে'র আপেক্ষিক ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপ করার কোন উপায় নেই।

৮৫. ৮।২২৯-৪৪। ৮৬. ৮।২৩৭-৩৮। ৮৭. ১০।১২৪। ৮৮. ১০।১২৫।
৮৯. ৭।১২৫। ৯০. ৭।১২৬। ৯১. ঐ। ৯২. পৃ ১৯৩ দ্র.।
৯৩. পাণিনি ১।৩।৭২ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।
৯৪. বাসুদেব শরণ আগরওয়ালা, 'ইণ্ডিয়া অ্যাজ নোন টু পাণিনি', পৃ ২৩৬-৩৭।
৯৫. পৃ ১৫৬ দ্র.।

শ্রমিকদের কাজের শর্ত নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মনুর বিভিন্ন ব্যবস্থা কৌটিল্যের মতো অত বিশদ নয়। কিন্তু যে কর্মী কাজে অবহেলা করে তার প্রতি তিনি কৌটিল্যের মতোই কঠোর। যে ভাড়া-করা কর্মী [ অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট কাজ করে দেয় ] অসুস্থ না হয়েও দর্পবশত চুক্তি অনুযায়ী কাজ করে না তার আট 'কৃষ্ণাল' অর্থদণ্ড হবে এবং তাকে কোন বেতন দেওয়া হবে না।[৯৬] তাহলেও অসুস্থতার কারণে যে-কর্মচারী কাজ করতে পারেনি কিন্তু সুস্থ হওয়ার পর তা শেষ করেছে তাকে দীর্ঘ অনুপস্থিতিকালীন বেতন দেওয়া হবে।[৯৭] অন্যদিকে সে যদি সুস্থ হয়েও কাজ শেষ না করে তাহলে যে-সময় পর্যন্ত কাজ করেছে তার বেতনও দেওয়া হবে না।[৯৮] এর থেকে আভাস পাওয়া যায়, অসুস্থতাবশত কাজ করতে না পারলে কর্মচারীদের কোন শাস্তি দেওয়া হতো না, যদি তাঁরা সুস্থ হওয়ার পর কাজ করতে সম্মত হতেন বা অন্যদের দিয়ে করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। 'অর্থশাস্ত্রে'র মতো নিয়োগ-কর্তার পক্ষ থেকে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থার সঙ্গে ঐ ধরনের আর কোন ব্যবস্থা মনু করেননি। তাঁর ব্যবহৃত একটি উপমা থেকে মনে হয় ভৃত্যকে তাঁর বেতন পাওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হতো।[৯৯]

মনে হয় নগরে বেতনভুক্‌দের জন্য আলাদা আলাদা পথ ছিল। একটি বৌদ্ধ সূত্র থেকে ভৃতকবীথীর—সম্ভবত রাজগৃহে—কথা জানা যায় যেখানে ব্রাহ্মণ ও গৃহকর্তারা ( সম্ভবত বৈশ্য ) শ্রমিক ভাড়া কবার জন্য যেতেন।[১০০] অন্য একটি সূত্রে নগরে দরিদ্রদের পথ ( দরিদ্রবীথী ) ও ধনীর বিলাসবহুল গৃহের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।[১০১] সম্ভবত এই দরিদ্রবীথী আর ভৃতকবীথী ছিল একই ব্যাপার। বেতনের উপর নির্ভরশীল দরিদ্রেরা সেখানে বাস করতেন। তিনজন ভৃতকের সম্বন্ধে জানা যায়, যাঁরা এক ধনীর বাড়ির কাছে ময়লা পরিষ্কার করতেন এবং অদূরে খড়ের একটি ঝুপড়ি ছিল তাঁদের নিবাস।[১০২] পতঞ্জলি বারবার বলেছেন, বৃষল অর্থাৎ শূদ্রের বাড়ি একটা দেওয়ালে ( 'কুড্য' ) পর্যবসিত হয়েছে।[১০৩] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সম্ভবত ঝুপড়ির একটি মাটির বা ইঁটের দেওয়াল ছিল এবং অন্য তিনদিক ছিল খড় দিয়ে ঘেরা। এখানে 'কুড্য' শব্দটি[১০৪] কুঁড়েঘরেরও সূচক হতে পারে।

৯৬. মনু ৮।২১৫। ৯৭. ঐ, ৮।২১৬।
৯৮. ঐ, ৮।২১৭। ৯৯. ঐ, ৬।১৪৫। ১০০. দিব্যাবদান, পৃ ৩০৪।
১০১. সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ ৭৬।
১০২. ...কটপলিকুঞ্চিকায়াম্‌। ঐ, পৃ ৭৮। সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ইস্ট গ্রন্থমালা-র অনুবাদ ঠিক বলেই মনে হয়। এজার্টন-এর 'বুদ্ধিস্ট হাইব্রিড স্যান্‌স্ক্রিট ডিকশনারি'তে শব্দটি নেই।
১০৩. কুড্যীভূতং বৃষলকুলমিতি। পাণিনি ১।২।৪৭ ও ৬।৩।৬১ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।
১০৪. 'কুটী'-র পরিবর্তে 'কুডী' অপপাঠ ( মনিয়ের-উইলিয়ম্‌স্‌, সং-ইং অভিধান দ্র. )। 'কুড্য' শব্দটি 'কুডী'র রূপান্তর হতে পারে।

ক্ষতবিক্ষত শরীর, অবিন্যস্ত চুল ও নোংরা জামাকাপড় ছিল ভৃতকের বৈশিষ্ট্য,[১০৫] কারণ জনৈক সুসজ্জিত ব্যক্তি ভৃতকবীথীতে কোন কাজ পাননি, যদিও তিনি সেখানে সারাদিন অপেক্ষা করেছিলেন।[১০৬] গৃহভৃত্য রূপে নিযুক্ত শূদ্রদের খাদ্যবস্তু সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায় মনু থেকে। এ-বিষয়ে তিনি শুধু গৌতমের প্রাচীন ব্যবস্থাপত্রের পুনরাবৃত্তি করেছেন ও খানিকটা বিশদভাবে বলেছেন। একজন শূদ্রভৃত্যের শক্তি, দক্ষতা ও পোষ্যের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।[১০৭] তাকে দেওয়া উচিত উচ্ছিষ্ট খাদ্য, অসার ধান, জীর্ণ বস্ত্র ও পুরাতন শয্যা।[১০৮] 'মিলিন্দপঞ্হো'-য় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদের কোমলাঙ্গী স্ত্রীরা সুস্বাদু পিষ্টক ও মাংস খাচ্ছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে,[১০৯] কিন্তু এই প্রসঙ্গে শূদ্র-স্ত্রীদের কোন উল্লেখ নেই।

যদিও শূদ্রেরা প্রধানত ভূস্বামীদের অধীনে কৃষি-শ্রমিক রূপেই নিযুক্ত হতেন তাহলেও যাঁরা হস্তশিল্পীর কাজ করতেন তাঁরা, মনে হয়, পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে আরও স্বাধীনভাবে চলতে পারতেন। সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের বৃদ্ধি ছাড়া তাঁদের মধ্যে সমৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। শূদ্রদের উপর নতুন অর্থনৈতিক বাধানিষেধ আরোপ করে মনু যেসব নীতি প্রণয়ন করেছিলেন সম্ভবত তা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু শূদ্রদের বৃহত্তর অংশের জীবনধারণের অবস্থার পরিবর্তনের কোন আভাস পাওয়া যায় না।

মৌর্যোত্তর যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূদ্রদের অবস্থান সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় মনু থেকে। তিনি বিধান দিয়েছেন, শূদ্র শাসকের রাজ্যে কোন স্নাতকের বাস করা উচিত নয়।[১১০] বিষয়টি স্পষ্টতই ঐ যুগে শূদ্র রাজাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। কিন্তু তাঁরা, মনে হয়, চতুর্থ বর্ণ থেকে উঠে আসেননি, কারণ সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসে এ-ধরনের কোন রাজার কথা পাওয়া যায় না। এইসব রাজা বলতে সম্ভবত গ্রীক, শক, পার্থিয় ও কুষাণ শাসকদের কথা বোঝায় যাঁরা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ ও অবশ্যপালনীয় বৈদিক অনুষ্ঠান না করায় মনু এঁদের শূদ্রত্বে পতিত ক্ষত্রিয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১১১] কলি-যুগের পৌরাণিক বর্ণনায় শূদ্র রাজাদের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান[১১২] ও ব্রাহ্মণ

১০৫. স্ফটিতপরুষা রূক্ষকেশা মলিনবস্ত্রনিবসনাঃ। দিব্যাবদান, পৃ ৩০৪। 'পরুষা' শব্দটির অভ্রান্ততায় এজার্টন সংশয় প্রকাশ করেছেন। তার পরিবর্তে তিনি প্রস্তাব 'পরুষা' (?) (তাঁর অভিধানে 'স্ফটিত' দ্র.)। কিন্তু বর্তমান পাঠেই আরও ভালো অর্থ হয়।

১০৬. দিব্যাবদান, পৃ ৩০৪।

১০৭. মনু, ১০।১২৪।

১০৮. ঐ, ১০।১২৫। তুলনীয়: ৫।১৪০।

১০৯. মিলিন্দপঞ্হো, পৃ ৬৮।

১১০. ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ। মনু ৪।৬১।

১১১. বৃষলত্বং গতা লোকে...। মনু ১০।৪৩-৪৪।

১১২. মৎস্য পুরাণ, ১৪৪।৪৩ ক; ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ২, ৩১।৬৭ খ। বায়ু পুরাণ, ৫৮।

পুরোহিত নিয়োগের[১১৩] কথা বলা হয়েছে। কলিযুগের শাসক প্রসঙ্গে 'বিষ্ণু পুরাণে' বলা হয়েছে, বিভিন্ন দেশের লোকে তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন ও তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন।[১১৪] মনে হয়, একথা বিদেশাগত শাসকদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। তাঁরা ছিলেন অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলির অনুগামী,[১১৫] তার ফলে তাঁদের বিরুদ্ধে মনুর বৈরিতা আরও বেড়েছিল। এইসব রাজা—যাঁদের রাজত্বে স্নাতকদের বসবাস করতে মনু নিষেধ করেছেন—ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংস্পর্শ বন্ধ করার জন্যই এই নিয়ম করা হয়েছে। মনু আরও বিধান দিয়েছেন, ক্ষত্রিয় বংশজাত নয় এমন রাজার কাছ থেকে ব্রাহ্মণদের উপহার গ্রহণ করা অনুচিত।[১১৬] নিঃসন্দেহে এসব নিয়মের অর্থ হলো, ব্রাহ্মণরা যেন বিদেশী শাসকদের স্বীকৃতি না দেন। কিন্তু বিদেশী শাসকদের প্রতি এই প্রকাশ্য শত্রুতা ক্রমে সহনশীলতা ও শেষ পর্যন্ত তাঁদের ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বীকৃতির পথ করে দিয়েছিল, যদিও তা নিকৃষ্ট ধরনের। কিছু বৌদ্ধও এ-যুগে নিম্নবর্ণের শাসকদের পছন্দ করতেন না। 'মিলিন্দপঞ্‌হো'-য় বলা হয়েছে, নীচ বংশজাত ও বংশমর্যাদাহীন ব্যক্তি রাজা হওয়ার অনুপযুক্ত।[১১৭]

মনুর বিধানমতো রাজার উচিত সাত বা আটজন এমন মন্ত্রী নিয়োগ করা যাঁদের পূর্বপুরুষরা রাজকীয় পদের অধিকারী ছিলেন, যাঁরা অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী, সদ্‌বংশজাত ও অভিজ্ঞ।[১১৮] শূদ্রদের পক্ষে এইসব শর্ত পূরণ করা যে অপ্রত্যাশিত একথা সুস্পষ্ট। মনু এই বলে সাবধান করেছেন যে, যখন কোন রাজা নিষ্ক্রিয় থাকেন আর শূদ্র নীতি নির্ধারণ করে সেই রাজার রাজ্য জলাভূমিতে গরুর মতো ডুবে যাবে।[১১৯] এই ধরনের নিয়ম সম্ভবত আবার বর্বর শাসকদের রাজ্য প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। বিচার পরিচালনায় বা অন্যান্য প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদনে তাঁরা হয়তো কিছু শূদ্র নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মনু জোরের সঙ্গে বলেন, এমনকি একজন ব্রাহ্মণ, যিনি প্রধানত তাঁর বর্ণের জন্যই টিঁকে আছেন (অর্থাৎ নিজেকে শুধু ব্রাহ্মণ বলেন), তিনি বিধিবিধানের ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু একজন শূদ্রকে কখনোই বিচারক ('ধর্মপ্রবক্তা') রূপে নিয়োগ করা যায় না।[১২০] ভাষ্যকাররা যোগ করেছেন, প্রয়োজনের সময়ে ক্ষত্রিয়দের নিয়োগ করা যেতে পারে,[১২১] কিন্তু বৈশ্যের কথা তাঁরা বলেননি। এটি মনুর পরিকল্পনার উপযোগী।

৬৭ক-র 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে'র "চাশ্বমেধেন"-র পরিবর্তে ভুল করে "নাশ্বমেধেন" পাঠ আছে (হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃ ২০৬, টী ৫৯)।

১১৩. কূর্ম পুরাণ, ৩০শ অধ্যায়, পৃ ৩৩৪। ১১৪. বিষ্ণু পুরাণ. ৪।২৪।৯৯।

১১৫. রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাখণ্ডানাং প্রবর্ত্তকাঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ২, ৩১।৪১।

১১৬. মনু ৫।৮৪। ১১৭. মিলিন্দপঞ্‌হো, পৃ ৩৫৮।

১১৮. মনু ৭।৫৪। ১১৯. ঐ, ৭।২১। ১২০. ঐ, ৮।২০।

১২১. মনু ৮।২০ প্রসঙ্গে কুল্লুক, রাঘবানন্দ ও নন্দন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে সমৃদ্ধ হতে পারেন না বা তার বিপরীতও হয় না, কিন্তু তাঁরা দৃঢ়ভাবে একতাবদ্ধ হয়ে ইহলোক ও পরলোকে সমৃদ্ধ হতে পারেন।[১২২] ব্রাহ্মণ্য রাজ্যের সব প্রশাসনিক ও বিচার-বিভাগীয় পদ সম্ভবত প্রথম দুই বর্ণ নিজেদের একচ্ছত্র অধিকারে রেখেছিল।

প্রাচীন নীতি পুনরাবৃত্ত করে মনু বলেছেন, চার বর্ণ ও অস্পৃশ্যরা তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের আদান-প্রদানে সাক্ষী হতে পারেন।[১২৩] কিন্তু তিনি যোগ করেছেন, বাদীপক্ষ আহ্বান করলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররা গৃহী, পুত্রবান্ ও মৌল (সেই দেশবাসী) হলে সাক্ষ্য দেওয়ার উপযোগী।[১২৪] কুল্লূকের মতে এটি ঋণ ও ঐ ধরনের অন্যান্য অর্থ-সংক্রান্ত বিবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তার অর্থ : অন্য অপরাধ-ঘটিত বিবাদে শূদ্রদের নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হতো না।[১২৫] পূর্ববর্তী যুগের ব্যবস্থা ছিল : উচ্চ বর্ণের লোকে জড়িত এমন মামলায় শূদ্ররা সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। তার তুলনায় অবশ্য মনুর ব্যবস্থা থেকে সুনিশ্চিত অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। মানহানি, বলপ্রয়োগ, ব্যভিচার ও চুরির ক্ষেত্রে, অর্থসংক্রান্ত বিবাদের বিভিন্ন শর্ত বিবেচনা না-করে যে-কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীরূপে আহ্বান করা যায়।[১২৬] উপযুক্ত সাক্ষী না পাওয়া গেলে মনু এমনকি দাস ও ভৃত্যদের সাক্ষী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[১২৭] গ্রামের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদে তিনি কোন বর্ণ-ভেদ করেননি ; গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।[১২৮] মনু যাঁদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত (নিঃসন্দেহে অর্থ-সংক্রান্ত বিবাদে) হওয়ার অনুমতি দেননি তাঁদের মধ্যে আছেন কারুশিল্পী, অভিনেতা ও নর্তক।[১২৯] এর সপক্ষে কুল্লূকের যুক্তি হলো : এরা সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকে ও উৎকোচ দিয়ে এদের বশীভূত করা যায়।[১৩০] গর্ভদাস-দেরও সাক্ষী হতে অনুমতি দেওয়া হয়নি।[১৩১]

সাক্ষ্য দেওয়ার আগে বিভিন্ন বর্ণের সাক্ষীদের সাবধান করার প্রাচীন নীতিও মনু পুনরাবৃত্ত করেছেন।[১৩২] কোন শূদ্র মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তাঁর সবরকম পাপ হয়েছে বলে ধরা হবে[১৩৩] ও সবচেয়ে ভয়াবহ আত্মিক দুর্গতির ভয় দেখানো হবে।[১৩৪] কিন্তু এইসঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, বিচারক ব্রাহ্মণকে শপথ করাবেন তাঁর সত্য দিয়ে, ক্ষত্রিয়কে তাঁর রথ বা বাহন দিয়ে, বৈশ্যকে

১২২. মনু ৯।৩২২।
১২৩. ঐ, ৮।৬৮। ১২৪, ঐ, ৮।৬২। ১২৫. মনু ৮।৬২ প্রসঙ্গে কুল্লূক।
১২৬. মনু ৮।৬২ ও ৬৯, কুল্লূক-ভাষ্য সমেত। ১২৭. ঐ, ৮।৭০।
১২৮. ঐ, ৮।২৫৪। ১২৯. ঐ, ৮।৬৫। ১৩০. ঐ, ৮।৬৫ প্রসঙ্গে কুল্লূক।
১৩১. ঐ, ৮ ৬৬, কুল্লূক-ভাষ্য সমেত। 'অধ্যধীন' শব্দটি 'গর্ভদাস' রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (ঐ)। ১৩২. ঐ, ৮।৮৮। ১৩৩. ঐ।
১৩৪. মনু ৮।৮৯-১০১-এ বিচারক যে একরাশ ভয় দেখান তা সম্ভবত শূদ্র সাক্ষীদের উদ্দেশে।

গবাদি পশু, শস্য ও সোনা দিয়ে এবং শূদ্রকে শপথ করানো হবে এই বলে যে সবরকম ভয়াবহ পাতকের অপরাধ তার উপর বর্তাবে।[১৩৫] অবশ্য এ-ও লক্ষণীয় যে, শূদ্র সাক্ষীর ক্ষেত্রে মনু কোন বিশেষ রাজশাস্তির বিধান দেননি। মিথ্যা সাক্ষ্যের বেলায় তিনি সাধারণ নীতিটি বলেছেন : রাজা তিন নিম্ন বর্ণকে অর্থদণ্ড ও নির্বাসন দেবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে শুধুই নির্বাসন।[১৩৬] একইভাবে মনুর কথা অনুযায়ী দৈহিক শাস্তি শুধু তিন নিম্ন বর্ণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে, ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে নয়।[১৩৭] সুতরাং এসব ক্ষেত্রে শূদ্রকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমপর্যায়ে রাখা হয়েছে।

মনু বিধান দিয়েছেন, বর্ণের ক্রম অনুসারে রাজা বিবাদীদের অভিযোগ গ্রহণ করবেন।[১৩৮] মীমাংসার সময়ে প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন প্রথাও বিবেচ্য।[১৩৯] সদাচারী ব্যক্তির কার্যকলাপকেও মনু ধর্মের মূলরূপে গণ্য করেছেন,[১৪০] এবং খৃস্টীয় ১৭ শতকের একজন ভাষ্যকারের মতে সদাচারী শূদ্রের আচরণও তার মধ্যে পড়ে।[১৪১]

পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রকারদের মতো মনুও বিচারের ক্ষেত্রে চালিত হয়েছেন উচ্চ-নিম্ন বর্ণ বিবেচনা দিয়ে, ফলে তা শূদ্রদের অবস্থার পরিপন্থী। ব্রাহ্মণের মানহানি করলে ক্ষত্রিয়ের শাস্তি হবে ১০০ 'পণ' অর্থদণ্ড, বৈশ্যের ১৫০ বা ২০০ 'পণ' কিন্তু শূদ্রকে ভোগ করতে হবে দৈহিক শাস্তি।[১৪২] কোন ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের মানহানি করেন তাহলে তাঁর অর্থদণ্ড হবে যথাক্রমে ৫০, ২৫ বা ১২ 'পণ'।[১৪৩] ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অপমান করলে তার জন্য ১২ 'পণ' অর্থদণ্ডের যে-ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 'গৌতম ধর্মসূত্রে' এ-জাতীয় ক্ষেত্রে কোন অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা নেই।[১৪৪]

শূদ্ররা উচ্চতর বর্ণের ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করলে মনু সাধারণত বেশ কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। ফলে কোন শূদ্র যদি দ্বিজকে কটুবাক্য বলে অপমান করে, তবে তার জিভ কেটে দেওয়া হবে।[১৪৫] 'দ্বিজ' শব্দটি শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে বোঝায়, কারণ শূদ্র কোন বৈশ্যকে গালাগালি করলে এই শাস্তি পরিস্কারভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[১৪৬] মনু আরও বিধান দিয়েছেন, কোন শূদ্র যদি দ্বিজের নাম ও জাতি অবজ্ঞা সহকারে উল্লেখ করে তাহলে দশ আঙুল পরিমাণ লম্বা একটি উত্তপ্ত লৌহশলাকা তার মুখে প্রবেশ করানো হবে।[১৪৭] উদ্ধতভাবে ব্রাহ্মণদের তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা

১৩৫. মনু ৮।১১৩। ১৩৬. ঐ, ৮।১২৩। ১৩৭. ঐ, ৮।১২৪-২৫।
১৩৮. ঐ, ৮।২৪। ১৩৯. ঐ, ৮।৪১। ১৪০. ঐ, ২।৬।
১৪১. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার-এর 'রাজধর্ম', পৃ ১৫৫-৫৬-য় উদ্ধৃত।
১৪২. মনু ৮।২৬৭। ১৪৩. ঐ, ৮।২৬৮। ১৪৪. ১২।১৩।
১৪৫. মনু ৮।২৭০। ১৪৬. ঐ, ৮।২৭৭।
১৪৭. ঐ, ৮।২৭১। 'দ্বিজাতি' শব্দটি কুল্লূক ব্যাখ্যা করেছেন 'ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য' বলে, কিন্তু এটি বোধহয় শুধু ব্রাহ্মণ-সূচক।

দিলে রাজা তার মুখে ও কানে গরম তেল ঢেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।[১৪৮] জায়সবাল প্রস্তাব করেছেন, ঐসব ব্যবস্থা 'ধর্ম'-প্রচারক শিক্ষিত শূদ্রদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে, অর্থাৎ বৌদ্ধ ও জৈন শূদ্রদের বিরুদ্ধে ও সেইসব শূদ্রের বিরুদ্ধে যাঁরা উচ্চতর বর্ণের সঙ্গে সমতা দাবি করেন।[১৪৯] ধর্মশাস্ত্রকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেন, স্পষ্টতই তাঁদের বিরুদ্ধে এইসব ব্যবস্থাই হলো আইন।[১৫০] সেগুলো কতদূর কার্যকর হয়েছিল তা বলা কঠিন। এ সবই কোন এক মতোন্মাদের প্রস্তাব হতে পারে, বাস্তবে কদাচিৎ প্রযুক্ত হতো (যদি কখনও হয়েও থাকে)।[১৫১]

দৈহিক আঘাত এবং ঐ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে শূদ্রদের জন্য প্রচণ্ড কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধান দেওয়া হয়েছে যে, নিম্ন বর্ণের মানুষ ('অন্ত্যজঃ') যে-অঙ্গ দিয়ে উচ্চ বর্ণের মানুষ ('শ্রেষ্ঠঃ')-কে আঘাত করবে সেই অঙ্গ ছেদ করা হবে।[১৫২] এখানে কুল্লুক 'অন্ত্যজ'কে শূদ্র অর্থে নিয়েছেন,[১৫৩] যা পূর্বতন কালের অনুরূপ বিধির সঙ্গে মেলে।[১৫৪] 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি ব্রাহ্মণদের বোঝায়, উচ্চ তিন বর্ণের মানুষদের নয়—মাঝে মাঝে যেমন ধরা হয়।[১৫৫] একটি শ্লোকে মনু বলেছেন, কোন লোক তার হাত বা দণ্ড তুললে সেই হাত কেটে ফেলা হবে। যে ক্রোধবশত পদাঘাত করবে তার পা কেটে ফেলা হবে।[১৫৬] সম্ভবত এখানেও ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শূদ্রের অপরাধই উল্লিখিত। আরও বিধান দেওয়া হয়েছে যে, সবচেয়ে নীচু ঘরে যার জন্ম ('অপকৃষ্টজঃ') এমন কোন লোক যদি উচ্চজাতির ('উৎকৃষ্টঃ') কোন মানুষের সঙ্গে একই আসনে বসার চেষ্টা করে তাহলে তার কটিদেশে ছেঁকা দিয়ে দাগ মেরে নির্বাসন দেওয়া হবে বা রাজা তার নিতম্বে গভীরভাবে ক্ষত করার ব্যবস্থা করবেন।[১৫৭] 'অপকৃষ্টজ' ও 'উৎকৃষ্ট'র অর্থ যথাক্রমে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ। একইভাবে যদি কোন শূদ্র ঔদ্ধত্যভরে ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু ফেলেন তাহলে রাজা তাঁর দুটি ঠোঁটই কেটে ফেলার ব্যবস্থা করবেন।[১৫৮] যদি তিনি ব্রাহ্মণের উপর প্রস্রাব বা বায়ুত্যাগ করেন তাহলে যথাক্রমে পুরুষাঙ্গ

১৪৮. মনু ৮।২৭২। ১৪৯ 'মনু অ্যাণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ১৫০।

১৫০. তুলনীয়: রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'আসপেক্ট্স্ অফ দ পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সিস্টেম অফ মনু', পৃ ১৩২।

১৫১. ব্যাশ্যাম, 'ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া', পৃ ৮০। ১৫২. মনু ৮।২৭৯।

১৫৩. মনু ৮।২৭৯ প্রসঙ্গে কুল্লুক।

১৫৪. গৌতম ধ. সূ. ১২।১; 'অর্থশাস্ত্রে'ও এই বিধানটি আছে।

১৫৫. সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট, ২৫, পৃ ৩০৩।

১৫৬. মনু ৮।২৮০। ১৫৭. ঐ, ৮।২৮১।

১৫৮. মনু ৮।২৮১ প্রসঙ্গে কুল্লুক। মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ কুল্লুকের সঙ্গে একমত (সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট, ২৫, পৃ ৩০৩)।

ও পায়ু কেটে ফেলার ব্যবস্থা হবে।[১৫৯] আবার শূদ্র ব্রাহ্মণের চুল ধরে থাকলে রাজার উচিত নির্দ্বিধায় তার হাত কেটে ফেলা এবং ঐ একই ব্যবস্থা নেওয়া যদি তিনি ব্রাহ্মণের পা, দাড়ি, ঘাড় বা অণ্ডকোষ ধরে টানেন।[১৬০] বোধ হয় এই ধরনের সব ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মনু একটি সাধারণ বিধি প্রণয়ন করেছেন : যে হীনবংশজাত শূদ্র ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রাহ্মণের বাধা ঘটায় রাজা তার জন্য বিভিন্ন ভয়ংকর দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।[১৬১] ভাষ্যকারদের মতে, বাধা ঘটানোর অর্থ তাঁর উপর শারীরিক উৎপীড়ন বা তাঁর সম্পত্তি অপহরণ।[১৬২]

উপরে যেসব ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া হলো তার অধিকাংশই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অপরাধী শূদ্রদের উদ্দেশ্যে কল্পিত। এমনকি ধর্মশাস্ত্রেও এইসব বিধানের অস্তিত্ব থেকেই দেখা যায়, উচ্চতম ও নিম্নতম বর্ণের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই অপ্রীতিকর। এসব ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল কিনা তা স্থির করার মতো প্রায় কোন সাক্ষ্যই নেই। 'মহাবস্তু' থেকে কিন্তু জানা যায় যে, ভাড়া-করা শ্রমিকদের খাটানোর জন্য মাঝে মাঝে তাঁদের উপর প্রচণ্ড দৈহিক শাস্তি প্রয়োগ করা হতো। এখানে বলা হয়েছে, কিছু লোক এই কর্মচারীদের ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে আটকে রাখার ব্যবস্থা করতেন ও তাঁদের অনেকের হাত-পা কাটা এবং নাক, মাংস, হাত ও পিঠ পাঁচ থেকে দশবার চিরে ফেলার আদেশ দেওয়া হতো।[১৬৩] 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' থেকে জানা যায় সদ্‌বংশজাত এক যুবকের কাঠের হাতকড়ায় আবদ্ধ থাকার কথা।[১৬৪] অতএব, শূদ্র অপরাধীদের উপর বিভিন্ন দৈহিক শাস্তি প্রযুক্ত হলে তাতে খুব একটা আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু শাস্তিবিধি একেবারে আক্ষরিক অর্থে তাঁদের উপর প্রয়োগ করা হতো কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

একই জাতির লোকে পরস্পরকে আঘাত করলে কিন্তু কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি তাঁর সমমর্যাদাবান্‌ অন্য কোন ব্যক্তির চর্মভেদ বা রক্তপাত ঘটালে তাঁর ১০০ 'পণ' অর্থদণ্ড হবে। যিনি মাংস কেটে ফেলবেন তাঁকে ছয় 'নিষ্ক' দিতে হবে ও হাড় ভাঙলে হবে নির্বাসন।[১৬৫] রাঘবানন্দের মতে, শূদ্র শূদ্রকে আঘাত করলে এই বিধি প্রযুক্ত হয়।[১৬৬]

১৫৯. মনু ৮।২৮২। ১৬০. ঐ, ৮।২৮৩। ১৬১. ঐ, ৯।২৪৮।

১৬২. মনু ৯।২৪৮ প্রসঙ্গে কুল্লুক।

১৬৩. মহাবস্তু, ১ম, পৃ ১৮। সেনার্ট-এ আছে 'হস্তিনগডাদিভিঃ', কিন্তু বেইলি-র পাঠ 'হদিও'। দিব্যাবদান, পৃ ৩৬৫ ও ৪৩৫-এ শেকল অর্থে এই শব্দটিই আছে ( সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দ বুদ্ধিস্টস, ১৬, পৃ ১৫ টী. ২ )। কাঠের বাঁধন অর্থে 'হরহীগোরহী' শব্দটি মৈথিলীতে প্রচলিত আছে।

১৬৪. পৃ ২৮৯। ১৬৫. মনু ৮।২৮৪।

১৬৬. সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ইস্ট, ২৫, পৃ ৩০৪।

নরহত্যার পাপ খণ্ডনের জন্য মনু চান্দ্রায়ণের বিধান দিয়েছেন। তার সময়সীমা নিহত ব্যক্তির বর্ণের উপর নির্ভর করবে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-হত্যা করলে যথাক্রমে তিন বছর ও ২½ মাসব্যাপী চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।[১৬৭] শূদ্রহত্যার বৈরদেয় মনু স্থির করেছেন দশটি গাভী ও একটি বৃষভ।[১৬৮] পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রেও তা-ই পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি যোগ করেছেন যে এই অর্থদণ্ড ব্রাহ্মণকে অর্পণ করতে হবে।[১৬৯] একইভাবে পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রকারদের মতো, শূদ্রহত্যা ও কিছু ক্ষুদ্র প্রাণী ও পক্ষি-হত্যার জন্য মনু একই শাস্তির বিধান দিয়েছেন।[১৭০] এসব বিধান থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়. শূদ্রের জীবনের ওপর মনু খুবই কম গুরুত্ব দিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, হত্যা সংক্রান্ত মনুর একটি বিধানে কোন বর্ণভেদের চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে-কোন বর্ণের মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারে মিথ্যা বলা যায়, তার ফলে যে পাপ হয় সরস্বতীর যাগ করে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।[১৭১] নারী, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়-হত্যাকে মনু তুচ্ছ অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন, যার ফলে জাতিচ্যুত হতে হয়।[১৭২] কিন্তু এই নিয়ম সম্ভবত শুধু ব্রাহ্মণের জীবনের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার জন্য।

মনুর ধারণা অনুযায়ী বর্ণ যত উঁচু হবে চুরির অপরাধ তত বেশি হবে। শূদ্রের অপরাধ সবচেয়ে কম বলে বিবেচিত হয়েছে,[১৭৩] কারণ সচরাচর তাঁকে চুরিতে অভ্যস্ত বলে মনে করা হয়।

ব্রাহ্মণ পিতার যদি উচ্চ জাতির স্ত্রীদের থেকে কোন সন্তান না হয় তাহলে তাঁর শূদ্রসন্তান সম্পত্তির এক-দশমাংশ পাবে—উত্তরাধিকার বিধিতে মনু এই প্রাচীন নীতিকে সমর্থন করেছেন।[১৭৪] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের শূদ্রসন্তান কোন অংশের অধিকারী হবেন না—এই প্রাচীন ধারণাই সেখানে আবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। শূদ্র সন্তানকে তাঁর পিতা যা দেবেন তাই তাঁর ভাগ হবে।[১৭৫] শূদ্রকে জ্ঞাতিরূপে গণ্য করা যায়, কিন্তু উত্তরাধিকারী নয়।[১৭৬] শূদ্রের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে একশ সন্তান থাকলেও তাঁদের প্রত্যেকের ভাগ হবে সমান।[১৭৭] ফলে ভাগ পাওয়ার বিষয়ে সর্বদা উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিদের শূদ্র সন্তানরাই শুধু নিশ্চিত ছিলেন না, সাধারণত শূদ্র বর্ণের লোকেও সম্পত্তির অধিকার ভোগ করতেন। অন্য একটি বিধান থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা

১৬৭ মনু ১১।১২৭ ; তুলনীয় : ১২৯-৩১। ১৬৮. ঐ. ১১।১২৮-৩১।

১৬৯ ঐ, ১১।১৩১।

১৭০. ঐ, ১১।১৩২, ১৪১। এই নিয়ম থেকে মনু ও অন্য ধর্মশাস্ত্রকারদের ধর্মীয় ও 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' শাস্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, কারণ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা অনুযায়ী শূদ্র-হত্যার জন্য বৈরদেয় হলো দশটি গাভী ও একটি বৃষভ।

১৭১. মনু ৮।১০৪-০৫। ১৭২. ঐ, ১১।৬৭। ১৭৩. ঐ, ৮।৩৩৭-৩৮।

১৭৪. ঐ, ৯।১৫১-৫৪। ১৭৫. ঐ, ৯।১৫৫। ১৭৬. ঐ, ৯।১৬০।

১৭৭. ঐ, ৯।১৫৭।

যায়। এই বিধান অনুযায়ী রাজা অবশ্যই অপহৃত সম্পত্তি সব বর্ণের লোককে ফিরিয়ে দেবেন।[১৭৮]

ব্যভিচার বিষয়ে মনুর বিধান শূদ্র পুরুষদের বিরুদ্ধে যতটা বৈষম্যমূলক, শূদ্র স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ততটা নয়। কোন ব্রাহ্মণ নিম্ন তিন বর্ণের অরক্ষিতা নারীকে গমন করলে তাঁর ৫০০ 'পণ' অর্থদণ্ড হবে। কোন অন্ত্যজ মহিলার বিরুদ্ধে ঐ একই অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড বেড়ে হবে ১০০০ 'পণ'।[১৭৯] ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি কোন সুরক্ষিত শূদ্র নারীর সঙ্গে সহবাস করেন, তবে ঐ একই অর্থদণ্ড হবে।[১৮০] বৃষলীর সঙ্গে কোন ব্রাহ্মণ একরাত্রি যাপন করলে তিন বছর ভিক্ষান্নজীবী হবেন, প্রতিদিন মন্ত্র জপ করে তিনি সেই পাপ দূর করবেন।[১৮১] যদিও এসব বিধানের অধিকাংশই ব্রাহ্মণের নৈতিক বিচ্যুতি রোধ করে তাঁর শুচিতা রক্ষার জন্যই উদ্দিষ্ট, তাহলেও একথা পরিষ্কার যে মনু শূদ্র নারীদের শুচিতাও রক্ষা করেন। চার বর্ণের স্ত্রীদেরই রক্ষা করা উচিত[১৮২]—তাঁর নীতির সঙ্গে এই বিষয়টির সঙ্গতি আছে।

পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা অনুচিত—মনুর এই নিয়ম কিন্তু শূদ্রদের কিছু অংশের—যেমন, অভিনেতা ও গায়ক—ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না, কারণ তারা তাদের স্ত্রীদের নিগূঢ় কর্মের উপরেই বেঁচে থাকে।[১৮৩] এসত্ত্বেও যারা এদের সঙ্গে ও কোন প্রভুর অধীনস্থ দাসীদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের অর্থদণ্ড দিতে হবে।[১৮৪] বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুণীদেরও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে,[১৮৫] কারণ তাঁরা সম্ভবত নিম্নবর্ণ থেকে আসতেন এবং ভিক্ষুদের মতো তাঁদেরও শূদ্র হিসেবে দেখা হতো।[১৮৬] শূদ্র পুরুষ ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে মনু সবচেয়ে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। অরক্ষিতা দ্বিজ জাতির স্ত্রীর সঙ্গে যে-শূদ্র সহবাস করবে সে তার অপরাধী অঙ্গ ও সর্বস্ব হারাবে। কোন সুরক্ষিতা স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সে সর্বস্ব হারাবে, এমনকি জীবনও।[১৮৭] এখানে 'দ্বিজাতি' শব্দটি দিয়ে মনে হয় ব্রাহ্মণদেরই বোঝায়। এর পূর্ববর্তী দুটি নিয়মে ব্রাহ্মণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১৮৮] কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সুরক্ষিতা ব্রাহ্মণীর প্রতি অপরাধ করে, তাদেরও শূদ্রের মতো শাস্তি হবে বা শুকনো ঘাসের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।[১৮৯] প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে এ-ক্ষেত্রে শুধু শূদ্র অপরাধীকেই পুড়িয়ে মারা হবে—কৌটিল্য এই শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন,[১৯০] যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপরাধীর

১৭৮. ঐ, ৮।৪০। ১৭৯. ঐ, ৮।৩৮৫।
১৮০. ঐ, ৮।৩৮৩। ১৮১. ঐ, ১১।১৭৯। ১৮২. ঐ, ৮।৩৫৯।
১৮৩. ঐ, ৮।৩৬১-৬২। ১৮৪. ঐ, ৮।৩৬৩। ১৮৫. ঐ।
১৮৬. জায়সবাল, 'মনু অ্যাণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ১৬৭-৬৮। ১৮৭. মনু, ৮।৩৭৪।
১৮৮. ঐ, ৮।৩৭৫-৭৬। ১৮৯. ঐ, ৮।৩৭৭। ১৯০. অর্থশাস্ত্র ৪।১৩।

বেলায়ও একই শাস্তির ব্যবস্থা দিয়েছেন বশিষ্ঠ।[১৯১] মনুর একটি শ্লোকের অর্থ করা হয়, এ জাতীয় ক্ষেত্রে শূদ্রের শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।[১৯২] শূদ্র ব্যভিচারীর মৃত্যুদণ্ড যেহেতু অন্যান্য সূত্র থেকেও সাধারণভাবে সমর্থিত হয়, তাই মনুর ব্যবস্থা কার্যকরী হয়ে থাকতেও পারে।

দাসত্ব সম্বন্ধে মনুর বিভিন্ন বিধান থেকে শূদ্রদের নাগরিক মর্যাদা বিষয়ে যথেষ্ট খবর জানা যায়। কৌটিল্যের মতে, আর্য পিতামাতার শূদ্র সন্তানকে দাসে পরিণত করা যায় না। মনু যদিও পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে শূদ্র সন্তানদের অংশলাভ অনুমোদন করেছেন, তিনি কিন্তু ঐ প্রথার কোন উল্লেখ করেননি। দাসত্ব শূদ্রদের চিরন্তন নিয়তি—এই নীতি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু এটি শুধু ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মনু বলেন, কেনা হোক বা না হোক, শূদ্রকে দাসে পরিণত করা হবে কারণ ব্রাহ্মণদের সেবা করা জন্য ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি করেছেন।[১৯৩] পরবর্তী শ্লোকে তিনি যোগ করেছেন, শূদ্রকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না, কারণ দাস্য তার স্বভাবজ।[১৯৪] দ্বিজ জাতির লোকদের শূদ্রদের মতো দাসে পরিণত করা যায় না। যদি কোন ব্রাহ্মণ দ্বিজ জাতির লোককে দাসরূপে কাজ করতে বাধ্য করেন তাহলে রাজা তাঁকে ৬০০ 'পণ' অর্থদণ্ড করবেন।[১৯৫] এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য অর্থদণ্ডের এক বহুস্তরযুক্ত তালিকা দিয়েছেন: ব্রাহ্মণকে দাসে পরিণত করার জন্য তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন ৪৮ 'পণ' এই উচ্চতম অর্থদণ্ডের।[১৯৬] মনু এ ধরনের কোন প্রভেদের উল্লেখ করেননি, কিন্তু উচ্চ তিনবর্ণের লোকদের দাসে পরিণত করার জন্য আরও গুরুতর অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন।

এমনকি 'মনুস্মৃতি'তেও সব শূদ্রকে দাসরূপে দেখা হয়নি।[১৯৭] শূদ্র ও দাসের মধ্যে বিধিগত পার্থক্যকে মনু স্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং

১৯১. বশিষ্ঠ ধ সূ. ২১।২-৩।

১৯২. মনু ৮।৩৫৯, কুল্লুক-ভাষ্য সমেত। মূলে ব্যবহৃত হয়েছে 'অব্রাহ্মণ', কুল্লুক তাকে শূদ্র অর্থেই নিয়েছেন।

১৯৩. শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোঽসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥ মনু ৮।৪১৩।

১৯৪. ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্ বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি॥ মনু ৮।৪১৪।
মেধাতিথি একে অর্থবাদ বলে মনে করেছেন, কিন্তু এ দিয়ে বোধহয় মনুর চেয়ে তাঁর টীকাকারের সময়কার অবস্থা আরও ভালোভাবে সূচিত হয়।

১৯৫. মনু ৮।৪১২। ১৯৬. অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।

১৯৭. জি. এফ. ইলিন-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ১০৫-০৮-এ এটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তুলনীয়: সেনার্ট, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৩।

দাসী বা দাসের দাসীর মাধ্যমে শূদ্রের সন্তানের উল্লেখ করেছেন।[১৯৮] ফলে সাধারণত শূদ্র বর্ণ থেকে দাস নিয়োগ করা হলেও শূদ্রেরা নিজেরাও মাঝে মাঝে দাসের অধিকারী হতেন। তবে শূদ্র ও তাঁর দাসের মধ্যে দ্বিজ ও তাঁর দাসের মতো অত বিশাল পার্থক্য ছিল না। মনুর বক্তব্য অনুযায়ী পিতার অনুমতিক্রমে দাসীর গর্ভজাত শূদ্রসন্তান উত্তরাধিকারের অংশ পেতে পারেন।[১৯৯] কিন্তু দ্বিজের ক্ষেত্রে ঐ একই ধরনের সন্তানের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়নি। মনুর এই বিধি থেকে প্রসঙ্গত দেখা যায় যে দাসরা সম্পত্তির অধিকার ভোগ করতেন। মনুর একটি শ্লোকের কুল্লুক-ভাষ্য অনুযায়ী প্রভু বিদেশে থাকাকালীন, তাঁর পরিবারের স্বার্থে দাসই তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। ব্যবসায়িক আদান-প্রদান তিনি করবেন, প্রভু সেগুলো বাতিল করতে পারবেন না।[২০০] অন্যত্র মনু কিন্তু বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, প্রকৃত অধিকারী নয় এমন কোন ব্যক্তি কিছু বিক্রি করলে তা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[২০১] আগেই দেখানো হয়েছে যে উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে এমনকি দাস ও ভৃত্যরাও সাক্ষ্য দিতে পারেন। এ সবকিছু থেকেই দেখা যায়, এমনকি দাসেরও কিছু বিধিবদ্ধ মর্যাদা ছিল।

কতক ক্ষেত্রে গৃহদাসদের সঙ্গে পরিবারের লোকের মতোই আচরণ করা হতো। মনু বিধান দিয়েছেন, গৃহকর্তা তাঁর পিতামাতা, ভগ্নী, পুত্রের ভার্যা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও দাসের সঙ্গে কোন আলোচনায় ('বিবাদে') যাবেন না।[২০২] এর কারণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন, স্ত্রী ও পুত্র গৃহকর্তার দেহের অংশ,[২০৩] কন্যা স্নেহের পাত্রী, দাসবর্গ তাঁর নিজের ছায়া। মনু তাই নির্দেশ দেন, লোকে যদি গৃহকর্তার অপমানও করে, তিনি শান্তভাবে তা সহ্য করবেন।[২০৪] এর থেকে কি বুঝতে হবে : পুরনো পারিবারিক সংহতি সাময়িকভাবে ভেঙে পড়েছিল ? কারণ দাসরা প্রভুকে অপমান করলে ধর্মশাস্ত্রকারের পক্ষে প্রভুকে তা হজম করতে বলার ব্যাপারটি শুনতে আশ্চর্য লাগে।

দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিকরা কিন্তু নাগরিকদের মতোই একই অধিকার ভোগ করতেন না। মালব ও ক্ষুদ্রকদের বিভিন্ন গণরাষ্ট্রের অবস্থা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়। পাণিনির একটি সূত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেছেন, ক্ষুদ্রক ও মালবদের সন্তানরা যথাক্রমে ক্ষৌদ্রক্য ও মালব্য নামে পরিচিত, কিন্তু এটি তাঁদের দাস ও কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[২০৫]

১৯৮. দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ। মনু ৯।১৭৯। ১৯৯. ঐ।

২০০. কুল্লুকের মতে, এখানে 'অধ্যধীন' শব্দটির অর্থ 'দাস'। মনু ৮।১৬৭।

২০১. মনু ৮।১৯৯। ২০২. ৪।১৮০। ২০৩. ৪।১৮৪। ২০৪. ৪।১৮৫।

২০৫. ইদং তর্হি ক্ষৌদ্রকাণামপত্যং মালবানামপত্যমিতি। অত্রাপি ক্ষৌদ্রক্যঃ মালব্য ইতি নৈতৎ তেষাং দাসে বা ভবতি কর্মকরে বা। পাণিনি ৪।১।১৬৮ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।। তুলনীয় : পাণিনি ৫।৩।১১৪ প্রসঙ্গে 'কাশিকা'-বৃত্তি।

শূদ্রদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে মনুর বিভিন্ন বিধান প্রধানত প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অনুরূপ বিধিবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নতুন বিধানের মধ্যে কয়েকটি ছিল বিদেশী শাসক ও অ-সনাতনী ধর্মগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে (তাঁদের শূদ্র বলে নিন্দা করা হয়েছে) এবং অন্যান্য বিধান ছিল শূদ্রদেরই বিরুদ্ধে। এই শেষোক্ত ধরনের বিভিন্ন বিধান প্রধানত ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধাচরণকারী শূদ্রদের সম্পর্কে। কিন্তু এমনকি এই বিষয়েও শূদ্রদের বিরুদ্ধে মনুর স্থূল ভেদনীতি কোন বিশেষ অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। তিনি শূদ্রের জীবনের বৈরদেয় সংক্রান্ত প্রাচীন বিধানটি তো বজায় রেখেছেনই, কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অপমান করলে তার ক্ষেত্রে ১২ 'পণ' অর্থ-দণ্ডেরও নির্দেশ দিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে সাতবাহন শাসক গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি (১০৬-১৩০ খৃস্টাব্দ) দাবি করেছেন, তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ('অবর') মধ্যে আপস করিয়ে, বিশৃঙ্খলা থেকে চতুর্বর্ণের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।[২০৬] ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ শাসকরা এই বর্ণ-সমবায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২০৭] এই ক্ষত্রিয়রা বোধহয় বিদেশী শাসক-বংশের।

শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে মনুর বিভিন্ন বিধানের অধিকাংশই প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতামতের চর্বিতচর্বণ। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কয়েকটি নতুন ভেদনীতির সূচনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন সৃষ্টি সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী, যেখানে শূদ্রদের স্থান দেওয়া হয়েছে সবার নীচে।[২০৮] উচ্চ বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে অভিবাদনের বিভিন্ন রীতি (সম্ভবত ব্রাহ্মণরা ব্যবহার করতেন) নির্দেশসূচক প্রাচীন বিধিরই তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন।[২০৯] কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যোগ করেন যে, কোন ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদনের রীতি না জানলে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁকে একেবারেই অভিবাদন জানাবেন না, কারণ ঐ ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য।[২১০] পতঞ্জলি থেকে জানা যায়, প্রত্যভিবাদনের সময়ে অশূদ্রদের থেকে শূদ্রদের আলাদাভাবে সম্ভাষণ করা হতো। ফলে শূদ্রদের সম্ভাষণ করার সময়ে কোন উদাত্ত স্বর প্রয়োগ করা হতো না। 'ভো' (একটি সম্বোধনসূচক পদ) শব্দটি রাজন্য বা বৈশ্যকে[২১১] সম্ভাষণ করার সময়ে ব্যবহার হতো, কিন্তু শূদ্রের ক্ষেত্রে নয়। অতএব এমনকি ব্যাকরণের নিয়ম রচনাতেও বর্ণভেদ প্রতিফলিত হয়েছিল। মনুর বিধান অনুযায়ী কোন শূদ্র নব্বই অতিক্রম করলে তাঁকে

২০৬. দিজাবর কুটুব বিবধনস···বিনিবতিত চাতুবণ সংকরস। বাসিষ্ঠিপুত্র পুলুমাবি-র নাসিক গুহালেখ, পঙ্ক্তি ৫-৬ (দীনেশচন্দ্র সরকার, 'সিলেক্ট্ ইন্স্ক্রিপ্শন্স্', ১ম, পৃ ১৯৭)।

২০৭. ঐ। ২০৮. মনু ১।৩১। ২০৯. ঐ, ২।১২৭। ২১০. ঐ, ২।১২৬।

২১১. ভো রাজন্যবিশাং বা। পাণিনি ৮।২।৮২-৮৩ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

সম্মান করা যায়।[২১২] কিন্তু এই ধরনের নিয়ম খুব অল্পসংখ্যক শূদ্রের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে।

শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানেও মনু বর্ণভেদ প্রবর্তন করেছেন যা স্বাভাবিকভাবেই শূদ্রের হীন অবস্থানের উপর জোর দেয়। তাঁর কথা অনুযায়ী, ব্রাহ্মণের নাম হওয়া উচিত মঙ্গল-বাচক, ক্ষত্রিয়ের বল, বৈশ্যের ধন এবং শূদ্রের নাম যেন কোনকিছু ঘৃণ্য সূচিত করে।[২১৩] এরই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে তিনি বলেছেন, চার বর্ণের উপাধি থেকে যথাক্রমে আনন্দ, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সেবা বোঝানো উচিত।[২১৪] এই প্রথা যে সর্বত্র মানা হতো সে-বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু নাম সম্পর্কে মনুর বিভিন্ন বিধান থেকে দেখা যায়, সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষ সাধারণত ছিলেন ঘৃণার পাত্র। শূদ্রের জন্য ব্যবহৃত 'বৃষল' শব্দটি ছিল গালি ও অমর্যাদার শব্দ। সমাস বিষয়ে পাণিনির একটি সূত্রের উদাহরণ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি বলেন, "দাসীর সদৃশ" বা "বৃষলীর সদৃশ" শব্দদুটি হচ্ছে গালাগালি।[২১৫] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, শূদ্র ও দাসদের সমাজের হেয় উপাদান বলে বিবেচনা করা হতো। বৃষলকে চোরের পর্যায়ে রাখা হয়েছিল এবং দুজনেই ব্রাহ্মণ্য বৈরিতার উদ্রেক করতেন।[২১৬] বৃষল, দস্যু ও চোরকে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখা হতো বলে জানা যায়।[২১৭]

ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের অঙ্গ অশুচি বলে বিবেচনা করা হতো। মনু বলেছেন, যে-ব্রাহ্মণ উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ও অধম ব্যক্তির সংস্রব বর্জন করেন তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, অন্যথায় তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।[২১৮] স্নাতকের পক্ষে শূদ্রের সঙ্গে ভ্রমণ করা অনুচিত—এই বিধান তিনি আবার উল্লেখ করেছেন।[২১৯] তিনি প্রাচীন নীতি স্মরণ করেছেন—বৈশ্য ও শূদ্ররা ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথিরূপে এলে দয়াপরবশ হয়ে তাদের ভৃত্যদের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়া উচিত।[২২০] তিনি বিধান দিয়েছেন, শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করা স্নাতকের পক্ষে উচিত নয়।[২২১] কোন্ কোন্ ব্যক্তির

২১২. মনু ২।১৩৭। তুলনীয়: গৌতম বলেছেন, আশি বছরে পৌঁছলে শূদ্র শ্রদ্ধার্হ হন।

২১৩. মনু ২।৩১।

২১৪. শর্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্ রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রেষ্যসংযুতম্॥ মনু ২।৩২।
কুল্লূক তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, উপাধি হওয়া উচিত যথাক্রমে শর্মা, বর্মা, ভূতি ও দাস।

২১৫. পাণিনি ৬।২।১১ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

২১৬. পাণিনি ২।২।১১ ও ৩।২।১২৭ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

২১৭. পাণিনি ৫।৩।৬৬ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি; তুলনীয়: ঐ, ৩।১।১০৭-০৮ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

২১৮. মনু ৪।২৪৫।

২১৯. ঐ, ৪।১৪০। শূদ্রের পরিবর্তে তিনি অবশ্য 'বৃষল' পদটি ব্যবহার করেছেন।

২২০. মনু ৩।১১২।

২২১. ঐ, ৪।২১১।

অন্ন স্নাতক গ্রহণ করবেন না তার একটি দীর্ঘ তালিকায় আছেন কর্মকার, নিষাদ, অভিনেতা, স্বর্ণকার, বেণ (ঝুড়ি প্রস্তুতকারী), শিকারী কুকুরের প্রশিক্ষক, শৌণ্ডিক (যারা মদ তৈরি ও বিক্রি করেন), রজক ও রঞ্জক।[222] এও বলা হয়েছে, যে রাজার অন্ন ক্ষয় করে স্নাতকের তেজ, শূদ্রের অন্ন তাঁর পবিত্র শিক্ষার উৎকর্ষ, স্বর্ণকারের অন্ন তাঁর আয়ুষ্কাল এবং চর্ম-কর্তন-কারীর ('চর্মাবকর্তিনঃ') অন্ন তাঁর যশ।[223] আশ্চর্যের বিষয়, শূদ্র সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে রাজার অন্নও স্নাতকের কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করা হয়েছে। মনু আরও যোগ করেছেন যে, কারুকর্মীর অন্ন ধ্বংস করে স্নাতকের সন্তানকে, রজকের অন্ন তাঁর শারীরিক ক্ষমতা এবং 'গণ' ও গণিকার অন্ন তার স্বর্গলোক ব্যাহত করে।[224] যদি তিনি অজ্ঞাতসারে এই জাতীয় ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই তিনদিন উপবাস করবেন। কিন্তু যদি জ্ঞানত গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁকে 'কৃচ্ছ্র' নামে পরিচিত একটি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত পালন করতে হবে।[225] মনে হয় এই সমস্ত উল্লেখে স্নাতকের অর্থ সম্ভবত ব্রাহ্মণ বর্ণের বেদাধ্যায়ী। কার্যকর হয়ে থাকলে এই সব বিধিনিষেধের পরিণতি হতো নীচ বর্গের মানুষদের সঙ্গে শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের সবরকম সামাজিক সংস্রব রোধ। যে-শূদ্র শ্রাদ্ধের আচার পালন করেনি তার পাক-করা অন্ন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করবে না—মনু এই বিধান দিয়েছেন। কিন্তু বেঁচে থাকার অন্যান্য উপায় ব্যর্থ হলে তিনি এক রাত্রির জন্য জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত আমান্ন (শুকনো ধান) গ্রহণ করতে পারেন।[226] আপৎকালে কিন্তু এ-জাতীয় নিয়ম গ্রাহ্য নয়। মনু বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন যেখানে বিশিষ্ট ঋষিরা অভাবের সময়ে নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করেছেন।[227] ফলে ধর্মাধর্মতত্ত্বজ্ঞ বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে চণ্ডালের হাত থেকে কুকুরের পুচ্ছমাংস ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন।[228] স্বাভাবিক সময়ে সাধারণত শূদ্রের খাদ্য গ্রহণ করা হতো। মনু নির্দেশ করেছেন, শূদ্রদের মধ্য থেকে ভাগচাষী, পারিবারিক বন্ধু, পশুপালক, দাস ও ক্ষৌরকারের খাদ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।[229] সূত্রধর,

২২২. ঐ, ৪।২১৫-১৬। ২২৩. ঐ, ৪।২১৮।

২২৪. কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।
গণান্নং গণিকান্নং চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি॥ মনু ৪।২১৯।

২২৫. মনু ৪।২২২। ২২৬. ঐ, ৪।২২৩।

২২৭. ঐ, ১০।১০৬-০৮। ২২৮. ঐ, ১০।১০৮।

২২৯. মূলে সম্বন্ধ-সূচক সর্বনাম নেই। কিন্তু কুল্লূক শ্লোকটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, একথা শুধু কারও নিজ ভৃত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সব দাস, ভাগচাষী ইত্যাদির প্রসঙ্গে এমন বলা হয়েছে—এই মতের চেয়ে মনুর মনোভাবের সঙ্গে এর অনেক বেশি মিল আছে (মনু ৪।০৫৩)। সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট, ২৫, পৃ ১৬৮-তে 'আর্ধিকঃ' শব্দটির ভুল অনুবাদ করা হয়েছে 'চাষে (নিযুক্ত) শ্রমিক'। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' "আভীর"কে গো-পালক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

রজক ও লৌহকারের থালা ঠিকমত ধুয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে পতঞ্জলি জানিয়েছেন।[২৩০] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে খাদ্যের বিষয়ে উচ্চবর্ণ ও শূদ্র সম্প্রদায়ের এই অংশের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে বিরাট পাপ বলে গণ্য হতো। বলা হয়েছে, যিনি স্ত্রীলোক ও শূদ্রের ভুক্তাবশেষ খেয়েছেন তিনি সাত দিনরাত্রি যবসিদ্ধ (ছাতুর পানা) পান করে পাপশুদ্ধি করবেন।[২৩১] এই নিয়ম বোধহয় ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইভাবে যে-ব্রাহ্মণ শূদ্রের পরিত্যক্ত জল পান করবেন তিনি যে-জলে তিনদিন ধরে কুশ সিদ্ধ হয়েছে সেই জল পান করে পাপমুক্ত হবেন।[২৩২] মনুর বিধান থেকে শূদ্রদের খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। শুষ্ক মাংস, ভূমিজাত ছত্রাক, অজ্ঞাতসূত্রের মাংস বা সূনাস্থ (কসাইখানায় রক্ষিত) মাংস যদি কোন দ্বিজ গ্রহণ করেন তাহলে তাঁকে 'চান্দ্রায়ণ' নামক প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[২৩৩] একইভাবে তিনি যদি মাংসাশী প্রাণী, শূকর, উট, মোরগ, গরু, মানুষ ও গাধার মাংস আহার করেন, তাঁকে 'তপ্তকৃচ্ছ্র' নামে একটি প্রচণ্ড কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[২৩৪] এই সমস্ত উল্লেখে দ্বিজের অর্থ যদি প্রথম তিন বর্ণ ধরা হয়, তাহলে বোঝা যায় শূদ্রা সবরকমের মাংস খেতে পারতেন। মনুর একটি শ্লোকের টীকায় কুল্লূক বলেছেন, রসুন ও অন্যান্য নিষিদ্ধ মূল খেলে শূদ্রের জাতিচ্যুত হওয়ার মতো অপরাধ হয় না।[২৩৫] এর থেকে বোঝা যায়, রসুন, পেঁয়াজ ও নানা-জাতীয় মাংস নিম্নবর্গের মানুষদের অনুমোদিত খাদ্যরূপে গণ্য করা হতো।

বৈশ্য ও শূদ্ররা মনে হয় উচ্চ বর্ণের থেকে পৃথক্ বিবাহরীতি পালন করতেন। মনু বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্রের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। তাঁদের মতে, প্রথম চার জাতীয় বিবাহ, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম', 'দৈব', 'আর্য' ও 'প্রাজাপত্য' ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ধারিত ; ক্ষত্রিয়ের জন্য 'রাক্ষস' এবং বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য 'আসুর'।[২৩৬] মনু যোগ করেছেন, ব্রাহ্মণ 'আসুর' ও 'গান্ধর্ব' রীতিও অনুসরণ করতে পারেন এবং ক্ষত্রিয় আর সেই সঙ্গে বৈশ্য ও শূদ্র 'আসুর', 'গান্ধর্ব' ও 'পৈশাচ' রীতি পালন করতে পারেন।[২৩৭] ফলে ক্ষত্রিয়রা 'রাক্ষস' রীতিতে বিবাহ করতে পারেন—শুধু এই ব্যবস্থার বলে তাঁদের সঙ্গে বৈশ্য ও শূদ্রের পার্থক্য করা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণকে অন্য তিন বর্ণের চেয়ে পৃথক্ করাই ছিল সম্ভবত এ-ক্ষেত্রে মনুর প্রধান উদ্দেশ্য। মনু যে-বক্তব্য

২৩০. পাণিনি ২।৪।১০ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

২৩১. মনু ১১।১৫৩। ২৩২. ঐ, ১১।১৪৯, কুল্লূক-ভাষ্য সমেত।

২৩৩. ঐ, ১১।১৫৬। ২৩৪. ঐ, ১০।১৫৭।

২৩৫. ঐ, ১০।১২৬। রাঘবানন্দ এর সঙ্গে পশুবধশালার রক্ষণাবেক্ষণও যোগ করেছেন।

২৩৬. মনু ৩।২৪। ২৩৭. ঐ, ৩।২৩।

উদ্ধৃত করেছেন ('মহাভারতে'র "আদিপর্বে"ও[২৩৮] এটি আছে) তার থেকে দুটি নিম্ন বর্ণের প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে : কন্যা-ক্রয়ের মাধ্যমে 'আসুর' রীতিতে বিবাহ সাধারণত বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত। মনু বিধান দিয়েছেন, 'আসুর' ও 'পৈশাচ' রীতিতে বিবাহ করা অনুচিত।[২৩৯] কুল্লুক মন্তব্য করেছেন, এই নিয়ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২৪০] এর থেকে বোঝা যায়, এই দুই রীতির বিবাহ বিশেষভাবে নিম্নবর্ণের জন্যই উদ্দিষ্ট।

স্ত্রীধন সংক্রান্ত মনুর নিয়মাবলি বিবাহের রীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। বলা হয়েছে, 'আসুর', 'রাক্ষস' ও 'পৈশাচ' রীতির বিবাহে, স্ত্রী যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান তাহলে স্ত্রীধন পাবেন তাঁর পিতামাতা, অর্থাৎ তাঁর পিতা-মাতার পরিবার, স্বামীর নয়। প্রথম চারটি ও গান্ধর্ব রীতির বিবাহের ক্ষেত্রে তা-ই অনুসরণ করা হতো।[২৪১] এর থেকে দেখা যায়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে প্রচলিত বিবাহরীতির ক্ষেত্রে মাতৃকুলগত উপাদানের কিছু গুরুত্ব ছিল।

মনু ঘোষণা করেছেন, বৈদিক মন্ত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠিত বিবাহের ক্ষেত্রে 'নিয়োগ'-এর আশ্রয় নেওয়া যাবে না।[২৪২] যেহেতু শূদ্রদের বিবাহে এইসব মন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি ছিল না,[২৪৩] অতএব এ-কথা পরিষ্কার যে নিয়োগ ছিল প্রধানত শূদ্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনুর আরেকটি বক্তব্য থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, শাস্ত্রবিদ্ দ্বিজরা বিধবার পুনর্বিবাহ ও 'নিয়োগ'কে 'পশুধর্ম' বলেই গণ্য করেন।[২৪৪] ইওলি-র মতে, এই দুটি বিষয়ে মনুর ধারণা স্ববিরোধী,[২৪৫] কারণ তিনি কয়েকটি শ্লোকে এদের স্বীকৃতি দেন, অন্যত্র নিন্দা করেন। কিন্তু এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহজেই সঙ্গতি আনা যায় যদি আমরা মনে রাখি যে বিধবার পুনর্বিবাহ ও 'নিয়োগে'র ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও ধিক্কার যথাক্রমে শূদ্র ও তিন উচ্চবর্ণের জন্যই উদ্দিষ্ট। শূদ্রদের মধ্যে উপরে উল্লিখিত প্রথার প্রচলন থেকে দেখা যায়, তাঁদের সম্প্রদায়ে স্ত্রীরা অত পরনির্ভরশীল ছিলেন না।

অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে মনু প্রাচীন প্রবচন উদ্ধৃত করেছেন যেখানে উচ্চবর্ণের পুরুষদের নিম্নবর্ণের রমণী বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[২৪৬] কিন্তু তিনি যোগ করেছেন, কোন দ্বিজ নিজ বর্ণের ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের রমণী বিবাহ করলে ঐ স্ত্রীদের জ্যেষ্ঠতা, সম্মান ও আবাস বর্ণের ক্রম অনুযায়ী স্থির করতে হবে।[২৪৭]

২৩৮. ৬৭।১১। ২৩৯. মনু ৩।২৫।
২৪০. কুল্লুকও বলেছেন, রাক্ষস-বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের বিহিত। মনু-ভাষ্য, ৩।২৫।
২৪১. মনু ৯।১৯৬-৯৭, কুল্লুক-ভাষ্য সমেত। ২৪২. ঐ, ৯।৬৫।
২৪৩ বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১।২৫।
২৪৪. অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্মো বিগর্হিতঃ। মনু ৯।৬৬।
২৪৫. ইওলি, 'হিন্দু ল অ্যান্ড কাস্টম', পৃ ১৫৫।
২৪৬. মনু ৩।১৩। ২৪৭. ঐ, ৯।৮৫।

কোন শূদ্রা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের প্রথমা স্ত্রী হবেন—মনু কিন্তু তা পছন্দ করেন না। তাঁর কথা অনুযায়ী প্রাচীন কোন কাহিনীতে এমন পূর্বদৃষ্টান্ত নেই।[২৪৮] সম্ভবত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের শূদ্রা স্ত্রীর মর্যাদা ছিল খুবই কম। পতঞ্জলি থেকে জানা যায়, উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের তৃপ্তি বিধান করা ছিল দাসী ও বৃষলীদের কাজ।[২৪৯] মনু বলেন, কোন দ্বিজ শূদ্রাকে বিবাহ করলে তিনি তার পরিবার ও সন্তানদের অচিরে শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন।[২৫০] কুল্লূকের কথা অনুযায়ী এই বিধান তিন উচ্চবর্ণের সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[২৫১] উপরের বক্তব্যের সমর্থনে মনু বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র উদ্ধৃত করেছেন। অত্রির মতে, কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রাকে বিবাহ করলে তিনি জাতিচ্যুত হন। শৌনক বলেছেন, পুত্রের জন্ম হলে ক্ষত্রিয় এই অবস্থানে [ শূদ্র পর্যায়ে ] নেমে আসেন আর ভৃগুর মতে, বৈশ্যের যদি শুধুই শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান হয় তাহলে তিনি জাতিচ্যুত হন।[২৫২] কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা মিলনের বিষয়ে মনু খুবই কঠোর অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এই ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকে নিমজ্জিত হবেন। যদি তাঁর শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হয় তাহলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে পতিত হবেন,[২৫৩] এবং শূদ্র ছাড়া অন্য কোন সন্তান না থাকলে, তাঁর পরিবার অচিরে ধ্বংস হবে।[২৫৪] কারণ ব্রাহ্মণের শূদ্র সন্তান বেঁচে থাকলেও সে শব, তাই তাকে 'পরাশব' বলা হয়।[২৫৫] যে-ব্যক্তি শূদ্রাকে ('বৃষলী') চুম্বন করেন, তার নিঃশ্বাসে দূষিত হন ও তার গর্ভে পুত্রলাভ করেন তাঁর শুদ্ধির আর কোন পথ নেই।[২৫৬] প্রসঙ্গ থেকে দেখা যায়, ঐ নিষেধ ছিল শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য।[২৫৭]

প্রাচীন সংকর জাতি, যেমন, নিষাদ,[২৫৮] পারশব, উগ্র, আয়োগব, ক্ষত্তা, চণ্ডাল, পুক্কস,[২৫৯] কুক্কুটক, শ্বপাক এবং বেণ[২৬০]-এর কথা মনু উল্লেখ করেছেন। এঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে এঁদের

২৪৮. ঐ, ৩।১৪।

২৪৯ পাণিনি ২।৩।৬৯ ও ১।২।৪৩ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি। ২৫০. মনু ৩।১৫।

২৫১. মনু-ভাষ্য ৩।১৫। ২৫২. মনু ৩।১৬, কুল্লূক-ভাষ্য সমেত।

২৫৩. ঐ, ৩।১৭। ২৫৪. ঐ, ৩।৬৪। ২৫৫. ঐ, ৯।১৭৮।

২৫৬. ঐ, ৩।১৯। ২৫৭. ঐ, ৩।১৭-১৯।

২৫৮. এমনকি এই পর্বেই আমরা নিষাদ-দেশের কথা শুনি ( পাণিনি ৪।২।১০৪ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি ); রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখ ১, পঙক্তি ১১ ( দীনেশচন্দ্র সরকার, 'সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস্', ১ম, পৃ ১৭২ )।

২৫৯. মনু ( ১২।৫৫ ) বলেছেন, ব্রহ্মঘাতক চণ্ডাল- বা পুক্কস-যোনিতে প্রবেশ করবে।

২৬০. মনু ১০।৮-৯, ১২, ১৬, ১৮, ১৯। ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রাচীন বর্ণ বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল, কারণ নিষাদ- ও চণ্ডাল-পুত্রদের কথা শোনা যায় ( পাণিনি ৪।১।৯৭ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি )।

উৎপত্তি। বিভিন্ন নতুন জাতির এক দীর্ঘ তালিকাতেও তিনি ঐ একই উৎপত্তি নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু তাঁর তালিকায় কম করেও ৬১টি জাতির উল্লেখ আছে, তাই দশম অধ্যায়ে তাদের একত্ররূপ মনে হয় খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের কাজ।[২৬১] যাই হোক, বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যই এখানে তাদের বিবরণ দেওয়া হলো। উগ্র কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ 'আবৃত' সন্তানের জন্ম দেন। অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে 'আভীর' এবং আয়োগব জাতির স্ত্রীর ক্ষেত্রে 'ধিগ্‌বণ'।[২৬২] এর সঙ্গে আছে যে আয়োগব স্ত্রীর গর্ভে 'দস্যু', 'বৈদেহক' ও 'নিষাদ' যথাক্রমে 'সৈরন্ধ্র', 'মৈত্রেয়ক' ও 'মার্গব' বা 'দাস'-এর জন্ম দেন। শেষোক্ত জন 'কৈবর্ত' নামেও পরিচিত।[২৬৩] বৈদেহক জাতির স্ত্রী থেকে 'চণ্ডাল' 'পাণ্ডুসোপাক'-এর জন্ম দেন এবং 'নিষাদ' 'আহিণ্ডক'-এর।[২৬৪] ঐ একই জাতির স্ত্রীর গর্ভে 'নিষাদ' 'কারাবর'-এরও জন্ম দেন। আর 'বৈদেহক' 'কারাবর' ও 'নিষাদ' স্ত্রীর থেকে যথাক্রমে 'অন্ধ্র' ও 'মেদ' সন্তান লাভ করেন।[২৬৫] 'নিষাদ' স্ত্রীর থেকে 'চণ্ডাল' 'অন্ত্যাবসায়ী' নামক পুত্রের পিতা হন, যাকে এমনকি চাতুর্বর্ণ্য প্রথার বহির্ভূত ব্যক্তিরাও ('বাহ্য') ঘৃণা করেন।[২৬৬] মনু আরও বলেছেন, 'সূত', 'বৈদেহক', 'চণ্ডাল', 'মাগধ', 'ক্ষত্তা' ও 'আয়োগব'রা একই জাতির স্ত্রীর গর্ভে যেসব সন্তানের জন্ম দেয় তারা আরও বেশি ঘৃণ্য, পিতাদের চেয়েও কলুষিত এবং তারা বর্ণসমাজ-বহির্ভূত।[২৬৭] তিনি যোগ করেন, উচ্চ জাতির গর্ভে 'বাহ্য' ও 'হীন' (নীচ ব্যক্তি) পনের ধরনের নিম্নবর্ণ[২৬৮] উৎপন্ন করেন। যদিও মনু এইসব জাতির সনাম বিবরণ দেননি, তাহলেও এঁরা ঐ তালিকারই অন্তর্গত।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন জাতিকে তাঁদের বৃত্তির মাধ্যমে পৃথক্ করা হতো।[২৬৯] 'চণ্ডাল', 'শ্বপাক' ও 'অন্ত্যাবসায়ী'রা অপরাধীদের বধ করার কাজে নিযুক্ত হতেন ও তাদের বস্ত্র, সজ্জা ও অলংকার গ্রহণ করতেন।[২৭০] 'নিষাদ'রা মাছ ধরে জীবনধারণ করতেন এবং 'মেদ', 'অন্ধ্র', 'মদ্‌গু' ও 'চঞ্চু'দের বন্যপ্রাণী শিকারে নিয়োগ করা হতো।[২৭১] গর্তের মধ্যে যেসব প্রাণী বাস করে তাদের ধরা ও হত্যার কাজে 'ক্ষত্তা', 'উগ্র' ও 'পুক্কস' নিযুক্ত ছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৭২] স্পষ্টতই এঁরা ছিলেন পশ্চাৎপদ

২৬১. পরিশিষ্ট ১ দ্র.। ২৬২. মনু ১০।১৫।
২৬৩. ঐ, ১০।৩৩-৩৪। ২৬৪. ঐ, ১০।৩৭। ২৬৫. ঐ, ১০।৩৬।
২৬৬. ঐ, ১০।৩২। ২৬৭. ঐ, ১০।২৬-২৯।
২৬৮. প্রতিকূলং বর্তমানা বাহ্যা বাহ্যাত্তরান্ পুনঃ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব চ ॥ মনু ১০।৩১।
তাঁর ভাষ্যে কুল্লূক দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে ঐ ধরনের বর্ণের সংখ্যা তিরিশ। এটি পরবর্তী পরিণতি হতে পারে।
২৬৯. মনু ১০।৪০। ২৭০. ঐ, ১০।৫৬; তুলনীয়: মহাবস্তু, ২য়, পৃ ৭৩।
২৭১. মনু ১০।৪৮। ২৭২. ঐ, ১০।৪৯।

আদিম জনগোষ্ঠী, যাঁরা ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্যে পরিগৃহীত হয়েও নিজেদের বৃত্তি রক্ষা করেছিলেন। কয়েকটি সংকর জাতি যে গুরুত্বপূর্ণ হস্তশিল্পের চর্চা করতেন 'মনুস্মৃতি' থেকে তা জানা যায়। 'আয়োগব'রা কাঠের কাজ করতেন;[২৭৩] 'ধিগ্বণ' ও 'কারাবর'রা করতেন চামড়ার কাজ,[২৭৪] আর 'পাণ্ডুসোপাক'দের ছিল বেতের কাজ।[২৭৫] 'মার্গব' বা 'দাস'রা ধীবরের কাজ করে প্রাণধারণ করতেন ও আর্যাবর্তের অধিবাসীদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'কৈবর্ত' নামে।[২৭৬] 'বেণ'রা ভাণ্ডনির্মিত বাদ্য বাজাতেন;[২৭৭] প্রভুর সাজসজ্জা ও পরিচর্যায় 'সৈরন্ধ্র'দের দক্ষ বলে ধরা হতো। এঁরা দাস না হয়েও দাসের মতো থাকতেন বা ফাঁদ পেতে প্রাণী ধরে জীবনধারণ করতেন।[২৭৮] 'মৈত্রেয়ক'কে মিষ্টভাষী ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি ভোর হলে ঘণ্টা বাজাতেন ও সততই মহান্ ব্যক্তিদের প্রশংসায় রত থাকতেন।[২৭৯]

উপরে যেসব জাতির কথা বলা হলো সেই ধরনের কয়েকটি নিম্নজাতির উল্লেখ পাওয়া যায় একটি বৌদ্ধসূত্রে। বলা হয়েছে যে চণ্ডাল, কৌক্কুটিক (হাঁস, মুরগী ইত্যাদির পালনকারী), সংকরিক (শূকর মাংসের কষাই), শৌণ্ডিক (মদ-বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালা),[২৮০] মাংসক (কষাই), মৌষ্টিক (মুষ্টিযোদ্ধা), নট-নর্তক, ঝল্ল ও মল্ল (কুস্তিগীর)—এঁদের সঙ্গে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের অনুগামীরা কোন সংস্রব রাখবেন না।[২৮১] নিষ্ঠুর ও অশুদ্ধ কার্যকলাপের সঙ্গে যোগ থাকার জন্য বৌদ্ধরা এঁদের তাচ্ছিল্য করতেন।

মনু-বর্ণিত বিভিন্ন সংকর জাতির অধিকাংশই ছিলেন অস্পৃশ্য। নিষাদ, আয়োগব, মেদ, অন্ধ্র, চুঞ্চু, মদ্গু, ক্ষত্তা, পুক্কস, ধিগ্বণ ও বেণদের কাজের কথা বলার পরে মনু নির্দেশ করেছেন যে এরা গ্রামের বাইরে চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, পর্বত ও উপবনের কাছে বাস করবে।[২৮২] এর থেকে

২৭৩. ঐ, ১০।৪৮।

২৭৪. মনু ১০।৩৬, ৪৯। প্রসঙ্গত, এর থেকে দেখা যায় চামড়ার কাজ গুরুত্বপূর্ণ কারু-কর্মে পরিণত হয়েছিল, কারণ তিন ধরনের কর্মী, চর্মকার, ধিগ্বণ ও কারাবর, এতে নিযুক্ত ছিলেন।

২৭৫. ঐ, ১০।৩৭। ২৭৬. ঐ, ১০।৩৪। ২৭৭. ১০।৪৯।

২৭৮. ঐ, ১০।৩২। ২৭৯. ঐ, ১০।৩৩।

২৮০. 'ভেড়ার মাংসের কসাই' অনুবাদটি (সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট, ২১, ৪৩৮) ঠিক বলে মনে হয় না।

২৮১. তালিকায় আজীবিক, নির্গ্রন্থ ও লোকায়তিকদেরও যুক্ত করা হয়েছে। সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক সূত্র, পৃ ১৮০-৮১, ৩১১-১২; তুলনীয়: অতীন্দ্রনাথ বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৬৩-৬৪। গোমাংসক ও তার শিক্ষানবীশের কথা আছে মহাবস্তু, ২য়, পৃ ১২৫-এ।

২৮২. মনু ১০।৪৯-৫০।

দেখা যায়, জনগোষ্ঠীয় মানুষদের বাস ছিল ব্রাহ্মণ্য বসতির বাইরে। চণ্ডাল ও শ্বপাকরা নিঃসন্দেহে বাইরে থাকতেন। তাঁদের ব্যবহৃত বাসনপত্র চিরকালের মতো বর্জন করা হতো। কুকুর ও গাধা ছিল তাঁদের একমাত্র সম্পত্তি, তাঁরা ভাঙা থালায় খেতেন, লোহার গয়না ও মৃত ব্যক্তির জামাকাপড় ব্যবহার করতেন, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতেন।[২৮৩] গ্রাম-নগরে তাঁরা শুধু দিনের বেলায় কাজ করতে পারতেন, রাত্রে আসার অনুমতি ছিল না।[২৮৪] মনু বিধান দিয়েছেন, রাজার আদেশে চণ্ডাল ও শ্বপাকদের চিহ্নিত করে পৃথক্ করা উচিত।[২৮৫] চণ্ডালদের কপালে ও শরীরের অন্যান্য অংশে উত্তপ্তশলাকা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে—রাঘবানন্দের এই ব্যাখ্যার সমর্থনে কোন সমসাময়িক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত চণ্ডাল ও শ্বপাকদের কোন এক ধরনের পোশাক পরতে হতো যা দিয়ে অন্যান্যদের থেকে তাঁদের আলাদা করা হতো।[২৮৬] নিজ জাতির ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরা বিবাহ, ঋণ, ধার ইত্যাদি বিষয়ে কোনরকম আদান-প্রদান করতে পারতেন না। মনু বিধান দিয়েছেন, উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের পক্ষে এমনকি নিজের হাতে তাদের শস্য দেওয়াও অনুচিত।[২৮৭]

মনু কিন্তু বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে সবরকমের সংস্রব পরিহার করতে চান। তিনি ব্যবস্থা দিয়েছেন, চণ্ডাল, পুক্কস, অন্ত্য ও অন্ত্যাবসায়ীদের সঙ্গে স্নাতক-এর (সাধারণত ব্রাহ্মণ) বাস করা উচিত নয়।[২৮৮] শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে যাদের ব্রাহ্মণদের দিকে তাকানো উচিত নয় তাদের মধ্যে আছে চণ্ডাল, গ্রামের শুয়োর, মোরগ, কুকুর ইত্যাদি।[২৮৯] মনু আরও ঘোষণা করেছেন, যদি কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বা অন্ত্য রমণীর সঙ্গে মিলিত হন বা তাদের খাদ্য আহার করেন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এসব কাজ করলে তিনি তাঁদের পর্যায়ে পতিত হবেন।[২৯০] এর থেকে বোঝা যায়, অব্রাহ্মণদের সঙ্গে চণ্ডালদের এই জাতীয় সম্পর্ক থাকলে কঠোর আপত্তি উঠত না।

২৮৩. মনু ১০।৪৯-৫০। বালচরিত, ২।৫; অবিমারক, ৬।৫-৬। পুসলকর, 'ভাস—আ স্টাডি', পৃ ৩৫৮ ও ৩৯১।

২৮৪. মনু ১০।৫৪-৫৫। ২৮৫. ...চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ। মনু ১০।৫৫।

২৮৬. মেধাতিথি এই চিহ্নগুলোকে ধরেছেন "অপরাধীদের বধের জন্য কাঁধে বওয়ার কুঠার, পরশু ইত্যাদি"। গোবিন্দরাজ ব্যাখ্যা করেছেন, "দণ্ড ইত্যাদি", আর সর্বজ্ঞনারায়ণের মতে, "লোহ অলংকার, ময়ূরপুচ্ছ ইত্যাদি"। (সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট, ২৫, পৃ ৪১৫, টী. ৫৫)। তুলনীয়: অতীন্দ্রনাথ বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৩৭।

২৮৭. কুল্লুক বলেছেন, এ কাজ ভৃত্যদের দিয়ে করাতে হবে। মনু ১০।৫৩-৫৪।

২৮৮. মনু ৪।৭৯। ২৮৯. ঐ, ৩।২৩৯। ২৯০. ঐ, ১১।১৭৬।

অস্পৃশ্য ও সংকর জাতিদের মনু শূদ্র বলে গণ্য করতেন কিনা তা ঠিক বোঝা যায় না। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, শাস্ত্রে চারটি বর্ণ আছে।[২৯১] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে যে সংকর জাতিদের শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত করা হয়েছিল। এঁদের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন অতিকথা থেকে দেখা যায়, তাঁদের শিরায় শূদ্ররক্তই থাকার কথা। মনুর একটি শ্লোকের টীকায় কুল্লূক অন্ত্যজকে শূদ্ররূপে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯২] কিন্তু অন্ত্যজ শব্দটি 'মনুস্মৃতি'তে চণ্ডাল অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে।[২৯৩] সূত, বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা এবং আয়োগব-এর মতো বিভিন্ন সংকর জাতি 'বাহ্য' নামে পরিচিত ছিল এবং ভাষ্যকাররা এঁদের চাতুর্বর্ণ্যপ্রথার বাইরের মানুষ বলেই গণ্য করতেন।[২৯৪] ব্যভিচারের অপরাধে শাস্তি প্রসঙ্গে মনু অন্ত্যজ ও শূদ্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন,[২৯৫] এবং অন্ত্যাবসায়ী ও শূদ্রের মধ্যে বিভেদ করেছেন তাঁর সাক্ষ্যদান বিধির ক্ষেত্রে। কিন্তু 'নিরবসিত' শূদ্রদের পতঞ্জলি চণ্ডাল ও 'মৃতপ' রূপে নির্দেশ করেছেন। তাঁদের বাসনপত্র উচ্চ-বর্ণের লোক ব্যবহার করতে পারবেন না।[২৯৬] এর থেকে আভাস পাওয়া পাওয়া যায় যে এই অস্পৃশ্যদের শূদ্র বলে গণ্য করা হতো। এই ধরনের শূদ্রদের জন্য মনু 'অপপাত্র' (অর্থাৎ যাদের পাত্র ব্যবহার করা যাবে না) শব্দটিও প্রয়োগ করেছেন।[২৯৭] ফলত মনে হয়, সংকর জাতি ও অস্পৃশ্যরা নিকৃষ্ট শূদ্র হিসেবে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। পৃথক্ বাসস্থান, পশ্চাৎপদ সংস্কৃতি ও আদিম ধর্মীয় বিশ্বাস দিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাধারণ শূদ্রদের পার্থক্য করা হতো।

অন্ন, সংস্রব ও শূদ্রা-বর্জন সংক্রান্ত মনুর বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রধানত ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[২৯৮] পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' ব্রাহ্মণ ও বৃষলের মধ্যে এই ধরনের সামাজিক দূরত্ব দেখা যায়। ফলে ব্রাহ্মণের দাঁত সাদা,

২৯১. ১০।৪। ২৯২. মনু ৮।২৭৯।

২৯৩. ঐ, ৪।৬। পরবর্তী সূত্রাদিতে 'অন্ত্যজ' বলতে রজক, চর্মকার, নট, বুরুদ, কৈবর্ত, ভিল্ল ও মেদ বোঝায়। রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'সাম আসপেক্‌ট্‌স্ অফ দ হিন্দু ভিউ অফ লাইফ অ্যাকর্ডিং টু দ ধর্মশাস্ত্র', পৃ ১১৫-১৬-য় পরাশর ও অত্রি-র উদ্ধৃতি।

২৯৪. মনু ১০।২৯-৩১, মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ ও কুল্লূকের ভাষ্য সমেত।

২৯৫. মনু ৮।৩৮৫।

২৯৬. যৈর্ভুক্তে পাত্রং সংস্কারেণাপি ন শুধ্যতি তে নিরবসিতাঃ। পাণিনি ২।৪।১০ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

২৯৭. মনু ১০।৫১।

২৯৮. মহাবস্তু, ১ম, পৃ ১৮৮-তে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—এই দুটি শব্দ দিয়েই সমগ্র জনসমষ্টিকে ধরা হয়েছে।

বৃষলের কালো[২৯৯] : ব্রাহ্মণ উচ্চ আসন লাভ করেন, কিন্তু বৃষল নীচু।[৩০০] কোন ব্যক্তি বৃষলী দাসীর সঙ্গে অবৈধ ও অসম্মানজনক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে পারেন কিন্তু ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করা উচিত।[৩০১] ভাণ্ডারকর যুক্তি দিয়েছেন যে, চার বর্ণের প্রত্যেকটির লোক নিয়ে বৃষলরা আর্য সম্প্রদায়ের ধাঁচে একটি সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন।[৩০২] কিন্তু বৃষলরা সাধারণভাবে শূদ্রদের সঙ্গে অভিন্ন ছিলেন। ফলে বিভিন্ন ধর্মসূত্রে যখন শূদ্রের সঙ্গে স্নাতকের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করা হয় তখন মনু তাঁকে বৃষলের সঙ্গে ভ্রমণ না করার নির্দেশ দেন।[৩০৩] ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের সবরকম সংযোগ নিষেধ প্রসঙ্গেই তিনি ব্রাহ্মণ-বৃষলী সংযোগের নিন্দা করেন।[৩০৪] যদিও 'মহাভাষ্য'র কোথাও "বৃষল" শব্দটি পরিষ্কারভাবে শূদ্র বোঝায় না,[৩০৫] তাহলেও বৃষলী ও দাসীর ছিল সমান মর্যাদা।[৩০৬] বৃষলের সুপরিজ্ঞাত দারিদ্র্য[৩০৭] থেকে দেখা যায়, তাঁর অবস্থা শূদ্রের চেয়ে কোন অংশেই ভালো ছিল না। শূদ্র শব্দটির মতো বৃষল শব্দটিকে বর্বর ও অপ্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীর জন্য যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বৃষলের তাৎপর্য হলো চতুর্থ বর্ণের মানুষ এবং 'মহাভাষ্যে' ব্রাহ্মণ ও বৃষলের প্রতিতুলনা তাই ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের প্রতিতুলনা অর্থেই নেওয়া উচিত।

বেদচর্চা দ্বিজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার যে প্রাচীন অনুজ্ঞা—মনু তার পুনরাবৃত্তি করেছেন।[৩০৮] দ্বিজের তুলনায় শূদ্রদের বলা হয় 'একজাতি', অর্থাৎ একবার জন্ম হয়েছে।[৩০৯] আর্যের প্রথম জন্ম হয় তাঁর মায়ের গর্ভে, কিন্তু মুঞ্জ ঘাসের মেখলা পরলে তাঁর দ্বিতীয় জন্ম হয়।[৩১০] অতএব যে-দ্বিজ বেদচর্চা না করে অন্যান্য বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করেন, তিনি শূদ্রে পরিণত হন, তাঁর বংশধরদেরও একই অবস্থা হয়।[৩১১] বেদপাঠের সময়ে শূদ্রের উপস্থিতি সযত্নে পরিহার করতে হবে।[৩১২]

২৯৯. পাণিনি ২।২।৮, ১১ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৩০০. পাণিনি ২।২।১১ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৩০১. পাণিনি ১।৩।৫৫ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৩০২. সাম আসপেক্ট্স্ অফ এনশেন্ট ইণ্ডিয়ান কালচার', পৃ ৫১ ও ৫৪।

৩০৩. ৪।১৪০।

৩০৪ মনু ৩।১৯।

৩০৫. এস. কে. বোস, 'ইণ্ডিয়ান কালচার', ২, পৃ ৫৯৬-৯৭।

৩০৬. পাণিনি ২।৩।৬৯ ও ১।২।৪৮ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৩০৭. পাণিনি ১।২।৪৭ ও ৬।৩।৬১ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি।

৩০৮. ২।১৬৫।

৩০৯. মনু ১০।৪।

৩১০. ঐ, ২।১৬৯-৭০।

৩১১. মনু ২।১৬৩। তুলনীয় : ২।১৭২, ১০।১১০। বলা হয়েছে, বালিকা ও শূদ্রের উপনয়ন হতো কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই (রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'পলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল আসপেক্ট্স্ অফ দ সিস্টেম অফ মনু', পৃ ১৪৫)। কিন্তু তার কোন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না।

৩১২. মনু ৪।৯৯ ও ১০৮।

এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও কিছু আচার্যের কথা জানা যায় যাঁরা শূদ্রদের শিক্ষা দিতেন। মনু বিধান দিয়েছেন, যিনি শূদ্র ছাত্রকে শিক্ষা দেন বা শূদ্র শিক্ষকের থেকে শিক্ষালাভ করেন তাঁকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা উচিত নয়।[৩১৩] শূদ্র গুরু বা ছাত্রের মাধ্যমে অপ্রাতিষ্ঠানিকদের বোঝানো হচ্ছে কিনা তা পরিষ্কার নয়। যাঁরা আচার্যের কাছে শিক্ষালাভ করতে পারেন এমন দশ ধরনের ব্যক্তির তালিকায় 'শুশ্রূষু'-র নাম পাওয়া যায়, যাঁকে কুল্লূক ভৃত্য ('পরিচারক')[৩১৪] অর্থে গ্রহণ করেছেন। শব্দটি শূদ্রকে বোঝাতে পারে।

কিন্তু শূদ্রদের সাধারণত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হতো বলেই মনে হয়। বশিষ্ঠের মতো মনুও বিধান দিয়েছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে শূদ্রকে উপদেশ দেওয়া বা ধর্ম ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।[৩১৫] এই ব্যবস্থাটিকে জোরদার করার জন্য তিনি একটি বিধি প্রণয়ন করেছেন। সেই বিধি অনুসারে যে-ব্যক্তি উপরের আদেশ লঙ্ঘন করবেন তিনি যাঁকে শিক্ষা দেবেন তাঁর সঙ্গে (তিনিও) 'অসংবৃত' নরকে পতিত হবেন।[৩১৬]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈদিক যজ্ঞের অধিকার থেকে শূদ্ররা বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছিলেন।[৩১৭] বলা হয়েছে যে শূদ্র জাতি হারাতে পারেন না ; ধর্মীয় সংস্কারে তাঁর কোন অধিকার নেই এবং আর্যদের ধর্ম অনুসরণ করার অধিকারী তিনি নন।[৩১৮] কোন দ্বিজ তাঁর শূদ্রা স্ত্রীকে (দৈনন্দিন) ধর্মকার্য পালনের সঙ্গে যুক্ত করবেন না।[৩১৯] তিনি যদি মোহবশত তা করেন তাহলে তাঁকে চণ্ডালের তুল্য ঘৃণ্যরূপে গণ্য করা হবে।[৩২০] বিধিটি বোধ হয় ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে। এও বলা হয়েছে যে যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের কাছে ভিক্ষা করবেন না ; করলে, মৃত্যুর পরে তাঁর চণ্ডাল-জন্ম হবে।[৩২১]

কিন্তু এক শ্রেণীর পুরোহিত ছিলেন যাঁরা শূদ্রদের ধর্মীয় প্রয়োজনে পৌরোহিত্য করতেন। মনু বলেন, যাঁরা শূদ্রের থেকে সম্পদ নিয়ে অগ্নিহোত্র করেন ও তার হয়ে পৌরোহিত্য করেন ব্রহ্মবাদীরা (বেদের আবৃত্তিকার) তাঁদের 'শূদ্র ঋত্বিক্' (পুরোহিত) বলে নিন্দা করেন এবং তাঁরা অজ্ঞ বলে বিবেচিত হন।[৩২২] মনুর একটি শ্লোকের ভাষ্যে কুল্লূক বলেছেন, শূদ্ররা ছোটখাট গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান ('পাকযজ্ঞ') পালন করতে পারেন।[৩২৩] শূদ্ররা যে বিনামন্ত্রে দেবদেবীর অর্চনা করতেন ভাস (-এর নাটক) থেকে তা জানা যায়।[৩২৪] মনু ঘোষণা করেছেন, ধার্মিক শূদ্র যদি শিষ্ট ব্যক্তির অভ্যাস অনুকরণ করে তাহলে সে প্রশংসা পায়, কিন্তু বৈদিক মন্ত্র পাঠ না করে

৩১৩. ৩।১৫৬। ৩১৪. মনু ২।১০৯।
৩১৫. ঐ, ৪।৮০। ৩১৬. ঐ, ৪।৮১।
৩১৭. পাণিনি ৪।১।৯৩ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি। ৩১৮. মনু ১০।১২৬।
৩১৯. ঐ, ৯।৮৬। ৩২০. ঐ, ৯।৮৭। ৩২১. ঐ, ১১।২৪।
৩২২. ঐ, ১১।৪২-৪৩। ৩২৩. ঐ, ১০।১২৬। ৩২৪. প্রতিমা নাটক, ৩।৫।

এ-কাজ করতে হবে।[৩২৫] তিনি এ-বিধানও দিয়েছেন যে, উচ্চ তিন বর্ণের মতো শূদ্ররা তাদের পূর্বপুরুষদের অর্ঘ্য জল দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শূদ্রদের পিতৃলোক সুকালিন এবং বশিষ্ঠ তাঁদের জন্মদাতা।[৩২৬] এই সবের থেকে দেখা যায়, মনু শূদ্রদের কিছু ধর্মীয় অধিকার দিয়েছেন যা মৌর্য বা প্রাগ্-মৌর্য যুগে তাঁদের ছিল না।

এ-যুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব শূদ্রদের কাছে এক বিকল্পের সন্ধান দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য প্রথা তাঁদের উপর যেসব ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল তার থেকে তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন। বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীজাতির কাছে বিষ্ণু-উপাসনা দিয়েছিল মুক্তির প্রতিশ্রুতি। যে-সব গ্রীক ও কুষাণ রাজা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা শূদ্রদের প্রতি আরও উদার ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করে থাকতে পারেন। সম্ভবত এই কারণেই ভারতে যেসব রাজার বৈদেশিক সংযোগ ছিল, বিভিন্ন মহাকাব্যে ও পুরাণে তাঁদের শূদ্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চতুবর্ণের প্রত্যেকের জন্য মনু নৈতিক আচরণ বিধি নির্দেশ করেছেন। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ইন্দ্রিয়সংযম, অবিদ্বেষ এবং শুধু নিজ স্ত্রীর থেকে সন্তানলাভ—তাঁরা এগুলি পালন করবেন।[৩২৭] কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শূদ্র ও নারীদের তিনি সমাজের সবচেয়ে অশুচি বলে মনে করতেন। চান্দ্রায়ণ ব্রতপরায়ণ যজমান তাঁদের পরিহার করবেন।[৩২৮] তিনি এঁদের অপেক্ষাকৃত কম কঠোর শুদ্ধি আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩২৯] শূদ্র মাসে একবার ক্ষৌরকর্ম করে নিজেকে শুচি রাখবে এবং বৈশ্যের মতো জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে অশৌচ পালন করে শুদ্ধ হবে।[৩৩০] বৈশ্য ও শূদ্রের অশুদ্ধির কাল যথাক্রমে পনের দিন ও এক মাস—প্রাচীন সূত্রকারদের এই মত মনু কিন্তু সমর্থন করেছেন।[৩৩১] তিনি আরও বলেছেন, অশৌচের পর্ব শেষ হলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হতে পারেন জল স্পর্শ করে, ক্ষত্রিয় তাঁর বাহন ও অস্ত্র, বৈশ্য প্রতোদ ( পশুতাড়ন-দণ্ড ) বা বল্গা এবং শূদ্র তার যষ্টি স্পর্শ করে।[৩৩২] মনু এই বিধানও দিয়েছেন, শূদ্র যেন ব্রাহ্মণের শব বহন না করে, কারণ সে যদি আহুতি ছুঁয়ে অশুচি করে তাহলে সেই মৃতব্যক্তি স্বর্গে পৌঁছবে না।[৩৩৩] এইভাবে, ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পরেও তিনি তার সঙ্গে শূদ্রের পার্থক্য বজায় রেখেছেন।

পুরাণে কলিযুগের যে-বর্ণনা আছে তাকে যদি প্রাগ্-গুপ্ত যুগে প্রচলিত

৩২৫. মনু ১০।১২৭।

৩২৬. ঐ, ৩।১৯৬-৯৮। মনু ৮।১৪০ ও ১।৩৫-এ বশিষ্ঠকে যথাক্রমে ধর্মশাস্ত্রকার ও দশ প্রজাপতির অন্যতম রূপে দেখা যায়।

৩২৭. মনু ১০।৬৩। ৩২৮. ঐ, ১১।২২৪।

৩২৯. ঐ, ৫।১৩৯। 'দাস' ও 'ভার্যা'কে পতঞ্জলি এক পর্যায়ে রেখেছেন ( পাণিনি ২।১।১ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি )।

৩৩০. মনু ৫।১৪০। ৩৩১. ঐ, ৫।৮৩। ৩৩২. ঐ, ৫।৯৯। ৩৩৩. ঐ, ৫।১০৪।

অবস্থার ক্ষীণ নিদর্শন বলেও ধরা হয়[৩৩৪] তাহলে দেখা যাবে, শূদ্ররা সে-সময়ের সামাজিক প্রথা প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করেছিলেন। শূদ্ররা যেসব সীমা লঙ্ঘনের কাজ করেছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় 'কূর্ম পুরাণে' : "রাজার অজ্ঞ কর্মচারীরা ব্রাহ্মণদের আসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন ও তাঁদের প্রহার করেন। পরিবর্তমান সময়ের ফলে ব্রাহ্মণরা রাজার কাছে অসম্মানিত হন ও শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চ আসন অধিকার করেন। যেসব ব্রাহ্মণ বেদে কম পারদর্শী, কম সৌভাগ্যবান ও দুর্বল তাঁরা ফুল, বিবিধ ভূষণ ও অন্যান্য পূত দ্রব্য দিয়ে শূদ্রদের সম্মান করেন। এইভাবে সম্মানিত হলেও শূদ্ররা এমনকি ব্রাহ্মণদের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। শূদ্রদের গৃহে প্রবেশ করার সাহস ব্রাহ্মণদের নেই। তাঁরা শূদ্রদের সম্মান জ্ঞাপনের সুযোগের অপেক্ষায় তাদের গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন। যেসব ব্রাহ্মণের জীবনধারণ শূদ্রদের উপর নির্ভরশীল, শূদ্ররা কোথাও আসন গ্রহণ করলে তাঁরা তাদের ঘিরে ধরেন যাতে তাঁরা তাদের প্রশংসা করতে পারেন ও বেদশিক্ষা দিতে পারেন।"[৩৩৫] খানিকটা একই ধরনের ছবি 'মৎস্য পুরাণে'ও পাওয়া যায়। সেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, শ্রুতি ও স্মৃতির ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বর্ণাশ্রম শিথিল হয়ে যাবে। এই বলে দুঃখ করা হয়েছে যে, সংকর জাতি থেকে মানুষের উৎপত্তি হবে, শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বসবে, অন্ন গ্রহণ করবে এবং তাঁদের সঙ্গে যজ্ঞ ও মন্ত্রোচ্চারণ করবে।[৩৩৬] 'বায়ু পুরাণ' ও 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে' বলা হয়েছে, কলিযুগে শূদ্ররা ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করবেন আর ব্রাহ্মণরা শূদ্রের মতো। এইসব পুরাণ থেকে জানা যায়, শূদ্রদের সবাই সম্মান করেন এবং রাজা ব্রাহ্মণদের রক্ষণাবেক্ষণ না করায় তাঁরা জীবনধারণের জন্য শূদ্রদের উপর নির্ভরশীল।[৩৩৭]

উপরের বিভিন্ন বিবৃতি সম্ভবত পূর্ববর্তী খৃস্টীয় শতকগুলির অবস্থা-সম্পর্কিত। মনে হয়, অশোকের সময়ের ক্ষেত্রে কথাগুলো প্রযোজ্য নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশোকের সম্পূর্ণ উৎসাহ সত্ত্বেও—পৌরাণিক বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁকে যেভাবে দেখানো হয়েছে—ব্রাহ্মণের প্রতি তেমন অসহিষ্ণুতার দোষে তাঁকে অভিযুক্ত করা যায় না। 'কূর্ম পুরাণে' কলিযুগের যে বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তার সময়কাল ৭০০-৮০০ খৃস্টাব্দ ধরলেও[৩৩৮] এটি মৌর্যোত্তর যুগেরই অভিমুখী। এই বর্ণনার কয়েকটি অংশের সঙ্গে হুবহু মিল পাওয়া যায় এর আগের 'বায়ু পুরাণ' ও 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে'।[৩৩৯] খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম অর্ধের একটি প্রস্তলেখে বলা হয়েছে যে পল্লবরাজা সিংহবর্মা কলিযুগের

৩৩৪. হাজরা, 'পুরাণিক রেকর্ডস', পৃ ২০৮-১০।

৩৩৫. কূর্ম পুরাণ, ৩০ অধ্যায়, পৃ ৩০৪-০৫। ৩৩৬. মৎস্য পুরাণ, ২৭২।৪৬-৪৭ ইঃ।

৩৩৭. বায়ু পুরাণ, ৫৮।৩৮-৪৯ ; ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ২য় ভাগ, ৩১।৩৯-৪৯।

৩৩৮. হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৮।

৩৩৯. এইসব পুরাণে কলিযুগ-বিষয়ক অংশগুলোকে হাজরা খৃস্টীয় ২০০-২৭৫-এর মধ্যে ফেলেছেন (পূর্বোক্ত. পৃ ১৭৪-৭৫)।

দোষ থেকে ধর্মকে উদ্ধারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত।[৩৪০] এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে কলিযুগের ধারণা খুব প্রাচীন নয়।[৩৪১] আগে যেমন দেখানো হয়েছে, কলিযুগের বর্ণনায় ম্লেচ্ছ ও বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর পারস্পরিক মিশ্রণের যে-উল্লেখ আছে তা মৌর্যোত্তর যুগের প্রচলিত অবস্থার সঙ্গে আরও ভালোভাবে মেলে। বিদেশী শাসকরা ব্রাহ্মণদের হত্যা করবে ও অন্যান্যদের স্ত্রী ও ধনসম্পদ হরণ করবে—এই ধরনের বিভিন্ন পৌরাণিক বিবৃতি সাধারণত এ-যুগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য,[৩৪২] এবং 'যুগ পুরাণে'র ঐ একই মর্মের নানান অভিযোগের সঙ্গে তার ভাবগত সাদৃশ্য আছে।[৩৪৩]

ব্রাহ্মণদের অভিযোগ ও ভবিষ্যদ্‌বাণীর মাধ্যমে কলিযুগের যে-বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,[৩৪৪] তাকে কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এইসব বর্ণনা থেকে গ্রীক, শক ও কুষাণদের কার্যকলাপের ফলে ব্রাহ্মণদের শোচনীয় অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। এও হতে পারে যে তাঁদের আক্রমণের ফলে যাঁদের বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল সেই শূদ্রদের মধ্যে একটা অভ্যুত্থান ঘটেছিল। যে-ব্রাহ্মণরা তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার স্রষ্টা তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সেই ব্রাহ্মণদের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সামাজিক বিক্ষোভ কতদিন ধরে ও দেশের কোন্‌ অংশে চলেছিল তথ্যের অভাবে তা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু মনে হয় অপ্রাতিষ্ঠানিক 'শূদ্র' রাজাদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের তীব্র শত্রুতার কারণ তাঁরা শূদ্রদের পক্ষ নিয়েছিলেন। শক ও কুষাণের মতো বিদেশী শাসকরা বর্ণবিভক্ত সমাজের মতাদর্শের প্রতি অনুগত ছিলেন না। তাঁদের নীতির ফলে দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক হিসেবে শূদ্রদের দাসসুলভ অবস্থা হয়তো দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে সমাজের অবস্থা বোধহয় মিশরের প্রাচীন রাজত্বের পতনের পরবর্তী অবস্থার অনুরূপ। সেখানে জনগণ কিছুকাল পুরোহিত ও অভিজাতদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা তছনছ

৩৪০. কলিযুগদোষাবসান্ন-ধর্ম উদ্ধারণ-নিত্য সন্নদ্ধস্য। এপি. ইণ্ডিকা, ৮, প্রত্নলেখ নং ১৫, পঙ্‌ক্তি ১০।

৩৪১. পার্জিটর মনে করেন, ভারত-যুদ্ধের সময় থেকে কলিযুগের সূচনা। কিন্তু যুগান্তে কলিযুগের পাপের বিবরণ, মনে হয়, মৌর্যদের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের মধ্যবর্তী নৈরাজ্যের পর্বকেই নির্দেশ করে।

৩৪২. জায়সবাল, 'হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া ( এ. ডি. ১৫০-৩৫০ )', পৃ ৫১-৫২।

৩৪৩. ঐ, পৃ ৪৬। যুগ পুরাণ, ৯৫ ইঃ। গ্রীক বিজয়ের পরিণামই 'যুগ পুরাণে'র চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি-না এ-বিষয়ে টার্ন সন্দিহান। 'দ গ্রীকস্‌ ইন বাকট্রিয়া অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া', পৃ ৪৫৬।

৩৪৪. আসিরিয়ার পতন বর্ণনা প্রসঙ্গে হিব্রু ভবিষ্যদ্‌বক্তারাও অনুরূপ রচনারীতি অবলম্বন করেছিলেন।

করে দিয়েছিলেন। অতএব অশোকের ব্যবস্থাদি ব্যর্থ করার চেয়ে মনুর বিভিন্ন বিধানের উদ্দেশ্য ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের ভাঙনের পরবর্তী বিভিন্ন অসংহতির শক্তিকে প্রতিহত করা। শূদ্ররা কাজ করতে অস্বীকার করার ফলেই নিঃসন্দেহে তাঁর পক্ষে শূদ্রদের দাসসুলভ প্রকৃতির প্রতি প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রাজাকে তিনি বৈশ্য ও শূদ্রদের কাজ করতে বাধ্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩৪৫] এর থেকে বোঝা যায়, উচ্চ দুই বর্ণের সঙ্গে একই স্বার্থের অংশীদার হওয়ার মতো কোন মনোভাব জনগণের ছিল না। মনু রাজাকে বর্ণ-ধর্ম সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ যে-রাজ্য বর্ণের পারস্পরিক মিশ্রণে অশুচি হয়, সেই রাজ্য তার অধিবাসীসহ বিনষ্ট হয়ে যায়,[৩৪৬] অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন হুকুমনামা জারি করে নানান ধরনের মানুষকে তাঁদের নিজস্ব বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে মনুর বিভিন্ন ব্যবস্থার মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনু কয়েকটি আত্মিক নিষেধাবিধিও প্রয়োগ করেছেন। যদি কোন শূদ্র তার কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তার চৈলাশক ( কাপড়ে যে পোকা থাকে তা-ই খেয়ে বাঁচে এমন প্রেত )-রূপে জন্ম হয়।[৩৪৭] কিন্তু বিশ্বস্তভাবে কর্তব্য সম্পাদন করলে পরের বারে উচ্চ জন্ম হয়।[৩৪৮]

শূদ্রদের বৈরী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মনু বেশ কয়েকটি সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। কৌটিল্যের বিপরীতে তিনি নির্দেশ করেন যে প্রধানত আর্য-অধ্যুষিত দেশে রাজার বসতি স্থাপন করা উচিত,[৩৪৯] কারণ যে-রাজত্বে শূদ্রের সংখ্যা বেশি ( 'শূদ্রভূয়িষ্ঠ' ) অচিরেই তা বিনষ্ট হয়।[৩৫০] যাঁরা আর্যের মতো জীবনযাপন করেন, মনু শুধু তাঁদের জন্যই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অধিকার সীমিত রেখেছেন।[৩৫১] তিনি আরও বলেন, যেসব অনার্য ( অর্থাৎ শূদ্র ) আর্যের চিহ্ন ধারণ করেন তাদের কণ্টকরূপে গণ্য করা এবং অবিলম্বে উৎপাটন করা উচিত।[৩৫২] সংকর জাতিদের ( অধিকাংশই শূদ্র ) বিশেষ করে অনার্য বলে বিবেচনা করা হতো, তাঁরা নিষ্ঠুর ও ক্রূর।[৩৫৩] শূদ্রদের প্রতি মনুর সম্পূর্ণ অনাস্থা এবং ফলত তাঁদের বৈরী

৩৪৫. মনু ৮.৪১৮। ৩৪৬. ঐ, ১০।৬১।

৩৪৭. ঐ, ১২।৭২। ৩৪৮. ঐ, ৯।৩৩৭।

৩৪৯. মনু ৭।৬৯। বলা হয়েছে, দেশকে হতে হবে 'অনাবিলম্'। ব্যাখ্যায় ভাষ্যকাররা ( নারায়ণ ও নন্দ ) বলেছেন 'বর্ণসংকর দোষমুক্ত' ( সেক্রেড বুক্স্ অফ দি ইস্ট, ২৫, পৃ ২২৭ )।

৩৫০. ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা—এ দিয়ে শূদ্র বিচারক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে—কল্পিত বলে মনে হয়।

৩৫১. মনু ৯।২৫৩। ৩৫২. ঐ, ৯।২৬০। ৩৫৩. ঐ, ১০।৫৭-৫৮।

কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাবধান হওয়ার জন্য দুশ্চিন্তার অভিব্যক্তি দেখা যায় তাঁর এইসব বিবৃতিতে। হয় এই কার্যকলাপের আশংকা ছিল, নয়তো বৈদেশিক আক্রমণের সময়ে সত্যই এরকম ঘটেছিল। মনু যখন নির্দেশ দেন যে রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণে যদি উচ্চ তিন বর্ণ তাঁদের কর্তব্যপালনে বাধা-প্রাপ্ত হন তাহলে তাঁদের অস্ত্রধারণ করা উচিত,[৩৫৪] তখন তিনি হয়তো এই জাতীয় পরিস্থিতির কথাই ভেবেছিলেন। 'বায়ু পুরাণে' কলিযুগের শেষ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রমিতির (ভগবান মাধবের অবতার) অভিযানের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সশস্ত্র ব্রাহ্মণদের এক সেনাবাহিনী গঠন করে ম্লেচ্ছ ও বৃষলের মতো বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার কাজে নেমে-ছিলেন।[৩৫৫] বিষয়টিকে একদিকে ব্রাহ্মণ আর অন্যদিকে শূদ্র ও বিদেশী শাসকদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের এক ক্ষীণ প্রতিধ্বনি রূপে গ্রহণ করা যায়। এটাই স্বাভাবিক, কারণ বৃষলদের দেখা হতো প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ধ্বংস-কর্তা রূপে,[৩৫৬] তার রক্ষাকর্তা রূপে নয়। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অপরাধী শূদ্রদের শাস্তির জন্য মনুর বিবিধ বিস্তৃত বিধানের কারণ রূপে প্রধানত শিক্ষিত শূদ্রের প্রতি তাঁর বৈরিতাকে দায়ী করা হয়।[৩৫৭] কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর ব্যবস্থাদি থেকে দেখা যায়, শূদ্র-সাধারণের প্রতিও তিনি কম বৈরী-ভাবাপন্ন ছিলেন না।

পুরাণে কলিযুগের বর্ণনা ও মনুর বিভিন্ন কঠোর শূদ্রবিরোধী ব্যবস্থা এক দীর্ঘকালব্যাপী সামাজিক সংকটের সূচক। মনে হয়, শাসকদের পীড়নই তার কারণ। পুরাণে বারবার বলা হয়েছে, কর, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিতে পীড়িত হয়ে মানুষ ধ্বংস হবে।[৩৫৮] আরও বলা হয়েছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধিতে তারা কষ্ট পাবে।[৩৫৯] 'মহাভারতে'র "আরণ্যকপর্বে" বলা হয়েছে, করভারের আশংকায় কৃষকরা প্রভূত পরিমাণে চুরি করে,

৩৫৪. শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্মো যত্রোপরুধ্যতে।
দ্বিজাতীনাং চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে॥ মনু ৮।৩৪৮।
বশিষ্ঠ ধ.সূ.-তেও এই ব্যবস্থা পাওয়া যায়, কিন্তু এত স্পষ্ট ভাষায় নয় (৩।২৪-২৫)।

৩৫৫. পাটিল, 'কালচারাল লাইফ ফ্রম দ বায়ু পুরাণ', পৃ ৭৪-৭৫-এ উদ্ধৃত। লেখক মনে করেন, এই বর্ণনা গুপ্ত যুগের আগের খৃস্টীয় শতকগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩৫৬. বৃষো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ ধর্মং ন লোপয়েৎ॥ মনু ৮।১৬।
"শান্তিপর্বে"ও এই ব্যবস্থা পুনরাবৃত্ত হয়েছে, কিন্তু তার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য রচনাদিতে এটি পাওয়া যায় না।

৩৫৭. জায়সবাল, মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ৯১-৯২।

৩৫৮. অনাবৃষ্ট্যা বিনংক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ...প্রজাঃ। ভাগবত পুরাণ ১২।২।১০।

৩৫৯. ঐ, ১২।২।১১।

মুনিবেশ ধারণ করে ও বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করবে।[৩৬০] কলিযুগের কথা উল্লেখ করে পুরাণে যোগ করা হয়েছে, লোকে অপরের শস্য ও বস্ত্র অপহরণ করবে।[৩৬১] 'বিষ্ণু পুরাণ' থেকে জানা যায়, কর ও দুর্ভিক্ষ-জনিত পীড়নে উপদ্রুত হয়ে দুঃখী কৃষকরা সেসব অঞ্চলে পালিয়ে যাবে, যেখানে প্রচুর গম ও যব উৎপন্ন হয়।[৩৬২]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও পীড়নমূলক কর ধার্য করাও নিঃসন্দেহে এই ধরনের অবস্থা গড়ে তোলার জন্য অংশত দায়ী। গুরুভার কর আরোপের জন্য কয়েকটি পুরাণে শাসকদের দায়ী করা হয়েছে। 'বিষ্ণু পুরাণ' ও 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে' বলা হয়েছে, বলি, ভাগ, শুল্ক প্রভৃতি করের মাধ্যমে রাজা জীবনধারণ করবেন, কিন্তু তিনি লোককে রক্ষা করবেন না, শুধু নিজের নিরাপত্তার কথাই ভাববেন।[৩৬৩] 'বিষ্ণুপুরাণে' এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে, কলিযুগে রাজা সাধারণের সম্পত্তি হরণ করবেন।[৩৬৪] মানুষ যাতে বেঁচে থাকতে পারে সেই পরিমাণ কর চাপানো উচিত—এই বিষয়ের উপর জোর দিয়ে 'মহাভারতে'র "শান্তিপর্ব" ও অন্যত্র কর ধার্য করার যেসব সুনীতি বিজ্ঞাপিত হয়েছে, শাসকরা যে তা অনুসরণ করতেন না সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলে বৈশ্য কৃষকরা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু প্রচুর শূদ্র বৈশ্যদের সঙ্গে শ্রমিক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, পীড়নমূলক করনীতি তাঁদেরও তাই প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কোন অবস্থাতেই বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্তব্যচ্যুত হতে দেওয়া হবে না, অন্যথায় সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা নেমে আসবে—মনুর এই চরম বিধান আমরা উপরে উল্লিখিত প্রসঙ্গ থেকেই অনুধাবন করতে পারি।

পূর্ববর্তী যুগে প্রধান বিভেদ ছিল শূদ্র ও উচ্চ তিন বর্ণের মধ্যে। মনু যদিও এই পার্থক্য বাহ্যত রক্ষা করেছেন, তাহলেও তাঁর রচনায় বিধিবিধান, খাদ্য ও বিবাহ বিষয়ে বৈশ্য ও শূদ্রের নিকট-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আরও প্রবল

৩৬০. করভয়াৎ পুংসো গৃহস্থাঃ পরিমোষকাঃ। মুনিচ্ছন্মাকৃতিচ্ছন্না বাণিজ্যমুপজীবতে॥ প্রামাণিক সংস্করণ, ৩।১৮৬।৪০; শারদা ১ ও কন্নড় ১ পুঁথিতে 'পরিপোষকাঃ' পদটি আছে।

৩৬১. সস্যাচোরা ভবিষ্যন্তি তথা চৈলাপিহারিণঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (জে. এল. শাস্ত্রী-সম্পাদিত), ১।২।৩১।৬০; বায়ু পুরাণ (এস. আর. আচার্য-সম্পাদিত), ১।৪০।৬০-এ কিছু গৌণ শব্দভেদ আছে।

৩৬২. দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপদ্রুতা জনাঃ (গীতা প্রেস সংস্করণ, বিক্রম সম্বৎ ২০০৯), ৬।১।৩৮। প্রসঙ্গত, বায়ু পুরাণে ধান-উৎপাদক অঞ্চলের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়েছে মনে হয়।

৩৬৩. অরক্ষিতারো হর্তারাশ্শুল্কব্যাজেন পার্থিবঃ। বিষ্ণু পুরাণ, ৬।১।৩৪; ন রক্ষিতারো ভোক্তারো বলিভাগস্য পার্থিবাঃ, স্বরক্ষণপরায়ণঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ১।২।৩১।৪৮।

৩৬৪ হারিণো জনবিত্তানাং সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে। ৬।১।৩৪।

প্রবণতা দেখা যায়। এই সময়ে বিশাল সংখ্যক বৈশ্যকে শূদ্রের পর্যায়ে অবনত করা হচ্ছিল—সম্ভবত তার থেকেই এর উৎপত্তি। 'বিষ্ণু পুরাণে' বলা হয়েছে, বৈশ্যরা কৃষি ও ব্যবসা ত্যাগ করে দাসত্ব ও যন্ত্রশিল্প গ্রহণ করবে,[৩৬৫] আর প্রচলিত সব বর্ণ হবে শূদ্রদের মতো।[৩৬৬] পরম্পরাগত বৈশ্য বর্ণ যে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায় 'মনুস্মৃতি'র একটি অংশ থেকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপর মনু যথাক্রমে সত্যগুণ ('সত্ত্ব') ও কর্মপরায়ণতা ('রজঃ') আরোপ করেছেন,[৩৬৭] আর পূর্বজন্মে বিভিন্ন কর্মের ফলে উৎপন্ন তমোগুণ, 'মধ্যমা তামসী গতি'র প্রতিনিধি রূপে শূদ্র ও ম্লেচ্ছদের একত্র রাখা হয়েছে।[৩৬৮] কিন্তু এই প্রসঙ্গে বৈশ্যের কোন উল্লেখ নেই। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে যে বৈশ্যরা শূদ্র-সাধারণের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন।

হপকিন্স বলেন, মনুর কিছু বিধান একদিকে উচ্চ দুই বর্ণ ও অন্যদিকে নিম্ন দুই বর্ণের মধ্যে বিরুদ্ধতাসূচক।[৩৬৯] মনে হয়, এই সংঘাতে উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও শূদ্ররা। এমনকি পূর্ববর্তী বিভিন্ন যুগেও শূদ্র ও অন্যান্য বর্ণের মধ্যে অল্পাধিক সংঘাতের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু মৌর্যোত্তর যুগে এই সংঘাত তীব্র ও হিংসাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। মনু-বিষয়ক একটি গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে, ভারতীয় ধাঁচে পরিকল্পিত সমাজে অর্থনৈতিক অসাম্য ও প্রতিঘাত দেখা দিতে পারত না বললেই হয়।[৩৭০] কিন্তু মনুর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে-সম্পর্ক প্রচলিত ছিল তার প্রকৃতি থেকে এটি সমর্থিত হয় না। মনু পরিষ্কার বলেছেন, শূদ্রকে ধনসম্পদ বৃদ্ধি করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, কারণ সে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেবে।[৩৭১]

কিন্তু শূদ্রদের বিরুদ্ধে মনুর বিভিন্ন কুৎসাকে মৌর্যোত্তর যুগে তাঁদের চরমতম দুরবস্থার লক্ষণ মনে করাও উচিত হবে না। নতুন নতুন শক্তির উদ্ভবে শঙ্কিত, প্রাচীন ধাঁচের সমাজকে বজায় রাখার জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন মরিয়া ব্যবস্থার লক্ষণরূপেই এদের দেখা উচিত। এমনকি মনুর ধর্মশাস্ত্রেও শূদ্রদের অবস্থান ঘটিত একাধিক পরিবর্তনকে অস্বীকার করা হয়নি।

৩৬৫. বিষ্ণু পুরাণ ৬।১।৩৬।

৩৬৬. শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে। ঐ, ৬।১।৫১।

৩৬৭. মনু ১২।৪৬-৪৮।

৩৬৮. ঐ, ১২।৪৩।

৩৬৯. হপকিন্স, 'মিউচুয়াল রিলেশন্স অফ দ ফোর কাস্টস ইন মনু', পৃ ৭৮ : তুলনীয় : পৃ ৮২।

৩৭০. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'আসপেক্ট্স অফ দ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ মনু', পৃ ১৫১-৫২। তিনি স্বীকার করেছেন যে, নীতিশাস্ত্রে মাঝে মাঝে "লক্ষপতিদের এক হাত নেওয়া হয়েছে" (পৃ ১৫৯)।

৩৭১. মনু ১০।১২৯।

ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে শূদ্রের সংগ্রামের নতুন নতুন লোকগোষ্ঠীর অবির্ভাব এবং কারু ও হস্তশিল্প বিকাশের ফলেই এসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়।

শূদ্রদের দাসসুলভ অবস্থা সম্পর্কে মনুর পৌনঃপুনিক উক্তি সত্ত্বেও প্রাগ্‌-মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগের মতো একই মাত্রায় দাস ও শ্রমিক রূপে তাঁদের দেখা যায় না। দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করানোর মতো বড় বড় ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় খামারের কথাও শোনা যায় না। মৌর্য রাষ্ট্রীয় খামারে নিযুক্ত দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিকরা এ-সময়ে সম্ভবত করপ্রদায়ী কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। মনু-ই প্রথম লেখক যিনি শূদ্রকে সুস্পষ্টভাবে ভাগচাষী রূপে বর্ণনা করেছেন।[৩৭২] তথ্যটি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে শুধু পরোক্ষে নির্ণয় করা যায়। 'অর্থশাস্ত্রে' ভাগচাষী ('অর্ধসীতিক') যখন উৎপন্নের মাত্র $\frac{1}{5}$ বা $\frac{1}{4}$ ভাগ নিজের কাছে রাখতে পারেন, তখন মনুর রচনা থেকে মনে হয় তিনি হন অর্ধেক অংশের অধিকারী।[৩৭৩] ভাগবৃদ্ধি ছাড়াও ভাগচাষীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। 'অর্থশাস্ত্রে'র বেতনভুক কর্মচারীদের পরিবর্তে মনু বিভিন্ন মর্যাদার অধিকারীদের একটি তালিকা দিয়েছেন, ভূমি-অনুদান দিয়ে যাঁদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হবে।[৩৭৪] কৃষিতে দাসদের নিযুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ না-থাকায় ধরে নেওয়া যায় যে উপরে বর্ণিত জমি চাষ করতেন ভাগচাষী ও ভাড়া-করা শ্রমিক। মনু ছাড়া আর কোন রচনায় সম্ভবত শূদ্রদের সংখ্যা-বৃদ্ধির এত বিপুল প্রসার দেখা যায় না। অসংখ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বিদেশী উপাদানকে আত্তীকরণের জন্য 'বর্ণসংকর' (বিভিন্ন বর্ণের পারস্পরিক মিশ্রণ)-এর কল্পিত ধারাটিকে মনু তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগিয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক কর্তব্য করার ব্যাপারে বিভিন্ন সংকরবর্ণকে শূদ্রদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।[৩৭৫] কিন্তু তাঁদের পূর্বসূরিদের মতো এই শূদ্রদের দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক রূপে নিয়োগ করা হতো বলে মনে হয় না। তাঁরা নিজেদের পুরনো বৃত্তি অনুসরণ করতেন; সম্ভবত তাঁদের কৃষিকর্মের নতুন পদ্ধতি শেখানো হয়েছিল,[৩৭৬] যার ফলে তাঁরা ক্রমশ কর-প্রদায়ী কৃষকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ফলত আদিবাসীদের সভ্য জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে তাঁদের

৩৭২. ৪।২৫৩।

৩৭৩. অর্থশাস্ত্র ২।২৩; মনু ৪।২৫৩। 'অর্থশাস্ত্রে' ভাগচাষী রাষ্ট্রের থেকে জমি পায়, 'মনুস্মৃতি'তে পায় ব্যক্তির থেকে।

৩৭৪. মনু ৭।১১৯। এখানে সামন্ততন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ বীজ পাওয়া যায়।

৩৭৫. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'আসপেক্ট্‌স্‌ অফ দ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ মনু', পৃ ১০৮।

৩৭৬. কোসম্বী. 'জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি', ৭৫, পৃ ৪১।

উপকৃত করার সঙ্গে সঙ্গে, এই নতুন উৎপাদনশীল জনতাকে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত করে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

হস্তশিল্পীদের নতুন নতুন বৃত্তিগোষ্ঠী ('গিল্ড') গঠন ও বিভিন্ন নতুন কারুশিল্পের উদ্ভব শুধু এ-যুগের অর্থনৈতিক জীবনেই নয়, শূদ্রদের অবস্থানেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে।[৩৭৭] সর্বশক্তিমান মৌর্য রাষ্ট্র বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এইসব পরিবর্তন হস্তশিল্পীদের তুলনায়-স্বাধীন হতে সাহায্য করে, ফলে তাঁদের সামাজিক মর্যাদার কিছু উন্নতি হয়েছিল। বৌদ্ধদের উদ্দেশে তাঁদের দানের অসংখ্য প্রত্নলেখভিত্তিক তথ্য থেকে এ-বিষয়ে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কয়েকজন শাসকের আর্থিক নীতিও শূদ্রদের অবস্থান উন্নত করতে পরোক্ষে সাহায্য করেছিল। বর্ণসমাজের সমর্থক,[৩৭৮] শক রাজা রুদ্রদামন দাবি করেছেন, প্রজাদের উপর বাধ্যতামূলক শ্রম না চাপিয়েই তিনি সুদর্শন হ্রদ সংস্কার করিয়েছেন।[৩৭৯] শূদ্র, দাস ও শ্রমিকদের (যাঁরা সাধারণত বেগার খাটতে বাধ্য হতেন) কাছে নিশ্চয়ই এটি বিরাট আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছিল।

নতুন নতুন হস্তশিল্প ও বৃত্তিগোষ্ঠীর বিকাশ সম্পর্কিত লিখিত প্রমাণের সঙ্গে যোগ করা যায় মুদ্রাভিত্তিক প্রমাণ এবং রোম ও ভারতের বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিদেশী পর্যটকদের সাক্ষ্য। এই বাণিজ্য খৃস্টীয় যুগের প্রথম দুই শতকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল,[৩৮০] বিশেষত সাতবাহন অঞ্চলে। বাণিজ্যিক লেনদেনের এই লক্ষণীয় বৃদ্ধি অন্তত বিভিন্ন বাণিজ্য-বন্দর[৩৮১] ও সমুদ্রতীর থেকে দূরের নগরেও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস করেছিল। তার ফলে নিম্নবর্গের সামাজিক অবস্থানেও উন্নতি হয়ে থাকতে পারে।

এ-যুগে বিভিন্ন বিদেশী লোকগোষ্ঠীর আবির্ভাব বর্ণপ্রথার বন্ধন শিথিল করতে সাহায্য করে। সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে বিস্তীর্ণ, কুষাণদের অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, যেমন মুদ্রা, পোড়ামাটির কাজ ও ভাস্কর্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ভারতে আগত গ্রীক, শক ও পার্থিয়দের সংখ্যা প্রচুর না হলেও যথেষ্ট ছিল। স্বভাবতই যাঁরা তখন সেখানে বাস করতেন তাঁদের স্থানচ্যুত হতে হয় ও নতুন নতুন বসতি স্থাপন করতে হয়। ফলত খৃস্টীয়

৩৭৭. স্বাধীন হস্তশিল্পের অস্তিত্বকে মধ্যযুগীয় ইওরোপে সামন্ত-সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বলে সাধারণত গণ্য করা হয়।

৩৭৮. রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখ, ১, পঙ্‌ক্তি ৯। ৩৭৯. ঐ, পঙ্‌ক্তি ১৬।

৩৮০. ওয়ার্মিংটন-এর 'দ কমার্স বিটুইন দ রোমান এম্পায়ার অ্যান্ড ইণ্ডিয়া'-র সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের জন্য হুইলার, 'রোম বিয়ন্ড দি ইম্পিরিয়াল ফ্রন্টিয়ার্স', অধ্যায় ১২-১৩ দ্র.।

৩৮১. ষোলটি উপকূলবর্তী নগরকে টলেমি আলাদা করে 'এম্পোরিয়া' হিসেবে ধরেছেন। হুইলার, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫১।

যুগের প্রথম শতকে গতিশীলতার সঞ্চার ঘটে। যেহেতু জাতিভেদ প্রথা মূলত গতিহীন জীবনযাত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত, এইসব নকুলগত পরিবর্তনের ফলে হয়তো উচ্চবর্ণের বিভিন্ন সুবিধা খর্ব হয় এবং তার জন্য শূদ্রদের অবস্থানও অনুকূলভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।

একইভাবে শূদ্রদের বিধিবিধানগত ও রাজনৈতিক মর্যাদার কিছু উন্নতি লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অপমান করলে তার শাস্তি হবে—মনুর এই বিধান তাৎপর্যপূর্ণ,[৩৮২] কারণ ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণের সব অপরাধই মাফ। অতএব, ব্রাহ্মণ রাজা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি অবর-দের সমর্থন ভিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন[৩৮৩]—এর থেকেই দেখা যায় খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল।

শেষত মনু যে বশিষ্ঠকে শূদ্রদের পূর্বপুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন সেটিও তাঁদের উন্নততর সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানের সূচক।[৩৮৪] শূদ্রেরা যে 'নামধেয়' (নামকরণ) অনুষ্ঠান পালন করতে পারতেন[৩৮৫] তার থেকে বোঝা যায়, তাঁদের ধর্মীয় মর্যাদা বাড়ছিল। কুষাণ রাজাদের উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলেও এ-বিষয়ে উন্নতি হয়ে থাকতে পারে। সনাতন ব্রাহ্মণ্য-বাদের সমর্থক না-হয়ে মুখ্যত শৈব ও বৌদ্ধ হওয়ার ফলে নিম্নতর শ্রেণীর প্রতি তাঁদের মনোভাব সম্ভবত আরও অনুকূল ছিল। বিভিন্ন সাতবাহন রাজত্বে, যেখানে নিঃসন্দেহে খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল, সেখানেও এই একই ফল ফলে থাকতে পারে।

শূদ্রের অবস্থান পরিবর্তনের এইসব লক্ষণ থেকে অনুমান করা যায়, অসংখ্য বাধাবন্ধের ভার বহন করে যে-প্রাচীন সমাজে তিনি ক্রীতদাসের আচরণ পেতেন সেই সমাজের পতন হতে শুরু করেছিল; তার জায়গায় অংশত আসছিল এক নতুন সমাজ যেখানে তিনি উন্নততর অবস্থান লাভ করেন। এই প্রক্রিয়া গুপ্ত যুগে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বারবার 'যুগান্তে'র উল্লেখ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেসব মূল্যবোধ প্রাচীন সমাজের ভিত্তি সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। ফলত, কিছু সময় ধরে, বর্ণসমাজের ভিত্তিরূপে 'জাতি'-র ধারণাকে যে-ভাবে দেখা হতো তার গুরুত্ব সম্পূর্ণ খর্ব হয়। বিদেশী আক্রমণকারীদের আচরণ বর্ণনা করার সময় 'বিষ্ণুপুরাণে' ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে তাঁদের রাজত্বকালে অর্থই আভিজাত্যের হেতু, ধর্মের একমাত্র উৎস হবে ধন ও ধনাঢ্যতাই হবে ধর্ম (সাধুত্ব)।[৩৮৬] এসব

৩৮২. ৮।২৬৮।

৩৮৩. বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবি-র নাসিক গুহালেখ, পঙ্‌ক্তি ৫-৬ (দীনেশচন্দ্র সরকার, সিলেক্‌ট্‌ ইন্‌স্ক্রিপশন্‌স্‌, ১ম, পৃ ১৯৭)।

৩৮৪. ৩।১৯৬-৯৮। ৩৮৫. মনু ২।৩০-৩১।

৩৮৬. ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুঃ ধনমেবাশেষধর্মহেতুঃ…দানমেব ধর্মহেতুঃ আঢ্যতৈব সাধুত্বহেতুঃ। বিষ্ণু পুরাণ ৪।২৪।২১-২৪; তুলনীয়: যুগ পুরাণ ৯৫-১১২।

নতুন মূল্যবোধ সম্ভবত দেশীয় শাসকদের রাজ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তার উৎস ছিল যতটা বিদেশীদের অভিযান ততটাই বর্ণব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংকট। 'মহাভারত' ও পুরাণের কলিযুগ বর্ণনা থেকে সামাজিক সংকটের প্রকৃতি জানা যায়। তার সঙ্গে শূদ্রের অবস্থান-পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ থেকে আভাস পাওয়া যায়, যেসব সামাজিক বিন্যাস শূদ্রকে ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করত ও তাঁদের উপর অসংখ্য বাধানিষেধের ভার চাপিয়ে দিয়েছিল, সেই বিন্যাস তখন ভাঙনের মুখে। সমাজে বর্ণসংকর বা বর্ণব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ার এক অবস্থা দেখা যায়। সেই বিশৃঙ্খলার প্রকৃত অর্থ বৈশ্যদের কর ও ধর্মীয় দান দিতে অস্বীকার করা এবং শূদ্রদের সেবামূলক বিভিন্ন কাজ না-করা। এ দিয়ে শূদ্র হস্তশিল্পীদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিও বোঝাতে পারে। এই অবস্থা সামলানোর জন্য বলপ্রয়োগ ও বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা—এই দু ধরনের ব্যবস্থার উদ্ভাবন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অতিরিক্ত উৎপন্ন ও শ্রম সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য নতুন নতুন উপায়ের চিন্তা করা, যাতে ধর্মীয় ও প্রশাসনিক সংস্থা রক্ষা পায়। শূদ্র ও এমনকি বৈশ্যদের প্রতি মনুর সাধারণভাবে সুতীব্র বৈরিতামূলক মনোভাব তাই বোঝা যায় এবং বোঝা যায়, ঐ একই কারণে 'মনুস্মৃতি'তে[৩৮৭] ও "শান্তিপর্বে"[৩৮৮] 'দণ্ড' বা শাস্তিমূলক ক্ষমতার কেন্দ্রীয় গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এমনকি মনুও শূদ্রদের ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন এবং খৃস্টীয় প্রথম দুই শতকেই ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারপ্রাপ্তদের ও অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের কর্তৃপক্ষদের কিছু ভূমি-অনুদান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগে এসেই এই দুই প্রক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা পরিগ্রহ করে।

৩৮৭. ৭।১৪-৩২। ৩৮৮. প্রামাণিক সংস্করণ, ১৫।২।৯, ১২-১৩।

## সপ্তম অধ্যায়

# কৃষিজীবিতা ও ধর্মীয় অধিকার

( আনু. ৩০০ - ৬০০ খৃস্টাব্দ )

এ-যুগে শূদ্রদের অবস্থা আলোচনা করার প্রধান সূত্র বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়নের স্মৃতি।[১] এদের মধ্যে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, কারণ পরবর্তীকালে এটি উত্তর ভারতে প্রামাণিকতা লাভ করে। সম্ভবত অন্যান্যদের চেয়ে এই স্মৃতির বিভিন্ন বিধানে গুপ্ত যুগের সমাজ-বিকাশের আরও বিশ্বস্ত প্রতিফলন পাওয়া যায়। শূদ্রদের বিরুদ্ধে মনুর প্রান্তবাদী ব্যবস্থাদি এই স্মৃতিগ্রন্থ বর্জন অথবা অগ্রাহ্য করে। এখানে এমনকি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও শাস্তিরূপে তপ্তশলাকা মুদ্রাঙ্কণ ও নির্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[২]

ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা কোন্ কোন্ অঞ্চলে বাস করতেন সে শুধু অনুমানই করা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের কর্মক্ষেত্র ছিল সম্ভবত মিথিলা,[৩] আর নারদ এসেছিলেন, মনে হয়, নেপাল থেকে।[৪] অন্যান্যরাও হয়তো উত্তর ভারতের অধিবাসী ছিলেম। ফলে তাঁদের গ্রন্থে প্রধানত উত্তর ভারতে প্রচলিত অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

এইসব স্মৃতি ধর্মসূত্রের মূলগ্রন্থগুলোর বিস্তার ঘটায় ও অনেক ক্ষেত্রে মনুর বিভিন্ন শ্লোক পুনরুদ্ধৃত করে।[৫] শুধু পাঠভেদ থেকেই পাওয়া যায় নতুন তথ্য, যার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সর্বদা কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

১. স্মৃতিগুলির ক্ষেত্রে কাণে রচনাকাল দিয়েছেন : বিষ্ণু ১০০-৩০০ খৃ, যাজ্ঞবল্ক্য ১০০-৩০০ খৃ, নারদ ১০০-৪০০ খৃ, বৃহস্পতি ৩০০-৫০০ খৃ, কাত্যায়ন ৪০০-৬০০ খৃ। 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ২য়, ভাগ ১, পৃ [১১]। বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি যদিও আগের রচনা বলে মনে হয়, তাহলেও এই সব ধর্মশাস্ত্রকেই গুপ্ত যুগের তথ্যসূত্র রূপে গণ্য করা যায়।

২. যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭০ ; বিষ্ণু ৫।৩। হপকিন্স মনে করেন যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি-র ক্ষেত্রে একথা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম ( 'মিউচুয়াল রিলেশন্স অফ দ ফোর কাস্টস ইন মনু', পৃ ৩১ ), কিন্তু বেশ কয়েকটি ব্যাপারে ঐ স্মৃতি-র জনমুখী মনোভাবের সঙ্গে এর মিল আছে।

৩. হপকিন্স, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২৭৯। ৪. ঐ, পৃ ২৮০।

৫. আদিরূপে 'বৃহস্পতি স্মৃতি'কে হয়তো 'মনুস্মৃতি'রই ধারাভাষ্য হিসেবে পড়া হতো। গায়কোবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ৭৫, ভূমিকা, পৃ ১১৮।

স্মৃতি থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা যায় মাঝে মাঝে তার সমর্থন ও পরিপূরণ হয় 'মহাভারত' ও পুরাণের স্মৃতি-বিষয়ক অংশ থেকে। হপকিন্স মনে করেন, এক বিরাট নীতিমূলক অংশ খৃ পূ ২০০ থেকে ২০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে 'মহাভারতে' ঢোকানো হয়েছিল।[৬] "শান্তিপর্বে"র যেসব শ্লোকের সঙ্গে মনুর শ্লোকের অবিকল সাদৃশ্য আছে সেসব ক্ষেত্রে কথাটি সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু "শান্তিপর্ব" ও "অনুশাসনপর্বে"র বিভিন্ন পাঠ-ভেদ, মনে হয়, পুরাণের স্মৃতি-অংশকে অনুগমন করেছে, যেগুলো পরবর্তী সময়ের রচনা। হপকিন্স মনে করেন, স্ফীতকায় "অনুশাসনপর্ব"টি "শান্তিপর্ব" থেকে পৃথক্ করা হয়েছিল ; ২০০ - ৪০০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এটিকে স্বতন্ত্র পর্বরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৭] খৃস্টপূর্ব যুগের বিভিন্ন পুরাণে স্মৃতি সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর কোন উল্লেখ নেই।[৮] 'বিষ্ণু'[৯], 'মার্কণ্ডেয়'[১০], 'ভবিষ্য'[১১] ও 'ভাগবত পুরাণে'[১২] বিভিন্ন বর্ণের কর্তব্য সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিকে মোটামুটিভাবে গুপ্ত যুগের বলে ধরা যায়।

এ-যুগের বিভিন্ন স্মৃতির একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো তাদের বৈষ্ণব-প্রবণতা। 'বিষ্ণুস্মৃতি', 'বৃহস্পতিস্মৃতি'[১৩], 'বিষ্ণুপুরাণ'[১৪] ও 'মৎস্য পুরাণে'[১৫] এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'মহাভারতে' আরও উদারনৈতিক মতবাদের যে অত বিস্তারিত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় তার কারণ সম্ভবত কৃষ্ণ-অর্চনা ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব।[১৬] পরে যেমন দেখানো হবে, ধর্মীয় পরিমণ্ডলে শূদ্রদের সংকীর্ণ কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু অধিকার দান করা হয়। তাঁদের প্রতি ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করে দিয়েছিল বৈষ্ণব-প্রবণতা।

কালিদাস ও শূদ্রকের লেখা থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোও স্মৃতির মূল চিন্তার অনুগামী। কালিদাসও বর্ণাশ্রম-আদর্শের ছবি এঁকেছেন,[১৭] এবং শূদ্রকের ক্ষেত্রেও সে-কথা সত্য বলে মনে হয়।[১৮]

৬. হপকিন্স, 'দ গ্রেট এপিক অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ৩৯৭-৯৮।

৭. ঐ ; তুলনীয় : 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ২৫৮।

৮. রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা, 'পুরাণিক রেকর্ডস অন হিন্দু রাইটস্ অ্যাণ্ড কাস্টমস্', পৃ ৫।

৯. ঐ, পৃ ১৭৫। ১০. ঐ, পৃ ১৭৪। ১১. ঐ, পৃ ১৪৮।

১২. সম্ভবত খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম অর্ধ। ঐ, পৃ ১৭৭।

১৩. গায়কোবড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ৮৫, ভূমিকা, পৃ ১৭৩।

১৪. হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯।

১৫. ঐ, পৃ ৫১। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের কয়েকটি অধ্যায়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায় (ঐ, পৃ ১৮)।

১৬. তুলনীয় : হপকিন্স, 'এথিকস্ অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ২৪১।

১৭. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, 'হিস্ট্রি অফ স্যানস্ক্রিট লিটরেচর', ভূমিকা, পৃ [৩০]।

১৮. কথিত আছে, শূদ্রক একজন বড় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। জে. শার্পাঁতিয়ের, 'জার্নাল অফ দ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি', ১৯২৩, পৃ ৫৯৬-৯৭।

বৌদ্ধ রচনা 'লঙ্কাবতার সূত্র' ও 'বজ্রসূচি' থেকেও শূদ্রদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমটি ৪৪৩ খৃস্টাব্দের আগে সংকলিত হয়,[১৯] কিন্তু দ্বিতীয়টির সময়কাল অত নিশ্চিত নয়। মৌর্যোত্তর যুগে যিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন এটি সেই অশ্বঘোষের রচনা বলে মনে হয় না, কারণ চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্ অশ্বঘোষের রচনার যে-তালিকা উল্লেখ করেছেন সেখানে এই বইটির নাম নেই।[২০] ৯৭৩ থেকে ৯৮১ খৃস্টাব্দের মধ্যে যে চীনা অনুবাদ হয় সেখানে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তিকে এর রচনাকার বলে ধরা হয়েছে। তিনি সম্ভবত খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[২১] 'বজ্রসূচি'তে 'মনুস্মৃতি'র বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায়, এটি পরবর্তী কালের রচনা। যেসব মুখ্য বৌদ্ধ ও জৈন[২২] ভাষ্য সম্ভবত এই সময়ে রচিত, সেখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছু বিশেষ ধরনের গ্রন্থ, যেমন কামন্দকের 'নীতিসার', ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র',[২৩] বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'[২৪], অমরসিংহের 'অমরকোষ' ও বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'ও[২৫] শূদ্রদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানায় যা সাদরে গ্রহণীয়।

'হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র' ও 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে'র মূর্তিতত্ত্ব-বিষয়ক অংশ থেকেও কিছু তথ্য চয়ন করা যায়। প্রথমটি গুপ্ত যুগের রচনা[২৬] বলে মনে হলেও দ্বিতীয়টি সম্ভবত গুপ্তোত্তর যুগের সংকলন। সেজন্য এটিকে শুধু অপ্রধান সাক্ষ্যরূপে ব্যবহার করা যায়।

১৯. সুজুকি, লংকাবতার সূত্র, ভূমিকা, পৃ [৪৩]।

২০. সুশীলকুমার দে, 'হিস্ট্রি অফ স্যানস্ক্রিট লিটরেচর', পৃ ৭১।

২১. দাসগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৩২ টী.। কীথ এঁকে খৃস্টীয় সপ্তম শতকের লোক বলে ধরেছেন ('হিস্ট্রি অফ স্যানস্ক্রিট লিটরেচর', মুখবন্ধ, পৃ [২২])।

২২. গুপ্ত যুগের বেশভূষা বর্ণনায় মোতি চন্দ্র এগুলো ব্যবহার করেছেন ('ভারতীয় বেশ-ভূষা', অধ্যায় ৯)।

২৩. এর রচনাকাল মনে হয় খৃস্টীয় তৃতীয় শতক ('দি এজ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি', পৃ ২৭০)। তুলনীয়: খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক (মনোমোহন ঘোষ, নাট্যশাস্ত্র, ইংরিজি অনুবাদ, ভূমিকা, পৃ [৮৬]); এছাড়াও দাসগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২২ দ্র.।

২৪. স্মিট বইটিকে খৃ পূ দ্বিতীয় শতকের রচনা বলে ধরেছেন (দাসগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৪৫-এ উদ্ধৃত), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধরেছেন খৃস্টীয় প্রথম শতক; কিন্তু অনন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, ইওলি ও ভিণ্টারনিৎস ধরেছেন খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক ('সোশ্যাল লাইফ ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৩৩-৩৭)। চাকলাদার মনে করেন, বাৎস্যায়ন পশ্চিম ভারতের লোক ছিলেন (ঐ, পৃ ৯৬)।

২৫. বরাহমিহিরকে ৫০৫-৫৮৭ খৃস্টাব্দের লোক বলে ধরা হয়, আর তাঁর সমস্ত রচনাকেই খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে রাখা হয়েছে।

২৬. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ডেভেলপমেণ্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি', পৃ ২৮-২৯।

প্রত্নলেখে বর্ণ হিসেবে শূদ্রের উল্লেখ নেই, কিন্তু ভূমি-অনুদানের ক্ষেত্রে করপ্রদায়ী কৃষক ও হস্তশিল্পীদের কথা বারবার বলা হয়েছে। এর থেকে একটি প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যার মাধ্যমে আদিবাসীদের বিভিন্ন ভূখণ্ড ব্রাহ্মণ্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। কয়েকটি প্রত্নলেখে হস্তশিল্পীদের বৃত্তিগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। শূদ্রদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগত পরিবর্তনের প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এ সবই আমাদের সাহায্য করে।

শূদ্রের কর্তব্য অন্য তিন বর্ণের সেবা করা[২৭]—এই পরিচিত প্রবচনটি গুপ্ত যুগের রচনায় আবার পাওয়া যায়। মনুর মতোই দাবি করা হয়েছে যে শূদ্র বিশেষ করে ব্রাহ্মণদেরই সেবা করবে।[২৮] "শান্তিপর্বে" একজন রাজা এই বলে গর্ব করেছেন যে তাঁর রাজত্বে শূদ্ররা যথাযথভাবে সেবা করে ও বিনা বিদ্বেষে অন্য তিন বর্ণের ভৃত্যের দায়িত্ব পালন করে।[২৯]

"অনুশাসনপর্বে" শূদ্রদের 'কর্মকর' রূপে গণ্য করা হয়েছে।[৩০] বলা হয়েছে, যদি শূদ্র না থাকে তাহলে কোন 'কর্মকর'ও থাকবে না।[৩১] শূদ্রদের একটা বড় অংশকে যে বেতনভুক্ রূপে নিয়োগ করা চলছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ 'অমরকোষে'র "শূদ্রবর্গে" বেতনের সমার্থবোধক পুরো এগারোটা শব্দই পাওয়া যায়।[৩২] একইভাবে ঐ অংশে বিভিন্ন ভাড়া-করা শ্রমিক ও ভৃত্যদের নামও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বৈতনিকদের চারটি নাম আছে, বার্তাবহ ও ভারিক প্রত্যেকের আছে দুটি ও ভৃত্যের জন্য এগারোটি।[৩৩]

নারদ ও বৃহস্পতি ভৃতকদের (বেতনভুক্) তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন: অর্থাৎ, যাঁরা সেনাবাহিনীতে কাজ করেন, যাঁরা কৃষিকাজে নিযুক্ত এবং যাঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে ভার বহন করেন।[৩৪] প্রথমোক্তদের সবচেয়ে ভালো কর্মচারী রূপে গণ্য করা হতো, দ্বিতীয়দের মধ্যম ও তৃতীয়দের নিম্নতম।[৩৫]

ভারিক ও বাহকদের সর্বনিম্ন ধরনের কর্মচারী রূপে বিবেচনা করলেও তাঁরা সব অর্থেই শ্রমিকদের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন বলে মনে হয়, কারণ তাঁদের কাজের অবস্থা সম্পর্কে নানান বিধানের জন্য এই যুগের ধর্মশাস্ত্রের বেশ কিছু স্থান ব্যয় করা হয়েছে। প্রধানত বণিকরা এই বাহকদের

২৭ কামন্দক নীতিসার ২।২১; শান্তিপর্ব ৬০।২৬; অনুশাসনপর্ব (দাক্ষিণী সং) ৯।১৮; ভাগবত পুরাণ ১১।১৭।১৯; ভবিষ্য পুরাণ, ১, ৪৪।২৭; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৮।৩-৮; বিষ্ণু পুরাণ ৩।৮।৩২ ও ৩৩।

২৮. আশ্বমেধিকপর্ব (দাক্ষিণী সং) ৯৭।২৯।

২৯. ৭৮।১৭।

৩০. অনুশাসনপর্ব (দাক্ষিণী সং) ২০৮।৩৪।

৩১. ঐ, ২০৮।৩৩।

৩২. অমরকোষ ২।১০ ৩৮-৩৯।

৩৩ ঐ, ২।১০।১৫-১৮।

৩৪ নারদ ৫।২৩; বৃহস্পতি ১৫।১২ ও ১৩।

৩৫. ঐ।

নিয়োগ করতেন এবং দৈবক্রমে বা রাষ্ট্রের কারণে ক্ষতি হওয়া ছাড়া তাঁদের হাতে ন্যস্ত জিনিসপত্রের জন্য তাঁদের দায়ী করা হতো।[৩৬] বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ না করার জন্য ভারিকদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া যেত। নারদের বিধান অনুযায়ী, যে-ব্যক্তি গন্তব্যস্থানে কোন পণ্যদ্রব্য পেঁাছে দিতে স্বীকার করার পর তা পরিত্যাগ করে তাকে পারিশ্রমিকের একের-ছয় অংশ দিতে হবে।[৩৭] যদি সে শুরু করার সময় কোন অসুবিধার কথা তোলে তাহলে তাকে পারিশ্রমিকের দ্বিগুণ পরিমাণ দিতে হবে।[৩৮] এই নিয়মটিকে যাজ্ঞবল্ক্যও সমর্থন করেছেন।[৩৯] কিন্তু পরবর্তী স্মৃতি-প্রণেতাদের অন্যান্য বিধান অনুযায়ী যদি কোন ভারিক কাজ শুরু করার পর তা পরিত্যাগ করে সেক্ষেত্রে, পথের উপর হলে পারিশ্রমিকের ১/৪ অংশ, ও মাঝপথে হলে পুরো পারিশ্রমিক দিতে হবে।[৪০] যে-ব্যক্তি বেতন দেওয়ার শর্তে ভারিককে ভাড়া করেছেন তাঁর ক্ষেত্রে উপরে উক্ত বিষয়ের অনুরূপ বাধ্যবাধকতা অত কার্যকরী ছিল না বলে মনে হয়। নারদ বিধান দিয়েছেন, কোন ব্যক্তি কোন শকট অথবা মালবহনের জন্য পশু ভাড়া করার পর না নিলে তাঁকে ভাড়ার ১/৪ অংশ দিতে হবে আর মধ্যপথে পরিত্যাগ করলে পুরোটাই।[৪১] এই বিধানটি শুধুমাত্র শকট বা পশুর মালিক বা খুব সম্ভবত যিনি একই সঙ্গে শকটের মালিক ও চালক তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেসব মানুষ ভারবাহী পশুর কাজ করতেন তাঁদের ক্ষেত্রে নয়। এসব সত্ত্বেও এই অংশের নেপালী পাঠে (যেটিকে সঠিক বলে গণ্য করা হয়)[৪২] বলা হয়েছে, যদি কোন ভারিক নিয়োগকর্তার দোষে কাজ না করেন তাহলে তাঁকে ঠিক যতটা কাজ করেছেন তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে।[৪৩]

যেসব কর্মচারী কৃষি-শ্রমিক ও গো-পালক রূপে নিযুক্ত হতেন তাঁদের বেতন সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' যে প্রাপ্যের হার নির্দেশ করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করেছেন যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও কাত্যায়ন। এই হার অনুযায়ী একজন কৃষক বেতন পাবেন শস্যের ১/১০ অংশ, গো-পালক মাখনের ১/১০ ও বিক্রেতা বিক্রয়মূল্যের ১/১০ অংশ।[৪৪] স্বভাবত এটি প্রথাগত ঘোষণা বলেই মনে হয়; গুপ্ত যুগে বেতনের পরিবর্তনকে এখানে হিসেবে ধরা হয়নি। "শান্তিপর্ব"র বিভিন্ন পাঠভেদ এবং নারদ ও বৃহস্পতির ধর্মশাস্ত্র থেকে তা নির্ণয় করা যায়। গো-পালকের বেতন সম্পর্কে "শান্তিপর্বে" বলা হয়েছে, তিনি ছ'টি গরুর রক্ষণাবেক্ষণ করলে

৩৬. বিষ্ণু ৫।১৫৫-৫৬; যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৭; নারদ ৬।৯।

৩৭. ৬।৬-৭। ৩৮. ৬।৩। ৩৯. যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৮। ৪০. ঐ।

৪১. ৬।৭। ৪২. সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট, ৩৩, পৃ ১৪০-৪১।

৪৩. ঐ, ৬।৬-এর টীকা।

৪৪. অর্থশাস্ত্র ৩।১৩; যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৪; নারদ ৬।২।৩; কাত্যায়ন, শ্লোক ৬৫৬।

একটি গরুর দুধ পাবেন।[৪৫] এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে, একশটি গরুর দেখাশোনা করলে গো-পালককে একজোড়া গরু দেওয়া হবে।[৪৬] নারদ এর চেয়ে নীচু হারে প্রাপ্যের কথা বলেছেন। একশটি গরু দেখাশোনা করলে প্রত্যেক বছর বেতন হিসেবে একটি বাছুর দেওয়া হবে, ২০০ গরুর জন্য একটি দুধেল গরু এবং দু-ক্ষেত্রেই প্রত্যেক অষ্টম দিনে গো-পালককে সবক'টি গরু দোহনের অনুমতি দেওয়া হবে।[৪৭] ফলত, হিসেব দাঁড়ায় আটটি গরু দেখাশোনা করার জন্য একটি গরুর দুধ এবং গো-পালকের বেতন হিসেবে নারদ যে প্রথাগত হারের কথা বলেছেন—মাখনের ১/১০ অংশ—তার মাত্রাভেদ ঘটে। সমসাময়িক বিভিন্ন জৈন সূত্র থেকে দেখা যায়, বাস্তবে এইসব বিধান মোটামুটি অনুসরণ করা হতো। একজন গো-পালকের কথা জানা যায় যিনি অষ্টম দিনে একটি গরু বা মোষের দুধ পেতেন।[৪৮] অন্য একটি ক্ষেত্রে বেতন ছিল অনেক বেশি ; একজন গো-পালক বেতন হিসেবে উৎপন্ন দুধের ১/৪ অংশ পেয়েছিলেন।[৪৯] ফলত গো-পালকের বেতনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত উন্নতি হয়েছিল। এছাড়াও, পশুর মালিক হওয়ার বিধান থেকে পশুপালকের তুলনায়-স্বতন্ত্র মর্যাদার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ধরনের পশুপালকের নিজের বাড়ি ও পশুখাদ্যের জন্য এক টুকরো নিজস্ব জমি থাকার কথা।

এই যুগের কাছাকাছি অন্যান্য রচনার চেয়ে ''শান্তিপর্ব'' ও 'বৃহস্পতি স্মৃতি'তে কৃষিশ্রমিকদের উচ্চতর বেতন-হারের কথা বলা হয়েছে। ফলত, প্রথম সূত্র অনুযায়ী, যদি কোন কৃষককে বীজ ও অন্যান্য উপকরণ যোগান দেওয়া হয় তাহলে তিনি উৎপন্নের ১/৭ অংশ নিতে পারেন।[৫০] এ-বিষয়ে বৃহস্পতি আরও উদার। তাঁর মতে, কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীদের ( 'সীর-বাহক' ) খাদ্য ও বস্ত্র দিলে তাঁদের উৎপন্নের ১/৪ অংশ দেওয়া উচিত।[৫১] খাদ্য ও বস্ত্র না দিলে তাঁদের উৎপন্নের ১/৩ অংশ দিতে হবে।[৫২] এসব বিধান নিঃসন্দেহে কৃষি-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ভাগচাষীদের ক্ষেত্রে নয়, যাঁরা নিজস্ব বীজ, ষাঁড় ও অন্যানা উপকরণ যোগান দিতেন। 'সীর' ভূমি ও কৌটিল্যের 'সীতা' ভূমি একই বস্তু[৫৩]—এই মতের সপক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 'সীতা' ছিল রাজকীয় ভূমি আর 'সীর' ছিল ব্যক্তি-স্বত্বের অধীন, যেখানে তাঁরা কৃষিকর্মের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করতেন।[৫৪]

৪৫. ৬০।২৪। ৪৬ ঐ। ৪৭. নারদ ৬।১০।
৪৮. পিণ্ড নির্যুক্তি, পৃ ৩৬৮-৩৬৯। ৪৯. বৃহৎকল্প ভাষ্য ২।৩৫৮।
৫০. শান্তিপর্ব ৬০।২৫। শান্তিপর্বের ব্যবস্থা বৈশ্য গো-পালক ও কৃষিশ্রমিকদের প্রসঙ্গে, কিন্তু শূদ্রদের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযুক্ত হয়ে থাকতে পারে।
৫১. বৃহস্পতি ১৬।১-২। ৫২. ঐ।
৫৩. প্রাণ নাথ, 'ইকনমিক কণ্ডিশন ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ১৫৮।
৫৪. তুলনীয় : ''সির'', উইলসন, 'আ গ্লসারি অফ জুডিসিয়াল অ্যাণ্ড রেভিনিউ টার্মস', পৃ ৪৮৫।

বৃহস্পতি প্রাপ্যের যে-হার নির্দেশ করেছেন তার থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, গুপ্ত যুগের শেষে কৃষি-শ্রমিকদের বেতন হয়েছিল দ্বিগুণ। এ ছাড়াও, তাঁরা যে খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান ছাড়াই কাজ করতেন, এই তথ্য থেকে এক নতুন পর্যায়ের শ্রমিক-উদ্ভবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এঁদের নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর সংগতি ছিল, ফলত তাঁরা নিয়োগকর্তাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন কম। অতএব, স্পষ্টই বোঝা যায়, একই সময়ে পশুপালক ও কৃষি-শ্রমিকদের বেতন নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি হয়েছিল। অর্থাৎ, এর ফলে যথেষ্ট সংখ্যক শূদ্রের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়।

গৃহভৃত্যের অবস্থা সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। খাদ্য ও পানীয় ছাড়াও ভৃত্যদের যে মাসিক বা বাৎসরিক বেতন পাওয়া উচিত তা 'কামসূত্র' থেকে জানা যায়।[৫৫] "শান্তিপর্বে" জোর দিয়ে বলা হয়েছে, উচ্চ তিন বর্ণের প্রভুরা শূদ্রভৃত্যকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধ্য থাকবেন।[৫৬] কিন্তু এখানে সেই প্রাচীন রীতির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে: দ্বিজরা তাদের দেবেন জীর্ণ ছত্র, উষ্ণীষ, শয্যা, আসন, পাদুকা ও ব্যজন এবং ছিন্ন বস্ত্র।[৫৭]

প্রজাপতি শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন অন্য তিন বর্ণের দাস রূপে—এই অতিকথাটি "শান্তিপর্বে" পুনরুক্ত হয়েছে।[৫৮] অতএব, শূদ্রের দাসধর্ম পালন করা উচিত।[৫৯] কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সব শূদ্রই দাস ছিলেন। দাসত্বের প্রচলন থাকায়[৬০] কিছু শূদ্র দাস হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা উৎপাদনশীল কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিলেন না। যদিও নারদ পনেরো রকম দাসের উল্লেখ করেছেন,[৬১] কিন্তু তিনি ও বৃহস্পতি দুজনেই পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে তাদের শুধু অশুচি কর্মেই নিয়োগ করা হয়।[৬২] তার অর্থ:

৫৫. কামশাস্ত্র ৪।১।৩৩ ও ৪২, টীকা সমেত।

৫৬. ...অবশ্য ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে। শান্তিপর্ব ৬০।৩১।

৫৭. ঐ, ৬০।৩২-৩৩।

৫৮. ঐ, ৬০।২৭।

৫৯. অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী সং) ২০৮।৩৪।

৬০. একটি গুপ্ত প্রত্নলেখে ('কর্পুস ইনস্ক্রিপতিওনুম ইন্দিকারুম', ৩, সংখ্যা ৬, পঙক্তি ২) দাস বেনা-বেচা নিয়ে উপমা আছে। 'বৃহস্পতি স্মৃতি'তে 'দাসলেখ্যম্' (দাস বিক্রির দলিল)-এর উল্লেখ আছে (৬।৭)। 'মৃচ্ছকটিকে' দেখা যায়, রাষ্ট্র-অনুমোদিত প্রথা হিসেবেই দাসত্বের প্রচলন ছিল ('ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টালি', ৫, পৃ ৩০৭)।

৬১. নারদ ৫।২৬-২৮। এদের মধ্যে কয়েকটিকে অযথা দাস বলা হয়—'বিবাদার্ণব-সেতু'র একটি উদ্ধৃতিতে এই মত ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বচনটি আছে বৃহস্পতির নামে (এইচ. টি. কোলব্রুক, 'আ ডাইজেস্ট অফ হিন্দু ল', ২য়, পৃ ১২)। সমসাময়িক জৈন রচনাদিতে ছ শ্রেণীর দাসের উল্লেখ আছে বলে মনে হয় (জৈন, 'লাইফ অ্যাজ ডেপিক্‌টেড ইন জৈন ক্যাননস', পৃ ১০৭)।

৬২. নারদ ৫।৫; বৃহস্পতি ১৫।১৫-১৬।

তোরণ, শৌচাগার ও পথ, পরিস্কার করা, উচ্ছিষ্ট, মল, মদ ইত্যাদি ফেলা এবং প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দন বা তাঁর শরীরের গুহ্যাঙ্গ পরিষ্কার করা।[৬৩] অন্যদিকে যাঁরা উৎপাদনশীল কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকতেন, যেমন কৃষি-শ্রমিক বা ভারিক, তাঁরা বিশুদ্ধ কাজ করেন বলে মনে করা হতো।[৬৪] অতএব, প্রাগ্-মৌর্য বা মৌর্য যুগের মতো ব্যক্তি বা রাষ্ট্র উৎপাদনের কাজে দাস নিয়োগ করেছেন—এমন সাক্ষ্য নেই বললেই চলে।

এ-যুগে আরও কয়েকটি লক্ষণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাস-ব্যবস্থা অশক্ত হয়ে পড়েছিল এবং দাসরূপে সেবা করার বাধ্যবাধকতা থেকে শূদ্রদের স্বাধীনত্য বাড়ছিল। আগেই যেমন দেখানো হয়েছে, আর্য পিতামাতার থেকে যাঁদের জন্ম বা যাঁরা নিজেরাই আর্য, সাধারণভাবে তাঁদের ক্ষেত্রে কৌটিল্যের দাস-মুক্তি সংক্রান্ত নীতিটি প্রযোজ্য। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য যখন বলেন, কোন ব্যক্তিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসে পরিণত করা যাবে না তখন তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রচলন করেন। তাঁর মতে, এ ধরনের ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।[৬৫] জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভাষ্য অনুযায়ী, এর অর্থ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শূদ্র, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে দাসকর্মে নিযুক্ত করলে রাজা তাকে মুক্তি দেবেন।[৬৬] অতএব শূদ্রকে বলপূর্বক দাসে পরিণত করার বিষয়ে মনুর যে-ধারণা, উপরের বিধানটি ঠিক তার বিপরীত ব্যবস্থা দেয়।[৬৭]

পূর্ববর্তী বিভিন্ন রচনায় দেখা যায়, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত উচ্চ তিন বর্ণের মানুষ বা তাঁদের সন্তানদের দাসে পরিণত করা যেত না। কিন্তু গুপ্ত যুগের স্মৃতিতে দ্বিজের জন্য এই জাতীয় বিশেষ সুবিধার কোন আভাস নেই। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও কাত্যায়ন বলেন, দাসত্ব হওয়া উচিত বর্ণের স্বাভাবিক ক্রম ('অনুলোম') অনুযায়ী, বিপরীত ক্রম ('প্রতিলোম') অনুযায়ী নয়, অর্থাৎ দাস যেন প্রভুর থেকে নিম্ন বর্ণের হয়।[৬৮] কাত্যায়ন কিন্তু দাবি করেছেন, তিন নিম্ন বর্ণের জন্য দাসত্বের ব্যবস্থা আছে, ব্রাহ্মণদের জন্য নয়।[৬৯] তা সত্ত্বেও এইসব বিধান থেকে বোঝা যায়, শূদ্রদের আর দাসত্বের জন্য আলাদা করে বেছে নেওয়া যেত না।

স্বতন্ত্র হয়েও যে হতভাগ্য নিজেকে বিক্রি করে তার মনোভাবকে নারদ ও বৃহস্পতি তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন।[৭০] "অনুশাসনপর্বে" বলা হয়েছে,

৬৩. নারদ ৫।৬-৭। ৬৪. ঐ, ৫।২৩-২৫।

৬৫ বলাদ্ দাসীকৃতশ্চৌরৈর্বিক্রীতশ্চাপি মুচ্যতে। যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮২।

৬৬. কোলব্রুক, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ২৫।

৬৭. কাত্যায়ন, শ্লোক ৭২২-এ এই তত্ত্বই কিন্তু পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

৬৮. যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮২-৮৩ ; নারদ ৫।৩৯ ; কাত্যায়ন, শ্লোক ৭১৬।

৬৯. শ্লোক ৭১৫। তুলনীয় : বিষ্ণু ৫।১৫৪।

৭০. বিক্রীণীতে স্বতন্ত্রো যঃ সমাত্মানং নরাধমঃ।
স জঘন্যতমঃ তু এষাং সোঽপি দাস্যান্ন মুচ্যতে ॥ নারদ ৫।৩৭ ; বৃহস্পতি ১৫।২৪৩।

কোন ব্যক্তির পক্ষে অপরকে বিক্রি করা উচিত নয় ; নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি প্রযোজ্য।[৭১] যদিও দাসদের ( বিশেষভাবে আর্য ) মুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি কৌটিল্যে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের মোচনঘটিত অনুষ্ঠানের কথা নারদই প্রথম বলেছেন।[৭২] এসবের ফলে দাসপ্রথা আরও খর্ব হয়ে থাকতে পারে।

নারদ বলেন, আঞ্চলিক বিবাদের নিজ নিজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে 'বর্গী' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোককে সাক্ষী রূপে ডাকা যায়।[৭৩] কাত্যায়নের কথা অনুযায়ী যাঁদের ক্ষেত্রে 'বর্গী' শব্দটি প্রযুক্ত হয় তাঁদের মধ্যে দাস-নেতারাও ( 'নায়ক' ) আছেন।[৭৪] ফলত দাসদের মধ্যে সংগঠনের চল থাকায় দাসপ্রথা হয়তো আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

দাসীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবশ্য পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে বলে মনে হয়। ধনবানদের গৃহে এঁরা পরিচারিকা রূপে কাজ করতেন। 'দাসীসভম্' ( বহুসংখ্যক দাসী ) শব্দটি 'অমরকোষে' সমষ্টিবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত রূপে দেখানো হয়েছে।[৭৫] এ যুগের জৈন রচনা থেকে দেখা যায়, অসংখ্য দাসী ও পরিচারিকা নিয়োগ হতো জনগোষ্ঠী থেকে।[৭৬]

আর সব বিষয়ে গুপ্ত যুগে দাসদের সাধারণ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁদের প্রহার ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা যেত,[৭৭] এবং অনির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করা হতো।[৭৮] তাঁদের কোন বিধিগত মর্যাদা ছিল না ;[৭৯] তাঁরা সম্পত্তির অংশবিশেষ রূপে গণ্য হতেন, যা সাধারণ স্বত্বের অধীন[৮০] বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য।[৮১] দাসের কোন সম্পত্তির অধিকার নেই—মনুর এই বচন[৮২] নারদ ও কাত্যায়ন পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু

৭১. অনুশাসনপর্ব ৪৫।২৩। কাণে, 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ২য়, ভাগ ১, পৃ ১৮২ তে উদ্ধৃত।

৭২. নারদ ৫।৪২-৪৩। তুলনীয়: দাসমুক্তি বিষয়ে কাত্যায়নের বিধি ( শ্লোক ৭১৫ )। নারদ অবশ্য যোগ করেছেন যে কয়েক শ্রেণীর দাসকে মুক্তি দেওয়া যায় না ( ৫।২৯ ) প্রভুর দয়া ছাড়া।

৭৩ ধর্মকোশ ১ম, ভাগ ১, পৃ ২৯৯ এ উদ্ধৃত।

৭৪. কাত্যায়ন, শ্লোক ৩৫০। ৭৫. অমরকোষ ৩।৫।২৭।

৭৬. জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬২-৬৫। 'বৃহৎকল্প ভাষ্য-গাথা'র তিনজন 'নাপিত-দাসী'র উল্লেখ আছে ( ৬০১৪ )।

৭৭. ঘোষাল, 'দ ক্ল্যাসিক্যাল এজ', পৃ ৫৫৮ ; কাত্যায়ন, শ্লোক ৯৬২-৬৩ ; মৃচ্ছকটিক, ৮।২৫।

৭৮. মৃচ্ছকটিক ( কার্মারকর সং ), পৃ ৩০৯।

৭৯. কাত্যায়ন, শ্লোক ৯২। ৮০. বিষ্ণু ১৮।৪৪।

৮১. কাত্যায়ন শ্লোক ৮৮২ ; বৃহস্পতি ( সেক্রেড বুকস্ অফ দি ইস্ট ), ২৫।৮২-৮৩।

৮২. নারদ ৫।৪১ ; কাত্যায়ন, শ্লোক ৭২৪।

কাত্যায়ন এও বলেছেন যে, কোন দাস নিজেকে প্রকাশ্যে বিক্রয় করে যে-অর্থ পান সেই অর্থে প্রভুর কোন অধিকার নেই।[৮৩]

এসব সত্ত্বেও গুপ্ত যুগে দাসপ্রথা সাধারণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলেই মনে হয়। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বিজয়ের পর এ-যুগে আর কোন বড় মাপের যুদ্ধের কথা জানা যায় না। মনে হয়, যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে দাস-সংগ্রহের সম্ভাবনা তাই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বাজারের সংকোচনের ফলে দাসপ্রথা হয়েছিল আরও খর্বিত। গ্রীস ও রোমে ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত দাসপ্রথা যুক্ত ছিল আর্থিক বাজারের সঙ্গে। ভারতের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অংশত সত্য। আনুমানিক খৃপূ ৫০০ থেকে প্রায় এক হাজার বছর ধরে ধাতব মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার দাস কেনা-বেচায় সাহায্য করেছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের শেষ থেকে মুদ্রার অভাব দাস-ব্যবসার প্রচলন দুর্বল করে থাকতে পারে। পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রে ক্রীতদাসের কথা থাকলেও তাঁদের সংখ্যা হয়তো খুব বেশি ছিল না। একইভাবে মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার অর্থ ঋণদানের পরিমাণ কম হওয়া ও যাঁদের পণমুক্তি বা বন্ধকীর জন্য আটকে রেখে দাসে পরিণত করা হতো তাঁদের সংখ্যা কমে যাওয়া। যাই হোক, একমাত্র ষষ্ঠ শতকের শেষে ও সপ্তম শতকের সূচনায় ধাতব মুদ্রা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল বলে মনে হয়। বাণিজ্য ও নগরের অবনতি[৮৪] এবং এক নতুন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থা উদ্ভবের পরিণাম রূপেই ঘটেছিল এই মুদ্রাহ্রাসের ঘটনা। আর এই নতুন অর্থ-ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজের প্রাপ্য ভূমি-অনুদানের মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো। এইভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন গ্রাম এক নতুন ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক একক গঠন করে, যেগুলি তাদের নিজস্ব ও সেই সঙ্গে তার উপকৃত ব্যক্তিদের প্রয়োজনে লাগত।[৮৫]

ভূ-ভাগ ও দানের প্রক্রিয়ায় ভূমির অসংবদ্ধতা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা এই বিকাশে সাহায্য করেছিল। ধর্মশাস্ত্র, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি-তে উত্তরাধিকার বিধির যে-বিধান দেওয়া হয়েছে সেখানে কখনোই ভূসম্পত্তি বিভাগের কথা বলা হয়নি। সর্বপ্রথম 'নারদ'[৮৬] ও 'বৃহস্পতি স্মৃতি'তে[৮৭] বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে আভাস পাওয়া যেতে পারে, গুপ্ত যুগের মধ্য অথবা শেষভাগে বিপুল ভূ-ভাগের অধিকারী বড় বড় যৌথ পরিবার আরও ছোট ছোট এককে ভেঙে যাচ্ছিল। ভূমি-বিভাজনের নীতি স্বীকৃত হওয়ায়, পূর্ববর্তী পর্যায়ের বসতি স্থাপনের

৮৩, শ্লোক ৭২৪। প্রভুর সম্মতি ছাড়া এ-কাজ সম্ভব ছিল না। কাণে 'বিবাদ-চিন্তামণি'-ধৃত পাঠেরই পক্ষপাতী। 'কাত্যায়নস্মৃতি', পৃ ২৬৭, শ্লোক ৭২৪-এর পাদটীকা।

৮৪. রামশরণ শর্মা, "ডিকে অফ গ্যাঞ্জেটিক টাউনস ইন গুপ্ত অ্যান্ড পোস্ট-গুপ্ত টাইমস", 'জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, পৃ ১৩৫-৫০।

৮৫. ঐ, 'ইন্ডিয়ান ফিউডালিজম', অধ্যায় ১।

৮৬. নারদ ১৩।৩৮।

৮৭. বৃহস্পতি ২৬।১৮, ২৮, ৪৩, ৫৩ ও ৬৪।

পর উত্তর ভারতের নদী-উপত্যকায় জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের পক্ষে কর্ষণযোগ্য ভূমি খণ্ডিত হওয়ার গতি ত্বরান্বিত হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের একটি প্রত্নলেখের সাক্ষ্য থেকে ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে দেখানো হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের একই স্থান থেকে ১½ 'কুল্যবাপ' জমি পাওয়া সম্ভব নয়। এই জমি ছোট ছোট খণ্ডে চারটি বিভিন্ন স্থান থেকে কিনতে হয়েছিল।[৮৮] জমি কেনা হয়েছিল দানের উদ্দেশ্যে, যার অসংখ্য উদাহরণ এই যুগে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের ও বিভিন্ন মন্দিরে ভূমি-অনুদান ভূমি-অসংবদ্ধতার প্রক্রিয়ায় আরও সাহায্য করেছিল। ৫০০ 'করিস'-এর মতো বড় ভূখণ্ড বা মৌর্য যুগের রাষ্ট্রীয় খামারের কথা আর শোনা যায় না। এক 'কুল্যবাপ' বা ৪, ২ ও ১ 'দ্রোণবাপ'-এর কর্ষণযোগ্য এককের প্রত্নলেখভিত্তিক উল্লেখ বড় ভূখণ্ডের ইঙ্গিত দেয় না।[৮৯] পার্জিটার-এর মতে, এক 'কুল্যবাপ' ছিল এক একরের চেয়ে একটু বড়।[৯০] কিন্তু আসামের কাছাড় জেলায় প্রচলিত জমির 'কুল্যবাপ' পরিমাপকে যদি এই 'কুল্যবাপ'-এর সমান বলে ধরা হয়,[৯১] তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে প্রায় ১৩ একর। এক 'কুল্য' যেহেতু ৮ 'দ্রোণ'-এর সমান, তাই মনে হয় উত্তরবঙ্গের জমির গড় পরিমাপ সাত থেকে তিন একরের মধ্যে থাকত। ঐ একই সময়ে গুজরাটে বলভীর মৈত্রক-শাসকরা ভূমি-অনুদানের যে জরিপ করেছিলেন তার থেকে দেখা যায়, কোন ভূখণ্ডই গড়ে দুই থেকে তিন একরের বেশি ছিল না।[৯২] ছোট ছোট জোতে বিশাল সংখ্যায় শূদ্র দাস বা শ্রমিক নিয়োগ স্বভাবতই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয়। কয়েকটিতে হয়তো দু-তিনজন করে নিয়োগ করা হতো, অন্যত্র হয়তো কোন নিয়োগই হতো না।

বলা হয়েছে, গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণদের ভূমি-অনুদান ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামে বসতি স্থাপনের পক্ষে কার্যকর হয়েছিল।[৯৩] ঘটনাটি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অনুন্নত অঞ্চলের ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে, কিন্তু গুজরাটে বা উত্তরবঙ্গে নয়। সেখানে এক-জায়গায় জমি পাওয়া শক্ত ছিল। সম্ভবত পতিত ও অনুন্নত জমিতে উদ্বৃত্ত শূদ্রদের দিয়ে বসতি স্থাপিত হয়েছিল, কারণ পুরনো কৃষকরা যেসব অঞ্চলে ছিলেন সেখান থেকে তাঁরা

৮৮. 'এপি. ইণ্ডিকা', ২০, প্রত্নলেখ নং ৫, পঙ্‌ক্তি ৫-১১ ; এস কে মাইতি, 'দি ইকনমিক লাইফ অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ইন দ গুপ্ত পিরিয়ড', পৃ ৫০-৫১।

৮৯. 'এপি. ইণ্ডিকা', ২০, প্রত্নলেখ নং ৫, পঙ্‌ক্তি ৫-১১।

৯০. 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিক্যুয়ারি', ৩৯, পৃ ২১৫-১৬।

৯১. ভারতবর্ষ', ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, ভাগ ১, পৃ ৩৮৪ ( 'হিস্টি অফ বেঙ্গল', ১ম, পৃ ৬৫২-র উদ্‌ধৃত )।

৯২. কৃষ্ণকুমারী জে. বিজ', 'এনশেণ্ট হিস্ট্রি অফ সৌরাষ্ট্র', পৃ ২৪৬-৪৭, ২৬৭ ইঃ।

৯৩. কোসম্বী, 'জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি', ৭৫, পৃ ২৩৭।

সরে যেতে পছন্দ করতেন না। অথবা আদিম জনগোষ্ঠীয় কৃষকদের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্থানে শূদ্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যদিও পরম্পরাগত সামাজিক ক্রমবিন্যাসে শূদ্রদের কর্তব্য ছিল দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক রূপে সেবা করা, তাহলেও নতুন শূদ্রেরা ছিলেন হয় কৃষক নয়তো ভাগচাষী। অতএব, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের বিভিন্ন রচনায় তাঁদের কৃষক রূপে অভিহিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

বৈশ্যারা যে কৃষক—এই পরম্পরাগত মত আবার এ-যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায়।[৯৪] 'অমরকোষে' কৃষক-বাচক শব্দগুলি বৈশ্য-বর্গের তালিকায় রয়েছে।[৯৫] কিন্তু শূদ্ররাও যে কৃষকে পরিণত হচ্ছিলেন এমন মনে করার কারণ আছে। মনুর মতো বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য দেখিয়েছেন যে শস্যের জন্য শূদ্রকে জমি ভাড়া দেওয়া হতো।[৯৬] এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে শূদ্র ভাগচাষীদের জমি ইজারা দেওয়ার প্রথা প্রবলতর হয়েছিল। তাঁরা ক্রমশ জমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ-যুগের (২৫০-৩৫০ খৃস্টাব্দ) একটি পল্লব দানপত্র থেকে জানা যায়, এমনকি ব্রাহ্মণকে একখণ্ড ভূমি দান করার পরেও চারজন ভাগচাষী ('আর্ধিকঃ') তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৯৭] এই অনুদানে দুজন কোলিক-এর স্থানান্তরিত হওয়ার উল্লেখও আছে,[৯৮] যাঁরা কোল জনগোষ্ঠীয় কৃষক বা কৃষিশ্রমিক হতে পারেন।[৯৯] ঐ একই যুগের অন্য একটি পল্লব ভূমিদানপত্রে চার 'নিবর্তন' পরিমাপের একটি ভূখণ্ড হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে। অতুক নামে এক ব্যক্তি সেখানে চাষ করতেন,[১০০] তিনি ভাগচাষীও হতে পারেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে জমি অন্যের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার পরেও রাষ্ট্র থেকে শূদ্র ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা যেত না।

সাক্ষী হিসেবে যারা জিজ্ঞাসাবাদের অনুপযোগী তাদের মধ্যে নারদ 'কিনাশ' (কৃষক)-দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১০১] অসহায় নামে খৃস্টীয় সপ্তম শতকের এক ভাষ্যকার[১০২] 'কিনাশ' শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন শূদ্র বলে।[১০৩]

৯৪ শান্তিপর্ব, ৬০।২৪-২৬, ৯২।২।

৯৫. অমরকোষ ২।৯।৬।

৯৬. মনু ৪।২৫৩ ও বিষ্ণু ধ.সূ ৫৭।১৬ 'আর্ধিকঃ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১।১৬৬-তে আছে 'অর্ধসীরিকঃ'।

৯৭ 'এপি. ইণ্ডিকা', ১, প্রত্নলেখ নং ১, পঙ্‌ক্তি ৩৯। 'আর্ধিকঃ' শব্দটি বুহ্‌লার ভুল অনুবাদ করেছেন শ্রমিক বলে (পূর্বোক্ত, পৃ ৯)।

৯৮. বৃহস্পতিস্মৃতি' (সংস্কার, ৪০৪)-এ 'কুলিক'দের উল্লেখ করা হয়েছে মানবগোষ্ঠী রূপে। খৃস্টীয় একাদশ শতকের পাল যুগের এক প্রত্নলেখে মানবগোষ্ঠীর তালিকায় তাদের নাম আছে। 'এপি ইণ্ডিকা', ২৯, প্রত্নলেখ নং ১, পঙ্‌ক্তি ৩৯।

৯৯. ছোটনাগপুরে মুণ্ডা আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দল হলেন কোলরা।

১০০. 'এপি. ইণ্ডিকা', ৮, প্রত্নলেখ নং ১২, পঙ্‌ক্তি ৬।

১০১. নারদ ১।১৮১।

১০২. 'দি এজ্ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটি', পৃ ২৯৯।

১০৩ 'কিনাশঃ শূদ্রঃ বদর্যো বা'। নারদ ১।১৮১-র টীকা।

এই ভাষ্য সঠিক বলে মনে হয়, কারণ কিনাশের পরেই নারদ শূদ্রা স্ত্রীর সন্তানকেও সাক্ষী হিসেবে অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।[১০৪] এর থেকে দেখা যায় যে শূদ্রদের সম্ভবত কৃষক রূপে বিবেচনা করা হতো। বৃহস্পতি থেকেও বিষয়টি সমর্থিত হয়। যে-শূদ্র ভূমির সীমানা সংক্রান্ত বিবাদে নেতৃত্ব দেন, তাঁর জন্য তিনি অতি কঠোর দৈহিক শাস্তির বিধান দিয়েছেন।[১০৫] স্পষ্টতই এসব বিবাদ তাঁরা পরিচালনা করতে পারতেন শুধু ভূমির স্বত্বাধিকারী রূপেই। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' গ্রামের সংজ্ঞার্থ একটি বসতি যেখানে শূদ্ররা অগণিত ও কৃষকদের সমৃদ্ধি হয়।[১০৬] এই কৃষকদের কিছু অংশ শূদ্র হতে পারেন। কাত্যায়ন বিধান দিয়েছেন, কোন ব্যক্তি ঋণ শোধে অসমর্থ হলে তাঁর উচিত কাজ করে তা শোধ করা ; কাজ করতে অপারগ হলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা উচিত। কিন্তু এই বিধানটি শুধু নিম্ন তিন বর্ণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (যাঁরা ছিলেন কৃষক), ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে নয়।[১০৭] 'বৃহৎসংহিতা'য় বলা হয়েছে, দক্ষিণে অগ্নিকাণ্ড হলে কষ্ট হবে উগ্র ও বৈশ্যদের, আর পশ্চিমে হলে শূদ্র ও কৃষকদের।[১০৮] এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে শূদ্র ও কৃষকদের পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত বলে মনে করা হতো। ফলত উপরের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়, শূদ্ররা ক্রমে ক্রমে কৃষকে পরিণত হচ্ছিলেন।

এই যুগে মধ্যভারতে যে-সব ভূমি-অনুদান করা হয়েছিল সেখানে বার বার করপ্রদায়ী 'কুটুম্বী' ও 'কারু' (কারিগর)-দের উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৯] বঙ্গে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 'কুটুম্বী'দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, ভূমি দান বা বিক্রয়ের কথা তাঁদের জানানো হয়।[১১০] 'কারু'রা যে শূদ্র ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-কথা 'কুটুম্বী'দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এঁদের

১০৪ নারদ ১।১৮১। ১০৫ 'যদি শূদ্রো নেতা স্যাৎ…', বৃহস্পতি ১৯ ৬।

১০৬ 'তথা শূদ্রজলপ্রায়ঃ স্বসমৃদ্ধকৃষিবলাঃ'। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৪৯।৪৭। তুলনীয়: অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৬৮ তে শূদ্র গ্রামসমূহের উল্লেখ (বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইকনমিক লাইফ অ্যান্ড প্রগ্রেস ইন এনশেন্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৩২৯)।

১০৭. …কর্ষকান্ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রান্ সমহীনাংস্তু দাপয়েৎ। কাত্যায়ন, শ্লোক ৪৭৯-৮০। প্রসঙ্গ থেকে দেখা যায়, 'কর্ষকান্' পদটি 'ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রান্'-এর বিশেষণ। এর অনুবাদে কাণে 'কর্ষকান্'-কে স্বতন্ত্র বিশেষ্যরূপে ধরেছেন (ইংরিজি অনুবাদ, শ্লোক ৪৭৯-৮০)। কিন্তু শ্লোকটির ভাবের সঙ্গে তা খাপ খায় না। 'ব্রাহ্মণ' ও 'ক্ষত্রবিট্‌-শূদ্রান্'এর মধ্যে 'কর্ষকান্' পদটি এসেছে। তুলনীয়: কাত্যায়ন, শ্লোক ৫৮৬।

১০৮. বৃহৎসংহিতা, ৩১।৩।৪।

১০৯. 'কর্পাস ইনস্ক্রিপশনুম ইণ্ডিকারুম', ৩, প্রত্নলেখ নং ৬০, পঙ্‌ক্তি ১২ ; নং ২৭, পঙ্‌ক্তি ৬ ; নং ২৬, পঙ্‌ক্তি ৬।

১১০. দীনেশচন্দ্র সরকার (সম্পা.), 'সিলেক্ট্ ইনস্ক্রিপশন্‌স', ১, পর্ব ৩, নং ৪০ক, পঙ্‌ক্তি ৫ ; নং ৪২, পঙ্‌ক্তি ৩।

গণ্য করা হয়েছে কৃষক[১১১] বা গৃহদাস[১১২] রূপে। এও প্রস্তাব করা হয়েছে যে 'কুটুম্বী'রা ছিলেন পেশাদার কারিগর শ্রেণীর মানুষ যাঁরা জীবনধারণের অনুপূরক উপায় হিসেবে চাষ করতেন।[১১৩] কিন্তু মনে হয় 'কারু'দের প্রতিতুলনায় 'কুটুম্বী'রা ছিলেন কৃষিতে নিযুক্ত গৃহস্বামী। পূর্ববর্তী বিভিন্ন পালি রচনায় তাঁদের সম্পন্ন গৃহকর্তা রূপে দেখা যায়[১১৪] এবং তাঁরা বৈশ্যও হতে পারেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ভাগচাষী 'কুটুম্বী'দের টি. গণপতি শাস্ত্রী শূদ্র বলেই ধরেছেন।[১১৫] গুপ্ত যুগের করপ্রদায়ী পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারেন বৈশ্য ও শূদ্র দুজনেই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে, মনে হয়, এই অবস্থানে বড় রকমের পরিবর্তন এসেছিল। কুর্মীরা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের একটি সংখ্যাগুরু কৃষিজীবী জাতি। তাঁদের শূদ্র পর্যায়ে রাখা হয়। 'কুটুম্বী'দের সঙ্গে তাঁদের মিল থাকতে পারে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে যে কুনবি জাতি দেখা যায় তাঁদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

আবার, 'উপরিকর' মানে অস্থায়ী কৃষকদের উপর আরোপিত কর—এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা হয়,[১১৬] তাহলে দেখা যাবে, পূর্ববর্তী যুগে যেসব দাস ও কর্মকর রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারীর ভূমিতে কাজ করতেন তাঁদের এখন অস্থায়ীভাবে জমি দেওয়া হচ্ছিল।

কৃষকদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ভূমির উপর বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ ও নতুন কৃষকদের উচ্চহারে কর দেওয়ার অক্ষমতা—এইসব কারণেই বোধহয় ভূমি-রাজস্বের ভার উৎপন্নের ¼ থেকে কমিয়ে ⅙ অংশ করা হয়েছিল।[১১৭] বৃহস্পতি বিধান দিয়েছেন যে চাষের প্রকৃতি ও উৎপাদন অনুযায়ী রাজা শস্যের ⅙, ⅛ বা ১/১০ অংশ গ্রহণ করবেন।[১১৮]

খৃস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে য়ুয়ান চাং শূদ্রদের বর্ণনা করেছেন কৃষিজীবীদের একটি শ্রেণী হিসেবে।[১১৯] 'নরসিংহ পুরাণ' থেকে এর

১১১. ফ্লীট, 'কর্পুস ইনস্ক্রিপতিওনুম ইন্দিকারুম', ৩, পৃ ১২৩।

১১২. কিলহর্ন, 'এপি. ইণ্ডিকা', ৩, পৃ ১৫৭। ১১৩. প্রাণ নাথ, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৭।

১১৪. দ্র. "কুটুম্বিক", পালি-ইংলিশ ডিকশনারি'। ১১৫. অর্থশাস্ত্র. ১ম, পৃ ১৩।

১১৬. ফ্লীট, 'কর্পুস ইনস্ক্রিপতিওনুম ইন্দিকারুম', ৩, পৃ ৯৮; ঘোষাল, 'হিন্দু রেভিনিউ সিস্টেম', পৃ ১৯১, ২১। অন্যান্য মতের জন্য দ্র. বার্নেট, 'জার্নাল অফ দ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি', ১৯৩১, পৃ ১৬৫; সরকার, 'সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশনস', ১ম, পৃ ২৬৬ টী. ৫।

১১৭. রঘুবংশ, ১৭।৬৫; নারদ ১৮।৪৮; বৃহস্পতি, আপদ্ধর্ম', শ্লোক ৭।

১১৮. বৃহস্পতি ১।৪৩-৪৪। মূলে 'কিনাশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। নারদ ১।১৩১ প্রসঙ্গে অসহায়-এর ভাষ্য অনুযায়ী তার অর্থ শূদ্র।

১১৯. "চতুর্থ শ্রেণী হলো শূদ্র বা কৃষিজীবী; তাঁরা জমি চাষ করেন ও বীজ বোনা ও শস্য কাটায় দক্ষ"। ওয়াটার্স, 'অন য়ুয়ান চাং'স ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া', ১ম, পৃ ১৬৮।

সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে কৃষিকেই শূদ্রদের কর্তব্য বলে বিধান দেওয়া হয়েছে।[১২০] কিন্তু এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল, মনে হয়, গুপ্ত যুগে। কৃষকরা প্রধানত শূদ্রদের দিয়েই তৈরি[১২১]—এই মত পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে গুপ্ত যুগের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্য বলে মনে হয়। সম্ভবত পূর্ববর্তী কোন যুগে কখনোই শূদ্রদের সংখ্যাগত শক্তির এত বিশাল বৃদ্ধি ঘটেনি। বহুসংখ্যক আদিম জনগোষ্ঠী ও বিদেশী উপাদানকে একীকরণের জন্য বর্ণসংকরের (বর্ণের মিশ্রণ) কল্পনাটিকে মনু তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগিয়েছেন। অধিকাংশ সময়ে বংশানুক্রমিক কর্তব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকরবর্ণকে শূদ্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১২২] কিন্তু পুরনো সপর্যায়ীদের মতো, এই নতুন শূদ্রদের দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হতো বলে মনে হয় না। তাঁরা তাঁদের পুরনো বৃত্তি অনুসরণ করতেন। হয়তো তাঁদের কৃষিকর্মের নতুন পদ্ধতি শেখানো হয়েছিল,[১২৩] যার ফলে তাঁরা ক্রমশ করপ্রদায়ী কৃষকে পরিণত হয়েছিলেন। ফলত, ব্রাহ্মণ্য সমাজ আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্য জীবনের জ্ঞান সঞ্চারিত করায় তাঁদের যেমন উপকার হয়েছিল, তেমনি এই সমাজও নতুন উৎপাদনশীল জনতাকে (নিজেদের সঙ্গে) যুক্ত করে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল তার বহু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা।

যে-পদ্ধতিতে শূদ্রদের মধ্যে কৃষিজীবিতার উদ্ভব হয়েছিল সে-বিষয়ে একটি প্রকল্প করার ঝুঁকি নেওয়া যায়। খৃস্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ বৈশ্য-শূদ্র সামাজিক সংস্থান এক গভীর সামাজিক সংকটে ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পুরাণের যেসব অংশের রচনাকাল খৃস্টীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতক সেখানে কলিযুগের বর্ণনায় এই সংকটের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। "শান্তিপর্বে" দণ্ডবিধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব ও মহাকাব্যগুলিতে অরাজকতার বর্ণনা সম্ভবত ঐ একই যুগের বিষয় এবং একই সংকটের নির্দেশক। বর্ণসংকর অর্থাৎ বিভিন্ন বর্ণ বা সামাজিক বর্গের মিশ্রণকে কলিযুগের বৈশিষ্ট্য রূপে ধরা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়: বৈশ্য ও শূদ্ররা, অর্থাৎ কৃষক, হস্তশিল্পী, ও শ্রমিকরা তাঁদের জন্য নির্ধারিত উৎপাদনশীল কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকতে অস্বীকার করেছিলেন অথবা বৈশ্য কৃষকরা কর দিতে অসম্মত হন ও শূদ্ররা শ্রমদান করতে অস্বীকার করেন। যেহেতু রাজকীয় অধিকারীদের মাধ্যমে কর সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তাই ধর্মীয়

১২০. নরসিংহ পুরাণ ৫৮।১০-১৫। আল-বীরুনী এই পুরাণটির কথা জানতেন (সাখাউ, ১ম, পৃ ১৩০), সুতরাং এটি সংকলনের শেষ সীমা খৃস্টীয় দশম শতকে রাখা যেতে পারে।

১২১. হপকিন্স মনে হয় শূদ্রের জায়গায় 'দাস' ('স্লেভ') শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' ১ম, পৃ ২৬৮।

১২২. রংগস্বামী আয়েংগার, 'আসপেক্‌ট্‌স্‌ অফ দ সোশ্যাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ মনু', পৃ ১০৮।

১২৩. কোসম্বী, 'জার্নাল অফ দি আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি', ৭৫, পৃ ৪১।

ও সম্ভবত প্রশাসনিক কাজের প্রাপ্য হিসেবে ভূমি-অনুদান দেওয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ায় রাজা ও কৃষকের মধ্যে একটি ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। কৃষকরা ছিলেন প্রধানত বিভিন্ন আবাসিত অঞ্চলের বৈশ্য। ফলে বৈশ্যরা নীচু পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। একইভাবে যখন আদিবাসী প্রধানেরা অসুবিধার সৃষ্টি করেন, তখন ভূমি-অনুদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের আদিবাসী অঞ্চলে বসত করানো হয়। বিভিন্ন পশ্চাৎপদ ও আদিম জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্যদের ভূমিদানের ফলে লোহার লাঙলে কৃষিকর্মের প্রসার, গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি-বর্ষপঞ্জির বিস্তৃতি ও আয়ুর্বেদিক ঔষধপত্রের জ্ঞানের বিস্তার ঘটে। ফলত ভূমিদানের বিষয়টি সামগ্রিকভাবে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রের প্রতি আদিবাসীদের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। এইভাবে ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য সংগঠনের আওতায় আসেন এক বিশাল সংখ্যক আদিম জনগোষ্ঠী। তাঁদের শূদ্র পর্যায়ভুক্ত করা হয়। অতএব, আদিপর্বের মধ্যযুগীয় লেখাপত্রে শূদ্রদের কৃষক ও কৃষিজীবী বলে অভিহিত করা শুরু হয়।

এমনও বলা যেতে পারে—যা কোন মতেই চূড়ান্ত নয়—যে এই উত্তরণে সাহায্য করেছিল ব্যাপক মাত্রায় লোহার ব্যবহার। 'অমরকোষে' লোহা ও লোহার মরিচার জন্য যথাক্রমে সাতটি ও দুটি নাম পাওয়া যায়।[১২৪] এই যুগের একটি বৌদ্ধ অর্থকথায় বিভিন্ন ধাতুর এক বিস্তৃত বর্গীকরণ করা হয়েছে।[১২৫] 'অমরকোষে' লাঙলের ফলার জন্যও পাঁচটি নাম আছে।[১২৬] সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এই কৃষিকর্মের উপকরণটির সুলভ সরবরাহ ও নিবিড়ভাবে ভূমিকর্ষণের ইঙ্গিত তার থেকে পাওয়া যেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের বিভিন্ন উপকরণের যোগান না থাকলে প্রাক্তন দাস, কর্মকর, আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান নতুন নতুন পরিবার কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকতে পারতেন না। লোহার যন্ত্রপাতির যোগান যে প্রচুর ছিল তা সিদ্ধান্ত করা যায় খৃস্টীয় প্রথম দুই শতকে রোমান সাম্রাজ্যে লোহার জিনিসপত্র রপ্তানি থেকে। শেষ পর্যন্ত সেখানে এই রপ্তানি নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল। ইস্পাত তৈরির কলাকৌশল শুরু হয় আনুমানিক খৃপূ ২০০ থেকে।[১২৭] লোহার জিনিসের ব্যবহার এত ছড়িয়ে পড়ে যে এখন তা অপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যেও ব্যবহার হয়। মেহরাউলি লৌহস্তম্ভ হলো এই ধরনের ব্যবহারের বড় দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তর

১২৪. অমরকোষ ২।৯।৯৮ ও ৯৯।

১২৫. বিভঙ্গ অট্‌ঠকথা, পৃ ৬৩, 'পালি-ইংলিশ ডিক্‌শনারি', "লোহ" প্রসঙ্গে উদ্ধৃত। চন্দ্রের মেহরাউলি লৌহস্তম্ভ থেকে স্পষ্ট যে এই পর্বে লোহার কাজের কারিগরী জ্ঞান চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

১২৬. অমরকোষ ২।৯।১৩।

১২৭. বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ. সি. ভরদ্বাজ-র কাছে প্রাপ্ত তথ্য।

ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামীণ বসতির উৎখননে কোন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। তার থেকে পূর্ববর্তী সময়ে লৌহজাত কৃষিজ উপকরণ ব্যবহারের ব্যাপকতর বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারত। কারণ, ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা-দের কথা থেকে জানা যায়, ভাড়া-করা শ্রমিকদের উপকরণ সরবরাহ করা হতো, কাজের শেষে প্রভুর কাছে তা ফেরত দিতে হতো।[১২৮] কিন্তু নিজস্ব উপকরণ না থাকলে এই শ্রমিকরা কৃষিজীবী হয়ে উঠতে পারতেন না। আর এই যুগের ক্রমবর্ধমান লৌহশিল্প সম্ভবত তাঁদের সেই উপকরণই যোগান দিয়েছিল।

এ-যুগে শূদ্র হস্তশিল্পীরা তাঁদের গুরুত্ব বজায় রেখেছিলেন। পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা শূদ্রের জন্য শিল্প ও কারুকর্মের অনুমতি দিয়েছিলেন শুধু তখনই যখন তাঁরা উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন না। কিন্তু এই শর্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো,[১২৯] হাতের কাজকে ধরা হলো শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তির মধ্যে।[১৩০] বৃহস্পতির সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী এই কারুকর্ম হলো সোনা, স্বল্প মূল্যবান ধাতু, কাঠ, সুতো, পাথর ও চামড়ার কাজ।[১৩১] সাধারণ কারুকর্মী তাঁদের কুলশ্রেষ্ঠী (বৃত্তি-গোষ্ঠীর প্রধান), মাল্যকার, রজক, কুণ্ডকার, লেপক, কুলাল (ইঁট-ভাটার কারিগর), তন্তুবায়, শৌচিক (দর্জি), চিত্রকর, শস্ত্রকার, চর্মশিল্পী, লোহকার, শঙ্খকার ও তাম্রকার—এঁদের প্রত্যেকের জন্য দুটি করে নাম পাওয়া যায় 'অমরকোষে'র "শূদ্রবর্গে"র অন্তর্ভুক্ত কারুশিল্পীর তালি-কায়।[১৩২] সেখানে স্বর্ণকার ও সূত্রধরের জন্য যথাক্রমে চারটি ও পাঁচটি নাম আছে।[১৩৩] মৃদঙ্গ, পাণি, বেণু ও বীণাবাদক,[১৩৪] কুশীলব, নট ও ঐন্দ্রজালিককেও "শূদ্রবর্গে"র অন্তর্গত করা হয়েছে।[১৩৫] অতএব, এই তালিকা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শূদ্ররা সব ধরনের শিল্প ও কারুকর্মের চর্চা করতেন।[১৩৬]

হস্তশিল্পীদের মাসে একদিন রাজার জন্য কাজ করতে হবে—এই প্রাচীন

১২৮ যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৩, নারদ ৫।৪।

১২৯. ভাগবত পুরাণ ১১।১৮।৪৯-এ এই মতই অবশ্য পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

১৩০. কামন্দক নীতিসার ২।২১, তুলনীয়: ৪।৫৪ ৫৬; মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২৮।৩-৮; বিষ্ণু পুরাণ ৩।৮।৩২-৩৩; যাজ্ঞবল্ক্য ১ ১২০; বিষ্ণু স্মৃতি ৩ ৫; শূদ্রস্য...সর্ব-শিল্পানি, বৃহস্পতি স্মৃতি, সংস্কার, শ্লোক ৫৩০।

১৩১ বৃহস্পতি ১৩।৩৩। ১৩২. অমরকোষ ২ ১০।৫-১০।

১৩৩. ঐ, ২।১০।৮ ও ৯। ১৩৪. ঐ, ২।১০।১৩। ১৩৫. ঐ, ২।১০।১২।

১৩৬. এঁদের কয়েকজন, যেমন মালাকার, স্বর্ণকার, রজক, নট, নর্তক ইত্যাদির উল্লেখ আছে 'কামসূত্রে' (১।৪।২৮, ৫।২।১২, ৬।১।৯)। এঁরা সম্ভবত নাগরকদের বিলাসদ্রব্য যোগান দিতেন।

বিধানের পুনরাবৃত্তি করেছেন বিষ্ণু।[১৩৭] বাস্তবে এই নীতির প্রয়োগ অব্যাহত ছিল, কারণ খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ভারতের এক প্রত্নলেখে বলা হয়েছে, ধাতুকার, রথকার, ক্ষৌরকার ও কুম্ভকারদের উপর জ্যেষ্ঠরা ('বারিকেণ') বাধ্যতামূলক শ্রম ('বিষ্টি') আরোপ করবেন।[১৩৮] বশিষ্ঠ বলেন যে কারুকর্মগত উপার্জনের উপর কোন কর ধার্য করা অনুচিত।[১৩৯] যাই হোক, মৌর্যোত্তর যুগে কর শুধু তন্তুবায়দের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়।[১৪০] কিন্তু এ-যুগে কারুকর্মীদের উপর কর চাপানো শুরু হয়। "শান্তিপর্বে" বিধান দেওয়া হয়েছে যে হস্তশিল্পী ও বণিকদের উৎপাদনের অবস্থা ও কারুশিল্পের প্রকৃতি বিবেচনা করে তাঁদের কর ধার্য করতে হবে। উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং দ্রব্য রূপেও তা সংগ্রহ করা যায়।[১৪১] হস্তশিল্পীরা যে রাষ্ট্রকে কর দিতেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ এ-যুগের বিভিন্ন প্রত্নলেখে বিষয়টি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ৪৪৬ খৃস্টাব্দের একটি পল্লব প্রত্নলেখ থেকে জানা যায় যে লোহকার, চর্মকার, তন্তুবায় ও এমনকি ক্ষৌরকারও রাজাকে কর দিতেন।[১৪২] এ-সমস্তই জাগতিক উন্নতির ও এক শ্রেণীর শূদ্র হস্তশিল্পীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে। 'কামসূত্রে'র একটি অংশের টীকা থেকে অনুমান করা যায়, হস্তশিল্পী, অভিনেতা ইত্যাদি বৃত্তির মাধ্যমে শূদ্র তাঁর উপার্জন সঞ্চয় করতে পারেন ও এইভাবে একজন সম্মানীয় ও বিশিষ্ট নাগরিকে ('নাগরক') পরিণত হতে পারেন।[১৪৩]

কর প্রদানের বিভিন্ন বিধান থেকে দেখা যায়, মৌর্য যুগে রাষ্ট্র যেভাবে হস্তশিল্পীদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করত এখন আর তা প্রচলিত ছিল না। রাজধানীবাসী হস্তশিল্পীরা[১৪৪] সম্ভবত রাজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। কিন্তু প্রায়ই গ্রামের হস্তশিল্পীদের উল্লেখ থেকে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলেই তাঁদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সেখানে তাঁরা অল্পাধিক স্বাধীনভাবে বসবাস ও কাজকর্ম করতেন।

বিভিন্ন বৃত্তিগোষ্ঠী ক্ষমতাবান হওয়ায় হস্তশিল্পীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজধানী ও নগরের বিন্যাসে[১৪৫] এইসব বৃত্তিগোষ্ঠীকে ('শ্রেণি')

১৩৭. গৌতম ধ. সূ. ১০।৩১-৩৩, বশিষ্ঠ ধ. সূ. ১৯।২৮, মনু ৭।১৩৮ ; বিষ্ণু ৩।৩২।

১৩৮. কার জন্য এ কাজ করা হতো—রাজার না 'বারিকে'র—তা স্পষ্ট নয়। 'জার্নাল অফ দ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল', পর্ব ৩, ১৬, পৃ ১২১, বিধি নং ৭২।

১৩৯. ১৯।৩৭। ১৪০. ষষ্ঠ অধ্যায় দ্র.।

১৪১. শান্তিপর্ব ৮৮।১-১২ ; প্রামাণিক সংস্করণে শ্লোক ১২-র টীকা ; রাজধর্ম, ২য় ভাগ, ফ্যাসিকুল ১৯, পৃ ৬৬৮, তুলনীয় : ৮৭।১৬-১৭।

১৪২. 'এপি. ইণ্ডিকা', ২৪, প্রত্নলেখ নং ৪৩, পঙ্‌ক্তি ১৮-১৯। প্রত্নলেখটিতে বিবাহ-করেরও উল্লেখ আছে। উত্তর ভারতে সাম্প্রতিককালেও এই প্রথা বলবৎ ছিল।

১৪৩. ১।৪।১। ১৪৪. বৃহস্পতি ১।৩৪। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'ও এর ব্যবস্থা আছে।

১৪৫. অমরকোষ ২।৮।১৮।

তার অঙ্গীভূত উপাদান রূপে বিবেচনা করা শুরু হয়। স্পষ্টতই এগুলো ছিল হস্তশিল্পী[১৪৬] ও বণিক সঙ্ঘ। পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রে ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' রাজাকে বলা হয়েছে বৃত্তিগোষ্ঠীর প্রথাকে ('শ্রেণিধর্ম') সম্মান দিতে।[১৪৭] গুপ্ত যুগের ধর্মশাস্ত্রে রাজাকে ঐসব গোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথা কার্যকরী করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৪৮] বৃহস্পতি বিধান দিয়েছেন, বিভিন্ন ঘোষিত বিধিবিধান অনুযায়ী শ্রেণিপ্রধানরা অন্য লোকের প্রতি যা করবেন, রাজাকে অবশ্যই তা অনুমোদন করতে হবে, কারণ বলা হয়েছে তাঁরাই হলেন কার্যকলাপ পরিচালনায় নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক।[১৪৯] তিনি রাজাকে এই বলে সতর্ক করেছেন: যদি অঞ্চল, জাতি ও কুলের বিভিন্ন প্রথাকে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে জনগণ অসন্তুষ্ট হবেন ও তার ফলে সম্পদের ক্ষতি হবে।[১৫০] অতএব, মনে হয় বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বাধীনভাবে ইচ্ছামতো কাজ করতেন ও রাজা তাঁদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য ছিলেন।[১৫১] অর্থাৎ, তাঁরা মোটামুটি-ভাবে উৎপাদনের স্বাধীন একক ও কার্যত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁরা অব্যাহত রেখেছিলেন নিজেদের প্রাচীন কার্যধারা, অর্থাৎ গচ্ছিত হিসেবে টাকা নেওয়া, ও সুদ দেওয়া এবং স্পষ্টতই নিজ ব্যবসায়ে তা বিনিয়োগ করা। ইন্দোরে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে তৈলিক শ্রেণির এক প্রত্নলেখ থেকে তা-ই দেখা যায়।[১৫২] এইসব কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে তাঁদের ঐহিক সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে মান্দাসোরের রেশমশিল্পীদের সূর্যমন্দির নির্মাণ ও সংস্কার থেকে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[১৫৩] এমন ভাবলে ভুল হবে যে, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র বিভিন্ন বৃত্তিগোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তার আরম্ভ করায় তাদের অবনতি শুরু হয়।[১৫৪] ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-শাস্ত্রপ্রণেতারা বৃত্তিগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে শুধু স্বীকৃতিই দেননি, গুপ্তযুগের প্রত্নলেখে উল্লিখিত দুটি বৃত্তিগোষ্ঠী ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল অথবা তাদের ব্রাহ্মণ্য যোগাযোগ ছিল।[১৫৫]

১৪৬. রঘুবংশ ১৬।৩৮ ও পঞ্চতন্ত্র, পৃ ৪-৫-এ যথাক্রমে 'শিল্পসংঘ' ও প্রধান-স্থপতিদের অধীনে গৃহনির্মাতাদের কথা আছে।

১৪৭. গৌতম ১১।২১-২২; মনু ৮।৪১ ও ৪৬; মুখোপাধ্যায়, 'লোকাল গভর্নমেণ্ট ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ১২৫-৩১।

১৪৮. নারদ ১০।২; তুলনীয় . বিষ্ণু ৫।১৬৮-তে 'সংবিদ্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে; তেষাং বৃত্তিং পালয়েৎ, যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯২, তুলনীয়: ১।৩৬১।

১৪৯. বৃহস্পতি ১৭।১৮।

১৫০. ঐ, ১।১২৬।

১৫১. মজুমদার, 'কর্পোরেট লাইফ এন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া', পৃ ৬২।

১৫২. 'কর্পাস ইনস্ক্রিপতিওনুম ইন্দিকারুম', ৩, স্কন্দগুপ্তের ইন্দোর তাম্রলেখ (৪৬৫ খৃ)।

১৫৩. ঐ, প্রত্নলেখ নং ১৮, পৃ ৮০-৮৫।

১৫৪. নরসু, 'এসেন্সিয়াল্স্ অফ বুদ্ধিজম', পৃ ১৪১।

১৫৫. ইন্দোরের 'তৈলিক শ্রেণি'র কাছে জনৈক ব্রাহ্মণ অর্থ গচ্ছিত রেখেছিলেন। রেশম-বয়নকারীরা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মণ্য দেবতা সূর্যের উদ্দেশে।

নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের সম্পর্ক পরিচালনা সংক্রান্ত নানান নিয়ম থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের (শূদ্র সম্প্রদায় থেকে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল) অবস্থানের উন্নতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে কাজ না করতে পারলে কৌটিল্য ১২ 'পণ' অর্থদণ্ডের বিধান দিয়েছেন। তিনি যে বেতনের পরিমাণ স্থির করেছেন এটি তার পাঁচ থেকে কুড়ি গুণের সমান।[১৫৬] কিন্তু কোন কর্মচারী বেতন নেওয়ার পর কাজ না-করলে গুপ্ত যুগের অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঐ বেতনের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ-দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন।[১৫৭] বৃহস্পতি কিন্তু শ্রমিকের ক্ষমতা অনুযায়ী বাড়তি অর্থদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন,[১৫৮] কোন কর্মী কাজ শেষ না-করলে নিয়োগকর্তাকে সব বেতন (ফেরত) দিয়ে দেবেন ও রাজাকে ১০০ 'পণ' অর্থ-দণ্ড দেবেন।[১৫৯] কিন্তু এই বিধানের একটি প্রতি-বিধানও আছে, যাতে কাজ শেষ হওয়ার আগে কোন কর্মীকে কর্মচ্যুত করলে নিয়োগকর্তার জন্যও এই শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১৬০] এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতি কয়েকটি ব্যবস্থাপত্রের প্রবর্তন করেছেন এ-যুগের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে যা পাওয়া যায় না। তার একটিতে নির্বিচারে মনুর নীতি গৃহীত হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী কোন কর্মী শারীরিকভাবে সমর্থ হয়েও গর্বভরে তাঁর নির্দিষ্ট কাজ না করলে তিনি তাঁর বেতনের অধিকার হারাবেন ও তাঁকে আট 'কৃষ্ণল' অর্থদণ্ড দিতে হবে।[১৬১] কিন্তু এর সঙ্গে বৃহস্পতি যোগ করেছেন যে কোন কাজ অসমাপ্ত রাখলে তাঁকে বেতন থেকে বঞ্চিত করা হবে ও তাঁর বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ আনা হবে।[১৬২] বিষ্ণুর মতো বৃহস্পতিও কর্মীর স্বার্থ রক্ষা করেছেন এই বলে যে কাজ সমাপ্ত করার পর নিয়োগকর্তা বেতন না দিলে রাজা তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।[১৬৩] নারদ যোগ করেছেন, এই ধরনের ঘটনায় নিয়োগকর্তাকে সুদসহ বেতন দিতে বাধ্য করা হবে।[১৬৪] নিঃসন্দেহে এর অর্থ হলো একটি সাধারণ নিয়মকে কার্যকর করা, যে-নিয়ম অনুযায়ী ভাড়া-করা ভৃত্যকে নিয়মমতো যথাস্বীকৃত বেতন দেওয়া প্রভুর পক্ষে বাধ্যতা-মূলক।[১৬৫] নারদের অপর একটি বিধান আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, নিয়োগকর্তার দোষে কোন ভারবাহক কাজ বন্ধ করলে তিনি

১৫৬. অর্থশাস্ত্র ৩.১৪ ; পৃ. ১৫৫-৫৬ দ্র.।

১৫৭ যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৩ ; নারদ ৬।৫ ; বৃহস্পতি ১৬।৫-৬।

১৫৮. বৃহস্পতি ১৬.৫। ১৫৯. বিষ্ণু ৫।১৫৩-৫৪। ১৬০. ঐ, ৫।১৫৭-৫৮।

১৬১. মনু ৮।২১৫ ; বৃহস্পতি ১৬।৪ ও ৮। বৃহস্পতির পাঠান্তরে আট 'কৃষ্ণল'-এর পরিবর্তে দশ 'পণ' আছে (সেক্রেড বুক্স অফ দি ইস্ট, ৪৩, পৃ. ৩৪৫, বৃহস্পতি ১৬।১৫-র টী.)।

১৬২. ১৬।৩। ১৬৩. ১৬।১১।

১৬৪. নেপালী পাঠ, সেক্রেড বুক্স অফ দি ইস্ট, ৩৩, পৃ. ১৪০-৪১, ৬।৭-এর টী.।

১৬৫. ৬।২।

যতটা কাজ করেছেন তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক তাঁকে দেওয়া হবে।[১৬৬] সম্ভবত অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল।

পশুপালক সংক্রান্ত কয়েকটি বিধানে, তাঁদের রক্ষণাধীন গবাদি পশু নিরাপদে রাখা যে তাঁদের কর্তব্য সে-বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।[১৬৭] কিন্তু পশু হারিয়ে গেলে কৌটিল্যের মতো তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়নি। বৃহস্পতি কিন্তু বলেন যে, পশুপালকদের রক্ষণাধীন গবাদি পশু পাকা শস্যের ক্ষতি করলে তাঁদের প্রহার করা হবে।[১৬৮]

অতএব, সব মিলিয়ে, কাজ না-করার জন্য গুপ্ত যুগের বিভিন্ন শাস্তি মৌর্য যুগের মতো অত কঠোর নয়; আর নিয়োগকর্তা বেতন না-দিলে বা অবিচার করলে কর্মীদের স্বার্থরক্ষার কিছু ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও এ-যুগের একটি ধর্মশাস্ত্রে কর্মচারীদের জন্য উদ্দীপক প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৌটিল্য শুধু তন্তুবায়দের জন্য পুরস্কারের প্রস্তাব করেছেন।[১৬৯] কোন কর্মীর থেকে যা কাজ আশা করা হয়েছিল তিনি যদি তার বেশি কাজ করেন, তাহলে নিয়োগকর্তার উচিত তাঁকে অধিক বেতন দেওয়া—যাজ্ঞবল্ক্য এই বিধান দিয়েছেন।[১৭০] অতএব, নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের সম্পর্ক সংক্রান্ত গুপ্ত যুগের বিভিন্ন বিধান থেকে ধারণা হয় যে, পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় সে-সম্পর্ক ছিল সদয় ও উদার। ফলত, শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা বেতনজীবী ছিলেন তাঁদের ঐহিক অবস্থা উন্নত হয়েছিল বলে আশা করা যায়।

গুপ্ত যুগে বাণিজ্যকে শূদ্রদের অন্যতম স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা অনুযায়ী কোন শূদ্র দ্বিজের সেবা করে নিজের ভরণপোষণ করতে না-পারলে সে বণিক হতে পারে।[১৭১] শূদ্রের অন্যতম স্বাভাবিক বৃত্তি হিসেবে তাঁকে সব রকমের পণ্য নিয়ে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন বৃহস্পতি।[১৭২] পুরাণেও বলা হয়েছে, শূদ্র কেনা-বেচায় নিযুক্ত থাকতে পারেন,[১৭৩] ও বাণিজ্যের লাভের মাধ্যমে জীবনধারণ করতে পারেন।[১৭৪] বৃহস্পতির বিধান অনুযায়ী কোন ব্যবসায় শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অংশীদার যথাক্রমে লাভের ১/৬, ১/৯, ১/১০ ও ১/২০ অংশ রাজাকে দেবেন।[১৭৫] এর সঙ্গে দেখা যায়, শূদ্র বণিকের অবস্থা উচ্চবর্ণের মতো অত অনুকূল ছিল না। এ ছাড়াও সৎ শূদ্ররা মদের মতো কয়েকটি পণ্য নিয়ে ব্যবসা করবেন বলে আশা করা হতো না।[১৭৬] কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত যে শূদ্ররা বাণিজ্য

১৬৬. নেপালী পাঠ, ঐ।

১৬৭. নারদ ৬।১১-১৭; বৃহস্পতি ১৬।১০, ১২-১৭। ১৬৮. ১৬।১৭।

১৬৯. অর্থশাস্ত্র ২।২৩। ১৭০. ২।১৯৫। ১৭১. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২০।

১৭২. ...বিক্রয়ঃ সর্বপণ্যানাং শূদ্রধর্ম উদাহৃতঃ। বৃহস্পতি, সংস্কার, শ্লোক ৫৩০।

১৭৩. মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৮।৩-৮। ১৭৪. বিষ্ণু পুরাণ ৩।৮।৩২-৩৩।

১৭৫. বৃহস্পতি ১৩।১৬। ১৭৬. ভবিষ্য পুরাণ ১।৪৪।৩২।

করতে পারতেন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা এ-বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে বৈশ্যদের প্রভেদ মুছে দেওয়া ছাড়াও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম দুই বর্ণের সঙ্গেও তাঁদের কোন প্রভেদ রাখেননি। শূদ্র বণিকরা, মনে হয়, সাধারণত ভ্রাম্যমান বিক্রেতার কাজ করতেন। এ-যুগের ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা 'অর্থশাস্ত্রে'র বিধি পুনরাবৃত্তি করেছেন: বিক্রয়ের $\frac{1}{10}$ অংশ তাঁদের পাওয়া উচিত।[১৭৭] কিন্তু "শান্তিপর্বে" এই অংশ বৃদ্ধি করে $\frac{1}{7}$ করা হয়েছে।[১৭৮] এই পরিবর্তন সম্ভবত গুপ্ত যুগের অবস্থা নির্দেশ করে।

বাণিজ্য ও শিল্পের স্থিতিশীলতা এই যুগে অব্যাহত ছিল।[১৭৯] তার উন্নতিতে হস্তশিল্পী ও বণিকরূপে শূদ্রেরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গুপ্ত যুগে শূদ্র কৃষকদের উত্থানের ঘটনা লক্ষ করা যায়। দেশের কৃষি-অর্থনীতিকে তাঁরা ধারণ করেছিলেন ও বিস্তার ঘটিয়েছিলেন।

কিন্তু উচ্চ বর্ণের তুলনায় শূদ্রদের জীবনধারণের মান নীচুই থেকে গিয়েছিল। বরাহমিহির-প্রণীত আবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের গৃহে যথাক্রমে পাঁচ, চার, তিন ও দুটি করে ঘর থাকবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মূল কক্ষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন হবে।[১৮০] এই ধরনের নিয়ম হয়তো শুধু গোঁড়া ব্রাহ্মণরাই মেনে চলতেন। কিন্তু এর থেকে দেখা যায়, নিম্নবর্গের মানুষ উন্নততর আবাসনের সুযোগসুবিধা ভোগের আশা করতে পারতেন না।

এই যুগে শূদ্র শাসকদের উল্লেখও পাওয়া যায়, যেমন সৌরাষ্ট্রে, অবন্তী,

১৭৭. অর্থশাস্ত্র ৩.১৩; যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৪; নারদ ৬।২-৩, কাত্যায়ন, শ্লোক ৬৫৬।

১৭৮. শান্তিপর্ব ৬০।২৫। শান্তিপর্বে যদিও বৈশ্য বিক্রেতার জন্য বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, শূদ্রদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয়ে থাকতে পারে।

১৭৯. যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা-র প্রথম অংশীদারি বিষয়ে বিস্তৃত নিয়মাদি পাওয়া যায়। তার থেকেই একথা স্পষ্ট। তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, কৌটিল্য ও মনুর (৭।২০৬-১০) মতো যাজ্ঞবল্ক্য (২।২৬৫) প্রথম বণিক ও বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের অংশ-সংক্রান্ত বিধির কথা বলেছেন, এবং এ-ও বলেছেন যে পৌরোহিত্য, কৃষিজীবী ও কারুশিল্পীদের অংশীদারি সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে এই পর্বের বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে নারদ বলেছেন (১।১০৫-০৬) যে বিদেশে ঋণের চুক্তি করা হলে চুক্তিস্থলের বিধি অনুযায়ী সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হবে। তুলনীয়: জায়সবাল, 'মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ১৯৮ ও ২১১। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'য় (আনু. ৫০০ খৃ-র রচনা, কীথ, 'হিস্ট্রি অফ স্যান্সক্রিট লিটরেচর', পৃ ২৬৮) রাজার কথা ততটা নেই, যত আছে বণিক, ব্যবসায়ী, সমুদ্রযাত্রী ও হস্তশিল্পীদের কথা (ঐ)।

১৮০. বৃহৎ সংহিতা, ৫২।১২-১৩।

অর্বুদ ও মালবে। এঁদের সঙ্গে পরম্পরাগত শূদ্র, আভীর[১৮১] ও ম্লেচ্ছ শাসকদেরও উল্লেখ আছে। তাঁরা সবাই সিন্ধু ও কাশ্মীর অঞ্চলে রাজত্ব করছেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পার্জিটার এর কাল নির্দেশ করেছেন খৃস্টীয় চতুর্থ শতক।[১৮২] কিন্তু এই জনগোষ্ঠীয় ও বিদেশী শাসকরা ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুসরণ করতেন না বলে তাঁদের সকলকে শূদ্র নামে অভিহিত করা হয়েছিল, চতুর্থ বর্ণ থেকে আসার কারণে নয়।[১৮৩] একটি নাটকে কিন্তু একজন গো-পালকের রাজা হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।[১৮৪] অ-ক্ষত্রিয় রাজার থেকে স্নাতকের কোন উপহার নেওয়া উচিত নয়—এই প্রাচীন বিধিটি যাজ্ঞবল্ক্য যখন পুনরাবৃত্তি করেছেন তখন তিনি বোধহয় এই ধরনের শাসকদের ( জনগোষ্ঠীয় বা শূদ্র ) কথা ভেবেছেন।[১৮৫] কালক্রমে এই শাসকরা ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি লাভ করেন ও সম্মানভাজন ক্ষত্রিয়ে পরিণত হন।

মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য ও কামন্দক প্রাচীন মতের পুনরাবৃত্তি করেছেন: তাঁরা যেন কুলীন ও বেদজ্ঞ হন।[১৮৬] এর ফলে শূদ্রদের মন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু "শান্তিপর্ব" নতুন পথের সূচনা করে। এখানে আটজন মন্ত্রীবিশিষ্ট একটি মণ্ডলের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার মধ্যে চারজন হবেন ব্রাহ্মণ, তিনজন বিশ্বস্ত সংযত ও বাধ্য শূদ্র, আর একজন সূত।[১৮৭] এই বিধি অনুসরণ করা হতো কি না জানা যায় না, কিন্তু এর থেকে শূদ্রদের প্রতি ব্রাহ্মণ্য মনোভাবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়।

বিচারক ও 'সভ্য' নিয়োগের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় কোন উদার মনোভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়েছেন যে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের সাহায্য নিয়ে রাজা বিচার পরিচালনা করবেন। রাজা অসমর্থ হলে ঐ ব্রাহ্মণরা বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[১৮৮] কাত্যায়ন এর সঙ্গে

১৮১. অমরকোষে "শূদ্রী' ( শূদ্রের স্ত্রী ) ও "শূদ্রা" ( শূদ্র জনগোষ্ঠীর নারী )-র মধ্যে তফাত করা হয়েছে। আভীর জনগোষ্ঠীর নারীকে বলা হয়েছে "মহাশূদ্রী" ( অমর-কোষ, ২।৬-১৩ )।

১৮২. পার্জিটার, 'ডাইনাস্টিজ অফ দ কলি এজ', পৃ ৫৫। ১৮৩. ঐ।

১৮৪ 'গোপালদারক' আর্যকের ঘটনা ( মৃচ্ছকটিক, ৬।১১ )। এটি সংশয়জনক, কারণ 'গোপাল'কে ব্যক্তিনাম হিসেবেও নেওয়া যেতে পারে।

১৮৫. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৪১।

১৮৬. মনু ৭।৫৪ ; কামন্দক নীতিসার ৪।২৫ ; যাজ্ঞবল্ক্য ১৩।৩১২। তুলনীয় : কামন্দক ৫।৬৮-৭০। কাত্যায়ন, শ্লোক ১১-য় বিধান দেওয়া আছে, অমাত্যকে ব্রাহ্মণ হতে হবে।

১৮৭. শান্তিপর্ব ৮৫।৭-১০। এই অংশে ৩৭ জন অমাত্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের চারজন হবেন ব্রাহ্মণ, আটজন শূদ্র, একুশজন বৈশ্য, তিনজন শূদ্র ও একজন সূত ( শান্তিপর্ব : কলকাতা সংস্করণ, ৮৫।৭-১১ )। প্রামাণিক সংস্করণে এই অংশটি নেই।

১৮৮. যাজ্ঞবল্ক্য ২।১-৩ ; তুলনীয় . বৃহস্পতি ১।৬৭।

যোগ করেছেন, ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিচারক নিয়োগ করা উচিত, কিন্তু শূদ্রকে সযত্নে পরিহার করতে হবে।[১৮৯] 'সভ্য' নিয়োগের ক্ষেত্রে বৃহস্পতি এই মত সমর্থন করেছেন।[১৯০] তিনি মনুর সাবধানবাণী পুনরাবৃত্তি করেছেন: শূদ্রের (বৃষল) সহায়তায় যে-শাসক কার্য পরিচালনা করেন তাঁর রাজ্য, শক্তি ও কোষাগার ধ্বংস হবে।[১৯১]

জেলা স্তরে কিন্তু কুলশ্রেষ্ঠী—যিনি শূদ্র ছিলেন—প্রশাসনিক কাজে কিছুটা ভাগ নিতেন। ৪৩৩ ও ৪৩৮ খৃস্টাব্দের দামোদরপুরের দুটি তাম্রলেখে 'প্রথমকুলিক' ধৃতিমিত্রকে কোটিবর্ষ (উত্তরবঙ্গে) জেলা পরিষদের সদস্য রূপে দেখানো হয়েছে। এই জেলা পরিষদটি ছিল একজন কুমারামাত্যের দায়িত্বে।[১৯২] বরিষ্ঠ নগর বিচারক[১৯৩] বা বণিক[১৯৪]—নানাভাবে 'কুলিক' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বতন রচনাদি থেকে এই ব্যাখ্যার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। 'কুলিক' শব্দটি সম্ভবত 'অমরকোষে'র 'কুলক'-এর সঙ্গে অভিন্ন, যার অর্থ কারুকর্মীদের প্রধান। শব্দটি 'অমরকোষে'র "শূদ্রবর্গে" পাওয়া যায়।[১৯৫] 'নারদস্মৃতি'তেও, মনে হয়, হস্তশিল্পী অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে 'কুলিক'কে মিথ্যা সাক্ষীর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৯৬] অতএব 'প্রথমকুলিক' ছিলেন কুলিকদের মধ্যে মুখ্য,[১৯৭] অর্থাৎ কারুকর্মীদের বৃত্তিগোষ্ঠীর প্রধান। তাই উত্তরবঙ্গের কোটিবর্ষ জেলার উপদেশক-পরিষদে তাঁর স্থান ছিল। সম্ভবত বৈশালীর বিভিন্ন জেলার মুখ্য কার্যালয়েও এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। সেখানে দুজন 'প্রথমকুলিকে'র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান-মুদ্রা পাওয়া যায়।[১৯৮] কারুকর্মীদের বৃত্তিগোষ্ঠীর প্রধানের সঙ্গে জেলার প্রশাসনের

১৮৯. শ্লোক ৬৭।

১৯০. ১'৭৯। ১৯১. বৃহস্পতি ১।৭২। ১৯২. 'এপি. ইণ্ডিকা', ১৫, পৃ ১৩০।

১৯৩. জায়সবাল, 'হিন্দু পলিটি', ১ম ভাগ, পৃ ৫৩ ; ২য় ভাগ, পৃ ১০৫।

১৯৪. টি. ব্লক, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, রিপোর্টস, ১৯০৩-০৪, পৃ ১০৪।

১৯৫. কুলকঃ স্যাৎ কুলশ্রেষ্ঠঃ। অমরকোষ ২।১০।৫। দীক্ষিতর এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন ('গুপ্ত পলিটি', পৃ ২৫৭)।

১৯৬ নারদ ১।১৮৭। মনে হয়, শূদ্র সাক্ষীদের বিরুদ্ধে প্রাচীন সংস্কার এই পর্বেও অব্যাহত ছিল।

১৯৭ বসার (বৈশালী)-এ 'কুলিক' (কারুকর্মী গোষ্ঠীর প্রধান)-দের আঠারোটি শিল আবিষ্কার হয়েছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, রিপোর্টস, ১৯০৩-০৪, পৃ ১১৪-১৬।

১৯৮. ঐ, পৃ ১১৭। খৃস্টীয় ১০ম-১১শ শতকে চম্বা রাজ্যে শৌল্কিক, গৌল্মিক ও অন্যান্যদের সঙ্গে গৌণ আধিকারিক রূপে কুলিক-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় (ফোগেল, 'অ্যান্টিকুইটিজ অফ চম্বা স্টেট', ১ম ভাগ, প্রস্তরলেখ নং ১৫, পঙ্‌ক্তি ৮-৯)। উত্তর প্রদেশের গোরখপুরে প্রাপ্ত, ১৯৩১ খৃস্টাব্দের একটি প্রস্তরলেখে শৌল্কিক, গৌল্মিক

যোগাযোগ তাঁদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই যুগের একটি জৈন রচনাতেও বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানে 'বড্‌ঢৈ' বা স্থপতিকে চতুর্দশ রত্নর অন্যতম বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৯৯] এই সব কিছু থেকেই শূদ্র কারুকর্মীদের পৌর মর্যাদায় কিছু উন্নতির আভাস পাওয়া যায়।

শূদ্ররা সাধারণত গৌণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। কৌটিল্যের মত পুনরাবৃত্তি করে কামন্দক বলেছেন, রাষ্ট্রের উচ্চ পদাধিকারী-দের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য গৃহভৃত্যরা গুপ্তচরের কাজ করবে।[২০০] নারদ বিধান দিয়েছেন, চণ্ডাল, জহ্লাদ (বাধক) ও ঐ ধরনের লোককে গ্রামের মধ্যে চোর খোঁজার কাজে নিয়োগ করা উচিত, আর যারা গ্রামের বাইরে বাস করে, তারা বাইরে থেকে চোরের খোঁজ করবে।[২০১]

বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাচীন বর্ণভেদ সাধারণভাবে অব্যাহত ছিল। বৃহস্পতি বিধান দিয়েছেন, সাক্ষীরা যেন সম্মানভাজন পরিবার থেকে আসেন এবং বেদ- ও স্মৃতি-নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়মিত পালন করেন।[২০২] স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে শূদ্রের কোন স্থান নেই। শূদ্ররা শুধু শূদ্রদের জন্য সাক্ষ্য দেবেন—এ-যুগের ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা এই বিধানের পুনরাবৃত্তি করেছেন।[২০৩] কাত্যায়নের বিধি হলো: কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা অনুরূপ জাতির সাক্ষীদের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে হবে। নীচ বর্ণের কোন অভিযোগকারী উচ্চবর্ণের সাক্ষীর সাক্ষ্য দিয়ে তাঁর অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না।[২০৪] নারদের মিথ্যা সাক্ষীর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন: ঐন্দ্রজালিক, নট, শৌণ্ডিক, তৈলিক, মাহুত, চর্মকার, চণ্ডাল, শূদ্র কৃষক ('কীনাশ'), শূদ্রার পুত্র ও পতিত।[২০৫] কিন্তু বর্ণ-সাক্ষী সংক্রান্ত প্রাচীন বিধিকে নারদ খানিকটা নমনীয় করেছেন। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী, যে-কোন বর্ণের মামলায় বর্ণ নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকতে পারেন।[২০৬] কয়েকটি বিষয়ে, যেমন ব্যভিচার, চুরি, মানহানি ও শারীরিক আঘাতের ক্ষেত্রে সাক্ষী হতে পারেন যে-কোন ব্যক্তি।[২০৭] গৃহ ও ভূমির সীমা সংক্রান্ত বিবাদে কৃষক, কারুকর্মী, কর্মকর, গোপ, ব্যাধ, মূলখানক, উঞ্ছবৃত্তিধারী এবং কৈবর্তদের (জেলে)

ইত্যাদির সঙ্গে মহাপান্ধাকুলিক-এর উল্লেখ আছে ('এপি. ইণ্ডিকা', ৭, প্রত্নলেখ নং ৯, পঙ্‌ক্তি ৩৪)। কুলিক ও মহাপান্ধাকুলিক ছিলেন সম্ভবত কারুকর্মীদের বৃত্তি-গোষ্ঠীর থেকে কর-সংগ্রাহক।

১৯৯ জম্বুদ্দিবহন্নত্তি, ৩।৫৫ (পৃ ২২৯)। ২০০. ১২।৪৪-৪৫।

২০১. ১৪।২৬। ২০২. ৫।৩৮।

২০৩. যাজ্ঞবল্ক্য ২।৬৯; কাত্যায়ন, শ্লোক ৩৪১; নারদ ১।১৫৪-এ 'অনিন্দিত শূদ্র' পদদুটি ব্যবহৃত হয়েছে। ২০৪. শ্লোক ৩৪৮।

২০৫. ১।১৭৮, ১৮১-৮৫। ২০৬. ১।১৫৪। ২০৭. যাজ্ঞবল্ক্য ২।৭২।

বৃহস্পতি অনায়াসেই সাক্ষী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[২০৮] অবস্থানের এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়, কারণ ক্ষেতের সীমানাগত বিবাদে যাজ্ঞবল্ক্য শুধু গোপ, কৃষক ও বনচারীদের এই ধরনের অনুমোদন দিয়েছেন।[২০৯] মনুতে এ-বিষয়ের বিধান আরও সীমিত ধরনের। ব্যাধ, শাকুনিক (পাখিশিকারী), গোপালক, কৈবর্ত, মূলখানক, ব্যালগ্রাহ (সাপুড়ে), উঞ্ছবৃত্তিধারী ও বনচারীদের মনু একমাত্র দুই গ্রামের মধ্যে সীমানাগত বিবাদে সাক্ষী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন—এবং কেবল তখনই যখন পার্শ্ববর্তী দুটি বা চারটি গ্রাম থেকে সাক্ষী পাওয়া যাবে না।[২১০] প্রধানত শূদ্রজাতিভুক্ত সাক্ষীদের জন্য বৃহস্পতির বিধান তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দেয়। কৃষক ও হস্তশিল্পী হিসেবে তাঁদের নতুন অবস্থানের সঙ্গে সেটি সঙ্গতিপূর্ণ। এটি এক প্রয়োজনীয় অধিকার, কারণ স্বভাবতই অন্য যে-কোন বিবাদের চেয়ে সীমানাগত বিবাদ বেশি হবে বলে আশা করা যায়।

যাই হোক, বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে যে বিভিন্ন সতর্কবাণী দেওয়া হতো তার কোন পরিবর্তন এ-যুগের ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা করেননি। শূদ্র সাক্ষীদের জন্য কঠোরতম সতর্কবাণীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[২১১]

শপথের ক্ষেত্রে বর্ণপার্থক্য মনুতে পাওয়া যায় না।[২১২] তার ব্যবস্থা কিন্তু এ-পর্বের ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা করেছেন।[২১৩] যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, শূদ্রের জন্য আগুন, জল ও বিষ দিয়ে পরীক্ষা এবং ব্রাহ্মণের জন্য তুলাদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত।[২১৪] এই প্রসঙ্গে তিনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ করেননি। কিন্তু অন্য তিনজন ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতার বিধান অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে যথাক্রমে তুলাদণ্ড, আগুন, জল ও বিষ দিয়ে যাচাই করা উচিত।[২১৫] কাত্যায়ন এখানে আবার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বলেছেন, এই সব ধরনের শপথ যে-কোন বর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, শুধু বিষ বাদে। ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য হয় না।[২১৬] ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উপর যে বিষ-পরীক্ষা করা যায় এই বিকল্প বিধি নারদও দিয়েছেন।[২১৭] নারদ ও কাত্যায়নের[২১৮] মতো বিষ্ণু বলেন, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে এই শপথ-বিধান করা যায় না।[২১৯] যে পরিমাণ গচ্ছিত ধন অস্বীকার করা হয়েছে তার মূল্যে অথবা

২০৮. ৯।২৬-২৭। ২০৯. যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৫০। ২১০. ৮।২৫৮-৬০।
২১১. বিষ্ণু ৮।২০-২৩; নারদ ১।১৯৯। ২১২. ৮।১১৪-১৬।
২১৩. যাজ্ঞবল্ক্য ২।৯৮; বৃহস্পতি ৮।১২; কাত্যায়ন, শ্লোক ৪২২।
২১৪. ২।৯৮। ২১৫. নারদ ১।৩৩৪-৩৫; বৃহস্পতি ৮।১২; কাত্যায়ন, শ্লোক ৪২২।
২১৬. শ্লোক ৪২২। যারা এসব নিয়ে কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে কাত্যায়নও অগ্নি-, জল- ও বিষ-পরীক্ষার অনুমতি দেননি (শ্লোক ৪২৪)।
২১৭. ১।৩২২। ২১৮. ৯।২৭। ২১৯. নারদ ১।৩৩৫; কাত্যায়ন, শ্লোক ৪২২।

চুরি বা ডাকাতির মাধ্যমে অপহৃত ধনের মূল্য অনুযায়ী বিষ্ণু শূদ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিজ্ঞা বা পবিত্র আহুতির মাধ্যমে শপথের নির্দেশ দিয়েছেন।[২২০] মূল্য যদি অর্ধ-সুবর্ণের বেশি হয় তাহলে বিচারক শূদ্রের জন্য চার রকম পরীক্ষা, অর্থাৎ তুলাদণ্ড, জল, আগুন ও বিষের শপথের মধ্যে যে-কোন একটির বিধান করতে পারেন।[২২১] এই চারটি শপথের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিশদ বিধি প্রদান করলেও[২২২] বিষ্ণু কিন্তু অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতাদের মতো বিভিন্ন বর্ণের জন্য তা নির্দেশ করেননি। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ করা যায় না বলেই বোধ হয় তাঁদের প্রতি খানিকটা বিবেচনা দেখানো হয়েছিল। অন্যথায় শপথ-বিধানের বিষয়ে বর্ণপার্থক্যের প্রচলন ছিল না। খৃস্টীয় তৃতীয় শতকে, সম্ভবত সাতবাহন রাজত্বের সময়ে, পশ্চিম ভারতে জলের মাধ্যমে শাপথ-বিধানের প্রথা পাওয়া যায়।[২২৩] কিন্তু এটি যে বিশেষ কোন বর্ণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল তেমন কিছু দেখা যায় না। যাই হোক, আদিম জনগোষ্ঠী ও বিদেশীদের (যাঁদের ব্রাহ্মণ্য সমাজের নীচু পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছিল) জন্য বিশেষ ধরনের শাস্তির প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। কাত্যায়ন তাই বিধান দিয়েছেন, অস্পৃশ্য, অধম, দাস ও ম্লেচ্ছদের জন্য রাজার শপথ-বিধানের ব্যবস্থা পালন করা উচিত।[২২৪]

মনুর বিধান অনুযায়ী বিচারালয়ের পক্ষে বর্ণের ক্রম অনুযায়ী আবেদন-পত্র গ্রাহ্য করা উচিত।[২২৫] কিন্তু আলোচ্য যুগের ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা এই বিধি উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও, বিভিন্ন সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে বর্ণপার্থক্য রক্ষা করা হতো। 'প্রতিভূ' রাখতে হয় এমন ধরনের বিবাদে কাত্যায়নও দ্বিজ ও শূদ্রের পার্থক্য করেছেন। প্রতিভূ না রাখতে পারলে দ্বিজকে রক্ষকরা শুধু প্রহরায় রাখবেন, কিন্তু শূদ্রকে আবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করা হবে।[২২৬] কিন্তু যাঁরা নিয়ন্ত্রণ ভেঙে পালাবেন তাঁদের সকলের জন্য তিনি বর্ণ-নির্বিশেষে আট 'পণ' অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন।[২২৭] এর সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন যে, বন্ধনদশায় থাকার সময়ে চতুর্বর্ণের প্রত্যেকের দৈনিক অবশ্যকর্তব্য আচার-অনুষ্ঠান পালনে কোন বাধা থাকবে না।[২২৮]

উত্তরাধিকার বিধিতে উচ্চ বর্ণের শূদ্র পুত্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম অংশ

২২০. ৯।৩-১০। ২২১. বিষ্ণু ৯।১১।

২২২. ঐ, অধ্যায় ৯, ১০, ১১ ও ১২।

২২৩. ইওহান্নেস স্তোবাইওস (৫০০ খৃ)-উদ্ধৃত বার্দেসানেস। ম্যাক্‌ক্রিন্‌ড্‌ল, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়া···ক্লাসিক্যাল রাইটার্স', পৃ ১৭২-৭৪।

২২৪. শ্লোক ৪০৩। ২২৫. ৮।২৪।

২২৬. দ্বিজাতিঃ প্রতিভূহীনো রক্ষ্যঃ স্যাদ্ বাহ্যচারিভিঃ।
শূদ্রাদীন্ প্রতিভূহীনান্ বন্ধয়েন্ নিগড়েন তু॥ কাত্যায়ন, শ্লোক ১১৮।

২২৭. শ্লোক ১১৯। ২২৮. ঐ।

দেওয়ার বিধানে কোন পরিবর্তন হয়নি।[২২৯] বিভিন্ন অবস্থায় ব্রাহ্মণের শূদ্র পুত্রের জন্য প্রাপ্য অংশ বিষ্ণু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন[২৩০] ও এই উদার বিধি দিয়েছেন যে, দ্বিজ পিতার যদি শূদ্র পুত্র থাকে তাহলে তিনি পিতার সম্পত্তির অর্ধাংশের অধিকারী হতে পারেন।[২৩১] কোন ব্যক্তির উৎকৃষ্ট ও অনুগত শূদ্র পুত্র, তাঁর অপর কোন পুত্র সন্তান না থাকলেও, শুধু নিজের ভরণপোষণেরই অধিকারী হবেন—এই প্রাচীন বিধির পুনরাবৃত্তি করেছেন বৃহস্পতি।[২৩২] শূদ্রার গর্ভজাত দ্বিজের সন্তান ভূ-সম্পত্তির অধিকারী নয়, এও বলা হয়েছে।[২৩৩] কিন্তু "অনুশাসনপর্বে"র এক জায়গায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শূদ্র পুত্র অবশ্যই সম্পত্তি পাবেন।[২৩৪] এই পর্বের ধর্মশাস্ত্রে সাধারণভাবে এই বিধানের সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে যে শূদ্রের সম্পত্তি তাঁর সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হবে।[২৩৫] যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, দাসীর গর্ভজাত শূদ্রের পুত্র তার সম্পত্তির অংশ পাবে যদি পিতা সেরকম ইচ্ছা করেন।[২৩৬] "অনুশাসনপর্বে" আরও বলা হয়েছে যে এই অংশ হবে সম্পত্তির দশম ভাগ।[২৩৭]

চারটি ভিন্ন বর্ণের জন্য সুদের বিভিন্ন হারের প্রাচীন বিধিটিই আবার আলোচ্য যুগের ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়।[২৩৮] কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এটি সংশোধন করে নির্দেশ করেছেন যে উভয়পক্ষের সম্মত পরিমাণকেই সুদ হিসেবে দেওয়া যায়।[২৩৯]

গুপ্তধন সংক্রান্ত বিধির ভিত্তি হলো বর্ণবিচার। ধর্মশাস্ত্রকারদের কথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ কোন গুপ্তধন পেলে তিনি পুরোটাই নিতে পারেন।[২৪০] বিষ্ণু যোগ করেছেন, ক্ষত্রিয় এক্ষেত্রে রাজা ও ব্রাহ্মণকে ১/৪ অংশ করে দেবেন আর বাকি অর্ধেক রাখবেন নিজের কাছে. বৈশ্যের উচিত রাজাকে ১/৪ ও ব্রাহ্মণকে ১/২ অংশ দিয়ে অবশিষ্ট ১/৪ অংশ নিজের জন্য রাখা, আর শূদ্র তাঁর আবিষ্কৃত গুপ্তধন ১২ ভাগ করে, রাজা ও ব্রাহ্মণকে পাঁচ ভাগ করে দিয়ে

২২৯. যাজ্ঞবল্ক্য ২।১২৫ ; বৃহস্পতি ২৬।৪১-৪২ ; অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ৮২।১৮ ও ২১, (উত্তরী পাঠ) ৪৭ ১৮ ও ২১।

২৩০. ১৮।৩৮-৩৯। ২৩১. বিষ্ণু ১৮।৩২।

২৩২. বৃহস্পতি ২৬।১২৫। তুলনীয় : অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ ৮৫।১৫, (উত্তরী পাঠ) ৪৭।১৫।

২৩৩. বৃহস্পতি ২৬।১২২।

২৩৪. অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১৯।৮২, (উত্তরী পাঠ) ৪৭।১৯।

২৩৫. ঐ, (দক্ষিণী পাঠ) ৮২।৫৭, (উত্তরী পাঠ) ৪৭।৫৬।

২৩৬ যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৩৩। ২৩৭. অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ৮৪।১৮।

২৩৮. যাজ্ঞবল্ক্য ২ ৩৭ ; বিষ্ণু ৬।১৫। ২৩৯. ২।৩৮।

২৪০. বিষ্ণু ২।৫৮ ; যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩৪-৩৫ ; নারদ ৭।৬-৭।

অবশিষ্ট ⅚ অংশ নিজের কাছে রাখবেন।[২৪১] গুপ্তধনের ক্ষেত্রে শূদ্রের ভাগ সবচেয়ে কম হলেও কৌটিল্য শ্রমিকের জন্য যে-পরিমাণ অংশের বিধান দিয়েছেন এটি তার দ্বিগুণ।[২৪২] গুপ্তধন সংক্রান্ত এইসব বিধি কতদূর কার্যকর হতো তা বলা শক্ত। একটি জৈন রচনায় উল্লেখ আছে যে, একজন রাজা এক ব্যবসায়ীর আবিষ্কৃত গুপ্তধন বাজেয়াপ্ত করেন কিন্তু জনৈক ব্রাহ্মণ একই ধরনের গুপ্তধন আবিষ্কার করলে রাজা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।[২৪৩]

ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত শূদ্রদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দৈহিক শাস্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন সাধারণভাবে নারদ ও কয়েকটি ক্ষেত্রে বৃহস্পতি।[২৪৪] বৃহস্পতি বলেন, শূদ্রের জন্য অর্থদণ্ডের বিধান দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তাড়না, বন্ধন ও বিড়ম্বনের ব্যবস্থা করা উচিত।[২৪৫] বৃহস্পতি বিশেষভাবে প্রতিলোম ( অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মাতা ও নিম্নবর্ণের পিতার থেকে জন্ম ) ও অন্ত্যদের ( অস্পৃশ্য ) প্রতি কঠোর। তাঁদের তিনি সমাজের নিকৃষ্টতম অংশ রূপে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে তাঁদের প্রহার করা উচিত, কখনোই তাঁদের অর্থদণ্ড হবে না।[২৪৬] শ্বপাক, মেদ, চণ্ডাল, মাহুত, দাস ইত্যাদির জন্য নারদও একই বিধান দিয়েছেন।[২৪৭] তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন, এসব ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ নিজেরাই বিবাদীদের শাস্তি দেবেন, কারণ দোষীর উপর শাস্তিদানে রাজার কোন ভূমিকা নেই।[২৪৮] রাষ্ট্রক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ার এটি এক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অপমান করলে তাঁকে ১২½ 'পণ' অর্থদণ্ড দিতে হবে— এই বিধি এ-যুগের ধর্মশাস্ত্রে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।[২৪৯] কিন্তু বৃহস্পতি এর সঙ্গে যোগ করেছেন যে, বিধিটি শুধু ধার্মিক শূদ্রের পক্ষেই প্রযোজ্য ; ধর্মহীন শূদ্রকে অপমান করলে ব্রাহ্মণের কোন অপরাধ হবে না।[২৫০] সম্ভবত এখানে শূদ্রদের অস্পৃশ্য অংশের কথা বলা হয়েছে যাঁদের জন্য এসব ক্ষেত্রে কোন বিধিবদ্ধ প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এই একই বিষয়ে

২৪১. বিষ্ণু ৩।৫৯-৬১। ২৪২. দ্বাদশমাংশ ভৃতকঃ। অর্থশাস্ত্র ৪।১।

২৪৩. নিশীথ চূর্ণি, ২০, পৃ ২৮১। জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ৬২-তে উদ্ধৃত।

২৪৪ নারদ অধ্যায় ১৫ ও ১৬।২২, ২৩-২৫, ২৬-২৮। ব্যবহার বিধির প্রস্তাবনা, ২।৩৭।

২৪৫. তাড়নং বন্ধনং চৈব তথৈব চ বিড়ম্বনম্।
এষ দণ্ডো হি শূদ্রস্য নার্থদণ্ডো বৃহস্পতিঃ॥ বৃহস্পতি ৯।২০।
রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের বর্গীকরণে I। পুঁথিতে আছে 'বিড়ম্বনম্'। 'বিড়ম্বকম্'-এর চেয়ে এই পাঠ আরও ভালো।

২৪৬. বৃহস্পতি ৯।১৮। ২৪৭. ১৫-১৬।১১-১৪। ২৪৮. নারদ ১৫-১৬।১৩।

২৪৯. মনু ৮।২৬৭-৬৯ ; নারদ ১৫ ও ১৬।১৬ ; বৃহস্পতি ২০।১২।

২৫০. ২।১৩।

শূদ্রদের অন্যান্য অংশ উচ্চতর তিন বর্ণের মানুষের অপরাধের বিরুদ্ধে বিধিগত নিরাপত্তা ভোগ করতেন।[২৫১]

বলা হয়েছে শূদ্রের দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকে অপমান করলে বৃহস্পতি বিভিন্ন শাস্তির যে-মাত্রা নির্দেশ করেছেন[২৫২] তার থেকে এ-বিষয়ে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ফা-হিয়েন জানিয়েছেন যে অঙ্গচ্ছেদ ও অন্যান্য দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা না করেই 'মধ্য রাজ্যে' রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।[২৫৩] এটি অতিরঞ্জন হতে পারে, কিন্তু এর থেকে আভাস প্যাওয়া যায় যে দৈহিক শাস্তির ব্যবহার আগের চেয়ে কম হতো; আর বিষয়টি শূদ্রদের অনুকূলে যেত। বর্ণভিত্তিক আইন প্রণয়নের নীতি মেনে নিলেও[২৫৪] অপরাধী শূদ্রদের বিরুদ্ধে মনুর চূড়ান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার পুনরাবৃত্তি করেননি যাজ্ঞবল্ক্য। দৈহিক আঘাত সংক্রান্ত তাঁর একটি বিধানে বর্ণভেদের কোন চিহ্ন নেই। তিনি বলেন, উভয়পক্ষই যদি অস্ত্র নিয়ে ভয় দেখায় তাহলে দুপক্ষেরই সমান শাস্তি হবে।[২৫৫] কিন্তু কোন অব্রাহ্মণ যদি কোন ব্রাহ্মণকে পীড়া দেয়, তার অঙ্গচ্ছেদ করা হবে।[২৫৬] ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করলে শূদ্রের বিরুদ্ধে এই বিধি প্রযোজ্য হতো কিনা তা স্পষ্ট নয়।

স্বজাতীয় কোন স্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গের জন্য বিষ্ণু উচ্চতম অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। আর নীচ জাতির স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচার করলে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থদণ্ড।[২৫৭] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিম্নতম জাতির স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারের ক্ষেত্রে তিনি মৃত্যুদণ্ডের (যদি না 'বধ্য' শব্দটিকে প্রহার অর্থে নেওয়া হয়) বিধান দিয়েছেন।[২৫৮] কিন্তু এর সঙ্গে তাঁর অন্য একটি ব্যবস্থাপত্রের বিরোধ দেখা যায়। সে-অনুযায়ী চণ্ডাল স্ত্রীর সঙ্গে এক রাত্রির জন্য সংসর্গ করার দোষে অভিযুক্ত কোন ব্রাহ্মণের দোষ খণ্ডনের উপায় হলো ভিক্ষার মাধ্যমে জীবনধারণ ও তিন বছর অবিরাম গায়ত্রী মন্ত্র-জপ।[২৫৯] লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বিজ স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচার করলে শূদ্রের জন্য মনু যে কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন, তার কোন উল্লেখ এ-যুগের কোন ধর্ম-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

চার বর্ণের মানুষ হত্যার জন্য ভিন্ন মাত্রায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এ-যুগের ধর্মশাস্ত্রে করা হয়নি। হত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্তির জন্য বিষ্ণু এই ধরনের প্রায়শ্চিত্তের এক মাত্রাভেদ প্রবর্তন করেছেন। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

২৫১. বৃহস্পতি ২০।১০। ২৫২. ঐ, ২০।১৬।

২৫৩. জে. লেগে, 'আ রেকর্ড অফ বুদ্ধিস্টিক কিংডমস', পৃ ৪৩। ২৫৪. ২।২০৬।

২৫৫. পরস্পরং তু সর্বেষাং শস্ত্রে মধ্যমসাহসঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৬।

২৫৬. যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৫। মূলের 'পীড়নম্' শব্দটি বিজ্ঞানেশ্বর ব্যাখ্যা করেছেন প্রহার ইত্যাদি অর্থে।

২৫৭. ৫।৪০-৪১। ২৫৮. অন্ত্যাগমনে বধ্যঃ। বিষ্ণু ৫।৪১।

২৫৯. বিষ্ণু ৫৪।৯।

বৈশ্য বা শূদ্রকে হত্যার দোষে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি যথাক্রমে ১২, ৯, ৬ ও ৩ বছর ধরে মহাব্রত প্রায়শ্চিত্ত পালন করবেন।[২৬০] এই ধরনের প্রায়শ্চিত্ত যে কার্যকর হতো তেমন কিছু দেখা যায় না। কিন্তু চার বর্ণের মানুষদের জীবনের আপেক্ষিক গুরুত্ব এতে প্রতিফলিত হয়। যাই হোক, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হত্যাকে বিষ্ণু ও নারদ চতুর্থ মাত্রার অপরাধ (উপপাতক)[২৬১] রূপে গণ্য করেছেন এবং তাঁদের কথা অনুযায়ী অভিযুক্তকে চান্দ্রায়ণ বা পরাক প্রায়শ্চিত্ত বা 'গোমখ' যজ্ঞ করতে হবে।[২৬২] এই ধরনের ব্যবস্থা শূদ্রকে বৈশ্যের সঙ্গে সমপর্যায়ে স্থাপন করে ও ব্রাহ্মণের বিশেষ অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। "শান্তিপর্বে"র অন্যতম পুঁথির একটি শ্লোকেও এই প্রবণতা প্রকট। এখানে বলা হয়েছে, কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে তাঁর চোখ উপড়ে নেওয়া হবে বা তাঁকে হত্যা করা হবে, কিন্তু অপরাধী ব্রাহ্মণ হলে তাঁর হবে নির্বাসন।[২৬৩] ঐ একই পুঁথির অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, পাপকর্মের দায়ে দোষী এবং 'বিপ্র'দের মধ্যে হত্যাকারী বা চোর, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মহত্যার দোষে অভিযুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রকে দৃষ্টিহীন করে দেওয়া হবে।[২৬৪] এ-ক্ষেত্রে তাই বর্ণপার্থক্যের কোন উল্লেখ নেই।

গুপ্ত যুগে দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্ণপার্থক্যের গুরুত্বকে খর্ব করা হয়েছিল মনে হয়। খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ভারতের একটি প্রত্নলেখে মানহানি, আক্রমণ বা আঘাতের জন্য বর্ণানুযায়ী শাস্তির কোন উল্লেখ নেই।[২৬৫] ফা-হিয়েন জানান যে মধ্যভারতে প্রত্যেক অপরাধীকে তাঁর অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্থদণ্ড দেওয়া হতো।[২৬৬] এর থেকে আভাস পাওয়া যায় যে বর্ণ অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি হতো না। এও হতে পারে

২৬০. ঐ, ৫০।৬ ও ১২-১৪।

২৬১. বিষ্ণু ৩৭।১৩, ৩৪; যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৬।

২৬২. বিষ্ণু ৩৭।৩৫। গোমখ-র বিধি স্পষ্টতই অতি প্রাচীন। গুপ্ত যুগেও এটি অনুসৃত হতো এমন বিশ্বাস হয় না। বিষ্ণু নিঃসন্দেহে এটি বহু প্রাচীনতর কোন সূত্র থেকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন।

২৬৩. D7s পুঁথি (প্রামাণিক সংস্করণের বর্গীকরণ অনুযায়ী), শ্লোক ৪৫। 'মৃচ্ছকটিক' (৯।৩৯)-এ বিচারক ব্রাহ্মণ চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড মকুবের সুপারিশ করেছেন। এই ধরনের অব্যাহতির জন্য কাত্যায়ন, শ্লোক ৪৮৩ দ্র.।

২৬৪. D7s পুঁথি (প্রামাণিক সংস্করণের বর্গীকরণ অনুযায়ী), শ্লোক ৫৫।

২৬৫ জার্নাল অফ দ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, সিরিজ ৩, ১৬, পৃ ১১৮।

২৬৬ এস. বিল, 'ট্রাভেলস অফ ফা-হিয়েন', পৃ ৫৪-৫৫। গাইলস-ও একই অনুবাদ করেছেন ('ট্রাভেলস অফ ফা-হিয়েন', পৃ ২১), কিন্তু লেগে অনুবাদ করেছেন "অপরাধীদের (প্রতি মামলার) পরিস্থিতি অনুযায়ী অর্থদণ্ড করা হতো" ('আ রেকর্ড অফ বুদ্ধিস্টিক কিংডমস', পৃ ৪৩)। এ দিয়ে বর্ণগত পার্থক্য বোঝাতে পারে।

যে, দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতি কিছু আনুকূল্য দেখানো হয়েছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী যুগে যেমন দেখা যায়, সেভাবে কঠোর শাস্তির জন্য আলাদা করে শূদ্রকেই বেছে নেওয়া হয়নি।

চুরির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অপরাধ যথাক্রমে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন—নারদ এই প্রাচীন মত সমর্থন করেছেন।[২৬৭] তাঁর সমর্থন সম্ভবত এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্রাহ্মণ পূর্ণ মাত্রায় ধর্ম অর্জন ও পালন করবেন, রাজা করবেন $\frac{৩}{৪}$, বৈশ্য $\frac{১}{২}$ ও শূদ্র $\frac{১}{৪}$। চার বর্ণের প্রত্যেকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পাপের গুরুত্ব বা লঘুত্ব এই নীতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত।[২৬৮] কাত্যায়ন যখন ব্যবস্থা করেছেন, শূদ্রকে যা শাস্তি দেওয়া হয় ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণকে তার দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া উচিত,[২৬৯] তখন তিনি বোধ হয় চুরির কথাই ভেবেছেন। এই প্রসঙ্গে যে বৈশ্যের উল্লেখ করা হয়নি তার থেকে দেখা যায়, তাঁরা শূদ্রদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই সবকিছু থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, শূদ্ররা চুরি করতেই অভ্যস্ত বলে মনে করা হতো। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় 'অমরকোষ' থেকে। চোর ও দস্যুবাচক বিভিন্ন শব্দকে সেখানে "শূদ্র-বর্গে"র তালিকায় রাখা হয়েছে।[২৭০]

"শান্তিপর্বে" দস্যুদের বারবার রাজার শত্রু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সর্বদাই রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।[২৭১] সম্ভবত এখানে রাষ্ট্রের বাইরের শত্রুদের কথা বলা হয়েছে, শূদ্রদের নয়; কারণ বিধান দেওয়া হয়েছে যে, দস্যুদের উৎপাতের ফলে বর্ণসংকর ঘটলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই অস্ত্রধারণ করতে পারেন।[২৭২] বলা হয়েছে, যিনি ভেলাহীন স্রোতে ভেলায় বা যেখানে পারাপারের কোন উপায় নেই সেখানে সেই উপায়ে পরিণত হন, শূদ্রই হোন বা অন্য কোন বর্ণের মানুষই হন, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বতোভাবে মান্য।[২৭৩] যে-ব্যক্তি দস্যুদের হাত থেকে অসহায় মানুষকে রক্ষা করেন তিনি স্ববান্ধবের মতো পূজ্য।[২৭৪] 'ধনুর্বেদ সংহিতা'য়[২৭৫] বিধান দেওয়া হয়েছে, সাধারণভাবে তিন উচ্চতর বর্ণের ব্যক্তি

২৬৭. মনু ৮।৩৩৭ ও ৮ ; নারদ, পরিশিষ্ট ( চৌর্য ), পরিশিষ্ট, ৫১ ও ৫২।

২৬৮. শান্তিপর্ব ৩৬।২৮-২৯। ২৬৯. শ্লোক ৪৮৫।

২৭০ অমরকোষ . ২।১০।২৫-২৬। তুলনীয় . অনুশাসনপর্ব ( দাক্ষিণী পাঠ ) ১৪।৩২১, ( উত্তরী পাঠ ) ৯৪।২১।

২৭১. শান্তিপর্ব ১২।২৭, ২৫।১১, ৬৭।২, ৭৬।৫, ৮৮।২৬, ৯০।৮, ৯৮।৮, ১০১।৩।

২৭২. শান্তিপর্ব ৭৯।১৭-১৮। অভ্যুত্থিতে দস্যুবলে ক্ষত্রার্থে বর্ণসংকরে।...ব্রাহ্মণো যদি বা বৈশ্যঃ, শূদ্রো বা রাজসত্তম। দস্যুভ্যোঽথ প্রজা রক্ষেদ্ দণ্ডং ধর্মেণ ধারয়ন্...। ঐ, ৭৯।৩৪-৩৬।

২৭৩. শান্তিপর্ব ৭৯।৩৭। ২৭৪ ঐ, ৭৯।৩৮।

২৭৫. যদিও গ্রন্থটি বশিষ্ঠের নামে আরোপিত, এর রচনারীতির সঙ্গে বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র-র মিল

অস্ত্রধারণ করতে পারলেও শূদ্র তা করবেন আপৎকালে।[২৭৬] কিন্তু এখানে যোগ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে ধনুক, তরবারি, বল্লম ও গদা ব্যবহার করা উচিত।[২৭৭] অতএব, উপরের বিভিন্ন বিধান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, শূদ্রদের অস্ত্রবহনের অধিকার অনুমোদন করা হয়েছিল। এর থেকে তাঁদের নাগরিক মর্যাদায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কারণ পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা তাঁদের অস্ত্রবহনের অনুমতি দেননি। এই নতুন ধারা শূদ্রদের কৃষকে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে যুক্ত এবং এর থেকেই দেখা যায়, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবেন—বর্ণপ্রথার সমর্থকদের মনে আর এই পুরনো ভয় কাজ করত না। মনে হয়, শূদ্রদের সত্যই সেনাবাহিনীতেও নেওয়া হয়েছিল। এ-যুগের একটি নাটকে সেনাবাহিনীর দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে যথাক্রমে ক্ষৌরকার ও চর্মকার সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে দেখানো হয়েছে।[২৭৮]

শূদ্রদের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বর্ণের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের সম্পূর্ণ বিরতি ঘটেনি। "শান্তিপর্বে"র অন্তত ন'টি শ্লোকে প্রথম দু বর্ণের মধ্যে মিলন ও সংহতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[২৭৯] এর থেকে সম্ভবত বৈশ্য ও শূদ্রদের পক্ষ থেকে যুক্ত বিরোধিতার আভাস পাওয়া যায়। অভিযোগ করা হয়েছে যে, একটি পর্যায়ে শূদ্র ও বৈশ্যরা চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারীভাবে ব্রাহ্মণ স্ত্রীদের সঙ্গে লিপ্ত হয়েছিলেন।[২৮০] শূদ্ররা যে বিশেষভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারী ছিলেন—বেশ কয়েকটি উল্লেখ থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। "অনুশাসনপর্বে" ঘোষণা করা হয়েছে, শূদ্ররা রাজার বিনাশকারী ও সেজন্য কোন বিচক্ষণ রাজার পক্ষে এই বিপদ সম্পর্কে অনবহিত থাকা উচিত নয়।[২৮১] "আশ্বমেধিকপর্বে"র একটি দীর্ঘ অংশে (এটি অংশত 'বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে'র একই ধরনের অংশকে পুনরাবৃত্তি করে) শূদ্রদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে: তাঁরা দীর্ঘবৈর, হিংস্র, অহংকারী, কোপনস্বভাব, অসত্যভাষী, প্রচণ্ড লোভী, অকৃতজ্ঞ, ব্রহ্মদূষক, অলস ও অশুচি।[২৮২] একইভাবে মনুর মতো "শান্তিপর্বে"

নেই। কিন্তু ধনুর্বিদ্যার উপর এত যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে মনে গুপ্ত যুগের পরে এটি সংকলিত হয়নি।

২৭৬. ধনুর্বেদ সংহিতা, শ্লোক ৩। ২৭৭. ঐ, শ্লোক ৮।

২৭৮. মৃচ্ছকটিক ৬।২২ ও ২৩-এ বীরক ও চন্দনকের ঘটনা।

২৭৯. শান্তিপর্ব ৭৩।৯; ৭৪।৪, ৫, ৮, ১০, ২৮, ৩২; ৭৫।১৩, ২২।

২৮০. ঐ, ৪৯।৬০-৬১।

২৮১. শূদ্রাঃ পৃথিব্যাং বহবো রাজ্ঞাং বহুবিনাশকাঃ।
তস্মাৎপ্রমাদং সুশ্রোণি ন কুর্যাৎ পণ্ডিতো নৃপঃ॥
অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ২১৪।৫৮।

২৮২. বশিষ্ঠ ধ. সূ. ৬।২৪. আশ্বমেধিকপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১১৮।১৭-২০। অমরকোষ (২।১০।৩)-এ শূদ্রদের লক্ষণ বলা হয়েছে অলস ও দক্ষ।

বৃষল ( অর্থাৎ শূদ্র )-এর সংজ্ঞার্থ হলো : যার মধ্যে ধর্মের বিলয় ঘটে।[২৮৩] 'নারদস্মৃতি'র একটি অংশ থেকেও শূদ্রদের বৈরী মনোভাব অনুমান করা যায়। এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাজা দণ্ড ক্ষমতা প্রয়োগ না-করলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই কর্মত্যাগ করবেন, কিন্তু শূদ্র তাঁদের সবাইকে অতিক্রম করে যাবেন।[২৮৪] যে-শূদ্র অন্যের চোখ শলাকাবিদ্ধ করেন,[২৮৫] ব্রাহ্মণের ভান করেন ও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁর ৮০০ 'পণ' অর্থদণ্ড হওয়া উচিত—কৌটিল্যের এই বিধান যাজ্ঞবল্ক্য পুনরাবৃত্তি করেছেন।[২৮৬] কয়েক উপবর্গের শূদ্র, যেমন অভিনেতা, দ্যূতাসক্ত, দ্যূতব্যসায়ী ও এই ধরনের অন্যান্য লোককে রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলার উৎসরূপে গণ্য করা হতো, কারণ তাঁরা ভদ্র প্রজাদের ( 'ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ' ) ক্ষতি করেন।[২৮৭] "শান্তি-পর্বে"র একটি পুঁথির এক জায়গায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে দাস ও ম্লেচ্ছদের একই উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করাই বিধেয়।[২৮৮] এই সবকিছু থেকে দেখা যায়, শূদ্র ও শাসকশ্রেণীর পুরনো বিরুদ্ধতা কোন-না-কোনভাবে অব্যাহত ছিল। কিন্তু শূদ্র মন্ত্রীদের ব্যবস্থা থাকায় এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের কাজে হস্তশিল্পীদের বৃত্তিগোষ্ঠীর প্রধানদের যোগ, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্ণপার্থক্য হ্রাস ও শেষত, আপৎকালে শূদ্রদের অস্ত্র বহনের অধিকারের স্বীকৃতির ফলে এই বিরুদ্ধতার তীব্রতা সম্ভবত চলে গিয়েছিল।

চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রাচীন কল্পকাহিনী[২৮৯] পুনরাবৃত্ত হয়ে চলছিল, কিন্তু বশিষ্ঠ যে শূদ্রদের সৃষ্টিকর্তা—মনুর এই উক্তি[২৯০] 'বায়ু' ও 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে' স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁদের উন্নত সামাজিক মর্যাদাকে বৈধতা দান করা হয়েছে।

চার বর্ণের সঙ্গে শ্বেত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণ এই চার রঙের যোগ থেকে দেখা যায় তাঁদের আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা।[২৯১] অভিনেতাকে মঞ্চে

২৮৩ শান্তিপর্ব ৯১।১২-১৩। ২৮৪. নারদ ১৮।১৪-১৬।

২৮৫. 'বীরমিত্রোদয়' অনুযায়ী।

২৮৬. যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩০৪। মনু ( ৯।২২৪ ) দ্বিজলিঙ্গী শূদ্রের ( যে-শূদ্র ব্রাহ্মণের ভান করে ) মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছেন, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে তিনি তার রাজবিরোধিতার উল্লেখ করেননি।

২৮৭. শান্তিপর্ব ৮৯।১৩-১৪। এ ধরনের লোককে কৌটিল্য নতুন বসতিতে ঢোকার অনুমতি দেননি। অর্থশাস্ত্র ২।১।

২৮৮. D7s পুঁথি ( প্রামাণিক সংস্করণের বর্গীকরণ অনুযায়ী ), শ্লোক ২০।

২৮৯. যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১২৬।

২৯০. বায়ু পুরাণ, ২।১১।৯০ ; ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩।১০।৯৬।

২৯১. বায়ু পুরাণ, পরিশিষ্ট নং ৮১৮। পাতিল, 'কালচারাল হিস্ট্রি ফ্রম দ বায়ু পুরাণ', পৃ ৩০৪-এ উদ্ধৃত। শান্তিপর্বেও এই প্রভেদের উল্লেখ আছে।

উপস্থিত করার সময়ে 'নাট্যশাস্ত্রে' ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য লোহিত[২৯২] এবং বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য ঘন বা গাঢ় নীল রং[২৯৩] নির্দেশ করা হয়েছে। এই রচনাটিতে বলা হয়েছে, প্রেক্ষাগৃহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের আসন চিহ্নিত করার জন্য যথাক্রমে শ্বেত, লোহিত, পীত ও নীল স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।[২৯৪] ব্রাহ্মণ স্তম্ভের পাদদেশে সোনা ও কুণ্ডল নিক্ষেপ করা উচিত; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র স্তম্ভের ক্ষেত্রে যথাক্রমে তামা, রুপো ও লোহা।[২৯৫] দার্শনিকরা সোনার তৈরি, যোদ্ধারা রুপোর এবং কৃষিজীবী ও কারিগরেরা পেতল ও লোহার[২৯৬]—প্লেটোর আবিষ্কৃত এই কল্পকাহিনীর সঙ্গে উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থার মিল দেখা যায়।

শূদ্ররাই শুধু 'দাস' উপাধিধারী[২৯৭] হবেন—এই নিয়ম অনুসৃত হয়নি বলেই মনে হয়। রবিকীর্তি নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষের নাম ছিল বরাহদাস;[২৯৮] সনকানীকদের এক শাসনকর্তার নাম ছিল মহারাজ বিষ্ণুদাস। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের এক সামন্ত।[২৯৯] 'নাট্যশাস্ত্রে' বিধান দেওয়া হয়েছে. নাটকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নাম নির্দেশ করবে তাঁদের গোত্র ও কর্ম, বণিকদের নাম তাঁদের উদারতা, আর ভৃত্যদের নাম হবে বিভিন্ন ফুলের।[৩০০] শূদ্ররা কেন ফুলের নামে অভিহিত হবেন তা বোঝা যায় না।

বিভিন্ন বর্ণের মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কুশল জিজ্ঞাসা করার সময়ে বিভিন্ন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা উচিত—এই নিয়মের উপরে আলোচ্য পর্বে গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি বলে মনে হয়। কিন্তু 'নাট্যশাস্ত্রে' ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, নাটকে স্ত্রী বা পুরুষ ভৃত্য, কারুকর্মী ও যন্ত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কথাবার্তার ভঙ্গি যেন কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয়।[৩০১] এর থেকে দেখা যায়, নীচ জাতির মানুষদের তাচ্ছিল্য সহকারে সম্ভাষণ করা হতো। নীচ জাতির মানুষদের সম্ভাষণ করার সময় 'মৃচ্ছকটিকে' "দাসীর পুৎ", "বেশ্যার পুৎ", "ছেনালের পুৎ" এই ধরনের নিন্দাসূচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে।[৩০২]

২৯২ অন্য একটি পুঁথিতে গৌড় ( সাদা ) রঙের বিধান দেওয়া হয়েছে।

২৯৩. নাট্যশাস্ত্র ২১।১১৩। পাঞ্চাল, শৌরসেন, মাগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের জন্যও কালো রঙের কথা বলা হয়েছে ( ঐ, ২১।১১২ )।

২৯৪ ঐ, ২।৪৯-৫২। ২৯৫ ঐ, ২।৫৫।

২৯৬ 'দ রিপাবলিক' ( জাওয়েট-এর ইংরিজি অনুবাদ ), পৃ ১২৬-২৭।

২৯৭. বিষ্ণু ২৭।৬-৯।

২৯৮. 'কর্পুস ইনস্ক্রিপতিওনুম ইন্দিকারুম', ৩য়, নং ৩৫ ( ৫৩৩-৩৪ খৃ ), পঙ্ক্তি ৯-১২।

২৯৯. ঐ, নং ৩ ( ৪০১-০২ খৃ. ), পঙ্ক্তি ১-২; তুলনীয় : ফ্লীট, পূর্বোক্ত, পৃ ১১ টী. ১।

৩০০. ১৭।৯৫-৯৯। ৩০১. ১৭।৭৩।

৩০২. মৃচ্ছকটিক, অংক ১, পৃ ৫; অংক ২, পৃ ৬৩-৬৪। এর কয়েকটি, যেমন 'ছিণালিআপুত্ত' শব্দটি এখনও বিহারে ব্যবহার হয়।

মঞ্চের উপর হীন কর্মে নিযুক্ত ভৃত্যদের উপস্থাপনার জন্য 'নাট্যশাস্ত্রে' ভিন্ন ধরনের ভঙ্গি ও গতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই শাস্ত্র অনুযায়ী তাঁদের শরীরের একপাশ বা মাথা বা হাত বা পা যেন অবনত থাকে, তাঁদের চোখ যেন বিভিন্ন বস্তুতে বিচরণ করে।[৩০৩] এই ধরনের ব্যবহার আস্থা-হীনতার ইঙ্গিত বহন করে, আর এর থেকে দেখা যায় যে প্রভুর উপস্থিতিতে নিম্ন বর্গের মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে উৎসাহ দেওয়া হতো না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, বৃদ্ধ শূদ্র সম্মানের পাত্র।[৩০৪] বৈশ্য ও শূদ্র অতিথিকে দিয়ে কাজ করিয়ে তারপর তাঁদের ভৃত্যদের সংগে খাওয়ানো উচিত—এ-বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্রকারদের মতো জোর দেননি। তবে তিনি বিধান দিয়েছেন, বর্ণের ক্রম অনুসারে অতিথিদের আপ্যায়ন ও ভোজন করাতে হবে।[৩০৫] সন্ধ্যায় কোন অতিথিকে ফেরানো অনুচিত, যা পাওয়া যায় তা-ই দিতে হবে[৩০৬]—যাজ্ঞবল্ক্যের এই বিধান কিন্তু কোন বিশেষ বর্ণভুক্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৈশ্যদের অনুষ্ঠানের শেষে চণ্ডাল ভোজনের বিষয়ে ধর্ম-সূত্রের নীতি আলোচ্য যুগে পুনরাবৃত্ত হয়েছে[৩০৭] এবং এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন দাস, শ্বপাক ও ভিক্ষুক।[৩০৮]

এ-যুগের বিভিন্ন রচনায় বারবার বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের খাদ্যগ্রহণ অনুচিত, কারণ এর ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি কমে যায়।[৩০৯] ''শান্তিপর্বে'' ব্রাহ্মণকে তক্ষা (ছুতোর), চর্মকার, রজক ও রঙ্গজীবীর অন্ন গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি।[৩১০] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, স্নাতকের পক্ষে শূদ্র ও পতিতের অন্ন অনুমোদিত নয়।[৩১১] তিনি আরও নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, অভিনেতা, বৈণ (বাঁশ কাটা যার কাজ), স্বর্ণকার, শস্ত্রবিক্রয়ী, কর্মার (কারিগর), তুন্নবায় (দর্জি), শ্বজীবী (কুকুর দিয়ে যার জীবিকা চলে), বধজীবী, রজক ও চাক্রিকের অন্ন স্নাতকের অভোজ্য।[৩১২] ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও

৩০৩ ...নীচাদি চেটাদিনাম্। ১২।১৪৬-৪৮।

৩০৪. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১১৬। গৌতমের মতো তিনি বয়ঃসীমা আশিতে বেঁধে দেননি।

৩০৫. ঐ, ১।১০৭। ৩০৬. ঐ।

৩০৭. আপস্তম্ব ধ. সূ. ২।৪।৯।৫; বৌধায়ন ধ. সূ. ২।৩।৫।১১।

৩০৮. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১০৩; অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১৫৪।২২, ২৫০।১৫।

৩০৯. আশ্বমেধিকপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১১০।১৭-২০; ৬১।৪৪-৪৫; বৃহস্পতি, শ্রাদ্ধখণ্ড, শ্লোক ৪৩।

৩১০. শান্তিপর্ব ৩৭।২২-২৩। 'রঙ্গজীবিনঃ' পদটি দিয়ে রঞ্জক বা অভিনেতা দুই-ই বোঝাতে পারে।

৩১১. ১।১৬০।

৩১২. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৬১-৬৫। 'চাক্রিক' পদটি দিয়ে তৈলিক, কুম্ভকার বা সারথি বোঝাতে পারে।

কিছু শূদ্রের অন্ন নিষিদ্ধ করার প্রবণতা দেখা দেয়। বলা হয়েছে, যেসব শূদ্র অসৎ পথে আসক্ত ও নির্দিধায় সব ধরনের খাদ্য গ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়রা অবশ্যই তাঁদের খাদ্য বর্জন করবেন।[৩১৩] "অনুশাসনপর্বে" ঘোষণা করা হয়েছে, যিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন তিনি পৃথিবীর যা কিছু ঘৃণ্য তা-ই ভোজন করেন, মানুষের শরীরের পরিত্যাজ্য অংশ পান করেন ও পৃথিবীর সব আবর্জনা আহার করেন।[৩১৪] সম্ভবত ব্রাহ্মণদের এই ধরনের আচরণ অবলম্বন থেকে নিবৃত্ত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। যে-ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন বা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে আহার করেন তাঁর শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩১৫]

শূদ্রান্ন বর্জন বিষয়ক নিয়মের প্রয়োগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এইসব নীতি প্রধানত ব্রাহ্মণ ও স্নাতকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁরা বোধহয় প্রধানত ব্রাহ্মণই ছিলেন। এমনকি ব্রাহ্মণকেও শূদ্রের ঘরে দুধ ও দই খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৩১৬] এ ছাড়াও ব্রাহ্মণ যদি দ্বিজের কাছ থেকে জীবনধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে অক্ষম হন তাহলে তিনি শূদ্রের থেকে তা গ্রহণ করতে পারেন।[৩১৭] শূদ্রদের মধ্যে গো-পালক, কুলমিত্র, দাস, নাপিত, অর্ধসীরী (ভাগচাষী) ও আত্মনিবেদকের থেকে স্নাতক অন্ন গ্রহণ করতে পারেন—মনুর এই বিধি যাজ্ঞবল্ক্য পুনরাবৃত্তি করেছেন।[৩১৮] বৃহস্পতির বিধানেও দাস ও গৃহভৃত্যদের থেকে খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৩১৯]

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট দ্বিজ আহার ও স্পর্শ করবেন—এই ভাবনাকে ভয়াবহ বলে বিবেচনা করা হতো ও এই পাপ খণ্ডনের জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩২০]

চণ্ডাল ও অন্যান্য অস্পৃশ্য ছাড়া কয়েকটি শূদ্র জাতির হাত থেকে জলগ্রহণ নিষেধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'মৃচ্ছকটিক' থেকে জানা যায় যে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ একই কূপ ব্যবহার করতে পারতেন।[৩২১]

দ্বিজের ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য কয়েক ধরনের পান-আহার নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁকে মদ্যপানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। ব্রাহ্মণের স্ত্রী এই নীতি লঙ্ঘন করলে তার জন্য বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩২২] কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের মতে, শূদ্রের স্ত্রীর ক্ষেত্রে এসব প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই।[৩২৩]

৩১৩. অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ১৩৫।২-৩, (দক্ষিণী পাঠ) ১৯৮।৩।

৩১৪. ঐ, (উত্তরী পাঠ) ১৩৫।৫, (দক্ষিণী পাঠ) ১৯৮।৫।

৩১৫. ঐ, (উত্তরী পাঠ) ১৩৬।২০-২২, (দক্ষিণী পাঠ) ১৯৯।২০-২২।

৩১৬. আশ্বমেধিকপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১১০।২৪।

৩১৭. ঐ, ১১০।৩২। ৩১৮. ১।১৬৬। ৩১৯. ১৫।১৯।

৩২০. বৃহস্পতি, প্রায়শ্চিত্ত, শ্লোক ৩৯, ৪৬-৪৮; আচার, শ্লোক ৮৭।

৩২১ ১।৩২। ৩২২. যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৫৫-৫৬।

৩২৩. যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৫৫-৫৬-র টীকা।

পানদোষ, মনে হয়, বিশেষভাবে শূদ্রদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, কারণ উত্তেজক পানীয়, তার প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি ও মত্ততা বিষয়ক একটি তালিকা 'অমরকোষে'র "শূদ্রবর্গে", পাওয়া যায়।[৩২৪] জুয়াখেলার বিভিন্ন শব্দও ঐ একই অংশে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।[৩২৫] 'পঞ্চতন্ত্রে' দেখানো হয়েছে, জনৈক মত্ত তন্তুবায় তার স্ত্রীকে প্রহার করছে।[৩২৬] সহবাসিনী গাভী, প্রসবের দশদিনের মধ্যেকার গাভী ও অবৎসা গাভীর দুধ ব্যবহার যাজ্ঞবল্ক্য নিষিদ্ধ করেছেন। একইভাবে উট, একখুর বিশিষ্ট প্রাণী, নারী, অরণ্যচারী পশু বা মেষীর দুধ অপেয়।[৩২৭] দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত হবিঃ, যজ্ঞের উৎসৃষ্ট, শিগ্রু (এক ধরনের শাক), অমেধ্য মাংস, কবক (পাতাল ফোঁড়), মাংসাশী প্রাণী ও কয়েকটি পাখি, যেমন শুক, হংস, বক, চক্রবাক ইত্যাদি দ্বিজের অভোজ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩২৮] কয়েকটি ক্ষেত্রে এই নীতি লঙ্ঘন জনিত পাপ খণ্ডনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।[৩২৯] যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেন, পঞ্চনখ বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে সজারু, গোধা (গোসাপ), কচ্ছপ, সেধা (এক ধরনের সূক্ষ্মলোম প্রাণী) ও শশক দ্বিজের গ্রহণ করা অনুচিত। তিনি দ্বিজের ভোজ্য চার ধরনের মাছ নির্দিষ্ট করেছেন।[৩৩০] নালিকা শাক, পেঁয়াজ, রসুন, গ্রাম্য কুক্কুট, ছত্রাক ও অলাবু (লাউ) ভক্ষণও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। যাঁরা এই নিয়ম লঙ্ঘন করবেন তাঁদের চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।[৩৩১] ফা হিয়েন থেকে জানা যায়, পেঁয়াজ ও রসুন খেতেন শুধু চণ্ডালরা।[৩৩২] যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়েছেন, কোন ব্যক্তি শূদ্রকে অমেধ্য খাদ্য ভোজন করতে বাধ্য করলে তাঁর প্রথম দণ্ডপারুষ্যের সঙ্গে জড়িত দণ্ডের অর্ধেক দণ্ড হবে, আর উচ্চতর বর্ণের লোকের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করলে দণ্ড বাড়বে।[৩৩৩] এর থেকে দেখা যায়, কয়েক ধরনের খাদ্য এমনকি শূদ্রদের পক্ষেও নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সেগুলো নির্দিষ্ট করে বলেননি। অন্যদিকে দ্বিজদের জন্য নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে শূদ্ররা সেসব খাদ্য গ্রহণ করতে পারতেন। মধ্যরাজ্যে কর্মকর ও কারুশিল্পীরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন, 'বৃহস্পতি স্মৃতি'তে তা বলা হয়েছে।[৩৩৪] এর থেকে দেখা যায় গোহত্যার বিরুদ্ধে

৩২৪. অমরকোষ ২।১০।৩৯-৪৩।
৩২৫. ঐ, ২।১০।৪৪-৪৬।
৩২৬. পঞ্চতন্ত্র, পৃ ১৫।
৩২৭. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭০।
৩২৮. ঐ, ১।১৭১-৭৩।
৩২৯. ঐ, ১।১৭৫-৭৬।
৩৩০. ঐ, ১।১৭৭-৭৮।
৩৩১. ঐ, ১।১৭৬।
৩৩২. লেগে, 'আ রেকর্ড অফ বুদ্ধিস্টিক কিংডেম্স্', পৃ ৪৩।
৩৩৩. ২।২১৬।
৩৩৪. মধ্যদেশে কর্মকরাঃ শিল্পিনশ্চ গবাশিনঃ। বৃহস্পতি স্মৃতি, পৃ ২১, শ্লোক ১২৮। আম্বেডকর যুক্তি দিয়েছেন, গো-মাংসাহারই অস্পৃশ্যতার উৎপত্তির অন্যতম মূল কারণ ('দি আনটাচেবল্স্', অধ্যায় ৯)। কিন্তু এমন কোন নিদর্শন নেই যাতে দেখা যায় হস্তশিল্পী ও শ্রমজীবীরা অস্পৃশ্য বলে গণ্য হতেন।

ব্রাহ্মণদের শক্তিশালী প্রচারও লোকপ্রচলিত এই প্রাচীন প্রথাকে সর্বদা বন্ধ করতে পারেনি। একটি নীতিমূলক উপাখ্যান (যেটি সম্ভবত এই পর্বে 'বায়ু পুরাণে' প্রক্ষিপ্ত হয়েছে) থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা যায়। এখানে বলা হয়েছে, মনু বৈবস্বতের সন্তান পৃষধ্র তাঁর গুরুর গরুর মাংস খাওয়ায় চ্যবন মুনি তাঁকে শূদ্রে পরিণত হওয়ায় অভিশাপ দিয়েছিলেন।[৩৩৫] উপরের এই আলোচনা থেকে তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্বিজ ও শূদ্রের খাদ্যাভ্যাসে কিছু পার্থক্য ছিল।

অন্য যে-কোন বর্ণের মতোই শূদ্রকেও সংসারী হতে বলা হয়েছে।[৩৩৬] কিন্তু শূদ্রদের নিজস্ব বিবাহ প্রথা পালনে কোন ছেদ পড়েনি।[৩৩৭] "অনুশাসনপর্বে" বলা হয়েছে, তিন উচ্চতর বর্ণের বিবাহ মন্ত্রের সঙ্গে পাণিগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। কিন্তু শূদ্রের বিবাহ হয় যৌন সঙ্গমের মধ্য দিয়ে।[৩৩৮] একটি জৈন সূত্রে, তোসলী-তে এক স্বয়ম্বর সভাগৃহের উল্লেখ আছে। একজন দাস-কন্যা সেখানে সমবেত দাসীপুত্রদের মধ্য থেকে তাঁর স্বামী নির্বাচন করেছিলেন।[৩৩৯] বিভিন্ন উল্লেখ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে উচ্চতর শ্রেণীর নারীদের চেয়ে শূদ্র সম্প্রদায়ের নারীরা আরও স্বাধীন রয়ে গিয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের একটি শ্লোকের ভাষ্যে বিশ্বরূপ মনে করেন যে বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে নিয়োগ সংক্রান্ত অংশে শূদ্রের উল্লেখ আছে।[৩৪০] তাঁর মতের সমর্থনে তিনি বৃদ্ধ মনুর দুটি শ্লোক ও 'বায়ু পুরাণে'র একটি গাথা উদ্ধৃত করেছেন।[৩৪১] স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য তিন বর্ণের স্ত্রীর চেয়ে শূদ্রা স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা ও অন্য স্বামী গ্রহণ করা অনেক সহজ ছিল। এক্ষেত্রে "অনুশাসনপর্বে" শূদ্রা স্ত্রীদের মাত্র এক বছর অপেক্ষা করার বিধান দেওয়া হয়েছে।[৩৪২] বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ স্ত্রীদের অপেক্ষাকাল নির্দিষ্ট করেছেন নারদ; কিন্তু তিনি বলেছেন, কোন শূদ্রা স্বামী প্রোষিত হলে তাঁর

৩৩৫. বায়ু পুরাণ থেকে পার্জিতর, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮-এ উদ্ধৃত।

৩৩৬. মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৬৯।৭২, হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃ ২৩২-এ উদ্ধৃত।

৩৩৭. অনুশাসনপর্বে (উত্তরী পাঠ ৪৪।৯, দক্ষিণী পাঠ ৭৯।৯) এই প্রাচীন বিধি পুনরাবৃত্ত হয়েছে যে আসুর ও পৈশাচ বিবাহ করা উচিত নয়, মনে হয় দ্বিজদের পক্ষে।

৩৩৮. উত্তমানাং তু বর্ণানাং মন্ত্রবৎপাণিসংগ্রহঃ।
বিবাহকরণং চাহুঃ শূদ্রাণাং সম্প্রয়োগতঃ॥

অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ), ২৪৯।৯।

৩৩৯. বৃহৎকল্প ভাষ্য ২।৩৪৪৬, জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৯-এ উদ্ধৃত।

৩৪০. এবং তাচ্ছূদ্রাণাং নিয়োগাধিকারঃ উক্তঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ১।৬৯ প্রসঙ্গে। কাণে, 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ২য়, ভাগ ১, ৬০৪।

৩৪১. কাণে, ঐ, পৃ ৬০৪-০৫-এ উদ্ধৃত।

৩৪২. অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১৪৯।১৫-১৬।

জন্য কোন নির্দিষ্ট কালনির্দেশ করা নেই।[৩৪৩] গোপ, তৈলিক, শৌণ্ডিক ইত্যাদির স্ত্রীরা তাঁদের স্বামী-কৃত ঋণের জন্য দায়ী[৩৪৪]—এই বিধানের পুনরাবৃত্তি থেকে দেখা যায়, শূদ্রারা জীবনধারণের জন্য সর্বদাই তাঁদের পুরুষদের উপর নির্ভর করতেন না।

বিষ্ণু বলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর কোন বালিকার বিবাহ না হলে তাকে বৃষলী (পতিতা) বলে গণ্য করা উচিত।[৩৪৫] ভাষ্যকার নন্দরাজ বলেছেন, এই বিধি শুধু নীচজাতীয় যুবতীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৩৪৬] মূলে এ-ধরনের অনুমানের সপক্ষে কোন কথা নেই।

উচ্চ বর্ণের মানুষ নিম্ন বর্ণের থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন—এই মতও আলোচ্য যুগের বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পেয়েছে।[৩৪৭] কিন্তু নিম্নতম বর্ণ থেকে স্ত্রী, অর্থাৎ শূদ্রদের থেকে বিবাহ করা হবে শুধু সুখভোগের জন্য[৩৪৮] এই ধারণাও পুনরুক্ত হয়েছে। 'কামসূত্রে' পরিচারিকা, কুম্ভদাসী (জল বইবার কাজে নিযুক্ত পরিচারিকা বা বারবণিতা?) এবং রজক ও তন্তুবায় স্ত্রীর সঙ্গে গণিকাদের কোন পার্থক্য করা হয়নি।[৩৪৯] এই শাস্ত্র অনুযায়ী শূদ্রা স্ত্রীর সঙ্গে সংগম নিষিদ্ধও নয়, আবার বিচক্ষণ কাজ বলেও গণ্য করা যায় না।[৩৫০] বাৎস্যায়ন সবর্ণ বিবাহের প্রশংসা করেছেন।[৩৫১] ব্রাহ্মণ শূদ্রাকে বিবাহ, বা তাঁর সঙ্গে সংগম, বা তাঁর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন করবেন—বিশেষত এই ধারণা সম্পর্কে এ-যুগের বিভিন্ন রচনায় কঠোর নিষেধ করা হয়েছে।[৩৫২] এই নিয়ম থেকে বিচ্যুতির ঘটনাও আছে। 'মৃচ্ছকটিকে' ব্রাহ্মণ চারুদত্ত গণিকা বসন্তসেনাকে বিবাহ করেন, যদিও তা রাজার বিশেষ অনুমতি নিয়ে করা হয়েছে।[৩৫৩] ঐ একই নাটকে দেখানো হয়েছে যে ব্রাহ্মণ শর্বিলক চারুদত্তের দাসী মদনিকাকে বিবাহ করলেন।[৩৫৪] এ-যুগের সাহিত্যেও ক্ষত্রিয়দের শূদ্রা বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৩৫৫]

৩৪৩. ১২।১০০।  ৩৪৪. যাজ্ঞবল্ক্য ২।৪৮; কাত্যায়ন, শ্লোক ৫৬৮।

৩৪৫. বিষ্ণু ২৪।৪১।  ৩৪৬. সেক্রেড বুকস্ অফ দি ইস্ট, ৭, পৃ ১০৯ টী. ৪১।

৩৪৭. নারদ ১২।৪-৬; অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ৪৪।১১, (দক্ষিণী পাঠ) ৭৯।১১।

৩৪৮. অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ৪৪।১২ ও ১৩।  ৩৪৯. ৬।৬।৫৪ টীকা সমেত।

৩৫০. কামসূত্র ১।৫।৩।  ৩৫১. ঐ, ৩।১।১।

৩৫২. যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫৬-৫৭; বৃহস্পতি, আপদ্ধর্ম, শ্লোক ৪৭; সংস্কার, শ্লোক ৩৭৫-৭৭; অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ৪৪।১৩, ৪৭।৮-৯; আশ্বমেধিকপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১১৭।১০। পুক্কসীর সঙ্গে সঙ্গম করলে পরাক প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হওয়া যায়। বৃহস্পতি, প্রায়শ্চিত্ত, শ্লোক ৭০।

৩৫৩. মৃচ্ছকটিক, অংক ১০।

৩৫৪. খৃস্টীয় অষ্টম শতকের একটি প্রত্নলেখে জানা যায়, রাজা লোকনাথের (ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন) মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ তাঁর শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্রের ('পারশব') জন্ম দিয়েছিলেন। 'এপি. ইণ্ডিকা', ১৫, পৃ ৩০১।

৩৫৫ মালবিকাগ্নিমিত্র, অংক ১, পৃ ১০; জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৫-৫৬।

সংকরবর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি থেকে আভাস পাওয়া যায় যে উচ্চবর্ণের মানুষদের অন্তর্বিবাহের ঘটনা একেবারে বিরল ছিল না।[৩৫৬] আগেই প্রস্তাব করা হয়েছে যে 'মনুস্মৃতি'র দশম অধ্যায়ে প্রদত্ত সংকরবর্ণের তালিকার রচনাকাল সম্ভবত খৃস্টীয় পঞ্চম শতক। "অনুশাসন-পর্বে" পনেরোটি প্রাচীন সংকরবর্ণের বিবরণ আছে[৩৫৭] ও চারটি নতুন জাতির প্রবর্তন করা হয়েছে, যথা, মাংস, স্বাদুকর, ক্ষৌদ্র ও সৌগন্ধ। তাঁদের দেখানো হয়েছে চার বর্ণের দুষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে মাগধীর ঔরসজাত সন্তান রূপে।[৩৫৮] মদ্রনাভ-র উল্লেখও আছে। তাঁদের নিষাদ থেকে জাত বলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে তাঁরা গর্দভবাহিত শকটে চড়তেন।[৩৫৯] শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ার সন্তানকে ব্রাত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে,[৩৬০] যিনি দ্বিজের প্রতি কর্তব্য থেকে চ্যুত হন তাঁকে নয়। ব্রাত্যকে চণ্ডালের পর্যায়ে রাখা হয়েছে।[৩৬১] এও বলা আছে যে বৈশ্য স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের মাধ্যমে বৈদ্যের জন্ম হয়।[৩৬২] পূর্ববর্তী যুগে চিকিৎসকদের যে অশ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো এটি তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ। 'অমরকোষে' মাহিষ নামে একটি নতুন জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন বৈশ্যা (অর্যা)-জাত ক্ষত্রিয়ের পুত্র। এঁরা সম্ভবত মাহিষকদের সঙ্গে অভিন্ন। দ্রবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, শক, যবন ও কম্বোজদের সঙ্গে এই মাহিষকদের পতিত শূদ্ররূপে দেখা যায়।[৩৬৩] মনু থেকে যেসব সংকরবর্ণের কথা জানা যায় তার সঙ্গে "অনুশাসনপর্বে"র অতিরিক্ত সাতটি যোগ করলে মোট সংখ্যা হয়ে আটষট্টি। বর্ণসংকরের মাধ্যমে নতুন বর্ণের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বটি উৎকাল্পনিক হলেও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বিষয়টির প্রভাব পড়ে থাকতে পারে, কারণ এমনকি এখনও পূর্ব নেপালে এ-ধরনের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে প্রভেদ এ-যুগের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে অপরি-বর্তিত রাখা হয়েছে। ফলত, যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দেন, চণ্ডাল নারীদের সঙ্গে কোন শূদ্র সংসর্গ করলে সে চণ্ডালের পর্যায়ে পতিত হয়।[৩৬৪] বিভিন্ন রচনায় শূদ্র ও শ্বপাকদের পৃথক্ উল্লেখ আছে।[৩৬৫] কিন্তু "অমরকোষে" সংকরবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের শূদ্র সম্প্রদায়ের অংশরূপে দেখা হয়েছে। তার "শূদ্রবর্গে" দশটি সংকরবর্ণের নাম আছে : করণ, অম্বষ্ঠ, উদগ্র (সম্ভবত

৩৫৬. যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯১-৯৪ ; নারদ ১২।১০৮, ১১১ ও ১১৩ ; অমরকোষ, ২।১০।১-৪।

৩৫৭. অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ৪৮।৫-২৭, (দক্ষিণী পাঠ) ৮৪।১৭।

৩৫৮. ঐ, (উ. পা.) ৪৭।২২, (দ. পা.) ৮৩।২২।

৩৫৯. ঐ, (উ. পা.) ৪৭।২৩, (দ. পা.) ৮৩।২৩।

৩৬০. ঐ, (দ. পা.) ৪৯।৯। ৩৬১ ঐ, (দ. পা.) ৮৪।২৮।

৩৬২. ঐ, (উ. পা.) ৪৯।৯। ৩৬৩. ঐ, (কলকাতা সংস্করণ) ৩৩।২১-২৩।

৩৬৪ ২।২৯৪। ৩৬৫. কাত্যায়ন, শ্লোক ৩৫১ ; আশ্বমেধিকপর্ব (দ পা.) ১১৬।১৯।

উগ্র ), মাগধ, মাহিষ, ক্ষত্তা, সূত, বৈদেহক, রথকার ও চণ্ডাল।[৩৬৬] বৈদেহক ( বণিক )-কে কিন্তু ''বৈশ্যবর্গে''র তালিকায়ও পাওয়া যায়।[৩৬৭]

'অমরকোষে' চণ্ডালদের জন্য দশটি নাম আছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি, যেমন 'প্লব', 'দিবাকীর্তি', 'জনংগম', পূর্ববর্তী রচনায় কদাচিৎ উল্লিখিত হয়েছে।[৩৬৮] এর থেকে অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যাবৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আরেকটি তথ্য থেকেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায় : পূর্ববর্তী যুগে গ্রীক লেখকরা চণ্ডালদের উল্লেখ করেননি, তাঁরা কিন্তু ফা-হিয়েন-এর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন।[৩৬৯]

ডোম্ব-রা পরবর্তী সময়ে উত্তর-ভারতে অস্পৃশ্যদের একটি বড় অংশ হয়ে উঠেছিলেন। মনে হয় গুপ্ত যুগেই তাঁরা একটি জাতিরূপে দেখা দেন। জৈন সূত্রে তাঁদের ঘৃণিত শ্রেণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৭০] তাঁরা বোধহয় অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী যাঁরা ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিম্নবর্গের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। কিরাত, শবর, পুলিন্দ-র মতো অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীকে 'অমরকোষে' ম্লেচ্ছদের সঙ্গে ''শূদ্রবর্গে''র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৩৭১] এর থেকে দেখা যায়, আদিম জনগোষ্ঠীর সুবিশাল অংশ শূদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন।

এ-যুগে অস্পৃশ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়াও অস্পৃশ্যতা প্রথা কিছুটা তীব্র হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। 'বৃহস্পতি স্মৃতি'তে চণ্ডালের স্পর্শজনিত পাপ খণ্ডনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩৭২] ফা-হিয়েন থেকে জানা যায়, চণ্ডালরা নগর তোরণে বা বাজারে ঢোকার সময়ে একখণ্ড কাঠে আঘাত করে তাঁদের আসার খবর আগেই দিয়ে দেন, যাতে অন্যরা তা জানতে ও তাঁদের এড়িয়ে চলতে পারেন।[৩৭৩] অন্ত্যজ বা অন্ত্যাবসায়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' শুদ্ধি-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৩৭৪] কিন্তু অস্পৃশ্যতা প্রধানত চণ্ডালদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতো, ডোম্বদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করার তেমন কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায়

৩৬৬. অমরকোষ, ২।১০।১-৪। ৩৬৭ ঐ, ২।৯।৭৮। ৩৬৮ ঐ, ২।১০।২০।

৩৬৯. লেগে, 'আ রেকর্ড অফ দ বুদ্ধিস্টিক কিংডম্‌স্', পৃ ৪৩।

৩৭০. ব্যবহার ভাষ্য, ৩।৯২ ; নিশীথ চূর্ণি, ১১, পৃ ৭৪৭, জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬০-এ উদ্ধৃত।

৩৭১ অমরকোষ, ২।১০।২১।

৩৭২. বৃহস্পতি, প্রায়শ্চিত্ত, শ্লোক ৪৯-৫০। কোন রজস্বলাকে শ্বপাক স্পর্শ করলে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে ( ঐ, প্রায়শ্চিত্ত, শ্লোক ৮৭ )।

৩৭৩. লেগে, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩।

৩৭৪. ২৫।৩৪-৩৬।

না। তেমনি চর্মকারদের পরবর্তীকালে অস্পৃশ্য বলে ধরা হলেও এই পর্বে তাঁদের যে সেরকম মনে করা হতো তার কোন নিদর্শনই নেই।

সংকরবর্ণ ও অস্পৃশ্যদের বৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ কোন নতুন তথ্য নেই। এসব জাতিকে তাদের বৃত্তির মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হবে—মনুর এই বিধি "অনুশাসনপর্বে" পুনরুক্ত হয়েছে।[৩৭৫] পথ পরিষ্কার, শ্মশানের কাজ, অপরাধী নিঘাত ও রাতে চোরদের অনুসন্ধান—এসব কাজে চণ্ডালদেরই নিয়োগ করা হচ্ছিল।[৩৭৬] শূদ্রদের নিম্ন অংশের গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি ছিল মৃগয়া। আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'অমরকোষে'র "শূদ্রবর্গে" শাকুনিক (পাখিশিকারী) ও ব্যধ[৩৭৭] ছাড়াও সারমেয় (সাধারণ কুকুর), বিশ্বকদ্রু (শিকারী কুকুর), গ্রাম্য শূকর ও দক্ষিণের্মা (ডানদিকে আহত হরিণ)-কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৩৭৮] ঐ একই অংশে ফাঁদ, জাল, দড়ি ও পাখি-ধরার খাঁচারও উল্লেখ আছে।[৩৭৯] ফা-হিয়েন থেকে জানা যায়, চণ্ডালরা ছিলেন ধীবর ও ব্যাধ এবং তাঁরা আমিষ বিক্রি করতেন।[৩৮০] কিন্তু কালিদাস চণ্ডালদের ব্যাধ ও মৎস্যজীবীদের থেকে পৃথক্ বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁরা সবাই একই শ্রেণীর অন্তর্গত।[৩৮১] অতএব এই চণ্ডালরা প্রধানত মৃগজীবী ছিলেন বলে মনে হয় না, যদিও মৃগয়া হয়তো ছিল তাঁদের অন্যতম গৌণ বৃত্তি। একটি জৈন সূত্রে বলা হয়েছে, মেদ-রা দিনরাত তীরধনুক দিয়ে শিকার করতেন।[৩৮২] শ্বপাক-রা যে কুকুরের মাংস রান্না করতেন ও জ্যা বেচতেন তা-ও জানা যায়।[৩৮৩]

বিভিন্ন সংকরবর্ণ, বিশেষত চণ্ডালদের বিভিন্ন আচরণ, প্রথা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেসব সংকরবর্ণ গ্রামবসতির বাইরে থাকতেন লোহার জিনিস ছিল তাঁদের প্রধান অলংকার।[৩৮৪] জনৈক চণ্ডালকে কুকুর ও গাধার উড়ানো ধুলোয় ধূসরিত রূপে দেখানো হয়েছে।[৩৮৫] ফা-হিয়েন থেকে জানা যায়, চণ্ডালরাই শুধু উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করতেন ও

৩৭৫. অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ৪৭।২৯-৩০, (দাক্ষিণী পাঠ) ৮৩।২৯-৩০।

৩৭৬. মহাবংশ, ১০।৯৩; ব্যবহার ভাষ্য, ৭।৪৪৯-৪৬২, পৃ ৭৯; নারদ ১৪।২৬।

৩৭৭. অমরকোষ, ২।১০।১৪। ৩৭৮. ঐ, ২।১০।২২-২৪। ৩৭৯. ঐ, ২।১০।২৬-২৭।

৩৮০. লেগে, পূর্বোক্ত. পৃ ৪৩। গাইলস্ 'চণ্ডাল'-এর অনুবাদ করেছেন 'অশুচি লোক (কুষ্ঠরোগী)', পূর্বোক্ত, পৃ ২১।

৩৮১. উপাধ্যায়, 'ইণ্ডিয়া ইন কালিদাস', পৃ ১৭০।

৩৮২. বৃহৎকল্প ভাষ্য, গাথা ২৭৬৮।

৩৮৩. ব্যবহার ভাষ্য, ৩।৯২; নিশীথ চূর্ণি, ১১, পৃ ৭৪৭, জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬০-এ উদ্ধৃত।

৩৮৪. অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ৪৭।৩২, (দাক্ষিণী পাঠ) ৮৩।৩২।

৩৮৫. ঐ, (উ. পা.) ১০১।৩, (দ. পা.) ১৫৮।৪।

পেঁয়াজ বা রসুন খেতেন।[৩৮৬] এর থেকে দেখা যায়, তাঁরা এসব খাদ্যাভ্যাসে বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন। মৃগজীবী ও ব্যাধ হওয়ার ফলে তাঁরা স্বভাবতই ছিলেন আমিষাহারে অভ্যস্ত।[৩৮৭] একটি বৌদ্ধ সূত্রে ঘোষণা করা হয়েছে, যাঁরা আমিষাশী তাঁদের বারবার জন্ম হয় চণ্ডাল, পুক্কস ও ডোম্বদের পরিবারে।[৩৮৮] সঙ্গে আরও বলা হয়েছে, আমিষাহারে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দূর থেকে দেখলে কুকুর এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে "এরা মৃত্যু-ব্যবসায়ী, এরা এমনকি আমাকেও হত্যা করবে।"[৩৮৯]

মনে হয়, গান গাওয়া ছিল ডোম্বদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি। ধরেই নেওয়া যায় তার উদ্দেশ্য ছিল লোকের মনোরঞ্জন করা।[৩৯০] গান করে এবং কুলো ও ঐ ধরনের জিনিস বেচে তাঁরা জীবনধারণ করতেন।[৩৯১] চাণ্ডালিকা নামে এক ধরনের অন্ত্যজবীণা 'অমরকোষে'র "শূদ্রবর্গে"র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৩৯২] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মনোরঞ্জন বিধানের ক্ষেত্রে চণ্ডালদেরও কিছু ভাগ ছিল।

ডোম্ব ও মাতঙ্গদের যক্ষ (জক্‌খ) নামে পরিচিত নিজস্ব কিছু দেবতা ছিল।[৩৯৩] একটি জৈন সূত্র থেকে জানা যায়, অল্প দিন আগে মৃত-ব্যক্তিদের অস্থি দিয়ে মাতঙ্গদের যক্ষস্তূপ তৈরি হয়েছিল।[৩৯৪] শ্মশানভূমির সঙ্গে চণ্ডালদের যোগের ফলে সম্ভবত এই প্রথার প্রচলন হয়।

অস্পৃশ্য, বিশেষত চণ্ডালদের অতি অশ্রদ্ধাসূচক ভাষায় উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অন্ত্যাবসায়ীদের বৈশিষ্ট্য হলো অশুদ্ধি, অসত্য, চৌর্য, ব্রহ্মদূষণ (ব্রাহ্মণনিন্দা), অনর্থক কলহ, কাম, ক্রোধ ও লোভ।[৩৯৫] হিংস্রতাকে চণ্ডাল-চরিত্রের এক বিশিষ্ট লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়। 'মৃচ্ছকটিকে' চণ্ডালরা তর্ক তোলেন যে, চণ্ডালকুলে জন্ম হলেও তাঁরা চণ্ডাল নন, বরং যারা ধার্মিক ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে তারাই চণ্ডাল ও পাপী।[৩৯৬] একটি বৌদ্ধ রচনায় যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সত্য, তপ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং সর্বভূতে দয়া যদি কোন ব্রাহ্মণ চর্চা না করেন, তবে তিনি চণ্ডালের তুল্য।[৩৯৭] ঐ একই মনোভাব থেকে বলা হয়েছে, সঙ্করবর্ণের

৩৮৬. লেগে, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩। ৩৮৭. তুলনীয়: মৃচ্ছকটিক, অঙ্ক ১০।

৩৮৮. লঙ্কাবতার সূত্র, পৃ ২৫৮। ৩৮৯. ঐ, পৃ ২৪৬।

৩৯০. এঁরা ছিলেন উত্তর ভারতের আদি অধিবাসীদের প্রতিনিধি, পতিত গায়কদের এক জাতি। জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৬০।

৩৯১. জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৪-৪৫। ৩৯২. ২।১০।৩১-৩২।

৩৯৩. জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ২২০-২২। বিহারের 'নীচ' জাতীয় লোকদের মধ্যে এখনও জট্ট ও জট্টীদের নিয়ে গান প্রচলিত আছে।

৩৯৪. আবশ্যক চূর্ণি, ২. পৃ ২৯৪। জৈন, পূর্বোক্ত, পৃ ২২২-এ উদ্ধৃত।

৩৯৫. ভাগবত পুরাণ ১১।১৭।২০, তুলনীয়: ৭।১১।৩০।

৩৯৬. ১০।২২। ৩৯৭. বজ্রসূচি (S), শ্লোক ১৬, পৃ ৫।

লোকে সাফল্য অর্জন করতে পারেন যদি তাঁরা গবাদি পশু ও ব্রাহ্মণের পরিচর্যা, নিষ্ঠুরতা থেকে নিবৃত্তি, মমতা, সত্যভাষণ, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি ধর্ম পালন করেন এবং প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণ দিয়েও অন্যদের রক্ষা করেন।[৩৯৮]

"শান্তিপর্বে"ই প্রথম ঘোষণা করা হয়েছে যে চতুর্বর্ণেরই বেদশ্রবণ বিধেয়[৩৯৯] এবং এমনকি শূদ্রের থেকেও জ্ঞান অর্জন করা উচিত।[৪০০] এর সঙ্গে মনুর বিভিন্ন বিধানের তীব্র বৈপরীত্য দেখা যায়। সেখানে এ জাতীয় ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শূদ্রদের বৈদিক শিক্ষাদানে অনুমতি দেওয়ার বিরুদ্ধে দৃঢ়মূল কুসংস্কারের ফলে "শান্তি-পর্বে"র নির্দেশ বাধা পেয়ে থাকতে পারে,[৪০১] কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণ-পাঠে শূদ্রদের কোন বাধা ছিল না। 'ভাগবত পুরাণে' বলা আছে, নারী ও শূদ্রের জন্য বেদের পরিবর্তে 'মহাভারতে'র ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪০২] শূদ্র 'মহাভারত' পড়বেন, না শুধুই শুনবেন—তা ঠিক পরিষ্কার নয়। পুরাণের ক্ষেত্রে 'ভবিষ্য পুরাণে' কিন্তু বলা হয়েছে, শূদ্রের কখনোই পুরাণ পাঠ উচিত নয়; তিনি শুধু শুনবেন।[৪০৩] সর্বজাতীয় মানুষের নৈতিক উন্নতি ও মুক্তির জন্য তাঁদের কাছে পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে উপাখ্যান বর্ণনা—এই ধর্মীয় প্রথার উৎপত্তি হয়েছিল সম্ভবত গুপ্ত যুগে।

'নাট্যশাস্ত্র' ছিল শিক্ষার অপর এক শাখা যেটিকে শূদ্রদের আয়ত্তে আনা হয়েছিল। 'নাট্যশাস্ত্র'কে চতুর্বেদের উপাদান দিয়ে গঠিত পঞ্চম বেদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে; সর্ব বর্ণের মানুষের তা উপভোগ্য।[৪০৪] এছাড়া, যোগ[৪০৫] ও সাংখ্য[৪০৬]—এই দুই দর্শনপ্রস্থান সম্ভবত গুপ্ত যুগে চূড়ান্ত

৩৯৮. অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ৪৭।৩৩-৩৫, (দক্ষিণী পাঠ) ৮৩।৩৩-৩৫।

৩৯৯. শ্রাবো চ চতুরো বর্ণান্। মহাভারত ১২।৩২৮।৪৯। হপকিন্স-এর 'দ রিলিজিয়ন অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ৪২৫-এ উদ্ধৃত।

৪০০. প্রাপ্য জ্ঞানম্...শূদ্রাদপি। মহাভারত ১২।৩১৯।৮৭ ইঃ, পূর্বোক্ত সূত্রে উদ্ধৃত।

৪০১. মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২১।৩১; নাট্যশাস্ত্র ১।১৪।

৪০২. স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ।
কর্ম শ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ॥
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্। ভাগবত পুরাণ ১।৪।২৫; ১।৪।২৯।

৪০৩. ...শ্রোতব্যমেব শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন। ভাগবত পুরাণ ১।১।৭২।

৪০৪. নাট্যশাস্ত্র ১।১২ ও ১৩।

৪০৫. পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' সম্ভবত খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের বেশি পুরনো নয়। কীথ, 'দ সাংখ্য সিস্টেম', পৃ ৫৭।

৪০৬. চীনা সাক্ষ্য অনুসারে সাংখ্যকারিকা-কার ঈশ্বরকৃষ্ণ ছিলেন বসুবন্ধুর (খুব সম্ভবত ৩০০ খৃস্টাব্দে জীবিত ছিলেন) পূর্বতন সমসাময়িক। ঐ, পৃ ৫৭।

রূপ লাভ করেছিল। তাতেও শূদ্রদের অধিকার ছিল।[৪০৭] সাংখ্যমত অনুযায়ী বেদ যে তার অন্যতম প্রামাণ্য উৎস এই বিষয়টির সঙ্গে সাংখ্যকে সকলের পক্ষে অবাধ করার কোন অসঙ্গতি ছিল না। একইভাবে যে-মহাকাব্যে বেদ থেকে বহু উদ্ধৃতি আছে তা শোনার ক্ষেত্রেও শূদ্রের বাধা ছিল না।[৪০৮]

গুপ্ত যুগে শিক্ষিত শূদ্রের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের একটি শ্লোকে ভৃত্যদের জন্য অধ্যাপকের কথাও আছে।[৪০৯] 'মৃচ্ছকটিকে' বিচারক শকারকে ভৎর্সনা করেন, "নীচু জাতের লোক হয়ে বেদের অর্থ বলছ। জিভ তোমার খসে পড়ছে না!"[৪১০] 'বজ্রসূচি' থেকেও এ জাতীয় শূদ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে বেদ, ব্যাকরণ, মীমাংসা, সাংখ্য, বৈশেষিক, লগ্ন ইত্যাদিতে শিক্ষিত শূদ্রের কথা আছে।[৪১১] এখানে শূদ্রদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, বৌদ্ধদের নয়। কারণ ব্রাহ্মণ্য বাগ্‌ভঙ্গিতে বৌদ্ধরাই শূদ্র বলে নিন্দিত হয়েছেন, বৌদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গিতে নয়। জায়সবাল বলেছেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে যে শিক্ষিত ও সংস্কৃতভাষী শূদ্রদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা হলেন শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণের পুত্র।[৪১২] একথা ঠিক হতে পারে, কিন্তু শূদ্রদের কিছু অগ্রণী অংশ, যাঁরা তাঁদের সজাতীয়দের উন্নতি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরাও শিক্ষিত হয়ে থাকতে পারেন।

উচ্চবর্ণের মানুষদের তুলনায় শূদ্রদের সাংস্কৃতিক মান যে নীচু ছিল সে-বিষয়ে কিন্তু কোন সন্দেহ নেই। ফলত বিভিন্ন নাটকে সংস্কৃতভাষী উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রদের মার্জিত ভাষায় কথা না-বলে মহিলা ও নীচজাতির লোক সর্বদাই সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃতে কথা বলেন।[৪১৩] যাই হোক, 'নাট্যশাস্ত্রে' বিধান দেওয়া হয়েছে যে পরিস্থিতি অনুযায়ী রানী, নায়িকা ও মহিলা-শিল্পীরা সংস্কৃত ব্যবহার করতে পারেন।[৪১৪] অনেক সময় প্রাকৃতের উপভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিভেদ করা হয়েছে। উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য শৌরসেনী, আর নীচ পর্যায়ভুক্তদের জন্য মাগধী।[৪১৫] বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও বৃত্তিজীবী, যেমন, চণ্ডাল, পুক্কস, ইত্যাদির জন্য 'নাট্যশাস্ত্রে' স্থানীয় উপভাষা ('বিভাষা') নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৪১৬] এই সমস্ত কিছু থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নীচু বর্ণের মানুষ অক্ষর-শিক্ষাও পেতেন না যার মাধ্যমে তাঁরা মার্জিত ভাষা সংস্কৃতে কথা বলতে পারবেন।

৪০৭. কীথ 'দ সাংখ্য সিস্টেম', পৃ ১০০। ৪০৮ ঐ, পৃ ১০০।

৪০৯. ভৃতকাধ্যাপকঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ১।২২৩।

৪১০. বেদার্থান্ প্রাকৃতস্তবং বদসি ন চ তে জিহ্বা নিপতিতা। ৯।২১।

৪১১. বজ্রসূচি (M), পৃ ৪। ৪১২. 'মনু অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ২৪১।

৪১৩. নাট্যশাস্ত্র ১৭।৩৭। ৪১৪. ঐ. ১৭।৩১।

৪১৫. কীথ, 'হিস্ট্রি অফ স্যানস্ক্রিট লিটরেচর', পৃ ৩১। ৪১৬. ১৭।৫৪-৫৬।

যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সমরশাস্ত্রের শিক্ষার্থী হিসাবে শূদ্রদের উপনয়ন অনুষ্ঠান পালন করা হতো; তার অঙ্গ ছিল বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি।[৪১৭] কিন্তু 'ধনুর্বেদ সংহিতা'য় এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত হস্তশিল্পী হিসেবে শূদ্রদের পরিবারে বা বাইরের বিশেষজ্ঞদের অধীনে বৃত্তিমূলক বা কারুশিক্ষায় কোন ছেদ পড়েনি। কিন্তু তার সঙ্গে অক্ষর শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। তা সত্ত্বেও গুপ্ত যুগের বিভিন্ন রচনায় শূদ্রদের শিক্ষা বিষয়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু শিক্ষিত শূদ্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

শূদ্রদের কোন ধর্মীয় অধিকার নেই—এই প্রাচীন বচনটি আলোচ্য যুগে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। বলা হয়েছে যে,[৪১৮] তাঁদের যজ্ঞ হলো উচ্চ তিন বর্ণের পরিচর্যা করা।[৪১৯] নারদ বলেন, নাস্তিক, ব্রাত্য ও দাসদের পূতবারি দেওয়া উচিত নয়।[৪২০] বিষ্ণু কিন্তু বিধান দিয়েছেন, ক্ষেত্রবিশেষে শূদ্রকে দিব্যবস্তু ('কোশ') দিয়ে শপথ করাতে হয়।[৪২১] শূদ্রের ধর্মীয় অবস্থানে পরিবর্তনের অন্যান্য ইঙ্গিতও দেখা যায়। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' শূদ্রদের দান ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্তব্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৪২২] শূদ্রদের নিঃসন্দেহে পঞ্চ-মহাযজ্ঞ পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[৪২৩] শূদ্ররা যে 'নমস্কার' মন্ত্র সহযোগে পঞ্চযজ্ঞ পালন করতে পারেন সে-বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য সুস্পষ্ট, যদিও মনু তা পরিষ্কার করে বলেননি।[৪২৪] হপকিন্স বলেন, এর সঙ্গে শূদ্রের কোন সম্পর্ক নেই।[৪২৫] একথা ঠিক নয়, কারণ অন্যান্য সূত্র থেকেও এটি সমর্থিত হয়।[৪২৬] যজ্ঞদীক্ষাকে মনু দ্বিজের অন্যতম জন্ম বলে গণ্য করলেও[৪২৭] যাজ্ঞবল্কের অনুরূপ অংশে এই বিশেষ সুযোগের কোন উল্লেখ নেই।[৪২৮] এটি তাঁর উদার মনোভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ফলেই শূদ্রকে যজ্ঞের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। "শান্তিপর্বে" নির্দ্বিধায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ত্রয়ী (তিন বেদ) শূদ্রদের স্বাহাকার, নমস্কার ও মন্ত্র

৪১৭. মুখোপাধ্যায়, 'এনশেন্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন', পৃ ৩৪৭।

৪১৮. যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৬২; অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১৪৯।১৩; তুলনীয়: শান্তিপর্ব ৭০।৫।

৪১৯, শূদ্রা পরিচারযজ্ঞাঃ··· । অনুশাসনপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১৪৭।১। তুলনীয়: ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ২।২৯।৫৫।

৪২০. ১।৩৩২। ৪২১. ৯।১০। ৪২২. ২৮।৭-৮।

৪২৩. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩।১২।১৯। এই পাঁচটি ধর্মকর্ম হলো ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈব, বলি ও নৃযজ্ঞ। মনু ৩।৬৯-৭০।

৪২৪. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২১।

৪২৫. হপকিন্স, 'মিউচুয়াল রিলেশনস্ অফ ফোর কাস্টস ইন মনু', পৃ ৩৬, টী. ১।

৪২৬. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩।১২।১৯। ৪২৭. মনু ২।১৬৯। ৪২৮. যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৯।

ব্যবহারের অনুমতি দেয় ; এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে যে, স্বাহাকার ও নমস্কারের সাহায্যে ব্রতবান্ হয়ে, শূদ্র পাকযজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারেন।[৪২৯] এই সংস্কারের সমর্থনে শূদ্র পৈজবনের পূর্ব-অনুষ্ঠিত ঘটনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রাচীন যুগে তিনি একটি পাকযজ্ঞ করেন এবং ঐন্দ্রাগ্নি (একাহ যজ্ঞ) বিধি অনুযায়ী এক লক্ষ ধান্যপূর্ণ পাত্র দান করেন।[৪৩০] এই ঘটনা থেকে আধুনিক সমাজ-সংস্কারকদের ঐ একই ধরনের প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে যায়। তাঁরা বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির সমর্থনে প্রাচীন পূর্ব-দৃষ্টান্ত খুঁজে বার করেন। শূদ্রদের গৃহযজ্ঞের অনুমতি দেওয়ার সময়ে "শান্তিপর্বে" একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় বলা হয়েছে, সর্ব-বর্ণেরই যজ্ঞে অধিকার আছে যদি তাঁরা শ্রদ্ধাবান্ হন।[৪৩১]

শূদ্রের যজ্ঞে অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্তরূপে দেখা যায় তাঁর প্রায়শ্চিত্ত পালনের অধিকারকে। যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্রদের জন্য চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন। তিনি যে 'অবকৃষ্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন[৪৩২] শূদ্ররা নিঃসন্দেহে তার মধ্যে পড়েন। এই ব্যবস্থাকে প্রক্ষেপ বলে মনে করা হয়।[৪৩৩] কিন্তু এটি তাঁর উদার মনোভাব ও 'বৃহস্পতি স্মৃতি'র ঐ একই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই স্মৃতিতে শূদ্র ব্রাহ্মণের উপবীত ছিন্ন করলে তাঁর জন্য প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৪৩৪]

৪২৯. স্বাহাকারনমস্কারৌ মন্ত্রঃ শূদ্রে বিধীয়তে।
তাভ্যাং শূদ্র পাকযজ্ঞৈর্যজেৎ ব্রতবান্ স্বয়ম্ ॥ শান্তিপর্ব ৬০।৩৬।
পুঁথির কেন্দ্রীয় ভাগে শূদ্র ও দ্বিজের বিহিত যজ্ঞে পার্থক্য করা হয়েছে। স্বাহাকার, নমস্কার ও মন্ত্রের প্রয়োগ শূদ্রের ক্ষেত্রে অনুমোদিত হয়নি, কিন্তু দীক্ষাব্রত ছাড়া পাকযজ্ঞ সম্পাদনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৬০, রাজধর্ম প্রসঙ্গে সমালোচনামূলক মন্তব্য, ২য় ভাগ, খণ্ড ১৯, পৃ ৬৬০-৬৬১। সব 'দস্যু'র জন্য পাকযজ্ঞ বিহিত হয়েছে (শান্তিপর্ব ৬৫।২১-২২)। এর থেকে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য গণ্ডীর বাইরে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যেও পাকযজ্ঞ প্রসারিত করা হচ্ছিল। তুলনীয় : বৃহস্পতি, সংস্কার, শ্লোক ৫২৯।

৪৩০. শান্তিপর্ব ৬০।৩৭-৩৮।

৪৩১. …যজ্ঞো মনীষয়া তাত সর্ববর্ণেষু ভারত। …তস্মাৎ সর্বেষু বর্ণেষু শ্রাদ্ধ যজ্ঞো বিধীয়তে। শান্তিপর্ব ৬০।৩৯-৪৩, তুলনীয় : ৫১-৫২। Cn টীকায় (প্রামাণিক সংস্করণের বর্গীকরণ অনুযায়ী) 'সর্ববর্ণ'-র অর্থ করা হয়েছে 'ত্রৈবর্ণিক'। খণ্ড ১৯, পৃ ৬৬০-৬১।

৪৩২. যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৬২।

৪৩৩. গাম্পের্ট, 'ডি সুহ্নেৎসেরেমোনিয়েন ইন ডোর আল্টইণ্ডিশেন রেখ্‌ট্‌স্‌-লিটেরাটুর', পৃ ৯৪।

৪৩৪. বৃহস্পতি, প্রায়শ্চিত্ত, শ্লোক ৬০।

শূদ্রদের জন্য কর্ণবেধন[৪৩৫] ও চূড়াকরণ[৪৩৬] সংস্কারের ব্যবস্থা আছে 'বৃহস্পতি স্মৃতি'তে। গৃহ্যসূত্রে প্রথমটির উল্লেখ নেই, দ্বিতীয়টির বিধান আছে;[৪৩৭] মনু এটি দ্বিজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।[৪৩৮] এখন কিন্তু তা শূদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হলো। লক্ষণীয় এই যে, সংস্কার অনুষ্ঠান করে লোকে কিছু সম্মানের অধিকারী হয় ও ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁর মর্যাদা বাড়ে। সমাজের একজন মান্য সদস্যরূপে এটি তাঁর পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করে; আচারভিত্তিক নাগরিকত্বের এ এক সম্ভাব্য স্বীকৃতি। গুপ্ত যুগে কৃষকদের একটি বৃহৎ অংশ শূদ্রপর্যায়ভুক্ত হন ও বৈশ্যদের সমান মর্যাদা অর্জন করেন। ফলে তাঁদের ধর্মীয় অবস্থানে অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয় তাঁদের পালনীয় সংস্কারের ক্রমিক বৃদ্ধিতে। গৃহ্যসূত্রের অধিকাংশই প্রাগ্-মৌর্য যুগে রচিত। সেখানে শূদ্রকে কোন সংস্কার পালনের অনুমতি দেওয়া হয়নি বা কোন প্রাগ্-গুপ্তকালীন রচনাতেও এজাতীয় অনুমতি নেই। কিন্তু প্রক্রিয়াটি গুপ্ত যুগে শুরু হয়, যখন সাধারণভাবে সংস্কারের সংখ্যা বেড়ে ষোল বা আরও বেশি হয়েছিল। নতুন শূদ্রদের ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় স্থান দেওয়ার সমস্যাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে এই উদ্দেশ্যে 'বৈজবাপ' নামে একটি নতুন গৃহ্যসূত্র প্রস্তুত করা হয়। আক্ষরিক অর্থে এর তাৎপর্য: যে-রচনায় বীজ বপন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈশ্য ও শূদ্র দুজনেই এ-কাজ করতেন। কুমারিল ভট্টের 'তন্ত্রবার্তিকে' উল্লিখিত[৪৩৯] এই সূত্রটির রচনাকাল সপ্তম শতকেরও আগে।[৪৪০] কিন্তু এটিকে সর্বপ্রাচীন গৃহ্যসূত্র-গুলির অন্যতম বলে গণ্য করা যায় না। মনে হয়, এটি সংকলিত হয়েছিল গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর কালে।

'বৈজবাপ গৃহ্যসূত্র' অনুযায়ী শূদ্রের যে যে অনুষ্ঠানের অধিকার আছে তা হলো: গর্ভষেক অনুষ্ঠান ('নিষেক'), গর্ভাবস্থার তৃতীয় মাসে অনুষ্ঠেয় পুত্রলাভের অনুষ্ঠান ('পুংসবন'), চুলের সিঁথি কাটা ('সীমন্তোন্নয়ন'), জন্মলাভ অনুষ্ঠান ('জাতকর্ম'), 'নামকরণ', শিশুকে গৃহের বাইরে আনা

৪৩৫. বৃহস্পতি, সংস্কার, শ্লোক ১০১। কিন্তু শিশুর বর্ণ অনুযায়ী কর্ণভেদের সূচের ধাতু আলাদা-আলাদা হয় (ঐ)।

৪৩৬. ঐ, সংস্কার, শ্লোক ১৫৪ (ক)।

৪৩৭. আর. বি. পাণ্ডেয়, 'হিন্দু সংস্কারস্', পৃ ১৬১।

৪৩৮. চূড়াকর্ম দ্বিজাতীনাং সর্বেষামেব ধর্মতঃ। মনু ২।৩৫।

৪৩৯. কাণে, 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ১ম, পৃ ৫০৬।

৪৪০. ঐ, ৫ম, ভাগ ২, কালানুক্রমিক সারণিতে (পৃ [১৩]) 'তন্ত্রবার্তিক'-কার কুমারিল ভট্টকে ৬৫০-৭০০ খৃষ্টাব্দে রাখা হয়েছে।

( 'নিষ্ক্রমণ' ), ষষ্ঠমাসে 'অন্নপ্রাশন' এবং কেশ মুণ্ডন ( 'চৌল' )।[৪৪১] এসব অনুষ্ঠান বিনামন্ত্রে যথাকালে পালন করতে হবে।[৪৪২] কৌতূহলের বিষয় এই যে, সবক'টি সংস্কারই মোটামুটি জন্মলাভের সঙ্গে যুক্ত ও দ্বিজদের পক্ষেও পালনীয়। সন্তান জন্মের বিষয়টি শুধু উচ্চ তিন বর্ণ নয়, নিম্নতম বর্ণের কাছেও যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছিল—এর থেকেই তা দেখা যায়। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে ক্রমবর্ধমান কৃষি-অর্থনীতি দেখাশোনা করার জন্য নিঃসন্দেহে আরও বেশি কাজের লোকের দরকার হয়েছিল এবং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল নির্বীজকরণের উপরে নয়, সন্তান উৎপাদনে।

শূদ্রদের পালনীয় অন্যতম সংস্কাররূপে বিবাহ কিন্তু 'বৈজবাপ'-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৩-১৪ শতকের 'হরিহর ভাষ্যে'[৪৪৩] তা করা হয়েছে। শূদ্র সর্বদা বিবাহ সংস্কারের অধিকারী—'ব্রহ্ম পুরাণে'র এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য করার সময় 'হরিহর ভাষ্যে' 'বৈজবাপে' উল্লিখিত আটটি সংস্কারের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিবাহ।[৪৪৪] অন্য এক ভাষ্যকার জয়পাল-ও ( ১৬ শতক )[৪৪৫] শূদ্রদের জন্য অনুমোদিত ন'টি সংস্কারের কথা বলেছেন।[৪৪৬] ১৭ শতকের একটি রচনায় শার্ঙ্গধরের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি সংস্কারের সংখ্যা বাড়িয়ে বারো করেছেন,[৪৪৭] কিন্তু শূদ্র পর্যন্ত প্রসারিত এই বারোটিকে তিনি সুনির্দিষ্ট করে দেননি। হয় তিনি অতিরিক্ত তিনটির কথা ভেবেছেন, নয়তো তাঁর বারোর তালিকায় এমন কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেগুলো অন্যান্যরা ( যাঁরা ন'টি সংস্কারের বিধান দিয়েছেন ) তালিকাভুক্ত করেননি। সে যাই হোক, লক্ষণীয় এই যে শূদ্রদের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রকমে বেড়ে গিয়েছিল।

কয়েকজন মধ্যযুগীয় ভাষ্যকার সৎ ও অসৎ শূদ্রের মধ্যে প্রভেদ করেছেন ও শুধু পূর্বোক্তদের জন্য আচার-অনুষ্ঠানের বিধান দিয়েছেন।[৪৪৮] ফলত ১৬ শতকের ভাষ্যকার গদাধরের[৪৪৯] বিধান অনুযায়ী সৎ শূদ্রদের জন্য বারোটি সংস্কার আর অসৎদের জন্য শুধু বিবাহ।[৪৫০] শার্ঙ্গধরের সংস্কারগুলো সম্ভবত সৎ শূদ্রদের জন্যই বিহিত। কিন্তু মিশ্রজাতির জন্য তিনি পরিস্কার পাঁচটি সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়েছেন।[৪৫১] তাঁর মতে, দ্বিজ, শূদ্র ও মিশ্রজাতি ( 'মিশ্রজাতীনাম্' ) যথাক্রমে ষোলো, বারো ও পাঁচটি সংস্কারের অধিকারী।[৪৫২] আপাত দৃষ্টিতে এ-ক্ষেত্রে মিশ্রজাতি বলতে

৪৪১. ধর্মকোশ, ৩য়, ভাগ ১, ২৮ ; তুলনীয় : ২৯।

৪৪২. অমন্ত্রকাণি যথাকালমুপদিষ্টানি। ঐ।

৪৪৩. ঐ, পৃ ১০, ১০৯। ৪৪৪. ঐ, ৫৯। ৪৪৫. ঐ।

৪৪৬. ঐ। ৪৪৭. ঐ, ৬২। ৪৪৮. ঐ, ৬০।

৪৪৯. ঐ। ৪৫০. ঐ। ৪৫১. ঐ।

৪৫২. ঐ. ৬২।

অস্পৃশ্যদের বোঝায়। যে-কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছিল সেখানে এই অস্পৃশ্যরা, মনে হয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ও স্পষ্টতই এইসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যয় নির্বাহের অবস্থাও তাঁদের ছিল।

শূদ্ররা যে সংস্কারসহ কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন—তৃতীয় শতক থেকে বেশ কয়েকটি রচনায় এ-বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৪৫৩] একটি মাত্র শর্ত ছিল: সেগুলো বিনামন্ত্রে করতে হবে।[৪৫৪] মন্ত্রগুলি নিঃসন্দেহে বৈদিক রচনায় অন্তর্ভুক্ত, কারণ 'পদ্ম পুরাণে' স্বীকার করা হয়েছে যে, দ্বিজ ও শূদ্রের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান যথাক্রমে শ্রুতি ('শ্রৌতম্') ও স্মৃতি ('স্মার্তম্') অনুসরণ করে।[৪৫৫] শূদ্রদের যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অনুমতি দেওয়া হয়নি—তার থেকে বোঝা যায় যে দ্বিজদের সঙ্গে তাঁদের ধর্মীয় প্রভেদ অব্যাহত ছিল, কিন্তু সেই প্রভেদ ততটা বাস্তব নয়, যতটা আনুষ্ঠানিক। তার কারণ: মধ্যযুগের গোড়ায় কিছু স্মার্ত মন্ত্র বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে স্থান লাভ করেছিল।[৪৫৬]

বৈদিক মন্ত্রপাঠ না-করার চেয়েও মুখ্য লক্ষণীয় পরিবর্তন হলো সংস্কার-পালন। আর যেহেতু সংস্কার-পালন করতে হবে তাই বিভিন্ন আদি-মধ্যযুগীয় শাস্ত্রে—যেমন, ব্যাস,[৪৫৭] মরীচি[৪৫৮] ও 'বরাহ পুরাণে'[৪৫৯]—বিধান দেওয়া হয়েছে যে, মন্ত্র উচ্চারণের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করা উচিত। এটি শূদ্র যজমানের শ্রবণসীমার মধ্যে করা হতো কিনা তা ঠিক স্পষ্ট নয়।

সব মিলিয়ে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে শূদ্রের পক্ষে পালনীয় প্রচুর সংখ্যক আচার-অনুষ্ঠান দেখা যায়। তার কয়েকটি পাকযজ্ঞ বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণভোজন তার মধ্যে পড়ে। অন্যগুলো হলো গর্ভাধান, জন্ম, বিবাহ, শেষকৃত্য ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আচার। তাদের বলা হয় 'সংস্কার'। আরও অন্যান্যর মধ্যে আছে দীর্ঘজীবন লাভের সঙ্গে যুক্ত আচার-অনুষ্ঠান। তাদের নাম 'পৌষ্টিক-কর্মাণি'।[৪৬০] একজন আদি-মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্রকার শূদ্রদের 'পূর্ত-ধর্ম', অর্থাৎ দান, সমাজসেবা ইত্যাদির অনুমতি দিয়েছেন,

৪৫৩. ঐ, ২৮, ৩৫-৩৬, ৪৩, ৪৬, ৫৪, ৫৬-৫৭, ৫৯।

৪৫৪. ঐ, ৩৫, ৪৩, ৪৭, ৫৬। ৪৫৫. ঐ, ৫৯।

৪৫৬. কাণে, পূর্বোক্ত, ৫ম, ভাগ ২, পৃ ৯২০; ৪র্থ, পৃ ৪৪০, টী. ৯৮৪।

৪৫৭. অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রো মন্ত্রেণ গৃহ্যতে। ধর্মকোশ. ৩য়, ভাগ ১, ৫৪-য় উদ্ধৃত।

৪৫৮. ঐ. ৫৬। ৪৫৯. ঐ, ৫৭।

৪৬০. মহাভারত, ঐ, ৩৬-এ উদ্ধৃত। বৃহৎ সংহিতা-য় বলা হয়েছে, সাংবৎসর (জ্যোতিষী) অবশ্যই শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্মে অভিজ্ঞ হবেন। কাণে, ঐ ৫ম, ভাগ ১, পৃ ৩৪৯-এ উদ্ধৃত।

কিন্তু বৈদিক আচার বাদ দিয়ে।[৪৬১] গ্রহফলের আশংকা ও প্রভাব দূর করার জন্য করণীয় বিভিন্ন আচার সম্ভবত শূদ্রদের জন্যও বিহিত ছিল। প্রাচীন যুগের শেষে ও আদি-মধ্যযুগের সূচনায় এসব আচার সম্মিলিতভাবে শূদ্রদের ধর্মীয় অবস্থানে এক বিশাল পরিবর্তনের নিদর্শনস্বরূপ।

এ-যুগের কয়েকটি রচনায় শূদ্রদের তপস্বী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। রামায়ণে শূদ্র তপস্বী শম্বূককে নিন্দাবাদের ঘটনাটি[৪৬২] কালিদাস ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর মতে, শম্বূক তপস্যার মাধ্যমে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছিলেন। রাম যে শম্বূককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তিনি তা অনুমোদন করেছেন। তাঁর যুক্তি: এই শাস্তির ফলে ঐ শূদ্র লাভ করেছেন পুণ্যাত্মার মর্যাদা যা তিনি কঠোর তপস্যা করেও অর্জন করতে পারতেন না, কারণ স্বধর্ম লঙ্ঘন করে তিনি এ-কাজ করেছিলেন।[৪৬৩] কিন্তু বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে "শান্তিপর্বে" ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে জোর দেওয়া হয়েছে ব্রাহ্মণের চতুরাশ্রম পালনের উপর, কিন্তু অন্য তিন বর্ণের জন্য তা আবশ্যিক করা হয়নি।[৪৬৪] এঁরা কিন্তু প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবেন না।[৪৬৫] এর অর্থ: শূদ্র ইচ্ছা করলে প্রথম তিনটি আশ্রমে প্রবেশ করতে পারবেন, কিন্তু চতুর্থটি শুধু তাঁর নয়, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও বন্ধ। কিন্তু কাত্যায়ন একজন শূদ্র প্রব্রজিতের উল্লেখ করেছেন, সন্ন্যাস-আশ্রম পরিহার করলে রাজা তাঁকে শাস্তি দেবেন।[৪৬৬] যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়েছেন, দৈব ও পৈত্র্যকর্মে শূদ্র প্রব্রজিতকে ভোজন করানো অনুচিত।[৪৬৭] এটি জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শূদ্র সন্ন্যাসী বোঝাতে পারে।

প্রতিমা নির্মাণ সংক্রান্ত কিছু বিধিব্যবস্থায় শূদ্রদের ধর্মীয় মর্যাদা উন্নতির এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতিমা নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাটি প্রস্তুত করার উপযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি বৈষ্ণব রচনায় বিধান দেওয়া হয়েছে যে সর্ববর্ণের মানুষ প্রতিমা গড়তে পারেন।[৪৬৮] এর

৪৬১. কাণে, ঐ, ৫ম, ভাগ ২, পৃ ৯৪৯, টী. ১৫৩২-এ উদ্‌বৃত।

৪৬২. রামের হাতে শম্বূক-বধের কাহিনীটি মনুর মনোভাবই প্রতিফলিত করে। রামায়ণে (উত্তরকাণ্ড, অধ্যায় ৭৪-৭৬) এটি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল মৌর্যোত্তর যুগে।

৪৬৩. রঘুবংশ ১৫।৫৩; তুলনীয়: অনুশাসনপর্ব (দাক্ষিণী পাঠ) ২৭০।১১।

৪৬৪. শান্তিপর্ব ৬৩।৯-১১; ৬৩।৯-এর সমালোচনামূলক মন্তব্য, খণ্ড ১৯, পৃ ৬৬২।

৪৬৫. শান্তিপর্ব ৬৩।১২-১৪।

৪৬৬. কাত্যায়ন, শ্লোক ৪৮৬। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও শূদ্র তপস্বীদের কথা আছে (২২।১৯), কিন্তু তাঁদের কাল সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

৪৬৭. যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৫।

৪৬৮. হরিভক্তিবিলাস, বিলাস ১৮-র গোপাল ভট্ট উদ্‌ধৃত করেছেন 'হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র' থেকে।

থেকে দেখা যায়, অন্যান্য বর্ণের মতো শূদ্রেরা একই বস্তু দিয়ে রচিত প্রতিমা নির্মাণ ও পূজা করতে পারতেন। এ-যুগের অন্য এক রচনায় কিন্তু প্রতিমা নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কাঠ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বর্ণ বিভেদের নির্দেশ আছে ও সেই অনুযায়ী চার বর্ণের জন্য চার রকম কাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪৬৯] গুপ্তোত্তর যুগের একটি বৈষ্ণব উপপুরাণে ঐ জাতীয় নিয়মে বলা হয়েছে, মন্দির ও মূর্তি নির্মাণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে শুভ হলো যথাক্রমে সাদা, লাল, হলুদ ও কালো কাঠ।[৪৭০] মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে ঐ একই গ্রন্থে চার বর্ণের জন্য যথাক্রমে ঐ চারটি রঙ বিহিত রয়েছে।[৪৭১] কাঠ ও পাথর বাছাইয়ে বর্ণভেদ থাকলেও মূর্তিতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনা থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, শূদ্রেরা প্রতিমা নির্মাণ করতে পারতেন।

বিধান দেওয়া হয়েছে যে, শ্মশানে শূদ্রের শব নিয়ে যাওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে যাবেন না। যদি করেন তাহলে স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতভক্ষণ করে শুদ্ধ হবেন।[৪৭২] শূদ্রের পরিবারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে অশৌচের সর্বাধিক কাল সংক্রান্ত একটি প্রাচীন বিধি ছিল। এ-যুগের কয়েকটি রচনায় তা বলবৎ রাখা হয়েছে।[৪৭৩] সাধারণ ও ধার্মিক ('ন্যায়বর্তী') শূদ্রের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য যথাক্রমে একমাস ও পনেরো দিনের বিধান দিয়েছেন।[৪৭৪] ফলত ধার্মিক শূদ্র বৈশ্যের মর্যাদা পেয়েছেন। উপবাস পালনের ক্ষেত্রে বৈশ্য ও শূদ্রকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। বিধান অনুযায়ী বৈশ্য ও শূদ্রেরা শুধু একরাত্রি উপবাস পালন করবেন।[৪৭৫] যদি ভুলবশত তাঁরা দুই বা তিন রাত্রি উপবাস করেন, তার ফলে তাঁদের কোন উন্নতি হয় না।[৪৭৬] বিশেষ উপলক্ষ্যে অবশ্য তাঁরা দু-রাত্রি উপবাস করতে পারেন।[৪৭৭] কিন্তু কখনও কখনও এও বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই শুধু উপবাস পালনের অধিকারী।[৪৭৮]

বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনগ্রাফি', পৃ ২২৭, টী. ১-এ পুনরুদ্ধৃত।

৪৬৯. বৃহৎ সংহিতা ( সুধাবর দ্বিবেদী-সম্পাদিত ) ৮৯।৫-৬।

৪৭০. বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ ৩।৮৯।১২।

৪৭১. শুক্লা শস্তা দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়ানাং চ লোহিতা।
পীত হিতা কৃষ্ণা শূদ্রাণাং চ হিতপ্রদা ॥ ঐ, ৩।৯০।২।

৪৭২. যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৬।

৪৭৩. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩।১৪।৮৬-৮৭; বিষ্ণু পুরাণ ৩।১৩।১৯; বৃহস্পতি, অশৌচ. শ্লোক ৩৯।

৪৭৪. ৩।২৩।

৪৭৫. অনুশাসনপর্ব ( উত্তরী পাঠ ) ১০৯।১১-১২, ( দক্ষিণী পাঠ ) ১৬৩।১১-১২।

৪৭৬. ঐ। ৪৭৭. ঐ, ( উ. পা. ) ১০৯।১৩, ( দ. পা. ) ১৬৩।২।

৪৭৮. ঐ, ( উ. পা. ) ১০৬।২, ( দ. পা. ) ১৬৩।২।

বৃহস্পতি বিধান দিয়েছেন, জন্মহানির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে ১০, ৭, ৫ ও ৩ দিনে শুচি হবেন।[৪৭৯]

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মহিলা ও শূদ্রদের অশৌচের বিষয়টি এ-যুগের বিভিন্ন রচনাতেও বলবৎ রাখা হয়েছে।[৪৮০] শূদ্র ও পতিত, যাঁদের কুকুরের মত অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়, তাঁদের দেখে ফেললে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪৮১] কোন ক্ষত্রিয় ছাত্র বৈশ্য বা শূদ্রের সংস্পর্শে এলে এবং বৈশ্য ছাত্র শূদ্রের সংস্পর্শে এলে তার জন্যও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে।[৪৮২]

গৃহ্যসূত্রে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের যে-বিধান আছে তা শূদ্রের জন্য নির্দেশ করা হয়নি।[৪৮৩] কিন্তু এ-যুগের বিভিন্ন রচনায় পরিষ্কারভাবে শূদ্রকে এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[৪৮৪] তিনি সাধারণ শ্রাদ্ধ ছাড়াও বিশেষ ('বৃদ্ধি') শ্রাদ্ধ পালন করতে পারেন।[৪৮৫] সেই বিশেষ উপলক্ষ্যে, যেমন পুত্রলাভে, মৃত পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন সামগ্রী উৎসর্গ করা হয়।[৪৮৬] এও জানা যায় যে আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পরে তাঁর নির্দিষ্ট স্বর্গ হলো 'প্রাজাপত্য', যে-ক্ষত্রিয় যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেন না তাঁর 'ঐন্দ্র', কর্তব্যপরায়ণ বৈশ্যের 'মারুত', আর হীন কর্মে নিযুক্ত শূদ্রের 'গান্ধর্ব'।[৪৮৭]

শূদ্র তাঁর পিতৃগণকে জল ও অন্যান্য দ্রব্য উৎসর্গ করতে পারেন। বিভিন্ন পুরাণে তাঁদের অভিধা হলো 'সুকালী'।[৪৮৮] বলা হয়েছে, তাঁরা কৃষ্ণবর্ণ।[৪৮৯] কিন্তু অন্য তিন উচ্চতর বর্ণ, যাঁদের ঋষির সন্তান বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের মতো শূদ্রদের কোন 'প্রবর' থাকার কথা নয়।[৪৯০]

বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে যে-হোম সম্পন্ন হয় তাতে আহুতি প্রদানের অধিকার শূদ্র ও মহিলাদের ছিল না।[৪৯১] সেজন্য নববর্ধমান নানা পূজা[৪৯২] ও ব্রতে তাঁদের ছিল অবাধ অধিকার। শূদ্র সহ সর্ববর্ণের

৪৭৯. বৃহস্পতি, অশৌচ, শ্লোক ৩৪-৩৫। কয়েকটি শাখার লোক, যেমন কারুকর্মী, কৃষক, চিকিৎসক, দাস-দাসী, ক্ষৌরকার, রাজা ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সদাশুচি বলে মনে করা হতো। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৮-২৯; বৃহস্পতি, অশৌচ, শ্লোক ৯।

৪৮০. শান্তিপর্ব ৩৬।৩৫।

৪৮১. বৃহস্পতি, আচার, শ্লোক ৩৭।

৪৮২. বৃহস্পতি, প্রায়শ্চিত্ত, শ্লোক ৭৪-৭৫।

৪৮৩. পাণ্ডেয়, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৯।

৪৮৪. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২১; বায়ু পুরাণ ২।১৩।৪৯।

৪৮৫. মৎস্য পুরাণ ১৭।৬৩-৬৪।

৪৮৬. ঐ, ১৭।৭০।

৪৮৭. মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৯।৭৭ ৮১; বিষ্ণু পুরাণ ১।৬।৩৪-৩৫।

৪৮৮. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩।১০।৯৬-৯৯; বায়ু পুরাণ ২।১১।৯০; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯৬।২৩।

৪৮৯. মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯৬।৩৬।

৪৯০. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ২।৩২।৯০, ১২১-২২।

৪৯১. কাণে, 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ৫ম, ভাগ ১, পৃ ৩২-৩৩।

৪৯২. এই প্রথার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য সুবীরা জায়সবাল, 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বৈষ্ণবিজম', অধ্যায় ৫ দ্র.।

মানুষই ব্রত পালনের অধিকারী ছিলেন। খৃস্টীয় ৬০০-৯০০ পর্বের ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা দেবল-এর[৪৯৩] মতে, ব্রত, উপবাস, সংযম ও আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে সর্ববর্ণের ব্যক্তিই পাপ থেকে নিশ্চিত মুক্ত হতে পারেন।[৪৯৪] ১৩ শতকে হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিন্তামণি'তে[৪৯৫] ব্রতের সংখ্যা ৭০০। তাহলেও তার অনেক ক'টিই বিভিন্ন পুরাণের সেইসব অংশে স্থান পেয়েছে যেগুলোর রচনাকাল ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক।[৪৯৬] একটি গণনায় দেখা যায়, পুরাণে ব্রত সংক্রান্ত শ্লোকের সংখ্যা পঁচিশ হাজার।[৪৯৭] তার প্রধান অংশই আদি-মধ্যযুগের হতে পারে, কিন্তু গুপ্ত যুগ থেকে শূদ্র-কৃষক জাতি ও অন্যান্য-দের ক্ষেত্রে ব্রতের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

মানুষকে তান্ত্রিক প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই পুরাণ-গুলোয় বিভিন্ন ব্রত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে মনে হয়।[৪৯৮] এই পদ্ধতিতে নানান তান্ত্রিক আচার ব্রাহ্মণ্য রূপ পরিগ্রহ করে। কৃষক সমাজের ধর্মীয় জীবনের একটি বিশাল অংশ অধিকার করে নিল বিভিন্ন ব্রত। তাঁদের সময় ও উপার্জনের বড় একটা অংশ এতেই ব্যয় হতো। সম্ভবত প্রথম দিকে কৃষকরা নিজেরাই কয়েকটি ব্রত পালন করতে পারতেন। কিন্তু ক্রমেই ব্রাহ্মণরা হস্তক্ষেপ করলেন। তার জন্য তাঁদের দক্ষিণা দিতে হতো। বেশ কয়েকটি ব্রতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হোম, যা একমাত্র ব্রাহ্মণরাই করতে পারেন।[৪৯৯] যেহেতু অধিকাংশ ব্রতই ছিল তিথিব্রত,[৫০০] তাই লোককে জ্যোতিষীর সাহায্যও নিতে হতো। তাঁরা চান্দ্র দিনের সঠিক পরিমাণ বলতে পারতেন। সাধারণত, পুরোহিত ও জ্যোতিষী—দুয়েরই কাজ করতেন ব্রাহ্মণরাই।

যে প্রক্রিয়ায় শূদ্রদের বিভিন্ন ধর্মীয় অধিকার প্রসারিত হয়েছিল ও তাঁদের ব্রাহ্মণ্য জীবন-ধারার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল তা মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছয় বলে মনে হয়। শূদ্রদের পালনীয় বিভিন্ন

৪৯৩. কাণে, পূর্বোক্ত, ৫ম, ভাগ ২, কালানুক্রমিক সারণি, পৃ. ১৩]।

৪৯৪. ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনৈস্তথা।
বর্ণাঃ সর্বেঽপি মুচ্যন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ॥
পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১, টী. ১২৩-এ উদ্ধৃত।

৪৯৫. কাণে, পূর্বোক্ত, ৫ম, ভাগ ১, পৃ. ৪৭।

৪৯৬. রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬, ১৮২, ১৮৩, ১৮৮।

৪৯৭. কাণে, পূর্বোক্ত, ৫ম, ভাগ ১, পৃ. ৫৭। কাণে-র গ্রন্থের ভিত্তিতে ১২৫৬টি ব্রত, উৎসব ইত্যাদি গণনা করা যায় (ঐ, পৃ. ২৫৩-৪৬২), কিন্তু অনেক পরবর্তী মধ্যযুগীয় রচনার ভিত্তিতে তিনি এই তালিকা তৈরি করেছেন। কাণে মনে করেন, ঠিকমতো ঝাড়াই বাছাই করলে সংখ্যাটি ১০০০-এর অনেক কম হবে।

৪৯৮. রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫-২৬।

৪৯৯. কাণে, পূর্বোক্ত, ৫ম, ভাগ ১, পৃ. ৫২, টী. ১৩০।

৫০০. ঐ, পৃ. ৫৬।

আচারের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি সংক্রান্ত গ্রন্থের আধিক্য দেখা যায় চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতকের মধ্যে। এগুলো হলো চতুর্দশ শতকে দিল্লী অঞ্চলে মদনপালের লেখা 'শূদ্রধর্মবোধিনী',[৫০১] পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় বাচস্পতি মিশ্র-রচিত 'শূদ্রাচার চিন্তামণি',[৫০২] পশ্চিম ভারতে পঞ্চদশ শতকে কৃষ্ণকোষ-এর 'শূদ্রাচার শিরোমণি',[৫০৩] ষোড়শ শতকে বাংলাদেশে রচিত রঘুনন্দনের 'শূদ্রকৃত্যতত্ত্ব'[৫০৪] এবং সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বারাণসীতে কমলাকার ভট্ট-রচিত 'শূদ্র কমলাকর'।[৫০৫] শূদ্রদের পালনীয় বিভিন্ন ধর্মীয় কর্তব্য ও আচরণকে সমমানে আনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য গ্রন্থও আরও আগে লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। যেমন, ১৫০০ খৃস্টাব্দের আগে লেখা অপিপাল-এর 'শূদ্রপদ্ধতি'[৫০৬] সোম মিশ্রের একটি পূর্ববর্তী রচনার[৫০৭] ভিত্তিতে রচিত, যার রচনাকাল ১৩০০ খৃস্টাব্দের আগেও হতে পারে। শূদ্রদের বিভিন্ন কর্তব্য সংক্রান্ত যেসব অংশ পুরাণে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে 'শূদ্রাচার' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।[৫০৮]

লক্ষণীয় এই যে, উচ্চতর তিন বর্ণের কর্তব্য সংক্রান্ত ঐ একই ধরনের রচনা বিরল। আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত সব সাধারণ রচনাতেই দ্বিজদের কর্তব্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু শূদ্রদের বিভিন্ন ধর্মীয় কর্তব্য ও আচরণ বিধিবদ্ধ করা এবং একটি পদ্ধতিতে আনাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর থেকেই দেখা যায়, মধ্যযুগে সম্প্রদায় হিসেবে তাঁদের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব আরোপ করা হতো। যাই হোক, এই পুরো প্রক্রিয়াটির সুস্পষ্ট সূচনা দেখা যায় গুপ্ত যুগ থেকে।

শূদ্রদের দান করার অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ এ-যুগের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় বিকাশ।[৫০৯] দানকে শূদ্রের পক্ষে শ্রেষ্ঠ মার্গরূপে ঘোষণা করা হয়েছে, এই করেই তাঁর সব কামনা পূর্ণ হয়।[৫১০] যে শূদ্র সত্য ও নিষ্ঠা পালন করেন, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে সম্মান দেখান ও দান করেন, তিনি স্বর্গ ও এমনকি পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।[৫১১] বেশ্যাদের জন্য উদ্দিষ্ট 'অনঙ্গদান' নামে একটি বিশেষ ব্রতে বেশ্যার গরু গ্রহণ করার সময়ে

৫০১. ঐ, ১ম, পরিচ্ছেদ ৯৩ ( পৃ ৩৮১-৮৯ ), ও টী. ৯৪০ দ্র।

৫০২. ঐ, পরিচ্ছেদ ৯৮ ( পৃ ৩৯৯-৪০৬ )। ৫০৩. ঐ, পৃ ৬৪১, ৬৮৬-৮৭।

৫০৪. ঐ, পরিচ্ছেদ ১০২ ( পৃ ৪১৬-১৯ ), টী. ১০১৮ সমেত।

৫০৫. ঐ, পরিচ্ছেদ ১০৬ ( পৃ ৪৩২-৩৭ ), টী. ১০৯২ সমেত।

৫০৬. ঐ, পৃ ৬৮০। ৫০৭. ঐ, পৃ ৬৪০। ৫০৮. ঐ, পৃ ৬৪১।

৫০৯. মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৮।৩-৮।

৫১০. দানেন সর্বকামাপ্তিরস্য সঞ্জায়তে। মৎস্য পুরাণ ১৭।৭১।

৫১১. অনুশাসনপর্ব ( দাক্ষিণী পাঠ ) ২১৭।১৩-১৫। পাপমোচনের জন্য দানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে হাজরা, 'পুরাণিক রেকর্ডস অন হিন্দু রাইটস অ্যাণ্ড কাস্টমস' পৃ ২৫০ দ্র.।

ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্রপাঠ করবেন—এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ্যাকে সাধারণত শূদ্র বলে গণ্য করা হতো।[৫১২] এও জানা যায় যে, লীলাবতী নামে এক শৈব গণিকা ও এক শূদ্র স্বর্ণকার দান করেছিলেন। ফলে প্রথমজন শৈবধাম ('শৈবমন্দিরম্') লাভ করেন আর দ্বিতীয়জন ধর্মমূর্তি নামে একচ্ছত্র রাজায় পরিণত হন।[৫১৩] খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের একটি বৌদ্ধ অর্থকথায় অন্তত বারোজন নিম্ন বর্গের ব্যক্তির উদাহরণ আছে যাঁরা বুদ্ধ, ভিক্ষু বা সংঘকে দান করার ফলে স্বর্গসুখ আর বৌদ্ধ 'বিমান'-এর আনন্দ ও আরাম উপভোগ করতেন।[৫১৪] অতএব ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ এই দুই ধারাতেই দানতত্ত্ব ছিল অভিন্ন।

'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি' রচনার আগে দানের পুণ্যকে জনপ্রিয় করার জন্য ব্রাহ্মণরা প্রবল প্রচার চালিয়েছিলেন—এমন কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।[৫১৫] 'বৃহস্পতি স্মৃতি' থেকে দানের মাধ্যমে মুক্তির তত্ত্ব তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছয়।[৫১৬] শূদ্রের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের উপর বারবার জোর দেওয়া থেকে বোঝা যেতে পারে, তাঁদের দান করার মতো অবস্থা ছিল। এটি তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মেলে।

শূদ্রদের বিভিন্ন যজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য আচার পালনের ব্যবস্থা থেকে বোঝা যায়, এগুলোয় ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করা হতো, তাঁরা এই উপলক্ষ্যে দান লাভ করতেন। শূদ্রকেও দান গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রাপকের বর্ণ অনুযায়ী দাতার দান বৃদ্ধি পায়।[৫১৭] শূদ্রদের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আচারে যেসব পুরোহিত ভার নিতেন তাঁদের বারবার ধিক্কার জানানো হয়েছে।[৫১৮] তা শুধু এই পুরোহিতদের বিরুদ্ধে প্রাচীন সংস্কারের প্রতিফলনই নয়, এর থেকে এও বোঝা যায় যে, তাঁদের আরও ঘন ঘন নিয়োগ করা হচ্ছিল। মনুর মতো[৫১৯] যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্র ঋত্বিকদের নিন্দা করেননি।

৫১২. ...ক ইদং কস্মাদাদিতি বৈদিকং মন্ত্রমীরয়েৎ। মৎস্য পুরাণ ৬৯।৫১-৫৪। ব্রত প্রসঙ্গে অধ্যায় ৬৯-৭২ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত সংস্করণে অধ্যায় ৭০-৭১)-কে রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা আনু. ৫৫০-৬৫০ খৃস্টাব্দ বলে ধার্য করেছেন (পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৬)।

৫১৩. মৎস্য পুরাণ ৯১।২৩-৩২।

৫১৪. বিমলাচরণ লাহা 'হেভেন অ্যান্ড হেল', পৃ ৩৬-৪৫-এ বিমলবথু-অর্থকথার যে সার-সংকলন করেছেন তার ভিত্তিতে নির্ণীত।

৫১৫. হাজরা, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৭।

৫১৬. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, বৃহস্পতি. ভূমিকা, পৃ ১৬২।

৫১৭. বৃহস্পতি, সংস্কার, শ্লোক ২৮৮।

৫১৮. বিষ্ণু ৮২।১৪ ও ২২; শান্তিপর্ব, Ds ৫নং পুঁথি; ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ৩।১৫।৪৪।

৫১৯. মনু ১১।৪২।

'বজ্রসূচি'তে ঘোষণা করা হয়েছে, ব্রাহ্মণদের এমনকি কৈবর্ত, রজক ও চণ্ডাল পরিবারেও পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যেও চূড়াকরণ, মুঞ্জ, দণ্ড, কাষ্ঠ, ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠিত হয়।[৫২০] এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণরা এমনকি শূদ্রদের নিম্নতম অংশের জন্যও পুরোহিতের কাজ করতেন। 'বজ্রসূচি'তে এও বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান, যজ্ঞের দায়িত্বভার গ্রহণ, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও দান গ্রহণ করতে দেখা যায়।[৫২১] এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে এটি পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিছু কিছু অংশের মানুষের মধ্যে বিদ্রোহসূচক মনোভাবের ইঙ্গিত বহন করতে পারে। সাম্প্রতিককালে এই ধরনের বেশ কয়েকটি আন্দোলন হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তরা যখন বর্ণের ভিত্তিরূপে জাতির (জন্ম) বিরুদ্ধে যুক্তি বিস্তার করেছিলেন,[৫২২] তখনই কিছু সংস্কারমূলক ভাবাদর্শ, বিশেষত বৈষ্ণবধর্ম শূদ্রের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে ধর্মীয় সমতা এনে দিয়েছিল। বৈষ্ণবধর্ম পরাকাষ্ঠা লাভ করে গুপ্ত যুগে, যখন অসংখ্য প্রত্নলেখ, মুদ্রা ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। শুধু উত্তর ভারতে নয়, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অংশও এই ধর্মের অনুপম প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।[৫২৩] 'মহাভারতে'র বিভিন্ন নীতিমূলক অংশে এই ধর্মসম্প্রদায়ের তত্ত্ব বিস্তার করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায়, প্রাচীন সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো বৈষ্ণবধর্ম শূদ্র অস্পৃশ্যদের দূরে সরিয়ে রাখেনি, বরং তাঁদের প্রতি ঈশ্বর ও মোক্ষলাভের সুযোগ প্রসারিত করেছিল।[৫২৪] নারী ও শূদ্ররা কৃষ্ণ, নারায়ণ ও বাসুদেব উপাসনা করে মুক্তি পেতে পারেন—এ-বিষয়ে বৈষ্ণবশাস্ত্রে সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[৫২৫] তাঁর প্রতি নিষ্ঠা থাকলে ব্রাহ্মণ থেকে শ্বপাক পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী শুদ্ধ হবে—ভগবান এইরকম দাবি করেছেন বলে দেখানো হয়েছে।[৫২৬] অন্যান্য গুণে ভূষিত কিন্তু অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণের চেয়ে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ও ভক্ত শ্বপাক ভগবানের কাছে প্রিয়তর বলে গণ্য হন।[৫২৭] নীচকুলজাত ব্যক্তি যদি একবার মাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন তাহলেই তিনি বন্ধনমুক্ত হন।[৫২৮] ''ধার্মিক শূদ্রকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বিশ্বের প্রদীপ্ত বিষ্ণু অর্থাৎ জগতের প্রধান

৫২০. বজ্রসূচি (BB), পৃ ৭। ৫২১. ঐ (O), পৃ ৪।

৫২২. ঐ (EE) ও GI), পৃ ৮ ও ৯।

৫২৩. কে. জি. গোস্বামী, "বৈষ্ণবিজম", 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি", ৩১, পৃ ১৩২।

৫২৪. রায়চৌধুরী, 'দি আর্লি হিস্ট্রি অফ দ বৈষ্ণব সেক্ট', পৃ ১১৭।

৫২৫. ভগবদ্‌গীতা ৯।৩২ ; ভাগবত পুরাণ ৭।৭।৫৪-৫৬ ; ১১।৫।৪।

৫২৬. ভাগবত পুরাণ ৩।১৬।৬। ৫২৭. ঐ, ৩।৩৩।৭।

৫২৮. ঐ, ৫।১।৩৫ ; তুলনীয় : আশ্বমেধিকপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১১৭।২।

রূপে গণ্য করেন”—এমনও বলা হয়েছে।[৫২৯] বিষ্ণুর শূদ্র ভক্তকে যাঁরা উপেক্ষা করেন তাঁরা কোটি বছর নরকে পতিত হন।[৫৩০] অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এমনকি বিষ্ণুর চণ্ডাল ভক্তকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়।[৫৩১] বিষ্ণুভক্তির মাধ্যমে রাজন্য অর্জন করেন জয়, ব্রাহ্মণ বিদ্যা, বৈশ্য সম্পদ ও শূদ্র পান সুখ।[৫৩২]

চার বর্ণের প্রত্যেকের জন্য ঐ একই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যদি তাঁরা মহাদেবের উদ্দেশে (রচিত) স্তোত্র পাঠ করেন।[৫৩৩] ব্রাহ্মণদের থেকে দক্ষ-শিব সংঘর্ষের কাহিনী শুনলে বৈশ্য, নারী ও শূদ্র রুদ্রলোকে স্থান লাভ করেন।[৫৩৪] উচ্চতর তিন বর্ণের মতো শিবের শূদ্রভক্তকেও গণপতি-মর্যাদা লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—যদি তিনি পানাসক্ত না হন।[৫৩৫] অতএব, দেখা যায় শৈবধর্মেও শূদ্রদের ছিল সমান প্রবেশাধিকার।

বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্ম—এই দুয়ের সঙ্গে যুক্ত তন্ত্রেও ধর্ম বিষয়ে বর্ণভেদ স্বীকার করা হয়নি। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের একটি তন্ত্রগ্রন্থ ‘জয়াখ্য-সংহিতা’য়[৫৩৬] চার বর্ণের প্রত্যেককেই দীক্ষিত হবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এই দীক্ষা ব্রাহ্মণের মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।[৫৩৭] ব্রাহ্মণ না-পাওয়া গেলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের যোগ্য ব্যক্তিরা তাঁদের নিজ নিজ শ্রেণীর, বা নিম্নতর শ্রেণীর লোকের দীক্ষাগুরু হতে পারেন।[৫৩৮]

গুপ্ত যুগে শাসক শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের ও কিছু পরিমাণে শৈবধর্মের

৫২৯. বৈদেহকং শূদ্রমুদাহরন্তি দ্বিজা মহারাজ শ্রুতোপপন্নাঃ।
অহং হি পশ্যামি নরেন্দ্র দেবং বিশ্বস্য বিষ্ণুং জগতঃ প্রধানম্।
শান্তিপর্ব (কলকাতা সংস্করণ) ২৯৬।২৮।
শূদ্রের বিশেষণ হিসেবে ‘বৈদেহক’ পদটির ব্যবহার থেকে দেখা যায়, বণিকদের মর্যাদা হানি ঘটেছিল।

৫৩০, আশ্বমেধিকপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১১৬।২১। ৫৩১. ঐ, ১১৬।২২।

৫৩২. ঐ, ১১৬।৩১।

৫৩৩. অনুশাসনপর্ব (উত্তরী পাঠ) ১৮।৮১, (দক্ষিণী পাঠ) ৪৯।৮১।

৫৩৪. বায়ু পুরাণ ১।৩০।১৮।

৫৩৫ ঐ, ২।৩৯।৩৫২-৫৪। বায়ু পুরাণের একটি পরিশিষ্টের অন্তর্গত কাহিনীতে মন্থ নামক এক নাপিত বারাণসীতে গণেশ ক্ষেমক-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। পার্জিটার, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮।

৫৩৬. প্রত্নলিপিগত কারণে এই গ্রন্থটিকে ৪৫০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাখা হয়। বি. ভট্টাচার্য, জয়াখ্য-সংহিতা, প্রাক্‌কথন, পৃ ৩৪।

৫৩৭. জয়াখ্য-সংহিতা, ১৮।৩১৫।

৫৩৮. সু (স?) জাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহাধিয়া।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্যৌ শূদ্রস্য সর্বদা॥ ঐ, ৬-৯।

অনুগামীর সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু নিম্নবর্গের মধ্যে এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রভাবের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করার কোন উপায় নেই বললেই চলে। প্রস্তাব করা হয়েছে যে, বৈশালীতে হস্তশিল্পী শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, কারণ দুজন কারুশিল্পীর ( 'কুলিক' ) নাম ছিল 'হরি'।[৫৩৯] অন্যত্রও এমন হয়ে থাকতে পারে।

বিভিন্ন সংস্কারমূলক প্রভাবে এই যুগের ধর্মশাস্ত্রে আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার পালনের পরিবর্তে গুরুত্ব পায় সদাচার ( 'শীল' ) যা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। বলা হয়েছে, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান বা বেদজ্ঞান দুইই নিষ্ফল,[৫৪০] কারণ দেবতারা সন্তুষ্ট হন সদাচারেই, যে ব্রাহ্মণ শীল রক্ষা করেন না তাঁকে শূদ্ররূপে গণ্য করা উচিত।[৫৪১] শীল বর্জিত ব্যক্তি সম্মানীয় নন, বরঞ্চ ধার্মিক শূদ্রও সম্মানার্হ।[৫৪২] শূদ্র যে 'অসংস্কৃত' দ্বিজে পরিণত হতে পারেন তা-ই নয়, যদি তিনি "শুদ্ধহৃদয় ও সংযতেন্দ্রিয়"[৫৪৩] হন, তবে তিনি সংস্কৃত ব্যক্তির মতোই পূজ্য। কারণ, একমাত্র শীলই মানুষকে সংস্কৃত করে—"জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা বা সন্ততি কিছুই তা পারে না।"[৫৪৪] সদাচারী শূদ্রও যে পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারেন এই যুক্তি 'মহাভারত' ও পুরাণের নীতিমূলক অংশে[৫৪৫] বারবার উপস্থাপিত হয়েছে এবং 'ব্রজসূচি'তে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।[৫৪৬]

৫৩৯. কে জি. গোস্বামী, 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল কোয়ার্টার্লি", ৩১, পৃ ১২৫।

৫৪০ কয়েকটি ব্যবস্থায় অবশ্য আচার পালনের উপযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষত ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে। তিনি যদি মন্ত্রপাঠ বা অগ্নিহোত্র না করেন, ও বণিক বা কৃষকের বৃত্তি গ্রহণ করেন, তিনি শূদ্র বা বৃষলের পর্যায়ে পতিত হন। অনুশাসনপর্ব ( উত্তরী পাঠ ) ১০৪।১৯-২০ ; ( দক্ষিণী পাঠ ) ১৬১।২০, ( দক্ষিণী পাঠ ) ২১৭।১০-১২ ; আশ্বমেধিকপর্ব ( দক্ষিণী পাঠ ) ১১৬।১১-১২ ; তুলনীয় : শান্তিপর্ব ১২।৬৩।৩-৫ ; ধর্মীয় আচার ও সংস্কার, যেমন, অগ্ন্যাধান, উপনয়ন, ব্রত ইত্যাদি পালন না করলে এবং অমেধ্য লোকের কর্মে নিযুক্ত হলে তথা শূদ্রযাজী হলে ব্রাহ্মণের পক্ষে সেগুলো উপপাতক রূপে গণ্য হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৩৪-৪২।

৫৪১ আশ্বমেধিকপর্ব ( দক্ষিণী পাঠ ) ১১৬।৫-৬।

৫৪২. অনুশাসনপর্ব ( উত্তরী পাঠ ) ৪৮।৪৮, ( দক্ষিণী পাঠ ) ৮৩।৪৭।

৫৪৩ যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।।

বনপর্ব ( কলকাতা সংস্করণ ) ২১৫।১৩।

৫৪৪. ...ন যোনির্নাপিসংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ...। অনুশাসনপর্ব ( কলকাতা সংস্করণ ) ১৪৩।৪৬-৫০। তুলনীয় ' বনপর্ব ( কলকাতা সংস্করণ ) ১৮১।৪২-৪৩।

৫৪৫. অনুশাসনপর্ব ( কলকাতা সং ) ১৪৩।৫১ ; শান্তিপর্ব ( কলকাতা সং ) ১৮৯।৮ ; বনপর্ব ( কলকাতা সং ) ১৮০।২৫-২৬। তুলনীয় : ঐ, ১৮০।৩৫-৩৬ ; ভবিষ্য পুরাণ ১।৪৪।৩১ ; তুলনীয় : ভাগবত পুরাণ ৭।১১।৩৫।

৫৪৬. বজ্রসূচি (KK), শ্লোক ৪৩. পৃ ১০।

এই তত্ত্বের সমর্থনে যথোপযুক্ত উপাখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। "বনপর্বে" ব্রাহ্মণ ঋষি কৌশিকের কাহিনী আছে। বিভিন্ন বর্ণের কর্তব্য ও তাদের অনুসরণীয় নৈতিক আচরণবিধি তিনি শিখেছিলেন এক ধর্মজ্ঞ ব্যাধের কাছে।[৫৪৭] মিথিলার 'ধর্মব্যাধ' দাবি করেছেন, তিনি অগ্রজ ও গুরুজনদের সেবা করেছেন, সদা সত্য বলেছেন, কখনও কাউকে ঈর্ষা করেননি, সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেছেন এবং দেবতা, অতিথি ও আশ্রিতদের সেবা করার পর যা অবশিষ্ট ছিল তা-ই দিয়ে জীবনধারণ করেছেন। তিনি কখনও কারও নিন্দা করেননি ও কাউকে ঘৃণা করেননি।[৫৪৮] বলা হয় যে এই কাহিনীটি বৌদ্ধমতের,[৫৪৯] কিন্তু ব্যাধের বক্তব্যের সুরের সঙ্গে বৈষ্ণবমতের বেশ সঙ্গতি আছে এবং সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এটি এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্যাস, কৌশিক, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ—প্রত্যেকেই নীচকুলজাত কিন্তু এই পৃথিবীতে তাঁদের আচরণের ফলে তাঁরা ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হন[৫৫০]—'বজ্রসূচি'র এই বৌদ্ধ যুক্তিও স্পষ্টতই পুরাণ-ধৃত প্রাচীন পরম্পরা থেকে গৃহীত।

কিন্তু সংস্কারমূলক ধর্মসম্প্রদায়সমূহের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করা অনুচিত। বর্ণবিভক্ত সমাজের ভিত্তিকে রক্ষা করার জন্য শাসকশ্রেণী বৈষ্ণব-ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন। বৈশ্য, নারী ও শূদ্রদের নীচকুলজাত বলে ধিক্কার জানানো হয়েছে।[৫৫১] ঘোষণা করা হয়েছে যে, বিষ্ণুভক্তি ও দ্বিজসেবা ছাড়া আর কিছুই শূদ্রের মুক্তি এনে দেয় না।[৫৫২] এ হলো মোটামুটিভাবে কর্মতত্ত্ব এবং যে-বর্গে মানুষের জন্ম সেই অনুযায়ী কর্তব্যপালনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তায় সাধারণ বিশ্বাসের অনুসিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শের মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষদের এই মতবাদে বিশ্বাস করানো হয়েছিল বলে মনে হয়।[৫৫৩] 'মৃচ্ছকটিকে' শকটচালক তার প্রভুর আদেশ—বসন্তসেনাকে হত্যা করো—পালন করতে অস্বীকার করে এই কারণে যে, "ভাগ্যের যে-দোষে আজন্ম চাকর হয়েই কাটালাম তা আর বেশি কিনে বাড়াব না। তাই অকাজ এড়িয়ে চলব।"[৫৫৪] এ-ধরনের বিশ্বাস স্বভাবতই জনসাধারণকে

৫৪৭. বনপর্ব (কলকাতা সং) ২০৫।৪৪ : ২০৬।১০-২৫। ৫৪৮. ঐ, ২০৬।২০-২২।

৫৪৯ হোলৎসমান, 'নরেনৎসেহ্ন ব্যাশের', পৃ ৮৬, হপকিন্স, 'রিলিজিয়ন্স্ অফ ইণ্ডিয়া', পৃ ৪২৫-এ উদ্ধৃত।

৫৫০. বজ্রসূচি (G), শ্লোক ৯ ও ১০, পৃ ২, তুলনীয় (Y), শ্লোক ২৭, পৃ ৭।

৫৫১. গীতা ৯।৩২। এমনকি ধর্মব্যাধও বিশ্বাস করেন যে শূদ্রের জন্য সেবাই বিহিত (কর্ম শূদ্রে···)।

৫৫২. দ্বিজশুশ্রূষণং ধর্মঃ শূদ্রাণাং ভক্তিতো ময়ি···। আশ্বমেধিকপর্ব (দক্ষিণী পাঠ) ১১৮।১৫-১৬।

৫৫৩. মনু ৯।৩৩৫।

৫৫৪. জেণ ম্হি গব্ভদাশে বিণিম্মিদে ভাঅধেঅদোশেহিং। অহিঅং চ ন কীণিশ্শং তেণ অকজ্জং পলিহলামি। মৃচ্ছকটিক ৮।২৫ [ সুকুমারী ভট্টাচার্যের অনুবাদ উদ্ধৃত ]।

মানবিক কৃতকর্মের মধ্যেই তাঁদের দুর্দশার কারণ সন্ধান থেকে নিবৃত্ত করে।

স্মৃতি, মহাকাব্য ও পুরাণে যে অসংখ্য আচার, অনুষ্ঠান, ব্রত, উৎসব, সংস্কার ইত্যাদি দেখা যায় তাদের উৎপত্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা কঠিন। সেগুলো আহরণ করা হয়েছে বিবিধ উৎস থেকে, যেমন প্রাচীন শাস্ত্র, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও অঞ্চল, এবং নানান কারুশিল্প ও কৃষিকর্মের রীতি। এসব আচার-অনুষ্ঠানের অনেকক'টি আহৃত হয়েছে সংস্কারমূলক ধর্মসম্প্রদায়গুলোর থেকে। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে ক্রমবর্ধমান কৃষকবর্গের বেশ একটি বড় অংশকে 'হিন্দু' পরিসীমার মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল, যাতে এসব আচার-অনুষ্ঠান তাঁরা পালন করতে পারেন, সংস্কৃতিগতভাবে সমন্বিত হতে পারেন ও তাঁদের নারীরাও তা মেনে চলতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে এই যুগে বিভিন্ন স্মার্ত রচনায় আচারগুলোকে আরও ভালোভাবে স্বীকৃত, ব্রাহ্মণ্যীকৃত, বিধিবদ্ধ ও সংহত করা হয়। গৃহ্যসূত্রে নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান প্রাগ্‌-মৌর্য যুগের মতোই প্রাচীন এবং শুধু দ্বিজদের জন্যই উদ্দিষ্ট। স্মরণ করা যায় যে পরবর্তী বৈদিক যুগে শূদ্রের কিছু ধর্মীয় অধিকার ছিল। সেগুলো তাঁরা আর্য জনগোষ্ঠীর আদি সভ্যরূপে ভোগ করতেন। জনগোষ্ঠীয় উপাদান দুর্বল হয়ে পড়া এবং দাস, গৃহভৃত্য, কৃষিশ্রমিক ইত্যাদি শূদ্র হিসেবে অভিহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এসব অধিকার হারিয়েছিলেন। এখন গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বেশ কিছু শূদ্রের কৃষকে পরিণত হওয়া বা তার বিপরীত ক্রিয়ার ফলে বৈশ্যসহ উচ্চবর্ণরা যে কয়েকটি অধিকার ভোগ করতেন সেগুলো তাঁদের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হলো। এ-ছাড়াও ভূমি-অনুদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শূদ্র-পরিসীমায় আনীত আদিম কৃষক-গোষ্ঠীর বিভিন্ন আচরণকেও সর্বাত্মক ব্রাহ্মণ্যপ্রথার অঙ্গীভূত করে সম্মানার্হ করা হয়েছে। সে যাই হোক, একদিকে বেদোত্তর যুগে শূদ্রদের উপর বিভিন্ন ধর্মীয় নিষেধ আরোপ আর অন্যদিকে খৃস্টীয় শতকের শুরুতে তাঁদের নানান ধর্মীয় অধিকার প্রদান ও আদি মধ্যযুগে সেগুলির পরিধি ও অন্তর্বস্তুর প্রসার—এই দুয়ের মধ্যে এক তীব্র বৈপরীত্য চোখে পড়ে। আমাদের মতে, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থানের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সূত্রেই এই বৈপরীত্য ব্যাখ্যা করা যায়।

কিন্তু গুপ্ত যুগে শূদ্রদের ধর্মীয় অধিকার যে প্রসারিত করা হয়েছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকটি অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাঁদের তিন উচ্চবর্ণের মানুষদের সঙ্গে একই স্তরে স্থাপন করা হয়। বলা হয়েছে যে, আত্মস্বার্থেই ব্রাহ্মণরা চেয়েছিলেন যেন জনগণের একটি বড় অংশ ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন,[৫৫৫] এবং তার ফলে শূদ্রদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগেও হয়তো ব্রাহ্মণদের এই একই ধরনের আত্মস্বার্থ ছিল,

৫৫৫. ঘুরে, 'কাস্ট অ্যান্ড ক্লাশ', পৃ ৯৫।

যদিও তখন এ-জাতীয় পরিবর্তনের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। শূদ্রদের ধর্মীয় অধিকার বিস্তৃতির কারণ বোধহয় তাঁদের ঐহিক অবস্থার উন্নতি, যার ফলে তাঁরা পুরোহিতদের অর্থ দিয়ে সংস্কার ও যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করতে পারতেন। সঠিকভাবেই বিশ্বাস করা হতো যে, যজ্ঞসামর্থ্যের সঙ্গে অর্থসামর্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।[৫৫৬] মোটামুটি বলতে গেলে, গুপ্ত যুগে শূদ্রদের ধর্মীয় অবস্থার বিকাশের সঙ্গে মধ্য রাজত্বের শুরুতে মিশরে যা হয়েছিল তার তুলনা করা যায়। এই সময়ে মিশরে কিছু পারলৌকিক কৃত্য (এতদিন যা ফারাও অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল) জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করা হয়।[৫৫৭] কিন্তু এর সঙ্গে তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির যোগ ছিল।[৫৫৮] গুপ্ত যুগে শূদ্রদের অবস্থার ক্ষেত্রেও এটি সত্য বলে মনে হয়।

গুপ্ত যুগে শূদ্রদের মর্যাদার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন চোখে পড়ে। ভাড়া-করা শ্রমিক, হস্তশিল্পী ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার বেতনহার বৃদ্ধি ছাড়াও দাস ও ভাড়া-করা শ্রমিকরা ক্রমশ ভাগচাষী ও কৃষকে পরিণত হচ্ছিলেন। এই পরিবর্তন ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয় শূদ্রদের রাজনৈতিক ও বিধিগত অবস্থানে। শূদ্র মন্ত্রী নিয়োগের সপক্ষে "শান্তিপর্বে"র সতর্ক-বাণীর[৫৫৯] উপর হয়তো গুরুত্ব না-দিলেও চলে, কিন্তু হস্তশিল্পীদের বৃত্তি-গোষ্ঠীর প্রধানরা নিঃসন্দেহে জেলার প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আপৎকালে শূদ্রদের অস্ত্রধারণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বর্ণগত বিধিনিষেধের কঠোরতা লাঘব করা হয় এবং শূদ্রদের বিরুদ্ধে কিছু নির্মম ব্যবস্থা সম্ভবত রদ হয়। তাঁদের বিভিন্ন ধর্মীয় অধিকারেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটে। অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সামাজিক অবনমন হয়েছিল। এঁদের শুধু তত্ত্বগতভাবেই শূদ্ররূপে গণ্য করা হতো, কিন্তু কার্যত সব ব্যাপারেই তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছিল একটি পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে। গুপ্ত যুগে শূদ্রদের অন্যান্য অংশও সামাজিকভাবে অবনমিত হয়েছিলেন—এমন ভাবলে কিন্তু ভুল হবে।[৫৬০] খাদ্য ও বিবাহ সংক্রান্ত প্রথায় এ-বিষয়ে কোন নিদর্শন নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে শূদ্রদের নিশ্চিতভাবে মহাকাব্য ও পুরাণ শোনার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কখনও কখনও এমনকি বেদ শোনারও। সামগ্রিক-ভাবে বিবেচনা করলে, গুপ্ত যুগে শূদ্রদের অবস্থানের বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিধিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনকে এই সম্প্রদায়ের মর্যাদাগত রূপান্তরের নিদর্শন রূপে গণ্য করা যায়।

৫৫৬. অনুশাসনপর্ব (দাক্ষিণী পাঠ) ১৬৪।২-৩, (উত্তরী পাঠ) ১০৭।২-৩।

৫৫৭. মারে, 'দ স্প্লেণ্ডর দ্যাট ওয়াজ ইজিপ্ট', পৃ ১৮৫।

৫৫৮. মোরেট ও ডেভি, 'ফ্রম ট্রাইব টু এম্পায়ার', পৃ ২২২।

৫৫৯. শান্তিপর্ব ৮৫।৭-১০।

৫৬০. ঘুরে যেমন মনে করেন। তাঁর মতে ৩০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১০০০ খৃস্টাব্দ পর্বে শূদ্ররা সামাজিকভাবে আরও অবনমিত হয়ে গিয়েছিলেন ('কাস্ট অ্যান্ড রেস', পৃ ৯৪)।

## অষ্টম অধ্যায়

# পরিবর্তন ও পরম্পরা

শূদ্রদের সর্বপ্রথম আবির্ভাব থেকে প্রায় ৬০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের ইতিহাসের পর্যায়গুলো মোটামুটি নির্দেশ করা যায়। প্রাচীন বৈদিক সমাজ ছিল প্রধানত পশুপালন-ভিত্তিক। সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেছিল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় উপাদান। 'ঋগ্বেদে'র আদি অংশেও হস্তশিল্পী, কৃষিজীবী, পুরোহিত ও যোদ্ধাদের দেখা পাওয়া যায়, তবু আর্যদের সমাজ ছিল মূলত জনগোষ্ঠীয়, পশুপালন-ভিত্তিক ও সমাধিকার-মূলক। যুদ্ধে লুণ্ঠন ও গবাদি পশুই ছিল সম্পদের প্রধান রূপ। একটি সুদৃঢ় খাদ্য-উৎপাদনকারী অর্থনীতি না-থাকায় তাঁরা পুরোহিত ও যোদ্ধাদের সম্পূর্ণ ভরণপোষণ করার মতো উদ্‌বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারতেন না। বয়স, বরিষ্ঠতা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলির ভিত্তিতে বিভিন্ন মর্যাদার আসন হয়তো ছিল, কিন্তু সামাজিক উদ্‌বৃত্তের শোষণমূলক কোন উচ্চ সামাজিক শ্রেণী ছিল না। অতএব এটি ছিল প্রাক্‌-শ্রেণীসমাজ এবং এই অবস্থায় শূদ্ররূপে সেবকবর্গ গঠনের কোন সুযোগ ছিল না বললেই হয়। রাজা ও পুরোহিতদের গৃহকর্মের জন্য দাসী থাকতেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি না-ও হতে পারে। 'ঋগ্বেদে'র উপান্তপর্বে আর্যদের পরাজিত ও পরিচ্যুত অংশ এবং বিভিন্ন অনার্য জনগোষ্ঠী শূদ্রে পরিণত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। জনগোষ্ঠীগুলোর নিজেদের মধ্যে ও অন্যান্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ শূদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু গাঙ্গেয় অববাহিকায় পশুপালন-ভিত্তিক সমাজ কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হওয়ার ফলেই তাঁদের সংখ্যা বাড়ে। কৃষির নানান কাজে শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল, তাঁদের অনেকেই ছিলেন "আর্য" পুরোহিত, রাজা ও কৃষকদের দীন জ্ঞাতি। যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যায় শূদ্র আদিতে আর্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তাই পরবর্তী বৈদিক সমাজে তাঁদের কয়েকটি জনগোষ্ঠীয় অধিকার, বিশেষত ধর্মীয় অধিকার, অক্ষুণ্ণ ছিল। (সবাই) একই জনগোষ্ঠীভুক্ত—এই কল্পকথার ভিত্তিতে এসব অধিকার হয়তো অনার্য শূদ্রদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। শূদ্ররা যে-কয়েকটি বৈদিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারতেন তার সঙ্গে পরবর্তী বৈদিক অর্থব্যবস্থার কিছু যোগ ছিল। এই অর্থব্যবস্থা খাদ্য-উৎপাদনকারী ও কৃষিভিত্তিক হলেও কৃষিগত কৃৎকৌশল ছিল আদিম ধরনের। লোহার ব্যবহার জানা ছিল, কিন্তু তা প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকত যুদ্ধেই। ভূমিকে আবাদযোগ্য করার সমস্যা ছিল খুবই কঠিন, বহু শ্রমিকের সাহায্য-সাপেক্ষ এমন বড় বড় ভূখণ্ড গড়ে তোলা যায়নি। ফলত কৃষকরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশেষ কিছু উৎপাদন করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই

কর ও উপঢৌকন নিয়মিত সংগ্রহ করা যায়নি। একদিকে, যাঁরা পরিশ্রম ও উৎপন্ন করতেন ও অন্যদিকে, যাঁরা জীবনধারণ করতেন কৃষকদের শ্রম ও উৎপন্নের উপর পরজীবী ও ব্যবস্থাপকরূপে—এই দুধরনের মধ্যে প্রভেদও তীব্র হতে পারেনি। শ্রেণীসমাজের সূচনা তখনও ছিল দুর্বল, এই স্তরে শূদ্রের অবস্থান সুনির্দিষ্ট হয়নি।

খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হস্তশিল্প, বড় মাত্রায় আবাদযোগ্য জমি তৈরি করা ও ক্ষেতে কৃষিকর্মের জন্য লোহার যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। তখনই জনগোষ্ঠীয়, পশুপালন-ভিত্তিক ও সমাধিকার-মূলক বৈদিক সমাজকে পূর্ণ-বিকশিত কৃষিভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক সমাজবিন্যাসে রূপান্তরিত করার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয়। মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকার অরণ্য-প্রধান অঞ্চল একবার লৌহনির্মিত কুঠার দিয়ে মুক্ত করে লাঙলের লৌহফলার অধীনে নিয়ে আসার পর বসতি স্থাপনের জন্য অবারিত হয় পৃথিবীর এক উর্বরতম অংশ। সম্ভবত জনসমাজের জন্য কাজ করার বিনিময়ে তার প্রদত্ত দানের মাধ্যমে, বা নিজেরাই ছলচাতুরী করে, রাজা ও পুরোহিতরা বিস্তৃত ভূ-খণ্ড আত্ম-অধিকারে আনতে সমর্থ হন। সে-জমি তাঁরা নিজেরা চাষ করতে পারতেন না। এমনকি সাধারণ কৃষক পরিবারেও মাঝে মাঝে নিজেদের জমির জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হতো। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষি-সমাজে যখন বিভিন্ন পরিবার এমন সম্পদ অধিকার করেন যা তাঁরা নিজস্ব ক্ষমতায় উপভোগ করতে অক্ষম, তখন তাঁরা সাধারণত অস্ত্রবলে শ্রমশক্তি সংগ্রহ করেন[১] এবং বিধান ও প্রথার বলে তার যোগান অব্যাহত রাখেন। এর সঙ্গে তাঁরা যোগ করেন ধর্ম ও ভাবাদর্শগত বাধ্যবাধকতা। এসব বিভিন্ন বাধ্যতামূলক, বাহ্য ও ভাবাদর্শগত উপাদানকে বর্ণপ্রথা নামক একটি সামাজিক বিন্যাসে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিস্থাপিত করাই হলো প্রাচীন ভারতীয় সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। মগধ ও অন্যান্য শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এলাকা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ সামাজিক-ভাবে অধীনস্থ হন। কর ছাড়াও তাঁদের শ্রমক্ষমতা যোগান দিতে হতো। যেসব শ্রমজীবী মানুষ কর দিতেন না তাঁদের সম্ভবত রাখা হয়েছিল শূদ্র পর্যায়ে। একবার বল-প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রম অধিগত হওয়ার পর প্রথাটিকে নিয়মানুগ করার জন্য বিধিবিধান, ধর্ম ও ভাবাদর্শকে লাগানো হয় শাসক-বর্গের কাজে, শ্রম সরবরাহ যাতে অবিচ্ছিন্ন থাকে ও বৃদ্ধি পায়। ধর্মসূত্রে দ্বিজ ও শূদ্রের মধ্যে পরিষ্কার বিভেদ করা হয়েছে এই বলে যে শূদ্র রয়েছে উচ্চতর তিন বর্ণের শুশ্রূষার জন্য। ধর্মসূত্রে এই দুই ভাগের মধ্যে নানা সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি করা হযেছে। শূদ্রদের বৈদিক যজ্ঞ ও উপনয়নের বাইরে রাখা হয়। এগুলোকে আর্য বা দ্বিজের আচারগত লক্ষণরূপে গণ্য করা হতো। শূদ্রকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বিধিগত,

১. এম. আই. ফিনলি, 'দি এনশেণ্ট ইকনমি', পৃ ৬৬।

সামাজিক ও ধর্মীয় বাধানিষেধে ভারাক্রান্ত করা হয়। সৃষ্টিকর্তার পা থেকে শূদ্রের অতিকথামূলক উৎপত্তির ভিত্তিতে এই সবকিছুকেই ন্যায্য বলে প্রমাণ করা যেত। কিছু লোক আদেশ মানার জন্যই জন্মেছেন আর অন্যরা আদেশ করার জন্য—দাসত্বের সপক্ষে আরিস্ততল-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে এর মিল আছে। তিনি এও যোগ করেছেন, প্রথম ধরনের লোক হয় দাস, দ্বিতীয় ধরনের লোক নাগরিক।

শূদ্রকে দাসের সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখা হতো, যদিও শূদ্রদের একটিমাত্র অংশ বৈধভাবে দাস হয়ে থাকতে পারেন। সুতরাং হপকিন্স যা করেছেন, সে-ভাবে "শূদ্র" শব্দটিকে "দাস" ('স্লেভ') অনুবাদ[২] করা ঠিক নয়। অর্থের ব্যবহার থাকলেও দাসের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত মাত্রায়। জমির ব্যক্তিগত ব্যবহার তখনও গোষ্ঠী ও যৌথ পরিবারের বিভিন্ন অধিকারের নীচে চাপা পড়েছিল। যেসব গোষ্ঠী দিয়ে উচ্চতর বর্ণ গঠিত হয়েছিল তাঁরা যেমন একযোগে ভূসম্পত্তি স্বীয় অধিকারে রাখতেন, ঠিক তেমনিই জমিতে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের উপর অধিকার বজায় রাখতেন একযোগে। একইভাবে শূদ্রকে ভূমিদাস ( 'সাফ'' ) রূপে চিহ্নিত করা ঠিক নয় ( 'বৈদিক সূচি'তে যেমন করা হয়েছে[৩] ) কারণ ভূমি-দাসের অর্থ এমন এক ব্যক্তি যাঁর কাজ জমির সঙ্গে যুক্ত ও তার সঙ্গেই যিনি হস্তান্তরিত হন।

শূদ্রকে 'হেলট' বলা হয়েছে, কিন্তু কিছু সীমা আরোপ না-করে শূদ্রকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় না। 'হেলট'দের মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীতে নেওয়া যেত, কিন্তু সংখ্যাগত শক্তির কারণে একমাত্র কৌটিল্যই বৈশ্য ও শূদ্রদের ( সেনাবাহিনীতে ) নেওয়া পছন্দ করেছেন। মনু শূদ্রদের নিযুক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে—নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে তাঁরা অস্ত্রধারণ করতে পারেন এই ভয়ে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, 'হেলট'রা রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে থাকতেন, যে-রাষ্ট্র স্পার্টার নাগরিকবৃন্দের সঙ্গে অভিন্ন। শূদ্রদের গণ্য করা হতো উচ্চ তিন বর্ণ নিয়ে গঠিত দ্বিজদের অধীন রূপে। বৈশ্যদের ( যাঁরা প্রধানত ছিলেন কৃষক ) কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য করা যেত না। এছাড়াও স্পার্টার কৃষিজ উৎপাদন পরিচালনা করতেন মূলত দাসভাবাপন্ন শ্রেণীর 'হেলট'রা, ভারতে কিন্তু বৈশ্য নামক স্বাধীন কৃষকরা কৃষিতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'হেলট'-প্রথাকে অপরিণত দাসত্ব বলা হয়; এক অর্থে শূদ্রত্বকেও অপরিণত 'হেলট'-প্রথা বলা যায়। 'হেলট'দের মতো শূদ্ররা অত পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন না।

শূদ্রদের দাসত্বের প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। তাঁরা গৃহভৃত্য ও দাস, কৃষিতে

২ হপকিন্স, 'কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া', ১ম, পৃ ২৬৮।

৩. 'বৈদিক ইনডেক্স', ২য়, পৃ ৩৮৯।

নিযুক্ত দাস, ভাড়া-করা শ্রমিক এবং হস্তশিল্পীরূপে কাজ করতেন। শূদ্ররা গঠনমূলক প্রয়াসে অসমর্থ—এই বলে একজন লেখক তাঁদের নিন্দা করেছেন।[৪] কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-বিকাশের উপযোগী বস্তুগত ভিত্তির যোগান দিয়েছিল নিঃসন্দেহে শূদ্রদের দক্ষতা ও শ্রম এবং সেইসঙ্গে বৈশ্য কৃষকদের মাধ্যমে উৎপন্ন কৃষিজ উদ্‌বৃত্ত। এই অর্থে ঐ সমাজ ছিল বৈশ্য-শূদ্র সংস্থান।

কৃষিতে শূদ্র শ্রমিক নিয়োগের ধারাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছিয় মৌর্য যুগে। দাস, ভাড়া-করা শ্রমিক ও হস্তশিল্পীদের উপর রাষ্ট্র এর আগে বা পরে কখনও এত নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করেনি। এ-যুগে উৎপাদনের কাজে রাষ্ট্র প্রভূত পরিমাণে দাস ব্যবহার করত। তাঁদের সংগ্রহ করা হতো সম্ভবত সমাজের নিম্নতম বর্গ থেকে, যদিও কলিঙ্গ যুদ্ধ ও ঐ ধরনের অন্যান্য যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু দাসবর্গের উপর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের এক বিচ্ছিন্ন অধ্যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আর তা অনুসৃত হয়নি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' শূদ্রদের আর্যরূপে গণ্য করা হতো,[৫] ফলে তাঁদের দাসত্বে পর্যবসিত করা যায়নি—'অর্থশাস্ত্রে'র প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন অংশ গভীরভাবে পরীক্ষা করলে এই অভিমত গ্রাহ্য হয় না।[৬] আর বিচারব্যবস্থা পরিচালনায় বর্ণভেদ বিলোপের জন্য অশোকের প্রয়াস সম্ভবত ব্রাহ্মণদের বিরক্তির কারণ হয়েছিল, কিন্তু নিম্নবর্গের কোন উপকারে আসেনি।

মৌর্যোত্তর যুগ ( আনু. খৃপূ ২০০ - ৩০০ খৃস্টাব্দ ), বিশেষত খৃস্টীয় তৃতীয় শতক শূদ্রদের অবস্থানের ক্ষেত্রে এক গুরুতর পর্যায়ের সূচক। মনুর উগ্র শূদ্রবিরোধী ব্যবস্থাপত্র ও পুরাণে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী কার্যকলাপের জন্য শূদ্রদের নিন্দাবাদ এক তিক্ত সামাজিক সংঘর্ষ ও অস্থিরতার পর্বের ইঙ্গিত বহন করে। বিভিন্ন অ-ব্রাহ্মণ্য বিদেশী উপাদানের হস্তক্ষেপ ও কারুশিল্পীদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বোধহয় এই পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করে তুলেছিল। সম্ভবত মৌর্যদের শক্তিশালী রাষ্ট্রক্ষমতার বিলুপ্তি এবং নতুন কলাকৌশল ও হস্তশিল্পের উত্থানের ফলে শূদ্রদের অবস্থানগত পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ করা যায়। প্রথম দুটি খৃস্টীয় শতক ছিল হস্তশিল্প, বাণিজ্য, সোনা ও তামার মুদ্রা, বন্দর এবং দেশের অভ্যন্তরে নগরের যুগ। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে মৌর্য যুগ যেমন অনন্য ছিল, হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের বিষয়ে কুষাণ ও সাতবাহনদের যুগ ঠিক তেমনই ছিল বলে মনে হয়। প্রাচীন ইতিহাসের আর কোন যুগে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এত সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি। হস্তশিল্পীদের বৃত্তিগোষ্ঠীর

৪. বল্লবলকর, 'হিন্দু সোশ্যাল ইনস্টিট্যুশনস', পৃ ৩২৭-২৮।

৫. আর. পি. কঙ্গলে, 'দ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র', ২য় ভাগ, পৃ ২৭১ টী..১।

৬. অর্থশাস্ত্র ৩।১৩।

বিভিন্ন প্রত্নলেখমূলক তথ্য ও দান থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সমাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বৃত্তিগোষ্ঠীগুলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে ফলপ্রসূ কাজকর্ম করতে পারত। প্রচুর সংখ্যক নগরে হতে পারত গ্রামাঞ্চলের নিপীড়িত মানুষের জীবনধারণের বিকল্প উৎসের ব্যবস্থা। অন্যদিকে, কলিযুগ-বর্ণনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নিম্ন দুই বর্ণের মানুষ তাঁদের কর্তব্য পালন করতে অস্বীকৃত হওয়ায় এক সুদীর্ঘ সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংকটের সমাধান হয় বলপ্রয়োগ ও আপসনীতির মাধ্যমে। মনুর বিভিন্ন শূদ্রবিরোধী ব্যবস্থা বলপ্রয়োগের প্রতিফলন, কিন্তু তাঁদের কিছু সুবিধাও তিনি দিয়েছিলেন। শূদ্রদের কয়েকটি গৌণ ধর্মীয় অধিকার দেওয়া হয়।

গুপ্ত যুগে ( আনু. ৩০০ খৃস্টাব্দ - আনু. ৬০০ খৃস্টাব্দ ) শূদ্রেরা কিছু ধর্মীয় ও পৌর অধিকার অর্জন করেন, অনেক বিষয়ে তাঁদের বৈশ্যদের সঙ্গে একই আসনে বসানো হয়। বৈশ্য ও শূদ্রকে একত্র করার বিষয়টি পূর্ববর্তী রচনাদিতেও পাওয়া যায়, কিন্তু মৌর্যোত্তর ও গুপ্ত যুগে এর উল্লেখ আরও বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে গুপ্ত যুগে এটি এক নতুন তাৎপর্য বহন করে। আপাতদৃষ্টিতে বৈশ্যদের মর্যাদা দাসত্বের দিকে অবনীত করা হয় ও শূদ্রদের মর্যাদা উন্নীত হয় স্বাধীনতার দিকে। উন্নত অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অসংখ্য ভূমি-অনুদান[৭] প্রাচীন কৃষক ও রাজার মধ্যে একটি মধ্যশ্রেণী তৈরি করে। এর ফলে ঐ কৃষকদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এটি ছিল এক সুদীর্ঘ সামাজিক সংকটের পরিণাম যার ফলে বৈশ্য ও শূদ্রদের থেকে যথাক্রমে কর ও শ্রম সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়েছিল। ফলত ভূমি-অনুদানের মাধ্যমেই পুরোহিত ও প্রশাসকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হতো। অনুন্নত অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের ভূমি-অনুদানের ফলে শূদ্রদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, কারণ ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংগঠনে আদিবাসী কৃষকদের নিযুক্ত করা হয় শূদ্ররূপে। পূর্ববর্তী যুগে শূদ্রদের শুশ্রূষার অর্থ ছিল উচ্চতর বর্ণদের শ্রম সরবরাহ করা। কিন্তু গুপ্ত যুগ থেকে তাঁদের সেবা ও অধস্তন অবস্থার অর্থ হলো হস্তশিল্পী, বণিক ও বিশেষভাবে কৃষকরূপে উৎপন্নের অংশ সরবরাহ করা। তাঁদের দাসভাবের তত্ত্বগত অবস্থান তখনও অব্যাহত ছিল, কিন্তু তার ব্যবহারিক সারবস্তু বদলে গিয়েছিল। শূদ্রদের দাস, গৃহভৃত্য, কারুশিল্পী ও কৃষিশ্রমিক হওয়ায় অবশ্য কোন ছেদ পড়েনি, কিন্তু এখন তাঁদের বাহিনী গঠিত হলো প্রধানত কৃষক দিয়ে, যদিও তার প্রকৃতি ছিল দাসভাবাপন্ন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শূদ্রদের অবস্থান আমরা বিবেচনা করতে পারি,

৭. খৃ. পূ. প্রথম শতকে ভূমি দানের আদিতম প্রত্নলেখ প্রমাণ পাওয়া যায় ( সরকার, 'সিলেক্‌ট্‌ ইনস্ক্রিপশন্‌স্‌', ১ম, পৃ ১৯৮, প্রত্নলেখ নং ৮২, পঙ্‌ক্তি ১১ ), কিন্তু গুপ্ত যুগেই এ-জাতীয় ভূমিদান সুপ্রচলিত হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে দেখতে পারি তাঁদের সামাজিক ও আচার-অনুষ্ঠানগত মর্যাদা কী ছিল। আনু. খৃপূ ৫০০ - ২০০-য় তাঁদের উপর আরোপিত ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অধিকাংশই আনু. ৩০০ খৃস্টাব্দ অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল—যতদিন এই পর্যায় গঠিত ছিল দাস, হস্তশিল্পী, গৃহভৃত্য ও কৃষিশ্রমিক দিয়ে। কিন্তু যখন প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী কৃষক শূদ্রদের দলবৃদ্ধি করতে আরম্ভ করলেন, এবং কম দাসভাবাপন্ন কর্মীদের স্থান করে দিয়ে কৃষিজ উৎপাদনে দাস-উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেল, তখন ধর্মসূত্রে প্রদত্ত শূদ্রের সামাজিক ও আচারভিত্তিক মর্যাদার সঙ্গে উৎপাদন-কর্মে তাঁদের নতুন ভূমিকার আর কোন সঙ্গতি রইল না। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে শূদ্রদের প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় অধিকার প্রসারের মাধ্যমে ও তাঁদের এ-ধরনের আরও অধিকার দান করে ক্রমেই অপসারিত করা হলো এই কালব্যত্যয়কে। একই সঙ্গে বেশ কিছু জন-গোষ্ঠীর মানুষ ও হস্তশিল্পীদের অস্পৃশ্য বর্গে নিক্ষেপ করে শূদ্র সম্প্রদায়কে বিভক্ত রাখা হয়েছিল। যাঁরা প্রাচীন দাসসুলভ অবস্থাতেই থেকে গিয়ে-ছিলেন ও ক্রমবর্ধমান সংখ্যার অস্পৃশ্যেরা যাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা পরিচিত হলেন আচরণগত দিক দিয়ে 'অসৎ' বা অশুদ্ধ শূদ্ররূপে। তাঁদের ধর্মীয় বিধিরীতি সেই অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হলো। স্পষ্টতই কৃষিজীবী বর্ণসমূহ ও তাঁদের সঙ্গে কিছু হস্তশিল্পী যুক্ত হয়ে 'সৎ' বা বিশুদ্ধ শূদ্ররূপে পরিগণিত হলেন এবং কৃষিশ্রমিক ও হস্তশিল্পের নীচু পর্যায়ের বৃত্তিধারীরা হলেন 'অসৎ' শূদ্র বা মিশ্রবর্ণের ( 'সঙ্কর' ) প্রতিভূ। গুপ্ত বা গুপ্তোত্তর যুগের সামাজিক বিন্যাসকে এটি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে। মনুর একটি পরবর্তী অধ্যায়ে ষাটেরও বেশি সঙ্করবর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি-অনুদান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় যুক্ত অসংখ্য জনগোষ্ঠীকে শূদ্র-জাতিতে রূপান্তরিত করে একের পর এক বিজিত অঞ্চলকে সংহত করা হলো। আর এই পদ্ধতিই সঙ্করবর্ণগুলির উৎপত্তির কারণ। সংস্কৃতি-গতভাবে নিম্নতর পর্যায়ে অবস্থিত জনগোষ্ঠীয় মানুষদের অস্পৃশ্যে পরিণত করা হয়। তাঁদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে ওঠে ও চীনা পরিব্রাজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো পর্যাপ্ত অবস্থায় পৌঁছয়। গুপ্ত যুগের শেষ থেকে কারু-শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতির ফলে বিভিন্ন বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কারণ বৃত্তিগোষ্ঠীগুলো গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে ও অনড় বংশানুক্রমিক সংগঠনে পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

আলোচ্য যুগে শূদ্রদের অবস্থার পরিবর্তন তাঁদের মূল দাসসুলভ অবস্থানে কোন পরিবর্তন আনেনি। তাঁদের দাস বলে অভিহিত করা যেত না, কিন্তু তাঁরা কাজ করতেন দাসদের বিকল্প রূপে। মোটামুটি খৃপূ ৫০০ থেকে ৩০০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী পর্ব বাদ দিলে দাসরা উত্তর ভারতে উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিলেন না। অন্যদিকে শূদ্রেরা তাঁদের শ্রমক্ষমতা সরবরাহ করতেন প্রধানত এমন এক অর্থব্যবস্থায় যেখানে জমি, গবাদি পশু ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ উচ্চতর তিন বর্ণের কার্যকর

নিয়ন্ত্রণে ছিল, আর তাঁরাই ছিলেন কোন এক ধরনের আর্য নাগরিকবৃন্দ। দ্বিজদের নিয়ে গঠিত ভারতের প্রথম তিন সামাজিক অনুভাগ( 'এস্টেট')-কে অত্যন্ত স্থূলভাবে গ্রীস ও রোমের নাগরিকদের সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর শূদ্রদের সঙ্গে তাঁদের অ-নাগরিকদের। বর্ণপ্রথা শুধু সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের উপকরণই ছিল না, বরং আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, এ-প্রথা ছিল উৎপাদন ও বণ্টন চালিয়ে যাওয়ার এবং ফলত এইসব ধারার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্ককে পরিশাসনের এক প্রক্রিয়া। যাঁরা উৎপাদনের সঙ্গে প্রধানত ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন, তাঁদের পক্ষে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ও শ্রম আত্মসাৎ করার প্রক্রিয়া হিসেবে প্রাচীন ভারতের বর্ণপ্রথা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ধ্রুপদী যুগের নাগরিকত্ব প্রথার মতো মোটামুটি একই উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। গ্রীস ও রোমে নাগরিকত্ব প্রকল্প যে-বৈধতা পেয়েছিল, ধর্মশাস্ত্র থেকে বর্ণপ্রথাও পেয়েছিল সেই বৈধতা। কিন্তু দুটি প্রভেদ ছিল। প্রথমত, বর্ণপ্রথাকে একটি ধর্মীয় আচ্ছাদনের মধ্যে রেখে উপস্থাপিত করা হয় আর নাগরিকত্ব প্রথার ছিল প্রধানত এক রাজনৈতিক-আইনগত আচ্ছাদন। দ্বিতীয়ত, বৈশ্যরা "নাগরিক" হলেও গুপ্ত যুগ অবধি তাঁরা ছিলেন প্রধান করদাতা। ফলে তাঁদের কাজ করতে হতো প্রাথমিক স্তরের উৎপাদক রূপে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ধ্রুপদী যুগের সামাজিক গঠন ভারতীয় ( সমাজ- ) ব্যবস্থার মতো উৎপাদনশীল নাগরিকদের এক বিশাল অংশের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখেনি। সে-যুগে ধনী ও দরিদ্র নাগরিক এবং অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে সর্বক্ষণ যে প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা ও সংঘর্ষ প্রবহমান ছিল তাকে অবশ্য অগ্রাহ্য করা হচ্ছে না। ভারতীয় কাঠামোয় আর্য নাগরিকবৃন্দের সংগঠনে প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা ও সংঘর্ষের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, শূদ্র সম্প্রদায়কে বৈশ্য কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ক্ষেত্রে দ্বিজের অতিকথাকে অনেকদিন ধরে সফলভাবে লালন করা হয়েছিল। খৃস্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ সম্ভবত এক সামাজিক সংকটের ফলে তাঁদের দাসসুলভ অবস্থার প্রকৃতিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু দাসত্বের উপাদান থেকেই গিয়েছিল। দাস, হস্তশিল্পী ও কৃষিশ্রমিক রূপে শূদ্ররা অনেকদিন ধরে উদ্বৃত্ত শ্রমের যোগান দিতেন, গুপ্ত যুগ থেকে তাঁরা কৃষক হিসেবে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন সরবরাহ করতেন এবং মাঝে মাঝে বাধ্যতা-মূলক শ্রম দিয়ে তার অনুপূরণ করা হতো। প্রাচীন ভারতের সামাজিক বিন্যাসের ভিত্তি যেহেতু বৈশ্যের কর ও শূদ্রের শ্রম, একে তাই বৈশ্য-শূদ্র সমাজ নামে অভিহিত করা যায়; কিন্তু ভাবাদর্শ ও আচারগত দৃষ্টিকোণ থেকে একে ব্রাহ্মণ্য সমাজও বলা চলে।

শূদ্র জনগণের দাসসুলভ অবস্থান ও শোচনীয় অবস্থা সত্ত্বেও, বিশেষভাবে প্রাগ্-গুপ্ত যুগে, খৃস্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে তাঁদের সশস্ত্র ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখ ছাড়া শূদ্র বিদ্রোহের কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন নেই বললেই হয়। 'মহাভারত' ও পুরাণে কলিযুগ ও অরাজকতার বর্ণনার

কেন্দ্রবিন্দু হলো সামাজিক বিপর্যয় ও বর্ণসংকর। ব্রাহ্মণদের প্রতি শূদ্র বৈরিতার বহিঃপ্রকাশও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এগুলোকে শূদ্র বিদ্রোহের প্রতিধ্বনি হিসেবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু তাদের সঠিক কাল ও স্থান নির্ধারণ করা যায় না। রোমের দাস-বিদ্রোহের তুলনায় সময়ে সময়ে শূদ্রদের বিক্ষিপ্ত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ ছিল নগণ্য। 'জনপদকোপ'[৮] ও 'প্রকৃতি-কোপ'[৯] নামে পরিচিত জনগণের ক্রোধে শূদ্রদের হয়তো কিছু অবদান ছিল। প্রস্তাব করা হয়েছে, নীচু পর্যায়ের বৈশ্যরা মধ্যশ্রেণী ('পেতি বুর্জোয়াজি') গঠন করেছিলেন, শূদ্র ও দ্বিজ শ্রেণীর মধ্যে সেটি ভারসাম্য রক্ষা করেছিল।[১০] দ্বিজশ্রেণীসমূহ—এই পদ প্রয়োগ যথার্থ নয়, কারণ বৈশ্য-দেরও ঐভাবেই (দ্বিজ রূপে) গণ্য করা হতো, কিন্তু একদিকে প্রথম দুই বর্ণ ও অন্যদিকে শূদ্রদের মধ্যে বৈশ্যদের স্থিতিশীল ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করার বিষয়টিও কেবল খৃস্টীয় যুগের সূচনার আগেই সত্য হতে পারে, কারণ মোটামুটিভাবে সেই সময় থেকে দুই নীচু বর্ণ পরস্পরের সমান হতে আরম্ভ করে ও কার্যত গুপ্ত যুগে তাঁরা তাদের স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে শূদ্রদের অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ব্যাখ্যা করার জন্য অবশ্য অন্যান্য কারণ প্রস্তাব করা যায়। মনে হয়, গ্রীস[১১] ও রোমের মতো ভারতে মুদ্রা-অর্থনীতি অত উন্নত হয়নি। ফলে শূদ্রদের তত্ত্বগত দাসত্ব সত্ত্বেও তাঁদের অল্প কয়েকজনকেই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই দাসত্বে পর্যবসিত করা যেত—যা ছিল গ্রীসে দাসপ্রথার এক মুখ্য উৎস।[১২] প্রাগ্‌-মৌর্য ও মৌর্য যুগ বাদে কৃষিতে দাস নিয়োগের কোন প্রমাণ নেই। দাসত্ব ছিল প্রধানত গৃহকর্মের সঙ্গে জড়িত। সেখানে প্রভুর সঙ্গে দাসদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল এবং দাসরা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত কোন শ্রেণী গঠন করেননি। তাঁরা ছিলেন শুধু গৃহস্থালীর সোপানের নিম্নতম ধাপ।

নিপীড়নের ক্ষেত্রে শূদ্র শ্রমিকরা হয়তো স্বাধীন জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন[১৩] বা দেশান্তরী হয়েছিলেন। নিপীড়িতরা নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন বলে মনে হয়। বিদ্রোহ বা সক্রিয় প্রতি-রোধের কোন নিদর্শন নেই বললেই চলে। এছাড়াও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের তুলনায় শূদ্ররা প্রভুদের বিরুদ্ধে মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে সমর্থ কোন

৮. অর্থশাস্ত্র ১।১৩।

৯. ঐ, ৫।৬, ৭।৬। এভা রিচ এ-বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র (চতুর্থ বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলন, ভাইমার ১৯৭৯) উপস্থিত করেছিলেন।

১০. বসু, পূর্বোক্ত, ২য়, পৃ ৪৮৬-৮৭।

১১. তুলনীয়: টমসন, 'স্টাডিজ ইন এনশেণ্ট গ্রীক সোসাইটি', ২য়, পৃ ১৯৪-৯৬।

১২. তুলনীয়: খৃপূ. ষষ্ঠ শতকের সূচনায় সোলোন-এর ঋণ বিধি।

১৩. জাতক-এর একটি কাহিনীতে পাঞ্চাল রাজ্য ছেড়ে নিপীড়িত প্রজাদের চলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

সুসংগঠিত, সংবদ্ধ সম্প্রদায় ছিলেন না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অসম সামাজিক অবস্থানসম্পন্ন বহুসংখ্যক উপ-বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অসংখ্য জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ফলে তাঁদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। প্রস্তাব করা হয়েছে যে বিভিন্ন কারুশিল্পী, যেমন মালাকার, কুম্ভকার, গৃহনির্মাতা, তন্তুবায়, বস্ত্রকার, বর্ণকার ইত্যাদিকে 'অমরকোষে' মোটামুটিভাবে অধঃক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।[১৪] প্রতিলোমের মাধ্যমে সঙ্কর জাতির উৎপত্তির তত্ত্বটিকে অবনমিত শূদ্রজাতিসমূহের স্তর তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে চতুরভাবে। শুদ্ধতা ও অশুচিতার ধারণায় এঁরা পরস্পরের থেকে পৃথক্।[১৫] এর ফলে তাঁদের পক্ষে একটি সর্বগ্রাহ্য ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। 'সৎ' ও 'অসৎ' শূদ্রের মধ্যে বিভাজন গুপ্ত যুগে লক্ষণীয় হয়ে উঠে।

শূদ্রদের মধ্যে গৃহভৃত্য, ভাগচাষী, পশুপালক ও ক্ষৌরকারদের সামাজিক পরিমাপে অন্যান্য ধরনের শূদ্রদের চেয়ে নিঃসন্দেহে উচ্চতর বলে গণ্য করা হতো, কারণ এমনকি ব্রাহ্মণ প্রভুরাও তাঁদের খাদ্য গ্রহণ করতে পারতেন।[১৬] শূদ্র ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিভক্ত হওয়াই ছিল নিম্নবর্গের আরও বড় দুর্বলতা। এই বিভাগ প্রথম দেখা দেয় পাণিনির সময়ে। পরবর্তীকালেও তা বহাল থাকে এবং গুপ্ত যুগে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। উচ্চ বর্ণের সঙ্গে সমান হওয়া ছাড়াও শূদ্ররা অস্পৃশ্যদের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েও মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। অতএব তাঁদের চেয়ে নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ থাকার ফলে ব্রাহ্মণ্য স্তরবিন্যাসে তাঁরা আত্মগৌরবের ভাব তুষ্ট করে থাকতে পারেন।

আর যদি কোন কারণে অসন্তুষ্ট শূদ্ররা অস্ত্রধারণ করেন, তার জন্য ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতারা তাঁদের নিরস্ত্র রাখার এক সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন যেটি সম্ভবত গুপ্ত যুগে পরিমার্জিত করা হয়।

বর্ণপ্রথার বিভিন্ন মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা ও সেইভাবে শূদ্রদের দাবিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যে শক্তিশালী কারণটি সাহায্য করেছিল তা হলো কর্মবাদ ও সেই সঙ্গে দেবনির্দিষ্ট বর্ণ- বা জাতি-গত কর্তব্য পালন না করলে তার অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে জনসাধারণকে ভজিয়ে রাখা। যুক্তি দেওয়া হয়, যেহেতু জনগণের মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ছিল এবং তাঁরা ছিলেন

১৪. কোসম্বী, 'জার্নাল অফ ওরিয়েন্টাল রিসার্চ', ২৪, পৃ. ৬১।

১৫. '...বিভিন্ন অনুমোদিত পর্যায় সৃষ্টি করা, তাদের অবনমিত অবস্থান নির্দিষ্ট করা এবং কেন এতগুলি লোকসমষ্টিকে জাতিগত স্তরবিন্যাসে নিম্ন বা অবদলিত অবস্থায় রাখা হয়েছে তার ভাবাদর্শগত ব্যাখ্যা ও ছদ্মযুক্তি উপস্থিত করার এক সুবিধাজনক বুদ্ধি-কৌশল হলো 'প্রতিলোম'।' এস. জে. তাম্বিয়াহ্, "ফ্রম বর্ণ টু কাস্ট থ্রু মিক্সড্ ইউনিয়নস", জ্যাক গুডি (সম্পা.), 'দ ক্যারেক্টর অফ কিনশিপ', পৃ. ২০৭।

১৬. যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৬৬।

বিশ্লেষণী মনোভাবসম্পন্ন, তাঁদের পক্ষে তাই উচ্চ বর্ণের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না।[১৭] এ ধরনের উদ্ভট দাবির কোন ভিত্তি নেই। বরঞ্চ শ্রমজীবী মানুষের মন ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের শৃংখলে এমনই কঠোরভাবে বাঁধা ছিল যে শূদ্রদের বিরুদ্ধে সরাসরি বলপ্রয়োগ বা শূদ্রের পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শের বাহকরা সদাসর্বদা তাঁদের তত্ত্বের দাস ছিলেন না। আদিম জনগোষ্ঠী ও বিদেশী প্রধানদের জন্য উপযুক্ত ক্ষত্রিয় বংশধারা আবিষ্কার করার সময়ে জন্মসূত্রের বিচার তাঁদের কাছে বাধা হয়ে ওঠেনি।[১৮] সম্ভবত কিছু দুঃসাহসী শূদ্রকে (যাঁরা হয়তো মাঝে মাঝে প্রভাবশালী মর্যাদায় উন্নীত হতেন) ক্ষত্রিয়রূপে ব্রাহ্মণ্যপ্রথার সংগে নিপুণভাবে খাপ খাইয়ে দেওয়া হতো, যাতে তাঁরা নতুন মতান্তরিত ব্যক্তির স্বাভাবিক উৎসাহ নিয়ে উচ্চ বর্ণের আধিপত্য রক্ষা করতে পারেন। শূদ্রার গর্ভে জাত চন্দ্রগুপ্তকে কৌটিল্য সমর্থন করেছিলেন—এই কিংবদন্তী থেকে দেখা যায় যে এ-ধরনের পরিণতি অসম্ভব ছিল না।

জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবিকদের শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে রাখা হয়েছিল। শূদ্ররা এসব সম্প্রদায়ে নির্বিভেদে যোগ দিতে পারতেন। খৃপূ ৫০০ থেকে ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এইসব ধর্মগোষ্ঠীর প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করা গিয়েছিল। মনে হয়, এগুলো ছিল হস্তশিল্পী শূদ্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বৌদ্ধধর্ম দাস ও ঋণীদের সংঘে স্থান দিত না। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল মৌর্যোত্তর ও আরও নির্দিষ্ট-ভাবে গুপ্ত যুগে, কিন্তু বর্ণপ্রথার সংগে জড়িত সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অর্থ-নৈতিক বিভেদ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ব্রাহ্মণরা বিষ্ণুপূজাকে কাজে লাগিয়ে-ছিলেন। তন্ত্র তার 'চক্র' বা দীক্ষাদান অনুষ্ঠানে শূদ্র ও নারীকে গ্রহণ করত এবং গুপ্ত যুগের শেষে ও গুপ্তোত্তর সময়ে এই তন্ত্র সাধারণ মানুষ ও আদিম জনগোষ্ঠীর মাতৃকা-দেবী সংক্রান্ত ধর্মীয় আচারকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু তন্ত্র অল্পদিনের মধ্যেই একেবারে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক একটি ধর্মীয় স্তরবিভাজন তৈরি করে ফেলে, সেখানে সাধারণ ভক্তকে দেওয়া হয় সর্বনিম্ন স্থান। কোন-না-কোন পর্যায়ে শূদ্রদের নানান অংশের ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়েছিল বিভিন্ন ধর্মসংস্কারপন্থী গোষ্ঠী। শূদ্র হস্তশিল্পীদের প্রয়োজন মিটিয়েছিল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম-

১৭. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'আসপেক্ট্স্ অফ দ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ মনুস্মৃতি', পৃ ১৩৪।

১৮. এমনকি সাম্প্রতিককালেও এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। 'সেন্সাস অফ ইণ্ডিয়া', ১৮৯১, ১৩ (মাদ্রাজ), পৃ ২১৩। 'ৎসাইটশ্রিফ্ট্ ডোর মোর্গেনল্যাণ্ডিশেন গেসেল-শাফ্ট্', ৯, পৃ ৫১০-এ উদ্ধৃত।

সম্প্রদায় আর শূদ্র কৃষকদের ক্ষেত্রে ঐ একই ভূমিকা পালন করেছিল শৈব, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধর্মগোষ্ঠীগুলি (যদিও সব আদি-মধ্যযুগীয় ধর্মগোষ্ঠীই পড়েছিল তন্ত্রের প্রভাবে)। কিন্তু কোন ধর্মগোষ্ঠীই চতুর্থ বর্ণের দাসসুলভ অবস্থায় সারগত পরিবর্তন আনতে পারেনি। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব বা বৈষ্ণবধর্মের সংস্কারবাদী অন্দোলনের কোনটিই প্রশ্ন তোলেনি 'কর্ম'-র মূলতত্ত্ব নিয়ে, যে-মতবাদ যোগান দিয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজ-বিন্যাসের তাত্ত্বিক ভিত্তি। সামাজিক বিক্ষোভকে বৈপ্লবিক দিকে প্রবাহিত করার পরিবর্তে ধর্ম-আন্দোলনগুলি তাকে নিবৃত্ত করারই চেষ্টা করে। অন্যান্য রূপের সাম্যের পরিবর্তে ধর্মীয় সাম্যের আশ্বাস দিয়ে নিম্নবর্গকে তারা প্রচলিত সামাজিক প্রথার সঙ্গেই আপসে আসতে সাহায্য করেছিল। সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনাই ছিল এইসব আন্দোলনের গোড়ার দিকের লক্ষণ; কিন্তু কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বর্ণ সংগঠনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তারা নিজেদের এক করে তোলে। অতএব এইসব উপাদান-কারণের সমাহার শূদ্রদের তুলনায়-শান্ত ভাব রক্ষা করতে ও তাঁদের চিরস্থায়ী দাসত্বকেই সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

## পরিশিষ্ট ১

# 'মনুস্মৃতি'র কাল

( বিশেষত দশম অধ্যায় প্রসঙ্গে )

ব্যুহ্লার প্রস্তাব করেছেন যে 'মনুস্মৃতি'র কালসীমা খৃপূ ২০০ থেকে ২০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চারশ বছরের পর্ব জুড়ে।[১] জায়সবাল এই পর্বকে বহুল পরিমাণে সীমিত করেছেন। শুঙ্গ যুগে 'ব্রাহ্মণ্য প্রতিবিপ্লবে'র পর্বকেই তিনি নির্দেশ করেছেন মনুর কাল বলে।[২] কিন্তু নারদের ধর্মশাস্ত্র ( পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক ) ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, ঐ ধর্মশাস্ত্রকার ব্রাহ্মণদের বেশি না-হলেও সমান গুরুত্বপূর্ণ সুযোগসুবিধা দিয়েছেন। মনুর ব্যবহৃত ও প্রত্নলেখে প্রাপ্ত কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছের তুলনা করলেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এই ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল আরও পরে।

মনুর উল্লিখিত যবনরা ইন্দো-গ্রীকদের সঙ্গে অভিন্ন। খৃস্টীয় শতকের গোড়ার দিকে তাঁদের গুরুত্ব হারিয়ে গেলেও শক, পহ্লব ও আভীরদের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। ঐ যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁদের ক্ষমতা অব্যাহত ছিল। খৃস্টীয় প্রথম শতকের পরে প্রত্নলেখে পার্থিয়দের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত শকদের ও দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত আভীরদের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, মনু 'মৈত্র' নামে একটি সঙ্করবর্ণের কথা বলেছেন।[৩] এঁদের বোধহয় বলভীর মৈত্রক হিসেবে সনাক্ত করা যায়। পঞ্চম শতকের প্রত্নলেখ এঁদের দেখা যায়, কিন্তু জনগোষ্ঠী রূপে হয়তো আরও আগে থেকেই তাঁরা বর্তমান ছিলেন।

মনুর দশম অধ্যায়ে[৪] 'মেদ' ও 'অন্ধ্র' নামে একত্র দুটি সঙ্করবর্ণকে ঐ একইভাবে পাল প্রত্নলেখে দেখা যায়।[৫] পূর্ববর্তী বিভিন্ন শাস্ত্রে সঙ্করবর্ণ হিসেবে উল্লিখিত যে-'অম্বষ্ঠ'দের দেখা যায় মনুতে তাঁরা বৈদ্যরূপে অভিহিত

১. সেক্রেড বুক্‌স্ অফ দি ইস্ট, ২৫, ভূমিকা, পৃ [১১৪]-[১১৮]।

২. 'মনু অ্যাণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য', পৃ ২৫-৩২ ; তুলনীয় : কাণে, 'হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র', ২য়, পৃ [১১]। কেতকর ( 'হিস্ট্রি অফ কাস্ট', পৃ ৬৬ ) বলেছেন যে গ্রন্থটি ২৭২-৩২০ খৃস্টাব্দেব রচনা।

৩. মৈত্রকদের সর্বাদি প্রত্নলেখ ৫০২ খৃস্টাব্দের, কিন্তু পঞ্চম শতকে তাঁরা গুপ্তদের সামন্ত ছিলেন বলেই মনে হয়।

৪. ১০।৪৯-৫০।

৫. এপি. ইণ্ডিকা, ৩য়, নং ৩৬, পঙ্‌ক্তি ৫-৬, ২২-২৩।

হয়েছেন। আদি মধ্যযুগেও তাঁরা এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন।[৬] মনুর দশম অধ্যায়ের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় : পূর্ববর্তী বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের কুড়িটি সংকরবর্ণ হঠাৎ বেড়ে ষাটেরও বেশি হয়ে গেছে। যেহেতু অন্য কোন স্মৃতি-গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু পাওয়া যায় না তাই মনুর এই দশম অধ্যায়টি সংশয়ের কারণ। আবার অন্যদিকে সংকরবর্ণের সংখ্যা বেড়ে যায় 'স্কন্দ পরাণ' ও 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণে'র মতো পরবর্তী বিভিন্ন রচনায়। 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' প্রদত্ত মিশ্রজাতির তালিকা[৭] যোগ করলে মনুর সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। এই সমস্ত কিছু থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে যে মনুর দশম অধ্যায় অনেক পরবর্তীকালের, কারণ আনু. ৭০০ খৃস্টাব্দের আগে এসব পুরাণের অস্তিত্বই ছিল বলে মনে হয় না।[৮]

মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে ভূমিদানের ব্যবস্থাপত্র থেকে মনে হতে পারে এ'টি খৃস্টীয় শতকের গোড়ার দিকের বিভিন্ন স্মৃতি ও প্রত্নলেখের সমসাময়িক। মনু ভূমিদ'নের অনুকূলে মত দিয়েছেন ও তার সুফল নির্দেশ করেছেন।[৯] কয়েকটিমাত্র ধর্মসূত্রে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু "শান্তিপর্ব", 'বিষ্ণু',[১০] 'যাজ্ঞবল্ক্য'[১১] ও 'বৃহস্পতি স্মৃতি'-র[১২] শিক্ষার সঙ্গে এর সংগতি আছে। "অনুশাসনপর্বে" 'ভূমিদান-প্রশংসা' নামে একটি অংশ আছে।[১৩] পরবর্তী শাস্ত্রে ও 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে'[১৪] (অষ্টম শতক) ভূমিদানকে সর্বোত্তম দান আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে বেদ বা বিদ্যাদান ('ব্রহ্মদান') ভূমিদান সমেত সব দানের চেয়ে বড়।[১৫] মনুর পক্ষে ব্রাহ্মণের ভূমি গ্রহণ না-করার কারণ : এ ধরনের প্রতিগ্রহ গ্রহীতার গুণ নষ্ট করে।[১৬] বিষয়টি নিঃসন্দেহে এমন এক পরিস্থিতি নির্দেশ করে যখন ভূমিদান খুবই প্রচলিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সম্পর্কে মনুর আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিপদ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই রীতি বহুব্যাপ্ত হওয়ায় মনু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রাহ্মণকে ভূমিগ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন : অবশ্য কৃত (কর্ষিত) জমির চেয়ে

৬. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'স্টাডিজ ইন দ সোসাইটি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ এনশেন্ট অ্যান্ড মিডিয়েভাল ইন্ডিয়া', ১ম, পৃ ১০৭-০৮।

৭ ব্রহ্মখণ্ড ১০।১৪-১০৬।

৮. রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা, 'স্টাডিজ ইন পুরাণিক রেকর্ডস অন হিন্দু রাইটস অ্যান্ড কাস্টমস' (২য় সংস্করণ, দিল্লী, ১৯৭৫), পৃ ১৬৫-৬৭।

৯ ৪।২৩০।

১০. বিষ্ণুস্মৃতি, অধ্যায় ৯১-৯২, সেক্রেড বুক্‌স্‌ অফ দি ইস্ট, ২৫, পৃ ১৬৫ পাদটীকায় উদ্‌ধৃত।

১১. ১।২১০-১১। ১২. ১।৮। ১৩. প্রামাণিক সংস্করণ, অধ্যায় ৬১।

১৪. ৩।১৩।১০। ১৫. ৪।২৩৩। ১৬. ৪।১৮৮-৮৯।

যেন অকৃত জমি পছন্দ করা হয়।[১৭] ভূমিদানের ক্ষীণ প্রারম্ভের প্রত্নলেখ-ভিত্তিক উল্লেখ খৃপূ প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট সাক্ষ্যের সময়সীমা হলো সাতবাহন শাসকদের অধীন মহারাষ্ট্রে খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক। মনুর ধর্মশাস্ত্র কিন্তু আর্যাবর্তে প্রযোজ্য ছিল, সেখানে খৃস্টীয় প্রথম দুই-তিন শতকে ভূমিদানের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না বললেই হয়। মনে হয়, চতুর্থ শতক বা ঐ রকম সময়ে রীতিটি মনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট সুপ্রচলিত হয়ে উঠেছিল। অকর্ষিত ভূমিগ্রহণ সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাব থেকে 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়'[১৮]-এর নীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণকে 'খিল' বা 'অপ্রহত' ভূমিদানের বিষয়টি মনে পড়ে যায়। এই বিষয়টির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চম শতকের প্রত্নলেখে। মিথ্যা ভূমিদান সংক্রান্ত রাজাজ্ঞা অর্থে মনু 'কূট-শাসন' পদটিও ব্যবহার করেছেন।[১৯] গুপ্ত যুগের একটি ধর্মশাস্ত্রে ও হর্ষবর্ধনের একটি ভূমিদানের ক্ষেত্রেও তা ব্যবহৃত হয়েছে।[২০] এ-সবই তাঁর রচনাকাল নির্ধারণের জন্য পূর্ববর্তী সীমারেখা নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে।

নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যদের অর্থে বা 'পণ'-এ প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতাদের মধ্যে মনুই সর্বপ্রথম অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের কার্যনির্বাহীদের ভূমিদানের মাধ্যমে প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[২১] বৃহস্পতিও এই ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন।[২২] এর থেকে আবার সেই পরিস্থিতির কথা মনে পড়ে যায় যখন ভূমিদানের মাধ্যমে ধর্মীয় ও ধর্ম-বহির্ভূত পরিষেবার প্রাপ্য শোধ করা হতো। প্রত্নলেখ থেকে ধর্ম-বহির্ভূত অনুদানের কোন প্রত্যক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় না, কারণ কাপড়ের টুকরো বা ভূর্জপত্র জাতীয় বিনাশশীল উপাদানের উপর এগুলো লেখা হতো। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে অসম্পর্কিত ব্যক্তিদের ভূমিদানের কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় পঞ্চম শতকে।[২৩] কৌটিল্যের ব্যবহৃত শব্দ 'দশগ্রামী' ও মনুর ব্যবহৃত 'দশগ্রামপতি'র[২৪] প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু নবম শতকের পাল প্রত্নলেখে।[২৫]

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতে মনু বলেছেন যে 'কীনাশ' বা কৃষক যাবে

১৭. ১০।১১৪।

১৮. 'কর্পাস ইনস্ক্রিপশনুম ইন্দিকারুম', ৩য়, নং ৩১, পঙ্‌ক্তি ৭-১১, ১৩।

১৯. ৯।২৩২। ২০. এপি. ইণ্ডিকা, ৭ম, নং ২২, পঙ্‌ক্তি ১০।

২১. ৭।১১৫-২০।

২২. ব্যবহারময়ূখ, পৃ ২৫-২৭-এ উদ্ধৃত (পি. ভি. কাণে ও এস. জি. পটবর্ধন-অনূদিত)।

২৩. 'ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজম', পৃ ১৩-১৪। ২৪. ৭।১১৫।

২৫. এপি. ইণ্ডিকা, ২৯শ, নং ১৩, পঙ্‌ক্তি ২৮-২৯ ; দশগ্রামিক' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে।[২৬] এর থেকে আভাস পাওয়া যায়, কিছু কৃষক বা ভাড়াটিয়া চাষী পারিবারিক জমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভূমিজ সম্পত্তি বিভাজনের প্রস্তাব মনু পরিষ্কারভাবে না করলেও, যে-জমি কৃষকরা চাষ করেন তার থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন—এমন ভাবা কঠিন। আনু. ২৫০-৩০০ খৃস্টাব্দের একটি পল্লব প্রাকৃত তাম্রলেখে একজন ভোক্তাকে ভাগচাষীসহ জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।[২৭] অতএব এ বিষয়ে মনুর ব্যবস্থাটি প্রাচীনতর সময়ের না-ও হতে পারে।

পশ্চাৎপদ অঞ্চলের দুই থেকে পাঁচটি গ্রামে 'গুল্ম' নামে এক সামরিক বাহিনী-স্থাপনা 'মনুস্মৃতি'তে একটি পরিকল্পিত উপায় রূপে দেখা যায়।[২৮] খৃস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগের একটি পল্লব প্রত্নলেখে উল্লিখিত 'গুল্মিক' বা 'গুমিক'-এর সংগে এই সামরিক প্রধানকে সনাক্ত করা যায়।[২৯] কিন্তু বিহার ও বাংলার পঞ্চম শতকের বিভিন্ন প্রত্নলেখে 'গৌল্মিক' শব্দটি পরিষ্কার দেখা যায়।[৩০] পরবর্তী চন্দ্র, পাল ও সেন দানপত্রে রাজকীয় উচ্চ-পদাধিকারীদের তালিকায় এটি বারবার উল্লিখিত হয়েছে।[৩১]

রাজার দেবত্ব মনুর ধর্মশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ: আটজন দেবতার 'মাত্রা' (অসাধারণ শক্তি) তিনি রাজার উপর আরোপ করেছেন।[৩২] কুষাণ ও সাতবাহন প্রত্নলেখে রাজকীয় দেবত্বের ধারণা প্রচলন করা হয়।[৩৩] কিন্তু গুপ্ত যুগের প্রত্নলেখেই মনুর ধারণা আরও বিশ্বাসজনকরূপে পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালেখে (সম্ভবত চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ) রাজাকে চারজন দেবতার সংগে তুলনা করা হয়েছে।[৩৪] এর থেকে মনে হয় 'মনুস্মৃতি'তে যে-ক্রমে আটজন দেবতার কথা পাওয়া যায় সেটি পরের-ঘটনা। একইভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি মনুর প্রযুক্ত 'দৈবত' শব্দটি[৩৫] পঞ্চম শতকের বাংলা প্রত্নলেখে গুপ্তরাজাদের প্রতি 'পরম-দৈবত' রূপে প্রথম প্রযুক্ত হয়েছে।[৩৬] এই সব কিছু থেকে মনে হয়, 'মনুস্মৃতি'র যেসব জায়গায় এই ধারণাগুলো এসেছে—সপ্তম, নবম ও একাদশ অধ্যায়—সেগুলো পরবর্তীকালের রচনা। অন্যদিকে চিরকালীন গচ্ছিতের অর্থে মনুর ব্যবহৃত 'অক্ষয়নিধি' শব্দটি[৩৭]

২৬. ৯।১৫০। ২৭. এপি. ইন্ডিকা, ১ম, নং ১, পঙ্‌ক্তি ৩৯। ২৮. ৭।১১৪।

২৯. 'সিলেক্‌ট্‌ ইনস্ক্রিপশন্‌স্‌', ১ম, পর্ব ৩, নং ৬৫, পঙ্‌ক্তি ৫; 'গুমিক' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। একটি সাতবাহন প্রত্নলেখে (খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম অর্ধ) 'গুমিক'-এর জায়গায় 'গামিক' পড়েছেন সুকঠণকর। ঐ, পৃ ২১২, টী. ৬।

৩০. 'কর্পুস ইনস্ক্রিপতিওনুম ইন্দিকারুম', ৩য়, নং ১২, পঙ্‌ক্তি ২৯।

৩১. ননীগোপাল মজুমদার, 'ইনস্ক্রিপশন্‌স্‌ অফ বেঙ্গল', ৩য় (রাজশাহী, ১৯২৯), পৃ ১৮৪। ৩২. ৮।৪-৮।

৩৩. 'সিলেক্‌ট্‌ ইনস্ক্রিপশন্‌স্‌', ১ম, পর্ব ২, নং ৪০, ৪১, ৪৪ ইঃ। তুলনীয়: নং ৮৬।

৩৪. পঙ্‌ক্তি ২৬। ৩৫. ৯।৩১৭; ১১।৮৪।

৩৬. 'সিলেক্‌ট ইনস্ক্রিপশন্‌স্‌', ১ম, পর্ব ৩, নং ১৮-১৯। ৩৭. ৭।৮৩।

কুষাণ ও সাতবাহনদের দ্বিতীয় শতকের প্রত্নলেখে 'অক্ষয়নীবি' রূপে দেখা যায়।[৩৮] পরবর্তীকালের কয়েকটি ভূমিদানপত্রেও শব্দটি পাওয়া গেছে।

'মনুস্মৃতি'তে বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখের ভিত্তিতে এর রচনাকালের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন অপরাধের জন্য মনু 'পণ'-এর মাধ্যমে অর্থ-দণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। কুষাণ ও গুপ্ত যুগে এই মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রামাণ্য কুষাণ স্বর্ণমুদ্রার ওজন ছিল ১৪০ গ্রেন। এই ওজন সুবর্ণের (মুদ্রা) জন্য মনু প্রদত্ত ৮০ 'কৃষ্ণল' বা 'রক্তি'র সমান বলে মনে হয়।[৩৯] কিন্তু মনু যে-হারে সুদের প্রস্তাব করেছেন তা খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের নাসিক প্রত্নলেখের হারের চেয়ে বেশি।[৪০]

দ্বিতীয় শতকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি ও রুদ্রদামন প্রত্নলেখে বর্ণব্যবস্থার সংরক্ষণকে অন্যতম রাজকীয় কর্তব্য বলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মনুও এর উপর জোর দিয়েছেন, বর্ণসংকর পরিহারেও তিনি খুবই আগ্রহী। এ-সবই 'মনুস্মৃতি'র প্রথম অংশের ক্ষেত্রে ২০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি কোন রচনাকাল নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু 'মনুস্মৃতি'র অন্য কয়েকটি অংশের প্রত্নলেখভিত্তিক পরীক্ষা করলে তাদের রচনাকাল হবে পঞ্চম শতক বা আরও পরে। অতএব ২২০ থেকে ৪০০ খৃস্টাব্দের একটি সংশোধিত সময়বন্ধনীর প্রস্তাব করা যায়। এটি "শান্তিপর্বে"র রচনাকালের সঙ্গে মেলে, যেখানে মনুর কয়েকটি শ্লোক হুবহু পাওয়া যাচ্ছে। কে কার থেকে ধার করেছিলেন বলা শক্ত। যাই হোক, যে-দশম অধ্যায়ে ষাটটিরও বেশি সংকরবর্ণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটির রচনাকাল হতে পারে পরবর্তী গুপ্ত বা এমনকি গুপ্তোত্তর যুগ।

৩৮. 'সিলেক্‌ট্‌ ইনস্ক্রিপশন্‌স্‌', ১ম, পর্ব ২, নং ৪৯, পঙ্‌ক্তি ১১ ; নং ৫৮, পঙ্‌ক্তি ১।

৩৯. ৮।১৩৪।

৪০. ৮।১৩৯-৪২ ; 'সিলেক্‌ট্‌ ইনস্ক্রিপশন্‌স্‌', ১ম, পর্ব ২, নং ৫৮, পঙ্‌ক্তি ১-৩।

# পরিশিষ্ট ২

## দাসবর্গীয় ও কৃষক জাতির সংখ্যা বিস্তার

পরবর্তী বৈদিক রচনায় আছে চার বর্ণ, নিষাদ ও অন্ধ্রের মতো কয়েকটি অনার্য জনগোষ্ঠী আর প্রায় বারোটি কারুশিল্পী গোষ্ঠীর কথা। যজুঃ-সংহিতায় পুরুষমেধের বর্ণনায় এঁদের সকলেরই স্থান আছে। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল 'আর্য' ও অনার্যদের মধ্যে একধরনের সংযোগ স্থাপন। আর্যরা ছিলেন পিতৃতান্ত্রিক, তাঁরা গো-পালন ও লাঙল দিয়ে চাষ করতেন; আর অনার্যরা ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক, তাঁরা করতেন শিকার ও নিড়ানি দিয়ে চাষ। স্পষ্টতই, বিভিন্ন বর্গ ও বৃত্তির লোক তথা অনার্যদের একই ছত্রচ্ছায়ায় আনার এক ধর্মীয় ব্যবস্থা হলো এই 'পুরুষমেধ'। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য অর্থে 'বর্ণ' বলতে যা বোঝায়, এইসব জনগোষ্ঠী ও বৃত্তির লোকে কিন্তু তা ছিলেন না। পরবর্তী বৈদিক কালে অনার্য মানবগোষ্ঠীদের ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আরেকটি উপায় উদ্ভাবিত হয়: ব্রাত্য তত্ত্ব। কৌটিল্য ও মনু পরবর্তীকালে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে ব্রাত্যরা আসলে ছিলেন দ্বিজ, ব্রতচ্যুত হওয়ার জন্যই তাঁরা 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' রূপে গণ্য হতে থাকেন। মাগধরা ছিলেন এই রকমের মানবগোষ্ঠী, আগে তাঁরা মগধে বসতি স্থাপন করেছিলেন, পরবর্তী বৈদিক রচনায় এঁদের রাজাকে ব্রাত্য শাসক রূপে দেখানো হয়েছে। ব্রাত্যদের মধ্যে অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর লোকও ছিলেন। পূর্বাঞ্চলে কিছু কিছু জনগোষ্ঠীয় লোকের বাস ছিল, যাঁরা নিড়ানি দিয়ে চাষ করে 'গবেধুক' নামে এক বুনো ভুট্টা উৎপন্ন করতেন।[1] এই 'গবেধুক' ছিল তাঁদের নিজেদের ও তাঁদের গবাদি পশুর খাদ্য। এঁদেরও ব্রাহ্মণরা সামূহিক ব্রাত্য শব্দটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় এঁরা ছিলেন মাতৃতান্ত্রিক মানবগোষ্ঠী। ব্রাত্যরা চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানতেন না। পশুদের দেবতা রুদ্র ছিলেন তাঁদের দেবতা। সম্ভবত এঁরাই ছিলেন কৃষ্ণ-লোহিত মৃৎভাণ্ড ব্যবহারক মানবগোষ্ঠী, যাঁরা প্রাগ্-লৌহ যুগে ক্ষুদ্রপ্রস্তর এবং কিছু তাম্র উপকরণ ব্যবহার করতেন। তাঁদের বাস ছিল উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, বিহার ও বাংলায়, আর আহার ছিল মাছ-ভাত। অবশ্য তাঁরা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন তাতে মনে হয় না যে গাঙ্গেয় অববাহিকার ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় তাঁরা বড় বড় বসতি গড়তে পেরেছিলেন। স্পষ্টতই ব্রাত্যদের মধ্যে ছিলেন নিষাদ, পুঞ্জিষ্ঠ ও অন্যান্য কয়েকটি অনামা জনগোষ্ঠী। এমনও হতে পারে যে একজন কুলপতির অধীনে

১. কে. পি. চট্টোপাধ্যায়, 'দি এনশেন্ট ইন্ডিয়ান কালচার কনট্যাক্টস্ অ্যান্ড মাইগ্রেশনস্' (কলকাতা, ১৯৭০), পৃ. ২৮।

কোন-এক কুলের সদস্যরা হয়তো দু-পুরুষ অবধি একসঙ্গে থাকলেন এবং একসময়ে হয়তো তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ালো ২০০।[২] 'ব্রাত্যষ্টোম' নামে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন কুলকে সমবেতভাবে পরবর্তী বৈদিক কৃষক সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হতো এবং ক্রমে ক্রমে তাঁরা লাঙল দিয়ে চাষ-আবাদে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন ও পরিণত হতেন একটি 'জাতি'তে। মনু-উল্লিখিত কয়েকটি নাম হয়তো আরও প্রাচীন। কিন্তু এ-সবই অনুমান-নির্ভর।

লোহার লাঙল দিয়ে চাষের ভিত্তিতে গঠিত, পূর্ণবিকশিত কৃষি-অর্থনীতি স্থাপিত হওয়ার পর, 'আর্য' সমাজ যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হতে লাগল এবং প্রাগ্-মৌর্য যুগে, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের সমস্যা অর্জন করল এক গুরুতর মাত্রা। এই পর্বেই দেখা যায় উত্তর-ভারতে গড়ে উঠল অন্ততপক্ষে ষোলটি বিশাল মহাজনপদ। প্রচলিত চার বর্গের লোক ছাড়াও সেখানে বাস করতেন বহুসংখ্যক নতুন জনগোষ্ঠী। উত্তর-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ও বিহারে লৌহ প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা, মুদ্রার ব্যবহার তথা গাঙ্গেয় অববাহিকায় নগর প্রতিষ্ঠার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বহু কারুশিল্পের উদ্ভব হলো এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ-সংস্থানে স্থান দিতে হলো এই কারুশিল্পীদের। এর জন্যই ধর্মসূত্রে উদ্ভাবন করা হলো 'অনুলোম' ও 'প্রতিলোম' তত্ত্ব। উচ্চ বর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্ন-বর্ণের নারীর বিবাহ হলো 'অনুলোম' আর 'প্রতিলোম' এর বিপরীত। সৃষ্টি হলো অনেকক'টি মিশ্র জাতি, আর তার সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল। ধর্মসূত্রে চব্বিশটি মিশ্রজাতির উল্লেখ আছে, আর কৌটিল্য নির্দেশ করেছেন ষোলটির, যার মধ্যে 'ব্রাত্য' ছাড়া আর সকলকেই ধর্মসূত্রের তালিকায় পাওয়া যায়। মিশ্রজাতির সংখ্যা তাতে বেড়ে দাঁড়ায় পঁচিশ। অবশ্য যাবতীয় কারুকর্মই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'দীঘ নিকায়ে' এই জাতীয় আঠাশ রকম কারুকর্মের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে আঠেরোটি সম্ভবত বৃত্তি-গোষ্ঠী রূপে সংগঠিত। আদি পালি রচনায় সাধারণত এঁদেরই বলা হয়েছে 'অষ্টাদশ শ্রেণি'।[৩] যতদিন পর্যন্ত মুদ্রার ব্যবহার ছিল ব্যাপক, বর্ধিষ্ণু নগর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করছিল এবং সেই সঙ্গে খৃপূ পঞ্চম শতক থেকে খৃস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত ঘটছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার, ততদিন অবধি কারুশিল্পীদের বৃত্তিগোষ্ঠীগুলো অনড় জাতি হয়ে ওঠেনি। এই অর্থব্যবস্থায় কারুশিল্পী ও বণিকদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গতিশীলতার অবকাশ ছিল; খাদ্য ও বিবাহ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাও তাঁদের ক্ষেত্রে শিথিল করতে হয়েছিল।

২. ঐ, পৃ ২৫-২৬।

৩. আঠেরো—এই সংখ্যাটি পরে তীর্থ (কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' উচ্চ পদাধিকারী). পরিহার, 'মহাভারতে'র পর্ব ও অক্ষৌহিণী, পুরাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। এর দ্বিগুণ ছত্রিশ সংখ্যাটি আদি-মধ্যযুগে বর্ণতালিকায় দেখা যায়।

কিন্তু 'মনুস্মৃতি'র দশম অধ্যায়ে (যেটি গুপ্ত যুগের শেষদিকে সংকলিত বলে ধরা যায়) এসে আমরা দেখি একষট্টিটি মিশ্র জাতির এক বিচিত্র সারণি, যার মধ্যে অধিকাংশই প্রতিলোম বিবাহের ফল। পরে য়ুয়ান চাং এত বেশি মিশ্র বর্ণ দেখতে পান যে, তাঁর পক্ষে তা বর্ণনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। মনু এদের উদ্ভবের দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথমত তিনি ব্রাত্য তত্ত্বের আশ্রয় নেন। পরবর্তী বৈদিককালে তত্ত্বটি পরিমার্জিত করা হয়। বৌধায়ন ব্রাত্য ও 'বর্ণসংকর' অভিন্ন বলে মনে করেছেন এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র তৃতীয় অধিকরণে এই মতটিই মোটামুটি সমর্থন করা হয়েছে।[৪] কৌটিল্যের মতে ব্রাত্যরা হলেন চতুর্বর্ণের যে-কোন অশুচি পুরুষের ঔরসে হীনতর রমণীর সন্তান।[৫] মনুও ব্রাত্যদের মিশ্র জাতিই বলেছেন, কিন্তু ব্রাত্যদের জন্ম দেওয়ার জন্য শূদ্রদের দায়ী করেননি। ব্রাত্যরা বর্ণসংকর—একথা ছাড়াও কৌটিল্য ও মনু উভয়েই বলেছেন যে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে ভ্রষ্ট। মনুর মতে সবর্ণা রমণীর গর্ভজাত দ্বিজাতির যেসব পুত্র 'ব্রত' পালন করেন না ('অব্রতান্') তাঁরা পবিত্র যজ্ঞোপবীত অনুষ্ঠানের যোগ্য নন। এঁদেরই বলা হয় ব্রাত্য।[৬] ব্রাত্য ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণীর গর্ভে ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ-র জন্ম দেন।[৭] রাজন্য ব্রাত্য ও ক্ষত্রিয়ার সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড়।[৮] বৈশ্য ব্রাত্য এবং বৈশ্যার সন্তানেরা হলেন সুধন্বা, আচার্য, কারুষ, বিজন্ম, মৈত্র ও সাত্বত।[৯] মনু এইভাবে আঠেরোটি ব্রাত্য মিশ্র বর্ণের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র এই তিনভাগে তাঁদের ভাগ করা হয়েছে, তাহলেও এঁদের সকলকেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল শূদ্রের পর্যায়ে, কারণ তাঁরা কেউই উপনয়নের এবং ফলত বেদ-অধ্যয়নের অধিকারী ছিলেন না। এইসব ব্রাত্য বর্ণ ছাড়াও মনু আরও বারোটি ক্ষত্রিয় বর্ণের উল্লেখ করেছেন—আচার পালন করতেন না এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না বলে যাঁদের শূদ্র পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১০] এঁরা হলেন পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খস।[১১] তাঁরাও ব্রাত্যদেরই সপর্যায়ী, উপনয়নের অভাবে তাঁরাও অন্যদের থেকে পৃথক্। দ্বিতীয় তালিকার দুটি মিশ্রবর্ণের নাম যেহেতু প্রথম তালিকাতেও পাওয়া যায় তাই ব্রাত্য এবং অর্ধ-ব্রাত্য বর্ণের সংখ্যা দাঁড়ায় আঠাশ।

এখানে যে আঠাশটি জাতির কথা আছে, নৃকুল, ভাষা, ভৌগোলিক ও

৪. অর্থশাস্ত্র ৩৭।

৫. অর্থশাস্ত্র ৩৭-এর কঙ্গলে-কৃত অনুবাদে ব্রাত্যরা হলেন তিন উচ্চতর বর্ণের অশুচি পুরুষ কর্তৃক ঐ বর্ণের নারীদের গর্ভে জাত সন্তান।

৬. ১০।২০। ৭. ১০।২১। ৮. ১০।২২।

৯. ১০।২৩। ১০ ১০।৪৩-৪৪। ১১. ঐ।

বৃত্তিগত দিক দিয়ে তাঁদের চিহ্নিত করা কঠিন। আবন্ত্য (অবন্তীর লোক) এবং 'বাটধান' ('মহাভারতে' একটি মানবগোষ্ঠী রূপে উল্লিখিত) নিশ্চিত-ভাবেই জনগোষ্ঠী তথা মানবগোষ্ঠী পর্যায়ের এবং আবন্ত্যরা অন্তত বাস করতেন মালব অঞ্চলে। সাত্বত মানবগোষ্ঠীও ছিলেন পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। মৈত্রক শব্দটি যেহেতু মৈত্র-র সঙ্গে ক্ষুদ্রতাব্যঞ্জক প্রত্যয় যোগে গঠিত তাই মৈত্র এবং মৈত্রকদের অভিন্ন বলে ধরা হলে মৈত্ররা ছিলেন গুজরাটের কাথিয়াবাড় অঞ্চলে অবস্থিত বলভীর লোক। মল্লরা অতীতে হিমালয়ের পাদদেশে বাস করতেন এবং গুপ্ত যুগে লিচ্ছবিরা নেপালে তাঁদের রাজত্ব স্থাপন করেন। সেখানে তাঁরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছিলেন। মল্লরা হয়তো ছিলেন তাঁদেরই প্রতিবেশী। মনে হয় এঁরা কোন জনগোষ্ঠীর অবশেষ। ঝল্ল পদবি আজও আছে, রাজস্থানে ঝলবার নামে একটি জেলাও আছে। পৌণ্ড্রকরা ছিলেন উত্তরবঙ্গের লোক, ঔড্র-রা ওড়িশার এবং দ্রাবিড়রা দক্ষিণ ভারতের। মনুও এঁদের ঐ একই ভৌগোলিক বিন্যাসে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে, কয়েকটি বিদেশী মানবগোষ্ঠী—যবন, শক, পারদ ও পহ্লবদের উল্লেখ করা হয়েছে সুস্পষ্ট ভৌগোলিক ও কালানুক্রমিক বিন্যাসে, যার মধ্যে কম্বোজদের প্রান্তিক অংশও পড়েন। এঁরা সকলেই ছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। উত্তর ও পূর্ব ভারতের আরেক দল স্থানীয় ও বৈদেশিক মানবগোষ্ঠীর কথা পাওয়া যায়। চীন, কিরাত, দরদ ও খস—এই বলে এঁদের সকলকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই 'মহাভারতে'ও স্থান পেয়েছেন; পাল প্রত্নলেখে হূণ এবং কুলিকদের সঙ্গে খসদেরও উল্লেখ আছে। বিহারের সাসারাম ও পালামৌ জেলা জুড়ে যে-জঙ্গল এলাকা, করূষরা ছিলেন তার অধিবাসী। সব মিলিয়ে মনু যে-কুড়িটি সংকরবর্ণের কথা বলেছেন তার মধ্যে উনিশটিই হলো এদেশীয় বা বিদেশী জনগোষ্ঠী। এঁদের অধিকাংশই বাস করতেন আর্যাবর্ত বা ব্রহ্মা-বর্তের প্রান্তে, মনুর মতে যেটি আর্য-সংস্কৃতির অঞ্চল। সুতরাং সমাজের অ-দ্বিজ সদস্যরূপে স্থানীয় ও বিদেশী জনগোষ্ঠীগুলোর প্রবেশের পথ সুগম করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল ব্রাত্যত্ব বা ব্রতহীনতা-জনিত অবস্থার অতিকথা। অবশ্য পতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্ররূপে এঁরা বিভিন্ন মাত্রায় সম্মান লাভ করতেন।

মনু-উল্লিখিত বাকি ন'টি ব্রাত্য জাতির মধ্যে ভূর্জকণ্টক,[১২] পুষ্পধ, শৈখ এবং আচার্য, মনে হয়, পতিত পুরোহিত ছিলেন অথবা তাঁরা ছিলেন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অনুগামী যাঁরা জাতি হিসেবে দানা বেঁধে উঠেছিলেন। নট এবং করণরা হলেন বৃত্তিগোষ্ঠী; সম্ভবত সুধন্বা-রা ধনুর্জীবীদের একটি গোষ্ঠী, আর 'বিজন্ম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবৈধ সন্তান। সুতরাং বিভিন্ন

১২. 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' প্রথম উল্লিখিত ভোজকদের সঙ্গে ভূর্জকণ্টকের কোন যোগ থাকতেও পারে।

নকুল, বৃত্তি ও অঞ্চলের যেসব লোক জাতিরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন, সেইসব পর্যায়কেই অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মনু ব্রাত্য তত্ত্বটি প্রয়োগ করেছেন ব্যাপকভাবে। এও সম্ভব যে মনুর দশম অধ্যায়, যেখানে জাতি হিসেবে এইসব মানবগোষ্ঠীর বৈধীকরণ সম্বন্ধে তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে, সেটি লেখা হয়েছিল পঞ্চম শতক নাগাদ। ঐ সময়েই এইসব জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্য সমাজে অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

অজস্র বর্ণের উৎপত্তির দ্বিতীয় একটি ব্যাখ্যাও মনু দিয়েছেন। সেটি 'অনুলোম' ও 'প্রতিলোম' তত্ত্বের সম্প্রসারণ। এই ধারণাটিও ব্রাত্য তত্ত্বেরই একটি অংশ। এর সাহায্যে প্রায় তিরিশটি জাতির উদ্ভব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকক'টির উদ্ভবের কারণ ধর্মসূত্রে আছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মনু-প্রযুক্ত বর্ণসংকর তত্ত্ব তার বিরুদ্ধে যায়। মনু সমেত বিভিন্ন স্মৃতিকাররা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই বর্ণের বর্ণসংকর উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। একটি প্রবন্ধে তার অসঙ্গতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[১৩] তার থেকে দেখা যায়, এ-তত্ত্ব কাল্পনিক। বর্ণের নির্ধারিত কর্তব্য পালনে বিচ্যুতি অথবা বিভিন্ন বর্ণের অপমিশ্রণ কিংবা দুই-ই—মূল চতুর্বর্ণের এই কঠোর যুক্তিক্রম আরোপ করা হয়েছে সমস্ত বর্ণের উপরেই। কিন্তু মনে হয়, অনেক সংকরবর্ণের সঙ্গে, এর কোন অর্থেই, চতুর্বর্ণের কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে।

এইসব সংকরবর্ণের মধ্যে অনেকের অ-সংস্কৃত নাম এবং জনগোষ্ঠী ও বৃত্তিগোষ্ঠী হিসেবে বিভিন্ন স্থানে তাদের বর্ণনা থেকে মনে হয় এঁরা ছিলেন প্রাচীন জনগোষ্ঠী বা বৃত্তিগোষ্ঠী, যেন তেন প্রকারেণ এঁদের জাতিতে রূপান্তরিত করা হয়। মনুর সংকরবর্ণের তালিকায় সম্ভবত আঠারোটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অবশেষ সনাক্ত করা যায়। সেগুলো হলো: আভীর, আহিণ্ডক, অম্বষ্ঠ, অন্ধ্র, চণ্ডাল, চুঞ্চু, দাশ, কৈবর্ত, মদ্গু, মাধুক, মাগধ, মার্গব, মেদ, নিষাদ, পুক্কুস, সৈরিন্ধ্র, বৈদেহক ও বেণ। বাকি তেরটির নাম: আবৃত, আয়োগব, চর্মকার, ধিগ্বণ, কুক্কুটক, কারাবর, করণ, ক্ষত্তা, মৈত্রেয়ক, পাণ্ডুসোপাক, পারশব, সূত, শ্বপাক ও উগ্র। সম্ভবত এগুলো বৃত্তিগোষ্ঠীর নির্দেশক।[১৪] বশিষ্ঠ এবং মনু অন্ত্যাবসায়ীদের একটি ভিন্ন সংকরবর্ণরূপেই উল্লেখ করেছেন। তাহলেও মনে হয়, এটি এক সর্বগ্রাহী শব্দ, সমস্ত অস্পৃশ্যদের ক্ষেত্রেই যা প্রযুক্ত হয়েছে।

১৩. বিবেকানন্দ ঝা "বর্ণসংকর ইন দ ধর্মসূত্রজ: থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস", 'জার্নাল অফ দি ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ দি ওরিয়েন্ট', ১৩ (১৯৭০), পৃ ২৭৩-৮৮।

১৪. বৃত্তিগত অস্পৃশ্যদের সমস্যা নিয়ে বিবেকানন্দ ঝা আলোচনা করেছেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর পি.এইচ.-ডি গবেষণাগ্রন্থ, 'আনটাচেবলস্ ইন আর্লি ইণ্ডিয়া', অধ্যায় ৩-এ।

মনু-উল্লিখিত ব্রাত্য এবং সংকরবর্ণের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় একষট্টি। আর তার সঙ্গে চারটি বৃহৎ বর্ণ যোগ করলে হয় পঁয়ষট্টি। ধর্মসূত্র তথা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' উল্লিখিত যাবতীয় সংকরবর্ণই কার্যত এই তালিকায় আছে। এগুলো হলো: অম্বষ্ঠ, অন্ত্যাবসায়ী, আয়োগব, ভৃজ্জ্যকণ্ঠ, চণ্ডাল, করণ, ক্ষত্তা, কুক্কুটক, মাগধ, নিষাদ, পারশব, পুক্কুস বা পৌল্কস, সূত, শ্বপাক, উগ্র, বৈদেহক বা বৈদেহ, বেণ বা বৈণ, ও যবন। দৌষ্মন্ত, ধীবর, কৃত, কুশীলব, মাহিষ্য ও মূর্ধাবষিক্ত—এই সংকরবর্ণগুলোর নাম পূর্ববর্তী বিভিন্ন তালিকায় থাকলেও, মনুর তালিকায় এরা অনুপস্থিত। অবশ্য মনুর 'নট' ও কৌটিল্যের 'কুশীলব' হয়তো সমজাতীয়। কৌটিল্যের রচনায় ব্রাত্য একটি সংকরবর্ণ, কিন্তু বৌধায়ন ও মনু এটিকে বর্গবাচক শব্দরূপে ধরেছেন এবং আঠাশটি সংকরবর্ণকে এই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই যে, মনুর রচনায় সংকরবর্ণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। প্রাচীনতর স্মৃতিগ্রন্থগুলোয় এঁদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল পঁচিশ, কিন্তু মনুর দশম অধ্যায়ে এঁদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ষাটেরও বেশি। এসব তালিকা হয়তো কোনক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু জাতির সংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রবণতা যে এতে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে কোন ভুল নেই।

গুপ্তোত্তর যুগে সংকরবর্ণের সংখ্যা অবিরত বেড়ে চলছিল। সংখ্যার দিক দিয়ে দেখলে 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের দশম অধ্যায়ের তালিকার সঙ্গে মনুর তালিকার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এই পুরাণটি দশম শতকের বলে ধরা যায়। এতে বাহাত্তরটি সংকরবর্ণের কথা আছে, যার অনেকগুলো মনুর তালিকাতেও পাওয়া যায়। অবশ্য অতিরিক্ত যেসব বর্ণের উল্লেখ এই পুরাণে আছে তার মধ্যে পড়ে প্রায় পঞ্চাশটি জনগোষ্ঠী তথা কারুশিল্পী গোষ্ঠী। 'মনুস্মৃতি'তে এঁদের নাম নেই।

স্পষ্টতই, বর্ণের সংখ্যাবিস্তার সম্বন্ধে মনুর ব্যাখ্যা যেমন মানা যায় না, তেমনি পরবর্তী রচনাদিতে এই ব্যাখ্যাকে যে আরও প্রসারিত করা হয়েছে, তা-ও আমরা মানতে পারি না। তাহলে এই সংখ্যাবৃদ্ধি হলো কী করে? যেহেতু সংকরবর্ণের মধ্যে অনেকেই আদিতে ছিল জনগোষ্ঠী, তাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে কী পরিস্থিতিতে তাদের বর্ণব্যবস্থার অংশ করে নেওয়া হলো। আগেই বলা হয়েছে যে, রাজ্যজয় ও বিস্তারই বর্ণ-ভিত্তিক শাসকদের নিয়ে এল সারা দেশের জনগোষ্ঠীয় ও আদিবাসী মানুষদের সংস্পর্শে। এইসব জনগোষ্ঠীয় মানুষ সম্পত্তি, সামাজিক বর্গভেদ ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের ভাগী ছিলেন না। শাসকশ্রেণীর ভাষা তাঁরা বুঝতেন না। তাঁদের প্রাচীন জীবনযাপন পদ্ধতি আঁকড়ে থেকে তাঁরা শাসকদের অসুবিধার সৃষ্টি করেছিলেন। এই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন অশোক; তাই তাঁদের সভ্য জীবনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তিনি

তাঁদের মধ্যে ধর্মনীতি প্রচার করেন। তিনি সফল হয়েছিলেন বলে দাবি করেন, কিন্তু তা কতদূর পর্যন্ত—সে-বিষয়ে আমাদের কোন ধারণা নেই।

মনুর পরবর্তী যুগের যে-সমাজ জনগোষ্ঠীয় মানুষদের গ্রহণ করেছিল এবং যে-পদ্ধতিতে তাঁদের আত্তীকরণ করেছিল, মনুর পরবর্তী যুগে তা বদলে যায়। প্রাচীন সমাজ বর্ণবিভক্ত হলেও অসম ভূমিবণ্টনের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ সেখানে ছিল না। এই বিভাজনের ফলেই কালক্রমে জমিতে সুদৃঢ় ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন কৃষকরাই ছিলেন সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। প্রভূত পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্য, বহুসংখ্যক বর্ধিষ্ণু নগর তথা কারুশিল্প ও ধাতুমুদ্রার ব্যাপক প্রচলন—এসবও সেই সমাজের কাজে লাগত। সেইজন্যই জনগোষ্ঠীগুলোকে চতুঃস্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো এবং তাদের অনেককেই অঙ্গীভূত করে নেওয়া হলো ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরূপে। মনুর ব্রাত্য-তালিকায় নির্দিষ্ট কোন শূদ্রবর্ণের কথা নেই। অপরপক্ষে এতে বারোটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষত্রিয়বর্ণ (যাঁরা সবাই আদিতে এদেশীয় ও বিদেশী জনগোষ্ঠীর লোক) এবং ছটি বৈশ্যবর্ণের জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ ব্রাত্য বর্ণের সংখ্যা হলো পাঁচ। এর মধ্যে মাত্র দুটিকেই আদি জনগোষ্ঠীর অবশেষ বলে মনে হয়। সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য সমাজে অধিযুক্ত এই জনগোষ্ঠীগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তৈরি এই ব্রাত্যতত্ত্বের সূচনা হয়েছিল আরও আগেই, আর মনুর দেওয়া ব্রাত্যের দৃষ্টান্তগুলোকেই যদি পুরনো প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত-বিন্দু বলে ধরা যায়, তাহলে মনে হবে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকেই সমাজের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় স্তরে স্থান দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ স্থান দেওয়া হয়েছিল যোদ্ধা এবং কৃষকরূপে।

জনগোষ্ঠীয় মানুষদের অঙ্গীভূত করার এই ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহায়তা নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা নগদ অর্থ উপহার পেতেন আর সেইসঙ্গে অনুদানরূপে পেতেন ভূখণ্ড। পশ্চিম মহারাষ্ট্র তথা সাঁচি ও ভারহুত অঞ্চলের প্রত্নলেখ নিদর্শনের ভিত্তিতে একথা বলা যায়। আনু. খৃপূ ২০০ - ৫০০ খৃস্টাব্দে যে বিনিময়ের মাধ্যম প্রচলিত ছিল, দানের ধরন স্থির হতো তা-ই দিয়ে। অশোকের 'ধর্মমহামাত্র'র মতো বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকরাও নিশ্চয়ই জনগোষ্ঠীয় মানুষদের মধ্যে বৌদ্ধ সমাজনীতি প্রচারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই নীতিতে যেসব মূল্যবোধের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হতো সেগুলো হলো : পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রমণ ও পুরোহিত ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা, গবাদি পশু সংরক্ষণ এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধা, কারণ পরবর্তী বৌদ্ধ রচনা অনুযায়ী বুদ্ধ কেবল এই দুটি উচ্চতর বর্ণেই জন্মেছিলেন। এই পর্বেই মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের একটি বড় অংশকে সাংস্কৃতিকভাবে আত্মীকৃত করে নেওয়া হয় এবং চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার জোরে এসব অঞ্চলে প্রায় চারটি বর্গই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

অর্থদানের পরিপূরক ছিল ভূখণ্ড-দান। এর অধিকাংশই ছিল পশ্চিম

মহারাষ্ট্রের রাজক্ষেত্রে ('রাজকং খেতম্')। সেখানেই আমরা (এই বিষয়ক) প্রাচীনতম প্রত্নলেখের নিদর্শন পাই। গ্রাম-অনুদানও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের অনুদানে প্রদত্ত গ্রামের রাজস্বই শুধু হস্তান্তর করা হতো, ভূমিস্বত্ব নয়। যাই হোক, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালে দান-পদ্ধতি বস্তুতই বদলে গিয়েছিল। অর্থদানের জায়গায় আসে মূলত ভূমি-দান এবং বৌদ্ধ গ্রহীতার জায়গায় আসেন ব্রাহ্মণ প্রাপক।

'ধর্মমহামাত্র' এবং 'অন্তমহামাত্র'-দের প্রতিনিধিরূপে পাঠানোর বদলে জনগোষ্ঠীয় এলাকায় পরবর্তী শাসকরা ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ বসানোর প্রথাই গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে, অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ভূমিদান করা হয়। চতুর্থ-পঞ্চম শতকে মধ্যপ্রদেশে, পঞ্চম-সপ্তম শতকে ওড়িশায়, ঐ একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে, সপ্তম শতকে আসামে, এবং পঞ্চম-সপ্তম শতকে হিমাচল প্রদেশ ও নেপালে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট মাত্রায় ভূমিদান করা হয়েছে বলে দেখা যায়। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মধ্যে গুজরাটের বলভীর মৈত্রক রাজারা ব্রাহ্মণদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভূমিদান করেছিলেন। অর্থাৎ সংক্ষেপে, চতুর্থ-সপ্তম শতকের মধ্যে সীমান্তস্থিত, প্রত্যন্ত, অনগ্রসর (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য) ও আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায়—যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বাংলা, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও নেপালে—পুরোহিত বর্গের লোকদের প্রভূত ভূমিদান করা হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে ভূমিদান-গ্রহীতার সংখ্যা ছিল অত্যধিক। পঞ্চম শতকে দ্বিতীয় প্রবরসেন একটি দানপত্রের মাধ্যমে একটি জেলাতেই ১০০০ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছেন।[১৫] সপ্তম শতকে আসামে একটিমাত্র দানপত্রের মাধ্যমে ২০৫ জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হয়েছে, এবং বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার বনাকীর্ণ এলাকাতেও একটিই দানপত্রের মাধ্যমে দান করা হয়েছে ১০০ জন ব্রাহ্মণকে। ঐ একই শতকে, একটি ক্ষেত্রে ২৩ জন ব্রাহ্মণ ও অন্যক্ষেত্রে ১২ জন ব্রাহ্মণ কটক অঞ্চলে ভূমি-অনুদান পেয়েছেন এবং পরের শতকে ঐ একই রাজ্যের বালেশ্বর জেলায় ভূমিদান করা হয়েছে ২০০ জন ব্রাহ্মণকে।[১৬]

রাজারা যেসব রাজস্ব সংক্রান্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, তা প্রায় পুরোপুরিই প্রদান করা হতো পুরোহিতবর্গীয় এই প্রাপকদের। নিয়মিতভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ আদায়, খাদ্য, জ্বালানি, ঘাস, কাঠ ইত্যাদি বলপূর্বক আদায়, বেগার শ্রম চাপানো (যাকে বলা হতো 'বিষ্টি' বা 'পীড়া') —এসব সমস্যার মুখে পড়তে হতো ঐ প্রাপকদেরই। প্রয়োজনবোধে তাঁরা

১৫. 'সিলেক্ট্ ইনস্ক্রিপশন্স্', ১ম, পর্ব ৩, নং ৬২, পঙ্‌ক্তি ১৯-২০।

১৬. আরও দৃষ্টান্তের জন্য বি. পি. মজুমদার, 'কলেক্টিভ ল্যাণ্ডগ্রাণ্টস ইন আর্লি মিডিয়েভাল ইনস্ক্রিপশন্স্', 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি', ১০ (১৯৬৮), পৃ ৭-১৭।

ভূমি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত অধিকার ইজারা দিতে পারতেন এবং কোন একদল কৃষকের জায়গায় বসাতে পারতেন অন্য এক দলকে। পরিবার এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়ার কর্তৃত্বও ছিল তাঁদেরই। বহুক্ষেত্রে প্রাপকদের আদেশ পালন করার জন্য গ্রামবাসীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং কতক ক্ষেত্রে তাঁদের সুনির্দিষ্টভাবে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। তাহলেও, যদি-না এইসব নিয়ম সর্বদাই বলবৎ করা হয়ে থাকে, শুধু এসব ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণদের সহায়ক হতো না। কিন্তু, রাজস্ব ও অর্থ-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন প্রশাসন-যন্ত্র ব্রাহ্মণদের ছিল না। এক অর্থে, উৎপন্ন দ্রব্যের একটা বড় অংশের ভোক্তা বলেই তাঁদের মনে হয়; কিন্তু, কৃষক ও কারুশিল্পীদের উৎপাদন করতে বাধা করার মতো কোন পীড়নের উপায় তাঁদের ছিল না। তাঁদের মূলত যা ছিল তা হলো পরিশীলিত আচার-অনুষ্ঠানের শক্তি এবং বর্ণ-ভাবাদর্শ প্রচার করার ও সর্বসাধারণকে তাতে মতান্তরিত করার ক্ষমতা। স্মৃতিগ্রন্থে সম্পত্তি ও অপরাধ-ঘটিত বিভিন্ন বিধান লঙ্ঘনের জন্য অর্থদণ্ড তথা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা প্রয়োগের দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের। শুধু তা-ই নয়, এইসব অপরাধের জন্য বিস্তারিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও আছে, যা অবশ্যই বলবৎ করতেন ব্রাহ্মণরা। কিন্তু এতে জনগোষ্ঠীয় লোকেদের কিছুই এসে যেত না, কারণ তাঁরা বর্ণব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক মূল্যবোধ স্বীকারই করতেন না। ব্রাহ্মণরা তাই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সংগঠনের মধ্যে জনগোষ্ঠীগুলোকে বর্ণে পরিণত করে নেওয়ার চিরাচরিত রীতিটিকে করে তুললেন আরও দ্রুত। এর জন্যই 'মনুস্মৃতি' ও পরবর্তী নানা পুরাণের তালিকায় বহুসংখ্যক সংকরবর্ণের কথা আছে, যাঁরা সবাই শূদ্র। এঁদের জনগোষ্ঠীয় উৎপত্তি সহজেই ধরা পড়ে।

পশ্চাৎপদ এলাকায় ভূমি-দাননির্ভর অর্থনীতির ফলে, বর্ণসংকর শূদ্র রূপে প্রবেশ করল অজস্র জনগোষ্ঠী; আর বসতি এলাকায়, এর ফলে, নিম্নতর স্তরের সামাজিক গতিশীলতা গেল হারিয়ে। গতিশীলতা হারিয়ে যাওয়ার আরও একটি কারণ হলো বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি। খৃস্টীয় প্রথম দুই শতকে সমৃদ্ধ বাণিজ্যের অন্যতম হেতু এই যে, হূণ, কুষাণ ও ইরানীয় ( আর্কাসিড ) সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ায় বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে এবং রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করতেন। খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি নাগাদ প্রথম তিনটি সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হয়,[১৭] এবং রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় আরও এক শতক পরে। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের

১৭ মাইকেল লোয়ে, "আসপেক্ট্স অফ ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইন দ ফার্স্ট সেভেন সেঞ্চুরিজ অফ দ ক্রিশ্চান এরা", 'জার্নাল অফ দ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি', সংখ্যা ২ (১৯৭১), ১৭৭।

এক ক্ষীণ ধারা গুপ্ত যুগেও বহাল ছিল, কারণ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের কিছু বাইজান্টাইন মুদ্রা ভারতে পাওয়া গেছে। কিন্তু ষষ্ঠ শতক থেকে এই বাণিজ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এর একটা কারণ হলো রেশম চাষ শিখে যাওয়ায়, সপ্তম শতক থেকে বাইজান্টিয়াম আর রেশমের জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল রইল না। এমনকি এর আগেও পশ্চিম ভারতে রেশম উৎপাদন ভীষণ কমে গিয়েছিল, কারণ পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি এক রেশম শিল্পগোষ্ঠীর লোকজন গুজরাট বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি নৌসারি-ভরহুচ এলাকা থেকে চলে গিয়ে মালবের মান্দাসোরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের পুরনো বৃত্তি পরিত্যাগ করে নানা পেশায় জড়িয়ে পড়লেন: ধনুর্ধর, কথক, ধর্মোপদেশক (শিক্ষক), জ্যোতিষী, যোদ্ধা ও যতি।[১৮] স্পষ্টতই, এসব কাজ উৎপাদনমূলক ছিল না। চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে, ছোটখাটো ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত অন্যান্য কারুশিল্পী-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

পাশ্চাত্য জগৎ এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের এই অবনতি চীন তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য দিয়ে পূরণ হলো না। তৃতীয়-চতুর্থ শতকে শেষোক্ত দেশগুলিই সম্ভবত পান্না, সুতিবস্ত্র ও চিনির বদলে ভারতে সোনা সরবরাহ করত। ওয়েই বংশের রাজত্বকালে (২২০-২৬৫ খৃস্টাব্দ) চীনারা পাথর থেকে রঙীন কাঁচ তৈরির কলাকৌশল শিখে নেন ভারতীয়দের কাছে। তাকেই পান্না বলে চালানো যেত।[১৯] ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলো-চাষ তথা সুতিবস্ত্র উৎপাদন প্রবর্তিত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতকের ঠিক পরেই চীনারাও ঐসব জায়গা থেকে কাজগুলো শিখে নেন।[২০] তাং সম্রাট্ তাই-ৎসাং-এর রাজত্বকালে (৬২৭-৬৪৯ খৃস্টাব্দ) তাঁরা মগধ থেকে চিনি তৈরির কৌশলও শিখে গেলেন।[২১] ফলত, সপ্তম শতক বা তার কাছাকাছি সময় থেকে চিনি, সুতিবস্ত্র ও মূল্যবান পাথরের জন্য চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর ভারতের উপর নির্ভরশীল রইল না। এর জন্যই এদিকে ভারতীয় বাণিজ্য হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে, ভারত প্রধানত সুগন্ধি আর হাতির দাঁতই সরবরাহ করত।

কুষাণ স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রায় খাঁটি সোনার পরিমাণ ক্রমশ কমে যায়। বাণিজ্যের অবনতির এ-ও এক সূচক। বাসুদেব মুদ্রায় খাঁটি সোনার পরিমাণ ১১৮ গ্রেন, চন্দ্রগুপ্ত-কুমারদেবীর মুদ্রায় ১০৯, বেশ কিছু সমুদ্রগুপ্ত মুদ্রায় ১০৫-০৪, অন্যান্য সমুদ্রগুপ্ত-প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মুদ্রায় ৯৯-৯৮, প্রথম কুমারগুপ্তের ধনুর্ধর মুদ্রায় ৯২, স্কন্দগুপ্তের অনুরূপ

১৮. 'সিলেক্ট্ ইন্‌স্ক্রিপশন্‌স্', ১ম, পর্ব ৩, নং ২৪, শ্লোক ১৬-১৯।

১৯. ত্যান চাং, "এনশেন্ট চায়না'জ কোয়েস্ট ফর ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট্‌স্", 'দ সান ডে স্টেটসম্যান', ম্যাগাজিন সেকশন, ৬ এপ্রিল ১৯৬৯।

২০. ঐ।

২১. ঐ।

মুদ্রায় ৭৯-৬৭ এবং নরসিংহগুপ্তের উত্তরাধিকারীদের মুদ্রায় ৭৩-৫৪ গ্রেন।[২২] অর্থাৎ পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি নাগাদ গুপ্ত মুদ্রায় খাঁটি সোনার পরিমাণ কমে কুষাণ মুদ্রার প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়ায়। ষষ্ঠ শতকের শেষা-শেষি স্বর্ণমুদ্রা প্রায় উবে গেল এবং প্রায় চারশ বছর ধরে হয়ে রইল দুষ্প্রাপ্য। পশ্চিম ভারতে শক এবং গুপ্ত যুগে প্রভূত সংখ্যায় রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। মনে হয় সেগুলো ঐ এলাকায় বাণিজ্যের কাজে লাগত। কিন্তু গুপ্তোত্তর কালে তা-ও কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায়। বড় রকমের বাণিজ্যিক লেনদেনের পক্ষে এ সবই নিশ্চয়ই বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মাঝারি এবং ছোটখাট লেনদেনে ( বিশেষত আন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ) তাম্র-মুদ্রা চালানো যেত। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাম্রমুদ্রাও পাওয়া যায় খুবই কম। দেশের কোন কোন জায়গায় কুষাণ তাম্রমুদ্রার নকল পাওয়া গেছে, কিন্তু কুষাণদের তুলনায় সেগুলোর সংখ্যা সীমিত। সুতরাং, পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি থেকে আভ্যন্তরীণ বাজারও যে যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে এসেছিল, মুদ্রার স্বল্পতা তা-ই নির্দেশ করে।

বাণিজ্য এবং ছোটখাট ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের অবনতির ব্যাপারটি আরও পরিস্ফুট হয় গুপ্ত যুগের ক্ষয়িষ্ণু নগর-বসতিগুলো থেকে, গুপ্তোত্তর যুগে যেগুলো পরিত্যক্ত হয়েছিল। উত্তর ভারতে নগর-বসতির একাধিক এলাকা খননের ফলে দেখা যাচ্ছে, প্রায় খৃপূ পঞ্চম থেকে তৃতীয় শতক অবধি গঠন-রীতি ক্রমাগত উন্নত হয়েছে ; কুষাণ স্তর হলো সবচেয়ে সমৃদ্ধ। পাকিস্তানে কুষাণ পর্যায় এত সমৃদ্ধ যে একে ঐ দেশের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কিন্তু উত্তর ভারতে গুপ্ত স্তরে এসে আমরা লক্ষ করি : তাঁদের ঘর-বাড়িতে কুষাণদের ইঁটই আবার ব্যবহার করা হয়েছে। গুপ্তোত্তর কালের যেসব জায়গায় খনন-কার্য চালানো হয়েছে তার অধিকাংশই ছিল পরিত্যক্ত, কারণ জনবসতির প্রায় কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। একই সাক্ষ্য দিয়েছেন য়ুয়ান চাং-ও। তিনি অবশ্য শুধু বৌদ্ধ নগরগুলোর অবনতিই লক্ষ করেছেন। কিন্তু তার সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট এবং বহু ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্য প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকেও সমর্থিত হয়।[২৩] সুতরাং নগরের অবক্ষয়ের অর্থ দাঁড়ায় কারুশিল্প ও বাণিজ্যকর্মের হ্রাস।

ভূমিদান প্রথার সঙ্গে বাণিজ্যের অবনতি মিলে এমন এক অবস্থা তৈরি করল যাতে আধা-ভোগ্যপণ্য উৎপাদন থেকে এক ধরনের স্বাভাবিক

২২. এস কে. মাইতি, 'ইকনমিক লাইফ অফ নর্থ ইণ্ডিয়া ইন দ গুপ্ত পিরিয়ড' ( কলকাতা, ১৯৫৭ ), পরিশিষ্ট ৩, পৃ ২০২ ও সারণি ১(গ), পৃ ২০৫-এর ভিত্তিতে ; আমার "ইণ্ডিয়ান ফিউডালিজম রিটাচ্‌ড্", 'দি ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রিভিউ', ১ (১৯৭৪), পৃ ৩২২-২৩-ও দ্র.।

২৩ রামশরণ শর্মা, "ডিকে অফ গ্যাঞ্জেটিক টাউনস ইন গুপ্ত অ্যাণ্ড পোস্ট-গুপ্ত টাইম্‌স্", 'জার্নাল অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি', সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ ১৩৫-৫৭।

অর্থব্যবস্থাতে ফিরে যেতে হয়। এই ব্যবস্থায় লোকে সাধারণত ভূমির সঙ্গেই যুক্ত থাকতেন এবং ভূমিদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগের মাধ্যমেই দেওয়া হতো যাবতীয় পারিশ্রমিক। ভূমি লাভের জন্য ব্রাহ্মণরা যেতেন স্থান থেকে স্থানান্তরে, হস্তশিল্পী ও বণিকদের কিন্তু তা করতে হতো না। বিবাহ তথা সবর্ণ-আহার জাতীয় সামাজিক আদান-প্রদান একটা ছোট গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকত; আর বিধান দেওয়া হয়েছিল যে ব্রাহ্মণরা দূরদেশী কোন লোকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন না। আঞ্চলিক তথা বৃত্তিগত গতিশীলতা হারিয়ে যাওয়ায় সমাজের নিম্নস্তরে এক বিশুদ্ধ কৃষিনির্ভর অর্থব্যবস্থায় বৃত্তি-ভিত্তিক হস্তশিল্পী-গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন জাতিতে জড়ীভূত হয়ে যেতে লাগল। বিশেষত প্রাচীনতর জনবসতিগুলোর ক্ষেত্রে সম্ভবত একথাই সত্য।

কারুশিল্প তথা বাণিজ্যের অবনতির ফলে বণিক ও কারুশিল্পীদের প্রতি ভূস্বামী শ্রেণীর—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের—মনোভাব কঠোর হয়ে উঠল। যাঁরা বাঁশ ও চামড়ার কাজ করতেন তাঁদের রাখা হলো অস্পৃশ্যের পর্যায়ে। কিন্তু সংকর, অর্থাৎ শূদ্র বর্ণের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাখ্যা হিসেবে যে মূল কারণের কথা বলা হয়েছে, জনগোষ্ঠীয় লোকদের রূপান্তর তথা বৃত্তিগোষ্ঠীগুলোর জড়ীভবনের ক্ষেত্রে কাজ করেছে ঐ একই কারণ। তা হলো ভূমি অনুদান-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিস্তৃতি এবং সামন্ততান্ত্রিক আঞ্চলিকতার সূচনা, যাতে প্রত্যেককেই তাঁর ভূমি, গ্রাম, প্রভু অথবা খরিদদারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে হতো। খরিদদার বা প্রভুর পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তাঁদের কারুশিল্পী বা কৃষকদের নয়। যে-সমাজে ছোটখাট ভোগ্যপণ্য উৎপাদন কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে, এই অপরিবর্তনীয়তা হলো তারই পরিণাম। এতে তৈরি হলো স্থায়িত্ব ও বর্ণের সংখ্যাবিস্তারের বাতাবরণ।

মনে হয়, আগেকার দিনে কারুশিল্পীরা তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রি করতেন এবং তাঁদের (প্রাপ্য) মেটানো হতো নগদে। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিক থেকে উৎপন্নের একটা ভাগ দেওয়া ছাড়া ভূমিদানও হয়ে উঠল তাঁদের প্রাপ্য চোকানোর এক পদ্ধতি। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা থেকে প্রাপ্ত ৫০৭ খৃস্টাব্দের একটি তাম্রশাসনে বিক্রয়ের একটি নথি লিপিবদ্ধ আছে। এর থেকে আমরা পরিষেবা-অনুদানের পরোক্ষ ইঙ্গিত পাই। ব্রাহ্মণদের অনুদত্ত ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করার সময় প্রতিবেশী অন্যান্য চাষীদের ভূখণ্ডগুলিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় অনেক হস্তশিল্পীও আছেন। আছে 'কালাক'দের জমির কথা।[২৪] সম্ভবত এঁরাই হলেন কৌলিক বা তাঁতি। বিষ্ণুবর্ধকি নামে এক ছুতোর[২৫] এবং বৈদ্যের জমির স্পষ্ট উল্লেখ আছে।[২৬] তিনজন লোকের নামের শেষে আছে

২৪. 'সিলেক্ট্ ইনস্ক্রিপশনস্', ১ম, পর্ব ৩, নং ৩৭, পঙ্‌ক্তি ২৫।

২৫ ঐ, পঙ্‌ক্তি ১৯।

২৬. ঐ, পঙ্‌ক্তি ২২।

'বিলাল'।[২৭] এ'দের তিনজনের তিনটি ভূখণ্ডের কথাও আছে। ছুতোরদের মতো এঁরাও যন্ত্রজীবী জাতির লোক বলে মনে হয়।[২৮] এছাড়া 'জা (জো)-লারী-ক্ষেত্র'র উল্লেখও পাওয়া যায়।[২৯] সম্ভবত, এটি ছিল তাঁতিদের। অনুরূপভাবে, 'বি (ডু) গুগুরিক-ক্ষেত্র'[৩০] মানে হয়তো কোন 'বাগুরিক' বা ব্যাধের জমি। কয়েকটি ক্ষেত্রে হস্তশিল্পীদের সনাক্ত করায় সংশয়ের অবকাশ থাকলেও, হস্তশিল্পী ও অন্যান্যদের যে পরিষেবা-অনুদান দেওয়া হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁদের কাজের বিনিময়ে দ্রব্যে পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা। স্বাভাবিকভাবেই, এ দুই-এ মিলে, তাঁরা নিজের জমির মধ্যে আটকে থাকতে বাধ্য হতেন এবং দুষ্কর হয়ে উঠত তাঁদের যাতায়াত। কারুশিল্পগুলো বর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে এটি দ্রুততর করে এবং 'যজমানী' প্রথার উদ্ভবে সহায়ক হয়।

২৭. ঐ, পঙ্‌ক্তি ১৯, ২১-২২, ২৮।
২৮. ঐ, পৃ ৩৪৫, টী. ১।
২৯. ঐ, পঙ্‌ক্তি ২৪।
৩০. ঐ, পঙ্‌ক্তি ২৬।

# গ্রন্থপঞ্জি

## একাধিক অধ্যায়ে ব্যবহৃত সূত্র


### ক. মূলগ্রন্থ

**মহাকাব্য**

মহাভারত

( কলকাতা সংস্করণ ) এন. শিরোমণি ও অন্যান্য সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলকাতা ১৮৩৪-৩৯। ইংরিজি অনুবাদ: কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী, প্রতাপচন্দ্র রায় প্রকাশিত. কলকাতা, ১৮৮৪-৯৬।

( কুম্ভকোণম সংস্করণ ) টি. আর. কৃষ্ণাচার্য ও টি. আর. ব্যাসাচার্য সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯০৫-১০।

(প্রামাণিক সংস্করণ) একাধিক হাতে সম্পাদিত, পুণা, ১৯২৭-৬৬। অন্য সূত্রের কথা বলা না থাকলে এই সূত্রই উল্লেখ করা হয়েছে।

জয় সংহিতা, অর্থাৎ 'দি উর-মহাভারত', ২ খণ্ড, সংকলক কেশবরাম. কে. শাস্ত্রী, আহমেদাবাদ, ১৯৭৭।

বাল্মীকি রামায়ণ

কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ সম্পাদিত, ২ ভাগ, বোম্বাই, ১৮৮৮।

পুরাণ

অগ্নি পুরাণ। মন্মথনাথ দত্ত অনূদিত। ২ খণ্ড, কলকাতা, ১৯০৩-০৪।

ভাগবত পুরাণ। বোম্বাই, ১৯০৫।

ভবিষ্য পুরাণ। বোম্বাই, ১৯১০।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। বোম্বাই, ১৯১৩।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলকাতা, ১৮৬২। এফ. ই. পার্জিটার অনূদিত। কলকাতা, ১৯০৪।

মৎস্য পুরাণ। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলকাতা, ১৮৭৬।

*The Purāṇa Text of the Dynasties of the Kali Age*, Tr. F. E. Pargiter, Oxford, 1913.

বায়ু পুরাণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত। ২ খণ্ড, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলকাতা, ১৮৮০-৮৮।

বিষ্ণু পুরাণ। শ্রীধরস্বামীর টীকা সমেত। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত। কলকাতা, ১৮৮২। এইচ. এইচ. উইলসন অনূদিত, ৫ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৬৪-৭০।

প্রত্নলেখ

D. C. Sircar, *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization*, i, Calcutta, 1942.

খ. অভিধান ও সূত্র-গ্রন্থ

W. H. Gilbert, *Caste in India* ( Bibliography ), Pt. I, Cyclostyled copy, Washington, 1948.

Laxmanshastri Joshi, *Dharmakośa*, Vol. I ( in three parts ), Wai, Dist. Satara, 1937-41 ; Vol. III, pt. I. Wai, 1959.

H. G. Liddell and R. Scott, *A Greek-English Lexicon*, 2 vols., Oxford, 1925-40.

G. P. Malalasekera, *A Dictionary of Pali Proper Names*, 2 vols., London, 1937-8.

A. A. Macdonell and A. B. Keith, *Vedic Index of Names and Subjects*, 2 vols., London, 1912.

Monier Monier-Williams, *A Sanskrit-English Dictionary*, Oxford, 1951.

J. Muir, *Original Sanskrit Texts*, i, London, 1872.

T. W. Rhys Davids and W Stede, *Pāli-English Dictionary*, PTS, London, 1921.

H. H. Wilson, *A Glossary of Judicial and Revenue Terms etc.*, London, 1885.

গ. ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস

S. N. Dasgupta and S. K. De, *A History of Sanskrit Literature* ( Classical Period ), vol. i, Calcutta, 1947.

A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Oxford, 1928.

B. C. Law, *A History of Pali Literature*, vol. i, London, 1933.

Albrecht Weber, *The History of Indian Literature*, Tr. from 2nd German Edn. by J. Mann and T. Zachariae, London, 1876.

M. Winternitz, *A History of Indian Literature*, Vol. i, Tr. from German by Mrs. Ketkar, Calcutta.

—, *Geschichte der Indischen Literatur*, Vols. ii-iii, Leipzig, 1920.

ঘ. সাধারণ গ্রন্থাদি

K. Antonova, G. Bongard-Levin & G. Kotovsky, *A History of India*, Book I, Moscow, 1979.

L. D. Barnett, *Antiquities of India*, London, 1913.

A. L. Basham, *The Wonder that was India*, London, 1954.

M. I. Finley, *The Ancient Economy*, University of California Press, 1973.

Raymond Firth (ed.), *Themes in Economic Anthropology*, London, 1975.

Max Gluckman, *Politics, Law and Ritual in Tribal Society*, Basil Blackwell, 1977.

Maurice Godelier, *Perspectives in Marxist Anthropology*. Cambridge, 1977.

D. D. Kosambi, *An Introduction to the Study of Indian History*. Bombay, 1956.

Lawrence Krader (ed. & tr.), *The Ethnological Notebooks of Karl Marx*, Assen, 1972.

Gunnar Landman, *The Origin of the Inequality of the Social Classes*, London, 1938.

Christian Lassen, *Indische Alterthumskunde*, 4 vols., Leipzig, 1847-1861.

R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri and K. K. Datta, *An Advanced History of India*, London, 1948.

R. C. Majumdar and A. D. Pusalker, *The Vedic Age*, London, 1951.

—, *The Age of Imperial Unity*, Bombay, 1951.

K. A. Nilakanta Sastri, *The Mauryas and Satavahanas*, Bombay, 1957.

H C. Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, 6th Edn., Calcutta, 1953.

E. J. Rapson, *The Cambridge History of India*, Vol. i, Cambridge, 1922.

Walter Ruben, *Einfuhrung in die Indienkunde*, Berlin, 1954.

V. A. Smith, *Early History of India*, 4th Edn. revised by S. M. Edwardes, Oxford, 1924.

Emmanuel Terray, *Marxism and Primitive Societies*, New York, 1972.

**ঙ. সহায়ক গ্রন্থাদি, প্রধানত প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিষয়ক**

K. V. Rangaswami Aiyangar, *Some Aspects of the Hindu View of Life according to Dharmaśāstra*, Baroda, 1952.

A. S. Altekar, *Education in Ancient India*, Banaras, 1934.

B. R. Ambedkar, *Who were the Shudras ?* ( How they came to be the Fourth Varna in the Indo-Aryan Society), Bombay, 1946.

—, *The Untouchables* ( Who were they ? And why they became Untouchables ? ), New Delhi, 1948.

A. Baines, *Ethnography*, Strassburg, 1912.

Narayanchandra Bandyopadhyaya, *Economic Life and Progress in Ancient India*, Calcutta, 1945.

N. N. Bhattacharya, *Ancient Indian Rituals and Social Content*, Delhi, 1975.

S. C. Bhattacharya, *Some Aspects of Indian Society from 2nd Century B.C. to 4th Century A.D.*, Calcutta, 1978.

G. M. Bongard-Levin, "Some Problems of the Social Structure of Ancient India", *History and Society : Essays in Honour of Professor Niharranjan Ray*, Calcutta, 1977, pp. 199-227.

Atindranath Bose, *Social and Rural Economy of Northern India* ( *cir.* 600 B.C.-200 A.D.), 2 vols., Calcutta, 1945.

Devraj Chanana, "Ideological Aspects of Slavery in Ancient India", *Journal of the Oriental Institute*, viii, 1959.

—, *Slavery in Ancient India*, English edn., Delhi, 1960.

Moti Chandra, *Geographical and Economic Studies in the Mahābhārata*, Lucknow, 1945.

—, *Sārthavāha*, Patna, 1953.

K. P. Chattopadhyaya, *The Ancient Indian Culture Contacts and Migrations*, Calcutta, 1970.

K. L. Daftari, *The Social Institutions in Ancient India*, Nagpur, 1947.

S. A. Dange, *India from Primitive Communism to Slavery*, Bombay, 1949.

Santosh Kumar Das, *The Economic History of Ancient India*, Calcutta, 1944.

J. D. M. Derrett, *Religion, Law and State in Ancient India*, London, 1968.

M. G. Dikshit, *History of Indian Class*, Bombay, 1969.

Bhupendranath Dutt, *Studies in Indian Social Polity*, Calcutta, 1944.

N. K. Dutt, *Origin and Growth of Caste in India*, Vol. i, (*c*. B.C. 2000-300), London, 1931.

U. N. Ghoshal, *Contributions to the History of Hindu Revenue System*, Calcutta, 1929.

G. S. Ghurye, *Caste and Class in India*, Bombay, 1950.

L. Gopal, "Slavery in Ancient India", *JAHRS*, xxvii, 70-89.

R. C. Hazra, *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs*, Dacca, 1940 ; 2nd edn., Delhi, 1975.

E. W. Hopkins, "Position of Ruling Caste in Ancient India", *JAOS*, xiii, 57-376.

J. H. Hutton, *Caste in India*, Oxford, 1951.

Jagadish Chandra Jain, *Life in Ancient India as Depicted in the Jain Canons*, Bombay, 1947.

P. C. Jain, *Labour in Ancient India*, New Delhi, 1971.

Suvira Jaiswal, *Caste in the Socio-Economic Framework of Early India*, Presidential Address, Section I, Indian History Congress, 38th Session, Bhubneshwar, 1977.

—, *Origin and Development of Vaiṣṇavism* ( *c*. 200 B.C. - A.D. 500), Delhi, 1967.

—, "Some Recent Theories of the Origin of Untouchability : A Historiographical Assessment," *Indian History Congress, Proceedings of the Thirty-ninth Session*, Hyderabad, 1978, 218-229.

K. P. Jayaswal, *Hindu Polity*, 2 pts., Calcutta, 1924.

—, *Manu and Yājñavalkya*, Calcutta, 1930.

D. N. Jha, "Social Changes in Ancient India", *Economic and Political Weekly*, xiv, No. 35, 1 September 1979, 1499-1500.

Vivekanand Jha, "From Tribe to Untouchable : The Case of the Niṣādas", *Indian Society : Historical Probings*, ed. R. S. Sharma and V. Jha.

V. Jha "Stages in the History of Untouchables," *IHR*, ii, 14-31.

—, "Untouchables in Early Indian History," Ph. D. Thesis, Patna University, 1972.

—, Varṇasaṃkara in the Dharmasūtras", *JESHO*, xiii, 273-88.

J. Jolly, *Hindu Law and Custom*, Calcutta, 1928, Tr. S. K. Das from the German Edn. of 1896.

P. V. Kane, *History of Dharmaśāstra*, Vol. ii, Poona, 1941.

S. V. Ketkar, *The History of Caste in India*, New York, 1909.

D. D. Kosambi, *The Culture and Civilization of Ancient India in its Historical Outline*, London, 1965.

B. C Law, *Tribes in Ancient India*, Poona, 1943.

R. C. Majumdar, *Corporate Life in Ancient India*, Calcutta, 1922.

R. K. Mookerji, *Ancient India Education*, London, 1940.

—, *Local Government in Ancient India*, Oxford, 1920.

Pran Nath, *A Study in the Economic Condition of Anclent India*, London, 1929.

Robert A. Padgug, "Problems in the Theory of Slavery and Slave Society," *Science and Society*. xl, No. 1, 1976, 3-27.

Jaimal Rai, *The Rural-Urban Economy and Social Changes in Ancient India*, Varanasi, 1974.

Dev Raj, *L'Esclavage dans l'Inde ancienne d'apres les Textes Palis et Sanskrits*, Pondichery, 1957.

H. Risley, *The People of India*, London, 1915.

Walter Ruben, *Die Lage der Sklaven in der altindischen Gesellschaft*. Berlin, 1957.

—, *Die ökonomische und soziale Entwicklung Indiens*, Berlin, 1959.

—, *Über die Fruhesten Stufen der Entwicklung der altindischen Śūdras*, Berlin, 1965.

—, *Die gesellschaftliche Entwicklung im alten Indien*, II. Die Entwicklung von Staat und Recht, Berlin, 1968.

—, *Kulturgeschichte Indiens*, Berlin, 1978.

B. A. Saletore, *The Wild Tribes in Indian History*, Lahore, 1935.
K. M. Saran, *Labour'in Ancient India*, Bombay, 1957.
Emile Senart, *Caste in India*, Tr. Denison Ross from the French Edn. *Les Castes dans l'Inde* (Paris, 1896), London, 1930.
R. N. Sharma, *Brahmins Through Ages*, Delhi, 1977.
R. S. Sharma, *Ancient India*, New Delhi, 1977.
—, *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India*, 2nd edn., Delhi, 1968.
— ( and D. N. Jha ) "Economic History of India up to A. D. 1200 : Trends and Prospects", *JESHO*, xvii, pt. 1, 1974.
—, *Light on Early Indian Society and Economy*, Bombay, 1966.
Romila Thapar, *Social History of Ancient India*, New Delhi, 1979
G. P. Upadhyay, *Brāhmaṇas in Ancient India*, New Delhi, 1979.
P. H. Valavalkar, *Hindu Social Institutions*, London, 1939.
Max Weber, *The Agrarian Sociology of Ancient Civilizzation*, London, 1976.
Lynn White, Tr., *Medieval Religion and Technology*, California, 1978.

## প্রথম অধ্যায়

### ইতিহাস রচনার ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

R. G. Bhandarkar, *Collected Works*, Ed. N. B. Utgikar and V. G. Paranjpe, 4 vols., Poona, 1927-33.
V S. Bhattacharya, "The Status of the Śūdras in Ancient India", *Vishwa Bharati Quarterly*, 1924.
H. T. Colebrooke, *Miscellaneous Essays*, Ed. E. B. Cowell, 2 vols., London, 1873.
J. C. Ghosh, *Brahmanism and the Sudra*, Calcutta, 1902.
Mountstuart Elphinstone, *The History of India*, London, 1841.
N. B. Halhed, *A Code of Gentoo Laws*, London, 1776.
Alfred Hillebrandt, "Brahmanen und Śūdras", *Festschrift für Karl Weinhold*, Breslau, 1896, pp. 53-57.
William Jones, *Institutes of Hindu Law or the Ordinances of Manu* (Tr.), Calcutta, 1794.

James Mill, *The History of India,* Vols. i and ii, 2nd edn., London, 1820.

Raja Rammohun Roy, *The English Works,* 3 vols., Ed. J. C. Ghosh, Calcutta, 1901.

Swami Dayananda Sarasvati, *Satyārthaprakāśa,* Ajmer, Saṃvat 1966.

Chitra Tiwari, *Śūdras in Manu,* Delhi, 1963.

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### উৎপত্তি

মূল সূত্রাদি

*Atharva Veda* ( of the Paippalādas ), Ed. Raghu Vira, Lahore, 1936-41.

*Atharva Veda Saṃhitā* ( School of the Śaunakas ), Ed. C. R. Lanman, Tr. W. D. Whitney, *HOS*, vii and viii, Harvard University, 1905. Ed. R. Roth and W. D. Whitney, Berlin, 1856. With the comm. of Sāyaṇa, Ed. S. Pāṇḍurang, Paṇḍit, 4 vols., Bombay, 1895-98. Tr. R. T. H. Griffith, 2 vols., Banaras, 1916-17. Unless otherwise stated the references are to the Śaunaka recension.

*Bhaviṣyatkathā* by Dhanapāla, Ed. C. D. Dalal and P. D. Gune, *GOS*, xx, Baroda, 1923.

J. W. McCrindle, *Ancient India as Described by Ptolemy,* Calcutta, 1885.

—, *The Invasion of India by Alexander the Great,* Westminister, 1893.

*Ṛg Veda Saṃhitā* with the comm. of Sāyaṇa, 5 vols., Vaidika Samshodhan Mandal, Poona, 1933-51. Tr. of the first six Maṇḍalas, H. H. Wilson, London, 1850-7. Tr. in German, K. F. Geldner, *Der Rig-Veda, HOS,* xxxiii-xxxvi, Cambridge, Massachusetts, 1951-1957.

*Vedānta-Sūtra* of Bādarāyaṇa with the comm. of Śaṅkarācārya, 2 vols., *BI,* Calcutta, 1863. Tr. George Thibaut, *SBE,* xxxiv, Oxford, 1890.

সহায়ক গ্রন্থাদি

H. W. Bailey, "Iranian Arya and Daha," *Transaction of the Philological Society*, London, 1959.

V. S. Bhattacharya Sastri, "Śūdra", *IA*, li, 137-39.

T. Burrow, *The Sanskrit Language*, London, 1955.

Jarl Charpentier, *Brahman*, Uppsala, 1932.

V. Gordon Childe, *The Aryans*, London, 1926.

—, *New Light on the Most Ancient East*, London, 1954.

Georges Dumezil, *Flamen-Brahman*, Paris, 1935.

—, "La Prehistoire Indo-Iranienne des Castes", *Journal Asiatique* ( Paris ), ccxvi, 109-130.

R. Ghirshman, *Iran* ( Pelican Series ), 1954.

N. N. Ghosh, "The Origin and Development of Caste System in India", *IC*, xii, 177-191.

Hermann Grassmann, *Wörterbuch zum Rig-Veda*, Leipzig, 1873.

Robert Heine-Geldern, "Archeological Traces of Vedic Aryans", *Journal of the Indian Society of Oriental Art* (Calcutta), vi, 87-115.

G. J. Held, *The Mahābhārata : An Ethnological Study*, London and Amsterdam, 1935.

P. V. Kane, "The Word *Vrata* in the *Ṛgveda*", *JBBRAS*, NS, xxix, 1-28.

D. D. Kosambi, "Brahmin Clans," *JBBRAS*, lxxiii, 1953, 202-8.

—, "Early Brahmins and Brahminism", *JBBRAS*, NS, xxiii, 39-46.

—, "On the Origin of Brahmin Gotras", *JBBRAS*, NS, xxvi, 21-80.

—, "Early Stages of the Caste System in Northern India", *JBBRAS*, NS, xii, 32-48.

B. B. Lal, "Protohistoric Investigation", *AI*, No. 9.

—, "The Indo-Aryan Hypothesis vis-a-vis Archaeology", Cyclostyled copy of a paper read at the Seminar on "Ethnic Problems of the Early History of the Peoples of Central Asia and India in the Second Millennium B. C." held at Dushanbe ( USSR ) from 17 to 22 October 1977.

E. Mackay, *Early Indus Civilizations*, 2nd Edn., London, 1948.

F. E. Pargiter, *Indian Historical Tradition*, London, 1922.

Louis Renou, *Vedic India*, Calcutta, 1957.

R. Roth, "Brahma und die Brahmanen", *ZDMG*, i. 66-86.

W. Ruben, "Indra's Fight against Vṛtra in the Mahābhārata", *S. K. Belvalkar Felicitation Volume* (Banaras, 1957),113-26.

Robert Shafer, *Ethnography of Ancient India* (on the basis of the *Mahābhārata*), Wiesbaden, 1954.

R. S. Sharma, "Conflict, Distribution and Differentiation in Rigvedic Society", *IHR*, iv, No. 1, 1977, 1-12.

—, Forms of Property in the early Portions of the *Ṛgveda*", *Essays in Honour of Prof. S. C. Sarkar*, New Delhi, 1976, pp. 39-50.

E. L. Stevenson, *Geography of Claudius Ptolemy*, New York, 1932.

Suryakanta, "Kīkaṭa, Phaliga and Paṇi", *S. K. Belvalkar Felicitation Volume*, 43-44.

J. Wackernagel, "Indoiranisches", *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, 1918, pp. 380-411.

R. E. Mortimer Wheeler, *The Indus Civilization* (Suppl. vol. to *CHI*, i), Cambridge, 1953.

## তৃতীয় অধ্যায়

### গোষ্ঠী বনাম বর্ণ

( আনু. খৃপূ ১০০০ - ৫০০ )[১]

মূল সূত্রাদি

*Aitareya Brāhmaṇa* with the comm. of Sāyaṇa, Ed. A. Weber, Bonn, 1879, Tr. Martin Haug, Bombay, 1863.

*Āpastamba Śrautasūtra* with the comm. of Rudradatta, Ed. Richard Garbe, 3 vols., Calcutta, 1882-1902. Ed. and Tr. W. Caland, 3 vols., Göttingen-Leipzig-Amsterdam, 1921-1928.

*Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad* with the comm. of Śaṅkarācārya, Tr. Swami Madhavananda, Almora, 1950.

১. গ্রন্থগুলি যে পর্বে ধার্য হয়েছে অবধারিতভাবে সেগুলি সেই পর্বেরই নয় বা সেই পর্ব সংক্রান্ত নয়। কোন পর্বের আদি ও অন্তের সুনির্দিষ্ট স্থিরবিন্দু পাওয়াও কঠিন।

*Bṛhad-devatā* attributed to Śaunaka, Ed. and Tr. A. A. Macdonell, *HOS*, v and vi, Harvard, 1904.

*Chāndogya Upaniṣad*, Text, Tr. and Annotation, Emile Senart, Paris, 1930.

*Drāhyāyaṇa Śrautasūtra* with the comm. of Dhanvin, Ed. J. N. Reutter, London, 1904.

*Gopatha Brāhmaṇa*, Ed. Dienke Gaastra, Leiden, 1919.

*Jaiminīya Brāhmaṇa of the Sāma Veda*, Ed. Raghu Vira and Lokesh Chandra, Nagpur, 1954.

*Das Jaiminīya Brāhmaṇa in Auswahl*, Ed. and Tr. into German, W. Caland, Amsterdam, 1919.

*Jaiminīya Śrautasūtra*, Ed. and Tr. into German, D. Gaastra, Leiden, 1906.

*Jaiminīya or Talavakāra Upaniṣad Brāhmaṇa*, Ed. Rama Deva, Lahore, 1921.

*Kāṇva Saṃhitā of the Śukla Yajur Veda*, Ed. Madhava Sastri, Banaras, 1915.

*Kapiṣṭhala-Kaṭha Saṃhitā*, Ed. Raghu Vira, Lahore, 1932.

*Kāṭhaka Saṃhitā*, Ed. Leopold von Schroeder, Leipzig, 1900-1910.

*Kātyayana Śrautasūtra* with the comm. of Karkācārya, Ed. Madanmohan Pathak, Banaras, 1904.

*Lāṭyavana Śrautasūtra*, with the comm. of Agnisvāmin, Ed. Ānandacandra Vedāntavāgīśa, *BI*, Calcutta, 1872.

*Maitrāyaṇī Saṃhitā*, Ed. Leopold von Schroeder, Leipzig, 1923.

*Nighaṇṭu and Nirukta*, Ed. and Tr. Lakshman Sarup. Text, University of Punjab, 1927. Eng. Tr. and notes, Oxford, 1921.

*Ṛg Veda Brāhmaṇas: Aitareya and Kauṣītaki Brāhmaṇas*. Tr. A. B. Keith, *HOS*, xxv, Harvard, 1920.

*Śāṅkhāyana Brāhmaṇa*, *ASS*, No. 35, 1911.

*Śāṅkhāyana Śrautasūtra*, Ed A. Hillebrandt, *BI*, Calcutta, 1888.

*Śatapatha Brāhmaṇa* (Mādhyandina recension), Ed. V. Sharma Gauḍa and C. D. Sharma, Kasi, Saṃvat 1994-97.

*Satyāṣāḍha (Hiraṇyakeśin) Śrautasūtra* with the comm. of Mahādeva, *ASS*, 1907.

*Taittirīya Brāhmaṇa of the Black Yajur Veda*, with the comm. of Sāyaṇa, Ed. R. L. Mitra, 3 vols., Calcutta, 1859-70

*Taittirīya Saṃhitā*, Ed. A. Weber, *Indischen Studien*, Band 11 and 12, Leipzig, 1871-2. Tr. A. B. Keith, ***HOS***, xviii and xix, Harvard, 1914.

*The Thirteen Principal Upaniṣads*, Tr. R.E. Hume, Oxford, 1931.

*Vājasaneyi Saṃhitā* (Mādhyandina recension) with the comm. of Uvaṭa and Mahīdhara, Ed. Wāsudev Laxmaṇ Shāstrī Paṇśīkar, Bombay, 1912.

*Vārāha Śrautasūtra*, Ed. W. Caland and Raghu Vira, Lahore, 1933.

*Zend-Avesta*, pt. I Vendīdād, Tr. James Darmesteter, ***SBE***, iv, Oxford, 1880.

সহায়ক গ্রন্থাদি

A. C. Banerjea, "Studies in the Brāhmaṇas", Ph. D. Thesis. London University, 1952.

Jogiraj Basu, *India of the Age of the Brāhmaṇas*, Calcutta, 1969.

M. Bloomfield, *The Atharvaveda*, Strassburg, 1899.

H. M. Chadwick, *The Heroic Age*. Cambridge, 1912.

R. G. Forbes, *Metallurgy in Antiquity*, Leiden. 1950.

Wilhelm Geiger, *Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times*, Tr. from the German by D. D. Poshotan Sanjānā, Vol. i, London, 1885.

A. Hillebrandt, "Zur vedischen Mythologie und Völkerbewegung", *ZII*, Band 3, Leipzig, 1925.

A. A. Macdonell, *A Vedic Grammar for Students*, Oxford, 1916.

J. Muir, "Relation of the Priests to the other Classes of Indian Society in the Vedic Age", *JRAS*, NS, ii (1866), 257-302.

Emile Benveniste, *Indo-European Language and Society*. London, 1973.

G. C. Pande, *Studies in the Origins of Buddhism*, Allahabad, 1957.

R. S. Sharma, "Class Formation and its Material Basis in the Upper Gangetic Basin (*c.* 1000-500 B. C.)", *IHR*, ii, No. 1, 1975, 1-13.

—, "The Later Vedic Phase and the Painted Grey Ware Culture", ***History and Society: Essays in Honour of Professor Niharranjan Ray***, Calcutta, 1978, pp. 133-41.

George Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, i, London, 1949.
Vibha Tripathi, *The Painted Grey Ware : An Iron Age Culture of Northern India*, Delhi, 1975.
A. Weber, "Collectanea über die Kastenverhaltnisse in den Brāhmaṇa und Sūtra", *Indische Studien*, x, 1-160.
—, Der erste Adhyāya des ersten Buches des Śatapatha-Brāhmaṇa", *ZDMG*, iv, 289-304.
Heinrich Zimmer, *Altindisches Leben*, Berlin, 1879.

## চতুর্থ অধ্যায়

### দাসপ্রথা ও বাধ্যতামূলক শ্রম

( আনু. খৃপূ. ৬০০ - ৩০০ )

মূল সূত্রাদি

ক. ব্রাহ্মণ্য

*Āpastamba Dharmasūtra*, Ed. G. Bühler, Bombay, 1932.
*Āśvalāyana Gṛhyasūtra* with the comm. of Haradattācārya, Ed. T. Gaṇapati Śāstrı, Trivandrum, 1923.
*Baudhāyana Gṛhyasūtra*, Ed. R. Shamasastry, Mysore, 1927.
*Baudhāyana Dharmasūtra*, Ed. E. Hultzsch, Leipzig, 1884.
*Gautama Dharmasūtra*, Ed. A. S. Stenzler, London, 1876, with the comm. of Maskarin, Ed. L.Srinivasacharya, Mysore, 1917.
*Pāṇini-Sūtra-Pāṭha and Pariśiṣṭas* with Word Index, compiled by S. Pathak and S. Chitrao, Poona, 1935.
*Pāraskara Gṛhyasūtra*, Bombay, 1917.
*Śāṅkhāyana Gṛhyasūtra*, Ed. H. Oldenberg in *Indische Studien*, xv., pp. 13f.
*Vaśiṣṭha Dharmaśāstra*, Ed. A. A. Führer, Bombay, 1916.
Translations of the Gṛhyasūtras of Śāṅkhāyana, Āśvalāyana, Pāraskara, Khadira, Gobhila, Hiraṇyakeśin and Āpastamba by H. Oldenberg in *SBE*, xxix and xxx, Oxford, 1986-92.
Trs. of the Dharmasūtras of Āpastamba, Gautama, Vaśiṣṭha and Baudhāyana by G. Bühler in *SBE*, ii and xiv, Oxford, 1879-82.

খ. বৌদ্ধ

*Aṅguttara Nikāya*, Ed. R. Morris and E. Hardy, 5 vols., PTS, London, 1885-1900. Tr. i, ii and v by F. L. Woodward, and iii and iv by E. M. Hare, PTS, London, 1932-36.

*Dīgha Nikāya*, Ed. T. W. Rhys Davids and J. E. Carpenter, 3 vols., PTS, London, 1890-91. Tr. T. W. Rhys Davids, 3 vols., *SBB*, London, 1899-21.

*Jātaka* with commentary, Ed. V. Fausböll, 7 vols. (Vol. 7, Index, by D. Anderson) London, 1877-97. Tr. Various hands, 6 vols., London, 1895-1907.

*Majjhima Nikāya*, Ed. V. Trenckner and R. Chalmers, PTS, 3 vols., London, 1888-1896. Tr. Lord Chalmers, 2 vols., *SBB*, London, 1926-7.

*Vinaya Piṭaka*, Ed. H. Oldenberg, 5 vols., London, 1879-83. Tr. I. B. Horner, 5 pts., *SBB*, London, 1938-52.

গ. জৈন

*Antagaḍa-Dasāo and Aṇuttarovavāiya-Dasāo*, Ed. P. L. Vaidya, Bombay, 1932. Tr. L. D. Barnett, London, 1907.

*Āyāraṅga Sutta* of the Śvetāmbara Jainas, Ed. H. Jacobi, PTS, London, 1882.

*Kalpasūtra of Bhadrabāhu*, Ed. H. Jacobi, Leipzig, 1879.

*Ovāiya* ( or *Aupapātikasūtra* ) with Abhayadeva's comm., Ed. Muni Hemasāgara, Āgamodaya Samiti publication.

*Sthānāṅga Sūtra* with the comm. of Abhayadeva, Ed. Veṇīcandra Suracandra, 2 vols., Bombay, 1918-20.

*Sūyagaḍam*, Ed. P. L. Vaidya, Bombay, 1928.

*Uttarādhyayanasūtra*, Ed. Jarl Charpentier, Uppsala, 1922.

*Uvāsagadasāo*, Ed. A. F. Rudolf Hoernle, Calcutta, 1890.

সহায়ক গ্রন্থাদি

V. S. Agrawala, *India as known to Pāṇini*, Lucknow, 1953.

V. M. Apte, *Social and Religious Life in the Gṛhyasūtras*, Bombay, 1954.

N. C. Banerjee, "Slavery in Ancient India", *The Calcutta Review* (Aug. 1930), pp. 249-265.

A. L. Basham, *History and Doctrines of the Ājīvikas*, London, 1951.

Shivnath Basu, "Slavery in the Jātakas", *JBORS*, ix, 369-375.

Richard Fick, *The Social Organisation in North-East India in Buddha's time*, Calcutta, 1920.

Ivor Fišer, "The Problem of the Seṭṭhi in Buddhist Jātakas", *AO*, xxii, 238-265.

U. N. Ghoshal, "The Status of Śūdras in the Dharmasūtras", *IC*, xiv, 21-27.

Ram Gopal, *India in Vedic Kalpasūtras*, Delhi, 1959.

D. D. Kosambi, "Ancient Kosala and Magadha", *JBBRAS*, NS, xxvii.

B. C. Law, "Slavery as known to Early Buddhists," *Journal of the Ganganath Jha Research Institute*, vi, 1948, 1-10.

F. Max Müller, *The Hibbert Lectures* 1878, London, 1880.

B. C. Law, *India as Described in Early Texts of Buddhism and Jainism*, London, 1941.

R. N. Mehta, *Pre-Buddhist India*, Bombay, 1939.

J. J. Meyer, *Über das Wesen der altindischen Rechtsschriften und ihr Verhaltnis zu Einander und zu Kauṭilya*, Leipzig, 1927.

Rodolf Mondolfo, "Greek Attitude to Manual Labour", *Past and Present*, No. 6.

W. Rahul, *What the Buddha Taught*, Badford, 1959.

T. W. Rhys Davids, *Buddhist India*, London, 1903.

R. S. Sharma, "Development of Productive Forces and its Social Implications in India in the First Millennium B. C. with special reference to the Age of the Buddha".

Paper presented to International Conference on Development of Productive Techniques and their Consequences for Social Formation, Berlin, G.D.R. November, 1978.

—, "Material Milieu of the Birth of Buddhism", *Das Kapital Centenary Volume*, Delhl, 1967.

Narendra Wagle, *Society at the time of the Buddha*, Bombay, 1966.

A. K. Warder, *Indian Buddhism*, Varanasi, 1970.

W. L. Westermann, *The Slave System of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia, 1955.

## পঞ্চম অধ্যায়

### রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও দাসবর্গ

( আনু. খৃ:পূ: ৩০০ - ২০০ )


মূল সূত্রাদি

আদি রচনা

*Arthaśāstra of Kauṭilya,* Ed. and Tr. R. P. Kangle, Bombay, 1960-65. Ed. R. Shamasastry, 3rd edn., Mysore, 1924 ( unless otherwise stated refs. in this work refer to this text ). Tr. R. Shamasastry, 3rd edn., Mysore, 1929. Ed. with comm. by T. Gaṇapati Śāstrī, 3 vols., Trivandrum 1924-25. Ed. J. Jolly and R. Schmidt, Vol. i, Lahore, 1924. Tr. R. Shamasastry, 3rd edn., Mysore, 1929. Tr. ***Das altindische Buch vom Welt-und Staatsleben***, J. J. Meyer, Leipzig, 1926.

ভাষ্য

*Jayamaṅgalā* ( runs up to the end of the Bk. I of the *AŚ* with gaps ), Ed. G. Harihara Sastri, ***JOR***, xx-xxiii.

*Pratipada-pañcikā* by Bhaṭṭasvāmin ( on Bk. II from sec. 8 ), Ed. K. P. Jayaswal and A. Banerji-Sastri, ***JBORS***, xi-xii.

*Naya Candrikā* by Mādhava Yajva ( on Bks. VII-XII ), Ed. Udayavīra Śāstrī, Lahore, 1924.

*A Fragment of the Kauṭilya's Arthaśāstra alias Rājasiddhānta with the fragment of the commentary named Nītinirṇiti of Ācārya Yogdhama alias Mugdhavilāsa*, Ed. Muni Jina Vijaya, Bombay, 1959.

প্রত্নলেখ

*Inscriptions of Aśoka*, Ed. E. Hultzsch, ***CII***, i, Oxford 1925.

বৈদেশিক বিবরণ

J. W. McCrindle, *Ancient India as Described in Classical Literature*, Westminister, 1901.

—, *Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian*, Calcutta, 1926.

— *Ancient India as Described by Ktesias the Knidian*, London, 1882

সহায়ক গ্রন্থাদি

K. V. Rangaswami Aiyangar, *Indian Cameralism*, Madras, 1949.

N. C. Bandyopadhyaya, *Kauṭilya or an Exposition of his Social and Political Theory*, Calcutta, 1927.

Bernhard Breloer, *Kauṭilīya-Studien*, 3 vols., Bonn, 1927-34.

Keith Hopkins, *Conquerors and Slaves*, Cambridge, 1978.

P. L. Narsu, *The Essence of Buddhism*, Madras, 1912.

Eva Ritschl and Maria Schetelich, *Studien zum Kauṭilīya Arthaśāstra*, Berlin, 1973.

I. J. Sorabji, *Some Notes on the Adhyakṣa-pracāra Bk. II of the Kauṭilīyam Arthaśāstram*, Allahabad, 1914.

Thomas R. Trautmann, *Kauṭilya and the Arthaśāstra*, Leiden, 1971.

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### প্রাচীন ব্যবস্থায় সংকট

( আনু. খৃপূ ২০০ - ৩০০ খৃস্টাব্দ )

মূল সূত্রাদি

আদি রচনা

*Āraṇyaka Parvan of the Mahābhārata*, Ed. V. S. Sukthankar, Critical Edn., Vol. III, pt. I; Vol. IV, pt. II, Poona, 1942.

Dramas of Bhāsa: *Avimāraka, Bālacarita, Pañcarātra* and *Pratimānāṭaka*, Ed. T. Gaṇapati Śāstri, Trivandrum. 1912-15.

*Divyāvadāna*, Ed. E. B. Cowell and F. A. Neil, Cambridge, 1886.

*Lalita Vistara*, Ed. S. Lefmann, 2 vols., Halle, 1902-1908.

*Mahābhāṣya of Patañjali*, Ed. F. Kielhorn, 3 vols., Bombay, 1892-1909.

*Mahāvastu*, Ed. E. Senart, 3 vols., Paris, 1882-97.

*Manu Smṛti or Mānava Dharmaśāstra*, Ed. V. N. Mandlik, Bombay, 1886. Tr. G. Bühler, *SBE*, xxv, Oxford, 1886.

*Milindapañho*, Ed. V. Trenckner, London, 1928. Tr. T. W. Rhys Davids, *SBE*, xxxv-xxxvi, Oxford, 1890-4.

*Paṃnavaṇā Sūtra* ( with the comm. of Malayagiri), 2 vols., Banaras, 1884

*Saddharmapuṇḍarīkasūtra* with N. D. Mironov's readings from

Central Asian MSS, Ed. N. Dutt, Calcutta, 1952. Tr. H. Kern, *SBE*, xxi, Oxford. 1884.

*Yuga Purāṇa*, Ed. D. R. Mankad, Vallabhavidyanagar, 1951.

প্রত্নলেখ

Lüders' List of Inscriptions, *EI*, x.

সহায়ক গ্রন্থাদি

G. L. Adhya, *Early Indian Economics : Studies in the Fconomic Life of Northern and Western India. c.* 200 B.C. - 300 A. D. Bombay, 1966.

R. C. Agrawala, "Position of Slaves and Serfs as depicted in the Kharosthi Documents from Chinese Turkestan", *IHQ*, xxix, 1953, 97-110.

K. V. Rangaswami Aiyangar, *Aspects of the Social and Political System of Manusmṛti*, Lucknow, 1949.

—, *Rājadharma*, Madras, 1941.

Tan Chang, "Ancient China's Quest for Indian Products," *The Sunday Statesman*, Magazine Section, 6 April 1969.

E. W. Hopkins, *The Mutual Relations of the Four Castes according to the Mānavadharmaśāstram*, Leipzig, 1881.

G. F. Ilyin, "Śūdras und Slaven in den altindischen Gesetzbuchern". *Sowjetwissenschaft* ( Berlin ), 1952, No. 2., pp. 94-107.

K. P. Jayaswal, *History of India*. 150 A.D. *to* 350 A.D, Lahore, 1933.

B.B. Lal, "Examination of some Ancient Indian Glass Specimens", *AI*, Vol. viii, 1952-5.

Michael Loewe, "Spices and Silk : Aspects of World Trade in the First Seven Centuries of the Christian Era," *JRAS*, 1971, 166-79.

Sir John Marshall, "*Taxila*", ii, Cambridge, 1951.

B. N. Puri, "Some Aspects of Economic Life in the Kuṣāṇa Period", *IC*, xii.

A. D. Pusalker, *Bhāsa—A Study*, Lahore, 1940.

R. P. Singh, "Artisans in Manu", *Proceedings of the 32nd Session of Indian History Congress*, Jabalpur, 1970, Vol. i, 102-117.

D. A. Suleykin, "Fundamental Problems of the Periodisation of Ancient India", *Medieval India Quarterly* ( Aligarh ), i, No. 3-4, 46-58.

W. W. Tarn, *The Greeks in Bactria and India*, Cambridge, 1938.

E. H. Warmington, *The Commerce between the Roman Empire and India*, Cambridge, 1928.

R. E. M. Wheeler, *Rome beyond the Imperial Frontiers*, Pelican Series, 1955.

## সপ্তম অধ্যায়

### কৃষিজীবিতা ও ধর্মীয় অধিকার

( আনু. ৩০০ - ৬০০ খৃস্টাব্দ )

মূল সূত্রাদি

আদি রচনা

*Amarakośa* or *Nāmaliṅganuśāsana* of Amara with the comm. of Bhaṭṭakṣīrasvāmin, Ed. A. D. Sharma and N. G. Sardesai, Poona, 1941.

*Bṛhaspati Smṛti* (this text has been followed), Ed. K. V. Rangaswami Aiyangar. *GOS*, lxxxv, Baroda, 1941.
Tr. J. Jolly, *SBE*, xxxiii, Oxford, 1889.

*Bṛhat Kalpasūtra* and *Original Niryukti* of Sthavira Ārya Bhadrabāhu Svāmin and a Bhāṣya by Saṃghadāsa Gaṇi Kṣamaśramaṇa with a commentary begun by Malayagiri and completed by Kṣemakīrti, 6 vols., Bhavanagar, 1933-42.

*Bṛhat Saṃhitā* of Varāhamihira with Hindi Tr., Durga Prasad, Lucknow, 1884.

*Bṛhat Saṃhitā* of Varāhamihira with the comm. of Bhaṭṭotpala, 2 parts, Ed. Sudhākara Dvivedī, Banaras, 1895-7.

*Jambudvīpaprajñaptiḥ* with the comm. of Śānticandra, Bombay, 1920.

*Jayākhya Saṃhitā*, Ed. Embar Krishnacharya, *GOS*, liv, Baroda, 1931.

*Kāmandakīya Nītisāra*, Ed. R. L. Mitra, *BI*, Calcutta, 1884.
Tr, M. N. Dutt, Calcutta, 1896.

*Kāmasūtra* of Vātsyāyana with the comm. *Jayamaṅgalā* of Yaśodhara, Ed. Gosvami Damodar Shastri, Banaras, 1929.

*Kātyāyana Smṛti* on Vyavahāra, Law and Procedure, Ed. with reconstituted text, tr., notes and introduction by P. V. Kane, Bombay, 1933.

*Laṅkāvatāra Sūtra*, Ed. Bunyiu Nanjio, Kyoto, 1923. Tr. D. T. Suzuki, London, 1932.

*Mālavikāgnimitra* of Kālidāsa, Ed. P. S. Sane, G. H. Godbole and H. S. Ursekar, Bombay, 1950.

*Mṛcchakaṭika* of Śūdraka, Ed. and Tr. R. D. Karmakar, Poona, 1937. Tr. R. P. Oliver, Illinois, 1938.

*Nārada Smṛti* with extracts from the comm. of Asahāya, Ed. J. Jolly, Calcutta, 1885. Tr. J. Jolly, *SBE*, xxxiii, Oxford, 1889.

*Narasiṃha Purāṇa*, 2nd Edn., Bombay, 1911.

*Nāṭyaśāstra* of Bharata Muni with the comm. of Abhinavagupta, Ed. Manavalli Ramakrishna Kavi, 3 vols., *GOS*, Baroda, 1926-54. Tr. Manomohan Ghosh, Calcutta, 1950.

*Pañcatantra* in its oldest recension, the Kashmirian, entitled *Tantrākhyāyikā*, Ed. J. Hertel, *HOS*, xiv, Harvard, 1915. The text in its oldest form, Ed. F. Edgerton, Poona, 1930 ( References are made to this text ).

*Piṇḍaniryuktiḥ* of Bhadrabāhu Svāmi, Bombay, 1918.

*Raghuvaṃśa* of Kālidāsa, Ed. Raghunatha Nandargikar, Bombay, 1891.

*Theragāthā Aṭṭhakathā* (*Paramattha Dīpanī*), the comm. of Dhammapāla, Ed. F. L. Woodward, 2 vols., PTS, London, 1940-52.

*Yajñavalkya Smṛti* with Vīramitrodaya and Mitākṣarā, Chaukhamba Sanskrit Series, Banaras, Saṃvat, 1986.

*Vajrasūci* of Aśvaghoṣa, Ed. and Tr. Sujitkumar Mukhopadhyaya, Santiniketan, 1950.

*Vimāna-Vatthu Aṭṭhakathā* (pt. IV of the *Paramattha Dīpanī* of Dhammapāla), Ed. E. Hardy, PTS, London, 1901.

*Viṣṇudharmottara Mahāpurāṇa*, Bombay, Vikrama Saṃvat 1969.

*Viṣṇu Smṛti* or *Vaiṣṇava Dharmaśāstra* ( with extracts from the comm. of Nanda Paṇḍita), Ed. J. Jolly, *BI*, Calcutta, 1881. Tr. J. Jolly, *SBE*, vii, Oxford, 1880.

চীনা সূত্রাদি

Samuel Beal, *Travels of Fah-hian and Sung-Yun* (Tr.), London, 1869.

H. A. Giles, *The Travels of Fa-hsien or Record of Buddhistic Kingdoms* (Tr.), Cambridge, 1923.

James Legge, *A Record of Buddhistic Kingdoms* (being an account of the Chinese monk Fa-hien's Travels) Tr., Oxford, 1886.

T. Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Ed. T. W. Rhys Davids and S. W. Bushell, 2 vols., London, 1904-5.

মুসলিম সূত্রাদি

Edward C. Sachau, *Alberuni's India* ( Tr. & Ed. ), London, 1888.

প্রত্নলেখ

J. F. Fleet, *Inscriptions of the Early Gupta Kings*, *CII*, iii, London, 1888.

সহায়ক গ্রন্থাদি

J. N. Banerjea, *The Devlopment of Hindu Iconography*, Calcutta, 1941.

R. G. Basak, "Indian Society as pictured in the Mṛcchakaṭika", *IHQ*, v.

R. G. Bhandarkar, *Vaiṣṇavism, Śaivism and Minor Religious Sects*, Strassburg, 1913.

H. C. Chakladar, *Social Life in Ancient India*, Calcutta, 1929.

V. R. R. Dikshitar, *The Gupta Polity*, Madras, 1952.

E. W. Hopkins, *The Religions of India*, London, 1895.

—, *The Great Epic of India*, New Haven, 1901.

G. F. Ilyin, "Osobennosti Rabstva v drevnei Indii", *Vestnik drevnei istorii* ( Moscow-Leningrad ), 1951, No. 1, pp. 33-52.

D. N. Jha, *Early Indian Feudalism : A Historiographical Critique*, Presidential Address, Section I : Ancient India, Indian History Congress, 40th Session, Waltair, 1979.

A. B. Keith, *The Sāṃkhya System*, Oxford, 1919.

D. D. Kosambi, "The Working Class in the Amarakośa", *JOR*, xxiv, pp. 57-69.

B. C. Law, *Heaven and Hell in Buddhist Perspective*, Calcutta and Simla, 1925.

S. K. Maity, *The Economic Life of Northern India in the Gupta Period*, Calcutta, 1957.

R. C. Majumdar and A. S. Altekar, *The Gupta-Vakātaka Age*, Lahore, 1946.

R. C. Majumdar and A. D. Pusalkar, *The Classical Age*, Bombay, 1954.

E. P. O. Murray, "The Ancient Workers of Western Dhalbhum", *JRASB*, III Series, vi, 79-104.

M. A. Murray, *The Splendour that was Egypt*, London, 1949.

R. N. Nandi, "Aspects of Untouchability in Early South India," *Indian History Congress, Proceedings of the Thirty-fourth Session*, i, Chandigarh, 1973, 120-25.

D. R. Patil, *Cultural History from the Vāyu Purāṇa*, Poona, 1946.

K. S. Ramaswami Sastri, *Studies in the Rāmāyaṇa*, Baroda, 1944.

H. C. Raychaudhuri, *Early History of the Vaiṣṇava Sect*, Calcutta, 1920.

R. N. Saletore, *Life in the Gupta Age*, Bombay, 1943.

A. M. Sastri, *India as seen in the Bṛhat-Saṃhitā of Varāhamihira*, Delhi, 1969.

R. S. Sharma, "Decay of Gangetic Towns in Gupta and Post-Gupta Times", *Journal of Indian History*, Golden Jubilee Volume, 1973, 135-50.

—, *Indian Feudalism : c.* 300-1200, Calcutta, 1965.

—, "Indian Feudalism Retouched", *The Indian Historical Review*, i, No. 2, 1974, 320-30.

—, The First Devraj Chanana Memorial Lecture, 1969 ; *Social Changes in Early Medieval India* (*c* A.D. 500-1200) Delhi, 1969.

D. C. Sircar, *Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India*, i, Calcutta, 1967.

B. S. Upadhyaya, *India in Kalidasa*, Allahabad, 1947.

K. J. Virji, *Ancient History of Saurashtra*, Bombay, 1952.

B. N. S. Yadav, *Society and Culture in Northern India in the Twelfth Century*, Allahabad, 1973.

—

## সংযোজন ও সংশোধন

অনু.=অনুচ্ছেদ সংখ্যা, টী.=টীকা সংখ্যা, প.=পঙ্‌ক্তি সংখ্যা, পৃ.=পৃষ্ঠা সংখ্যা

পৃ. ২ টী. ৮-এ ব্র্যাহ্মণ-এর বদলে ব্রা হ্ম ণ পড়তে হবে।

পৃ. ৪ টী. ২৩-এ শুক্রনীতিসার-এর বদলে শু ক্র নী তি সা র পড়তে হবে।

পৃ. ১৩ টী. ৪৭-এ গেল্ড্‌নায়-এর বদলে গে ল্‌ ড্‌ না র পড়তে হবে।

পৃ. ১৪ অনু. ৩ প. ৪-এ 'সায়ণ এর ব্যাখ্যা করেছেন'-এর পরে যোগ হবে: 'অবর্ণবচনাঃ'।

পৃ. ১৬ টী. ৬৮-তে দাস-রাজ্জ-র বদলে দা শ - রা জ্ঞ পড়তে হবে।

পৃ. ২২ অনু. ৩ প. ৯-এ অসদস্যু-র বদলে ত্র স দ স্যু পড়তে হবে।

পৃ. ২৯ অনু. ১ প. ১৬-য় স্মৃত-র বদলে সূ ত পড়তে হবে।

পৃ. ৩৬ অনু. ১ প. ৪ ও পৃ. ১২৮ অনু. ৪ প. ৩-এ দ্রাবিড়-এর বদলে দ্র বি ড় পড়তে হবে।

পৃ. ৩৯ অনু. ৩ প. ২-এ ভরত-এর বদলে ভা র ত পড়তে হবে।

পৃ. ৪০ অনু. ২ প. ৬, ১৪, ১৬ ও পৃ. ৫০ অনু. ১ প. ৭-এ জনশ্রুতি-র বদলে জা ন শ্রু তি পড়তে হবে।

পৃ. ৪২ অনু. ১ প. ৪-এ উৎপত্তি-র বদলে উ ৎ প ত্তি পড়তে হবে।

পৃ. ৪২ টী. ২৪৩ ও পৃ. ৭২ টী. ২০০-এ গেল্ড ও ঘেল্ড-এর বদলে হে ল্ড পড়তে হবে।

পৃ. ৪৯-এর টীকা ৪৬ পৃ. ৫০-এ যাবে।

পৃ. ৫৭ অনু. ২ প. ৪-এ পয়ম্পরা-র বদলে প র ম্প রা পড়তে হবে।

পৃ. ৬৭ অনু. ৩ প. ১-এ শূদ্রাদের-এর বদলে শূ দ্র দে র পড়তে হবে।

পৃ. ৭০ অনু. ১ প. ২-এ বৈদিক আর্যদের-এর বদলে বৈ দি ক ভা র তী য়- দে র পড়তে হবে।

পৃ. ৭১ টী. ১৯০-এ তৈ. ক্রা.-র বদলে তৈ. ব্রা. পড়তে হবে।

পৃ. ৮৭ টী. ২৪-এ উ. কৃ. পা-র বদলে উ. কা পা. পড়তে হবে।

পৃ. ১০০ অনু. ১ প. ১-এ গৃহসূত্রে-র বদলে গৃ হ্য সূ ত্রে পড়তে হবে।

পৃ. ১০৯ টী. ১৭৮-এ হপকিন্স-এর বদলে হ প কি ন্স পড়তে হবে।

পৃ. ১১৩ অনু. ১ প. ২-এ অপরাগ-এর বদলে অ পা র গ পড়তে হবে।

পৃ. ১১৮ অনু. ২ প. ১২-য় খাদা-র বদলে খা দ্য পড়তে হবে।

পৃ. ১১৯ অনু. ১ প. ১৩-য় শূদ্রান্ন-র বদলে শূ দ্রা ন্ন পড়তে হবে। ঐ, প. ১৬-য় লাত-এর বদলে লা ভ।

পৃ. ১২৪ অনু. ১ প. ৬-এ যোগা-র বদলে যো গ্য পড়তে হবে। ঐ, অনু. ২ প. ১৬-য় ভাযায়-এর বদলে ভা ষা য় পড়তে হবে।

পৃ. ১৩৩ অনু. ১ প. ৭, ৮-এ অন্তবসায়ী-র বদলে অ ন্ত্যা ব সা য়ী পড়তে হবে।

পৃ. ১৫১ অনু. ২ প. ৪-এ জীবনধারণ করে-র পরে যোগ হবে: (অর্থাৎ কর্মকর)। ঐ, টী. ৪৪-এ রন্জুবর্তক-এর বদলে র জ্জু ব র্ত ক পড়তে হবে।

পৃ. ১৮৩ অনু. ২ প. ৩ ও পৃ. ১৯৯ অনু. ১ প. ১২-য় সাতকর্ণী ও সাতকর্ণির বদলে শা ত ক র্ণি পড়তে হবে।

পৃ. ১৯০ অনু. ১ প. ৭-এ নিযেধ-এর বদলে নি ষে ধ পড়তে হবে।

পৃ. ২০০ অনু. ৩ প. ১-এ অঙ্গ-র বদলে স ঙ্গ পড়তে হবে।

পৃ. ২০৪ অনু. ১ প. ১৭-য় পরাশব-এর বদলে পা র শ ব পড়তে হবে।

পৃ. ২১৩ অনু. ১ প. ৫-এ ক্রাহ্মণ-এর বদলে ব্রা হ্ম ণ পড়তে হবে।

পৃ. ২১৪ অনু. ১ প. ৩ ও ৫-এ শুদ্র ও বৈশা-র বদলে যথাক্রমে শূ দ্র ও বৈ শ্য পড়তে হবে।

পৃ. ২১৬ অনু. ২ প. ৬-এ হরেছে-র বদলে হ য়ে ছে পড়তে হবে।

পৃ. ২১৭ অনু. ১ প. ৬-এ উপব-এর বদলে উ প র পড়তে হবে।

পৃ. ২১৮ অনু. ২ প. ১১-য় ভাগচাযী-র বদলে ভা গ চা ষী পড়তে হবে।

পৃ. ২২১ অনু. ১ প. ৮-এ বিধ্বক্ত-র বদলে বি ধ্ব স্ত পড়তে হবে।

পৃ. ২২২ অনু. ২ প. ৪-এ ছিলেম-এর বদলে ছি লে ন পড়তে হবে।

পৃ. ২২৩ টী. ১৫-য় বৈষ্ণমধর্মে'র-এর বদলে বৈ ষ্ণ ব ধ র্মে র পড়তে হবে।

পৃ. ২২৫ টী. ২৭-এ ডাগবত-এর বদলে ভা গ ব ত পড়তে হবে।

পৃ. ২২৮ টী. ৫৫-য় কামশাস্ত্র-র বদলে কা ম সূ ত্র পড়তে হবে।

পৃ. ২২৯ অনু. ২ প. ৩-এ স্বাধীনত্য-র বদলে স্বা ধী ন তা পড়তে হবে।

পৃ. ২৩৩ অনু. ২ প. ৯-এ তায়-এর বদলে তা র পড়তে হবে। ঐ, অনু. ৩ প. ২-য় কিনাশ-এর বদলে কী না শ।

পৃ. ২৩৫ অনু. ৩ প. ৪-এ বুহস্পতি-র বদলে বৃ হ স্প তি পড়তে হবে।

পৃ. ২৩৭ অনু. ১ প. ৫-এ অসুবিবার-এর বদলে অ সু বি ধা র পড়তে হবে।

পৃ. ২৪২ টী. ১৭২-এ বিক্রুরঃ-র বদলে বি ক্র য়ঃ পড়তে হবে। ঐ, টী. ১৭৩-এ পুর‍্যাণ-এর বদলে পু রা ণ।

পৃ. ২৪৩ টী. ১৭৯ উনশেষ পঙ্‌ক্তিতে য়াজার-এর বদলে রা জা র পড়তে হবে।

পৃ. ২৪৮ অনু. ১ প. ১১-য় শাপথ-এর বদলে শ প থ পড়তে হবে।

পৃ. ২৫০ টী. ২৪৬-এ উদধৃত-র বদলে উ দ্ ধৃ ত পড়তে হবে।

পৃ. ২৫১ টী. ২৫৫-য় তৃ-র বদলে তু পড়তে হবে। ঐ, টী. ২৫৮-য় অন্ত্যাগমনে-র বদলে অ স্ত্যা গ ম নে।

পৃ. ২৫২ টী. ২৬২ নির্বিচায়ে-র বদলে নি র্বি চা রে পড়তে হবে।

পৃ. ২৫৩ টী. ২৭৫-এ ধর্মসুত্র-র বদলে ধ র্ম সূ ত্র পড়তে হবে।

পৃ. ২৫৫ টী. ২৮৭-তে অর্থশাস্ত্র-র বদলে অ র্থ শা স্ত্র পড়তে হবে।

পৃ. ২৫৮ টী. ৩২৩-এ টীফা-র বদলে টী কা পড়তে হবে।

পৃ. ২৫৯ অনু. ১ প. ১৫-য় অনুচিত-এর বদলে অ নু চি ত পড়তে হবে। ঐ, টী. ৩৩২-এ কিংডেমস্-এর বদলে কিং ড ম্ স্।

পৃ. ২৬৪ অনু. ২ প. ৭-এ ব্যধ-এর বদলে ব্যা ধ পড়তে হবে।
পৃ. ২৬৫ টী. ৩৯৪-এ উচ্ধৃত-র বদলে উ দ্ ধৃ ত পড়তে হবে।
পৃ. ২৬৬ টী. ৪০০-য় মহাভরাত-এর বদলে ম হা ভা র ত পড়তে হবে। ঐ, টী. ৪০১-এ ম্যর্কণ্ডেয়-র বদলে মা র্ক ণ্ডে য়।
পৃ. ২৬৯ অনু. ১ প. ১-এ অনুমাত-এর বদলে অ নু ম তি পড়তে হবে। ঐ, টী. ৪৩৩-এ লিঢেরাটুর-এর বদলে লি টে রা টু র।
পৃ. ২৭১ অনু. ৩ প. ৬-এ পরিস্কার-এর বদলে প রি ষ্কা র পড়তে হবে। ঐ, টী. ৪৪১-এ ধর্কোশ-এর বদলে ধ র্ম কো শ।
পৃ. ২৭৩ টী. ৪৬১-তে উদ্বৃত-র বদলে উ দ্ ধৃ ত পড়তে হবে।
পৃ. ২৯৬ অনু. ২ প. ৯-এ প্রত্নলেখ-এর বদলে প্র ত্ন লে খে পড়তে হবে।
পৃ. ৩০৯ অনু. ১ প. ৯-এ যন্ত্র-র বদলে য ন্ত পড়তে হবে।
পৃ. ৩১১ টী. ২৩-এ জয়ন্তী-র বদলে জ য় ন্তী পড়তে হবে।

এ ছাড়াও কিছু পরিচিত শব্দে উ ঊ, আ-কার য-ফলা, ং ঃ, ব র, য য য়-ঘটিত আরও কিছু ভুল আছে। তার জন্য আমরা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

# শব্দসূচি

## অ


অংশুমতী ( অথবা যমুনা ) ১৩
অক্রতূন ১২
অগ্নি ১৩, ১৭, ৫৭-৯, ৭৮-৯
অগ্নিহোত্র ৮৪
অঙ্গ ৯৯
অঙ্গ ( মানবগোষ্ঠী ) ১৬৭
অঙ্গিরা ( গোত্র ) ১২, ২১
অঙ্গুত্তর নিকায় ৮৬
অঙ্গুলিমাল ( দস্যু ) ১৩৫
অজাতশত্রু ১৩৭-৯
অজীগর্ত ৬৭
অটবি ১৬৭
অতুক ২৩৩
অত্রি ২০৪
অথর্বন ( ইরান ) ১৭
অথর্ববেদ ৯, ১২, ২২, ২৯-৩৫, ৪০, ৪২, ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭১, ৮১, ১২৪
অদেবীঃ বিশঃ ১৩
অধরহ্রু ৫৫, ৫৯
অনিন্দ্র ১২
অনু ( মানবগোষ্ঠী ) ১৬
অনুশাসনপর্ব ( মহাভারত ) ২২৩, ২২৫, ২২৯, ২৪৯, ২৫৪, ২৫৮, ২৬২, ২৬৪, ২৯৭
অনুলোম ১২৩, ২২৯, ৩০২, ৩০৫
অনৃতদূত ৫৩
অন্তরাল ১৭০
অন্ত্য ১৩২, ২৫০
অন্ত্যজ ১৯৩, ১৯৬, ২০৮, ২৬৩
অন্ত্যযোনি ১৩৩
অন্ত্যাবসায়ী ১৩৩, ১৬১, ১৭১, ২০৫, ২০৭-৮, ২৬৩, ২৬৫, ৩০৬
অন্তঃ ১৩৩
অন্ধ্র ( জনগোষ্ঠী ) ৬৮, ২০৫-৬, ২৯৬, ৩০১, ৩০৫
অন্ধ্রপ্রদেশ ১৭৯-৮০, ৩০৮
অন্যব্রত ১২, ২৩
অনিপাল ২৭৭
অমরকোষ ২২৪-৫, ২৩০, ২৩৩, ২৩৭-৮, ২৪৫, ২৫৩, ২৫৯, ২৬২-৫, ২৯৩
অমরসিংহ ২২৪
অম্বষ্ঠ ( রাজা ) ৩৩
অম্বষ্ঠ ( জাতি ) ৩২, ৪০, ১৩১, ২০৫, ২৬২, ২৯৬, ৩০৫-৬
অযজ্ঞান ১২
অর্থশাস্ত্র ৫, ১০৪, ১৪৫-৯, ১৫২-৪, ১৫৬, ১৫৮-৯, ১৬১-২, ১৬৮, ১৭১, ১৭৩-৪, ১৮৩, ১৮৭-৮, ২১৮, ২২৬, ২৩১, ২৩৫, ২৪০, ২৪৩, ২৮৮, ৩০৩, ৩০৬
অর্য/অর্যা ৫৬, ৬৫, ৭৫, ২৬২
অর্বুদ ২৪৪
অরাধসমু ১৭
অলিন ১৬
অবন্তী ৯৯, ১৬৭, ২৪৩, ৩০৪
অব্রত ১২
অশোক ১৪০, ১৪৫-৬, ১৬০, ১৬৫, ১৬৭-৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ২৮৮, ৩০৬-৭
অশ্বঘোষ ২২৪
অশ্বপতি কৈকের ৩৮
অশ্বমেধ ৪৭, ৪৯, ৫৬-৮, ৬৪, ১৮৯
অশ্বিনী ২১
অশ্বীশ্বর ৭৬

অশ্রুধান্ ১২
অসহায় ( ভাষ্যকার ) ২৩৩
অসুর ১৩, ৩৭, ৭১
অহুর ৩৭

আ

আঙ্গিরস ৬৭
আচার্য ৩০৩-৪
আজীবিক ( সম্প্রদায় ) ১৪০, ১৪৩, ১৭১, ২৯৪
আট্টিকা ৯৯
আত্রেয় ৪৮
আদিপর্ব ( মহাভারত ) ২০৩
আদি পুরাণ ১৪৯
আনাতোলিয়া ২৫
আপস্তম্ব ( ধর্মশাস্ত্রকার ) ৮৬, ৯৬, ১০০, ১০৫, ১০৯, ১১২, ১১৫-৮, ১২২, ১২৪, ১২৮, ১৩৪, ১৮৭
আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ৭১, ৯৯, ১০৪, ১১৮, ১২৩, ১৩৩, ১৪৬
আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ৪৪, ৭৩, ৭৯
আফগানিস্তান ১৭৯, ১৮১
আফামিওতাই ১৬৬
আফ্রিকা ৮
আবাস্তানোই ৩২
আভীর ৩৪-৫, ২০৫, ২৪৪, ২৯৬, ৩০৫
আভীরী ( আর্য উপভাষা ) ৩৬
আয়োগব ৫৭, ১৬২, ১৭০, ২০৪-৬, ২০৮, ৩০৫-৬
আর্কাসিড ১৭৮, ৩০৯
আর্য ৭৫, ১৫৮, ১৬২, ১৬৪, ১৮৫, ১৯৭, ২০২, ২০৯-১০, ২১৪, ২২৯-৩০
আর্য ( জনগোষ্ঠীর ) ৭৫, ৭৭, ১৫৮, ১৬২, ১৬৪-৬, ১৮৫, ১৯৭, ২০২, ২০৯-১০, ২১৪, ২২৯-৩০, ২৮৩-৬, ৩০১
আর্য (সম্প্রদায়) ১৬, ৩০, ৭৭, ২০৯, ২৮৫
আর্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা ৫৪
আর্যসমাজ ২
আর্যাবর্ত ৮৬, ২০৬, ২৯৮, ৩০৪
আরিকামেদু ১৭৯-৮১
আরিয়ান ৩২, ১৫০, ১৫৯, ১৬৬, ১৭০
আরিস্তুতল ১৫৮, ২৮৭
আরুণি ৪৮, ৬৯, ৮০
আলেকজাণ্ডার ৩২, ১৪৭
আবস্থ্য ৩০৩-৪
আবৃত ২০৫, ৩০৫
আশ্বমেধিকপর্ব ( মহাভারত ) ২৫৪
আশ্বলায়ন ৪৯
আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১২৫
আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৪৫, ৪৯, ৭৩
আসাম ২৩২, ৩০৮
আহিণ্ডক ২০৫, ৩০৫
আহিতক ১৬৩-৫
আহুর মাজদা ৭০

ই

ইংল্যাণ্ড ২
ইওরোপীয় ৩, ৮, ৩২
ইওলি, ইউলিউস ২০৩
ইটালি ১৬৭
ইৎ-সিঙ ২২৪
ইন্দো-আর্য জাতি ২৫, ৩৭
ইন্দো-আর্য রীতি-নীতি ১৩৩
ইন্দো-আর্য শাসনব্যবস্থা ৫২
ইন্দো-ইওরোপীয় ২৫, ২৮, ৩৭, ৫২, ১০৪, ১২০
ইন্দো-গ্রীক ১৭৯, ২৯৬
ইন্দোর ২৪০
ইন্দ্র ৯, ১১, ১৩-১৫, ১৮, ২০, ৭৬
ইরাণ, ইরাণীয় ২৫, ৭০, ৭২, ৩০৯
ইলিন, জি. এফ. ৫

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১
ইসিদাসী ৯৮

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২

উ

উইলসন, এইচ. এইচ. ১৪-৫
উগ্র ১২৩, ১৩৩, ২০৪-৫, ২৬৩, ৩০৫-৬
উণাদিসূত্র ৪১
উত্তর প্রদেশ ২৬, ৯০, ২৩৫, ৩০১-২
উত্তর ভারত ৮৯, ৯০, ২১৯, ২২২, ২৩২, ২৩৭-৩৮, ২৬৩, ২৭৯, ২৯০, ৩০২, ৩০৪, ৩১১
উত্তরবঙ্গ ২৩২, ২৪৫, ৩০৪
উত্তর-পশ্চিম ভারত ২৬, ৩৪, ৩৭, ৪০, ২৯৬, ৩০৪
উত্তর-পূর্ব ভারত ৪, ৮৯, ৯৩, ৩০৪
উত্তরাধ্যয়ন সূত্র ১৩৬
উদগ্র ২৬২
উদয় ( রাজা ) ১০১, ১১৮
উপনিষদ্‌ ৪৫, ৪৭, ৫০
উপালি ১২৭
উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ৫, ৫৫, ৬১, ১৫০
উবট ( ভাষ্যকার ) ৫৬
উশিজ্‌ ২১, ৬৬
উশীনর ২৬২

ঋ

ঋগ্‌বেদ ৮-৯, ১২, ১৪-৬, ১৮-৯, ২১-৫, ২৭-৩০, ৩৩, ৩৮, ৪২, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৮১, ২৮৫

এ

একাহ ৬৯
এগলিং, জে. ৬৫
এথেন্স ১৬৭
এলফিনস্টোন, এম. ১
এলাহাবাদ ২৯৯
এশিয়া ৮

ঐ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩২, ৫৬, ৬১, ৬৩-৪, ৬৬

ও

ওড়িশা ৩০৪, ৩০৮
ওনেসিক্রিতোস ১৬৬
ওয়েই ( রাজবংশ ) ৩১০
ওল্ডেনবের্গ, এইচ. ১৯, ৮৯, ৯৭

ঔ

ঔড্র ৩০৩-৪

ক

কক্ষীবান্‌ ৬৬
কটক ৩০৮
কণ্ব ২১
কপিঞ্জলাদ ৬৬
কপিষ্ঠল সংহিতা ৭৯
কপিলবস্তু ১৪৩-৪
কম্বোজ ১০৯, ২৬২, ৩০৩
কম্মকর/কর্মকর ( ভাড়া-করা শ্রমিক ) ২৮, ৪৭, ৮৩, ৯১, ৯৭-৯, ১০০ ৫, ১০৭-৮, ১১৩, ১৩৪, ১৩৮-৪১, ১৪০ ৭, ১৫১-৩, ১৫৬-৭, ১৬৬-৭, ১৭২, ১৭৪, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৬-৮, ১৯৪, ১৯৮, ২২৫, ২৩৩, ২৩৫-৬, ২৪১, ২৪৬, ২৫৯, ২৮৪, ২৮৮
কম্মকরী ১৪০
কর্মকর্তা ৪৭
কর্মার ২৯-৩০, ৫২, ৫৪, ৭৭
কর্ষক ১৪৮-৯ ১৫২, ১৫৫, ১১৯
করণ ১২২, ২৬২, ৩০৩-৬
করূষ/কারূষ ৩০৩-৪

কলিঙ্গ ১৬৭
কলিঙ্গ ( জনগোষ্ঠী ) ১২৮, ২৬২, ২৮৮
কলিযুগ ১৭৬, ১৮৯-৯০, ২১১-৩, ২১৫-৬, ২২১, ২৩৬, ২৮৯, ২৯১
কবষ ঐলূষ ৬৫, ৭৪
কাক্ষীবন্ত ২১
কাছাড় ২৩২
কাঠক সংহিতা ৭৪, ৭৯-৮০
কাত্যায়ন ( স্মৃতি ) ২২২, ২২৬, ২২৯-৩১, ২৩৪, ২৪৪, ২৪৬-৮, ২৫৩, ২৭৩
কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৪৫, ৪৯
কাথিয়াবাড় ৩০৪
কামন্দক ২২৪, ২৪৪, ২৪৬
কামসূত্র ২২৪, ২২৮, ২৩৯, ২৬১
কারাবর ২০৫-৬, ৩০৫
কালাক ৩১২
কালিদাস ২২৩, ২৬৪, ২৭৩
কাবেরীপত্তনম্ ( বন্দর ) ১৭৯
কাশী ১৮, ১০০
কাশীপ্রসাদ জায়সবাল ৫৪-৫, ৫৯, ১১০, ১৮৬, ১৯৩, ২৬৭, ২৯৬
কাশ্মীর ২৪৪
কাসাইট ২৫
কিরাত ৪৭, ২৬৩, ৩০৩-৪
কীকট ১১
কীথ, এ. বি. ২০, ৪৮, ৫৩, ৬২-৩, ৮২
কুক্কুটক ( কুটক, কৌকুটিক ) ১২৩, ১৭০, ২০৪, ২০৬, ৩০৫-৬
কুদ্র ৩৭
কুদ্রোস ৩৬
কুনবি ২৩৫
কুমারগুপ্ত, প্রথম ৩১০
কুমারামাত্য ২৪৫
কুমারিল ভট্ট ২৭০
কুম্ভকার ১২৭, ২৯৩
কুম্ভদাসী ২৬১
কুর্মালী ২৭
কুর্মী ২৩৫
কুরু ১৭৫
কুরু পাঞ্চাল ৪৪
কুল ৯, ৩৪, ২৪০
কুলূক ১৭৭-৮, ১৯১, ১৯৩, ১৯৮, ২০২-৪, ২০৮, ২১০
কুশীলব ৩০৬
কুষাণ ১৭৬, ১৭৮-৯, ১৮১, ১৮৯, ২১১, ২১৯-২০, ২৬৮, ২৯৯-৩০০, ৩০৯-১১
কূর্ম পুরাণ ২১২
কৃত ৩০৬
কৃষ্ণ ( দেবতা ) ১৩, ২২৩, ২৭৯
কৃষ্ণ ( রঙ ) ১৩-৪
কৃষ্ণকোষ ২৭৭
কৃষ্ণরূপা অসুরসেনাঃ ১৩
কৃষ্ণ যজুর্বেদ ৪৪, ৫৪ ( তৈত্তিরীয় সংহিতা দ্র. )
কৃষ্ণযোনিঃ দাসীঃ ১৩
কৃষ্ণল ২৪১, ৩০০
কেতকর ৩
কেম্ব্রিজ ভারত-ইতিহাস ৮৮
কেল্ট ৫২
কৈবর্ত ২০৫-৬, ২৪৬-৭, ২৭৯, ৩০৫
কোটিবর্ষ ২৪৫
কোড অফ জেণ্টু লজ, আ ১
কোল ২৩৩
কোলব্রুক, এইচ. টি. ১
কোলিক ২৩৩
কোশল/কোসল ৯০, ১০৭, ১৬৭
কৌটতক্ষ ৯৪
কৌটিল্য ৫, ৮৭, ১০৪, ১০৭, ১৪৫-৫৩, ১৫৫-৬, ১৫৮-৬৫, ১৬৭-৭২, ১৭৪, ১৮৬-৮, ১৯৬-৭ ২১৮, ২২৬-৭, ২২৯-৩১, ২৩৫, ২৪০-২, ২৪৬, ২৫৫, ২৮৭-৮, ২৯৪, ২৯৮, ৩০১-২, ৩০৬

কৌশাম্বী ৯৫
কৌশিক ২৮২
কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৪৪
ক্ষত্তা ৫৩, ৫৭, ১২২, ১৬২, ১৭০, ২০৪-৬, ২৬৩, ৩০৫-৬
ক্ষত্র ৫৫, ৬০, ৬১, ৬৪
ক্ষত্রিয় ৪-৫, ৭ ; আদি বৈদিক যুগ ১৯-৩৮ ; বেদোত্তর যুগ ৩৮-৮২ ; প্রাগ্-মৌর্য যুগ ৮৯-১৪৪ ; মৌর্য যুগ ১৫৮-১৬৩ ; মৌর্যোত্তর যুগ ১৭৬-২১১ ; গুপ্ত যুগ ২৪৩-৩১২ ( প্রায়শ )
ক্ষুদ্র ৪১
ক্ষুদ্রক/ক্ষৌদ্রক ১১৮

খ

খস ৩০৩-৪

গ

গঙ্গমাল ১১৮
গঙ্গমাল জাতক ১০১
গঙ্গা ২৬, ১৪৩
গণ ৯, ১১
গণপতি ২৮০
গণপতি শাস্ত্রী, টি. ১৫২-৩, ২৩৫
গণপাঠ ( পাণিনি ) ১৩২
গদাধর ২৭১
গয়া ১৮২
গর্ভদাস ৫০
গহপতি/গৃহপতি ৪, ৯১-৪, ১০৭-৮, ১১০, ১৪১, ১৫৩
গাইগার, ডব্লু ৭০
গাঙ্গেয় অববাহিকা ৪৬, ৬৪, ৮০, ৯০-১, ১০৫, ১৬৭, ১৭৯, ২৮৫, ৩০১-২
গাঙ্গেয় উপত্যকা ১১০
গান্ধার ( জনগোষ্ঠী ) ১২৮
গায়ত্রী ৫৮, ২৫১
গুজরাট ২৩২, ৩০৪, ৩০৭-৮
গুল্ম ২৯৯
গৃহ্যসূত্র ৪৫, ৭১, ৮৪-৬, ৮৯, ১২৩, ১৩১, ২৭০, ২৭৫, ২৮৩
গেল্‌ড্‌নার, কে. এফ. ১৪, ১৬
গোপথ ব্রাহ্মণ ৪৮
গোমখ ( যজ্ঞ ) ২৫২
গোবিকর্তন ৫২-৩, ৭৮
গৌড় ( জনগোষ্ঠী ) ১২৮
গৌতম ( স্মৃতি ) ৮৫, ৯২, ৯৯, ১০৩, ১০৫-৭, ১১১-২, ১১৬-৭, ১১৯, ১২২-৬, ১৩৩, ১৪২, ১৮৭, ১৮৯
গৌতম ধর্মসূত্র ৮৫, ১১০, ১৩৩, ১৪৬, ১৯২
গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ১৯৯, ২২০, ৩০০
গ্রামণী ২৯
গ্রামতক্ষ ৯৪
গ্রামভৃতক ১৫৬
গ্রামশিল্পী ৯৪
গ্রাম্যকুটুম্বিনঃ ১৫১
গ্রীক ১০৮, ১৩৪, ১৭৯-৮০, ১৮৯, ২১১, ২১৯, ২৬৩
গ্রীস ৫১, ৯৫, ১০৮-১১, ১১৬, ১৪৪, ১৫১, ২৩১, ২৯১-২

ঘ

ঘুরে, জি. এস. ৩

চ

চণ্ডাল ৬৭-৮, ৮২, ৮৪, ৮৭, ১১৮, ১২২, ১২৪, ১২৮-৩৭ ( প্রায়শ ), ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৭০-১, ২০১, ২০৪-৫, ২০৭-৮, ২১০, ২৪৬, ২৫০, ২৫৫, ২৫৭-৮, ২৬২-৫, ২৬৭, ২৭৯-৮০, ৩০৫-৬
চতুর্বর্গচিন্তামণি ২৭৬
চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য) ১৪৫, ১৫৮, ১৬৭, ২৯৪
চন্দ্রগুপ্ত-কুমারদেবী ৩১০

চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় ২৩১, ২৫৬, ৩১১
চম্ব ২৯৯
চম্মকার/চর্মকার ১২৭, ১৩২, ২৬৪, ৩০৫
চর্মম্ন ৩০
চাইল্ডার্স, আর. সি. ৯৮
চাণ্ডালিকা ২৬৫
চান্দ্রায়ণ ২০২, ২১১, ২৫২, ২৫৯, ২৬৯
চারুদত্ত ২৬১
চুন্দ ৯৩
চীন ১৭৮, ১৮০, ৩১০
চীন ( মানবগোষ্ঠী ) ৩৪, ২৯০, ৩০৩-৪
চণ্ডু/চুণ্ডু ২০৫-৬, ৩০৫
চ্যবন ( মুনি ) ২৬০

ছ

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫০, ৬৯-৭১, ৮৪

জ

জগতী ৫৮
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ২২৯
জন ৯, ১৯, ৫৯
জনক ৩৮, ৫১, ৯১
জন্য ৫৯
জন্যমিত্র ৫৯
জয় সংহিতা ৪৫
জয়পাল ২৭১
জয়মঙ্গল-ভাষ্য ( কামসূত্র ) ১৭২
জয়াখ্য-সংহিতা ২৮০
জাতক ৮৬-৭, ৯৪, ৯৮-১০২, ১০৪, ১১০, ১২০, ১২৪, ১২৯-৩১, ১৩৫, ১৩৯-৪০, ১৪২-৩, ১৮৩
জাতি ( কাস্ট ) ১৯, ১২৮, ২৯৩
জানশ্রুতি ৪০, ৫০, ৭০-১
জৈন-রচনা ১৪০, ১৪৫, ১৭৬, ১৮৩-৪, ২২৭, ২৩০, ২৪৬, ২৫০, ২৬০, ২৬৩-৫
জৈনধর্ম ১৩৬-৮, ১৫৩, ২৭৩, ২৯৪
জৈমিনি ৯২, ১২৫
জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ৪৪, ৪৭, ৫৮
জোন্স্, উইলিয়াম ১

ঝ

ঝলবার ( রাজস্থানের জেলা ) ৩০৪
ঝল্ল ২০৬, ৩০৩-৪

ড

ডোম্ব ২৬৩, ২৬৫

ত

তক্মা ৩৪
তক্ষক ৭৩-৪, ১৩১
তক্ষণ ৩০, ২৫৭
তক্ষশিলা ১২৪, ১৭৯-৮০
তক্ষা ৫২-৪, ৮০, ৮২
তন্ত্রবার্তিক ২৭০
তপ্তকৃচ্ছ্র ২০২
তমলুক ১৭৯
তরুক্ষ ২২, ২৫
তাং ( সম্রাট ) ৩১০
তাই-ৎ সাং ৩১০
তাম্রপ্রস্তর যুগ ১৯
তুখার ৩৪
তুন্নকার ৯৪
তুর্বশ ১৬
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৪৪, ৬০, ৭১, ৭৬-৭, ৭৯
তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫৮, ৭৭, ৭৯
তোসলী ২৬০
ত্রসদস্যু ১৪, ২২
ত্রিপুরা ৩০৮
ত্রিষ্টুভ্ ৫৮
ত্রেতা ( যুগ ) ২৮

থ

থের-, থেরীগাথা ১২৭, ১৩৬

দ

দক্ষ ২৮০

দক্ষিণ ভারত/দাক্ষিণাত্য ১৭৯, ১৮৩, ২৩২, ২৩৯, ২৭৯, ৩০৪, ৩০৮

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৩১০

দধীতি ১১

দম্ভোদ্ভব ৫৭

দয়ানন্দ, স্বামী ২

দর্ভ ৩১

দর্ভ শাতানীকি ৫৮, ৭৬

দর্শপূর্ণমাস ৬০

দরদ ৩৪, ৩০৩-৪

দশগ্রামপতি ২৯৮

দশগ্রামী ২৯৮

দশ রাজার যুদ্ধ ৩৯

দস্যু ( মানবগোষ্ঠী ) ৯-১৬, ২০, ২৪-২৫, ৩৩, ৬৮, ২৫৩

দস্যু ( মিশ্র জাতি ) ২০৫

দহ ১৮, ২৪

দামোদরপুর ( তাম্রলেখ ) ২৪৫

দাস ( মানবগোষ্ঠী ) ৯-২২ (প্রায়শ ), ২৫

দাস ( -প্রথা ) ২৩-২৪, ৪২, ৪৯, ৯৭-১০০, ১৬৩-৮, ১৮৪, ১৯৮, ২০৫-৬, ২২৮-৩৭, ২৪৮

দাসকর্মকরপোরিস ৯৭, ১০৪

দাসকর্মকরকল্প ১৬৪

দাস পরিভোগ ১০০

দাস প্রবর্গ ২৩

দাস ভোগ ১০৯

দাস বিশ্ ২৩-৪

দাসী ২২, ২৮, ৪৮, ৬৫-৬, ১৪০, ১৯৮, ২০৪, ২০৯, ২৩০

দাহাএ ৩৬

দিওদোরস ৩২

দিন্নী ২৭৭

দিবোদাস ( পুরোহিত ) ২১

দিবোদাস ( রাজা ) ২৫

দিব্যাবদান ১৭৫

দীক্ষিত, এম. জি. ১৮০

দীঘ নিকায় ৮৬, ১২৭, ১৩৭, ১৩৯, ১৮৪, ৩০২

দীর্ঘতমা ২১, ২৩, ৬৬

দুর্যোধন ৯১

দুন্দুবতী ২৬, ৩৬, ১৭৫

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ২০৯

দেবল ২৭৬

দৌষ্মন্ত ৩০৬

দ্রবিড় ৩৬, ১২৮, ২৬২, ৩০৩

দ্রাবিড় ১৩৩-৪, ৩০৪

দ্রাহ্যায়ন ( শ্রৌতসূত্র ) ৪৫

দ্রুহ্যু ১৬

ধ

ধনুর্বেদ সংহিতা ২৫৩, ২৬৮

ধর্মমূর্তি ২৭৮

ধর্মশাস্ত্র/-সূত্র ২, ৫, ৭, ৩০, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৭৪, ৮৪-৫, ৮৯, ৯২, ৯৫-৯, ১০৬, ১১১-২, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২১-৪, ১২৯-৩১, ১৩৪, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪-৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৭-৯, ১৬১-২, ১৬৬, ১৬৮-৭০, ১৭৪-৫, ১৮৭, ১৯৯, ২০৯, ২১৭, ২২০, ২২২, ২২৫-৬, ২৩১, ২৪০-২, ২৪৯-৫১, ২৫৭, ২৬২, ২৮৬, ২৯০, ২৯৬-৯, ৩০২, ৩০৫-৬

ধর্মশাস্ত্রকার / -প্রণেতা ১৮৭, ১৯২-৩, ১৯৮, ২২২, ২৩৯-৪১, ২৪৩, ২৪৬-৮, ২৫৪, ২৫৭, ২৭২, ২৭৬, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৮

ধিগ্বণ ২০৫-৬, ৩০৫

ধীবর ৩০৬

ধৃতিমিত্র ২৪৫

ন

নকুল ৩৪
নট ১২৬, ১৫১, ২৪৬, ৩০৩-৪, ৩০৬-৭
নট-নর্তক ২০৬
নন্দ ( বংশ ) ১১০, ১৪৫
নন্দরাজ ( ভাষ্যকার ) ২৬১
নয়চন্দ্রিকা ( ভাষ্য ) ১৫০
নরসিংহগুপ্ত ৩১১
নরসিংহ পুরাণ ২৩৫
নাট্যশাস্ত্র ( ভরত ) ২২৪, ২৫৬-৭, ২৬৬-৭
নারদ ( স্মৃতি ) ২২২, ২২৫-৩১, ২৩৪, ২৪১, ২৪৫-৭, ২৫০, ২৫২-৩, ২৫৫, ২৬০, ২৬৮, ২৯৬
নারায়ণ ২৭৯
নাসিক ১৮২, ৩০০
নাসিক প্রত্নলেখ ১৮৪, ৩০০
নিঘণ্টু ৪৮
নিরুক্ত ৬৩, ৭৩,
নিষাদ ৪৭, ৭১, ৭৩-৪, ৭৭-৮, ৮০, ১০৬, ১২২-৩, ১২৮, ১৩০. ১৩২-৫, ১৬২, ১৭০-১, ২০১, ২০৪-৬, ২৬২, ৩০১, ৩০৫-৬
নীতিসার ২২৪
নেপাল ২২২, ২৬২, ৩০৪
নৌসরি ৩১০

প

পক্থ ১৬
পঞ্চতন্ত্র ২৫৯
পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ৪৪, ৬৫-৬
পণি ১৮
পতঞ্জলি ১২৮, ১৭৫, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৭-৮, ১৯৮-২০০, ২০২, ২০৪, ২০৮
পদ্মপুরাণ ২৭২
পর্ণক ৪৭
পর্ণ-মণি ২৯
পরশুরাম ৩৮
পরাশর ৬৬
পরুষ্ণি ( নদী ) ১৬
পল্লব প্রত্নলেখ ২৩৯, ২৯৯
পল্লব ভূমিদান পত্র ২৩৩
পশ্চিম ভারত ১৭৯, ২৪৮, ২৫২, ২৭৭, ২৭৯, ৩০৪, ৩১০-১
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ১৬৭
পশ্চিম মহারাষ্ট্র ৩০৭
পশ্চিমবঙ্গ ৩০৮
পহ্লব ৩৪, ২৯৬. ৩০৩-৪
পাকিস্তান ২৬, ১৭৯, ৩১১
পাঞ্চাল ৫৮, ৭৬, ১৭৫
পাঞ্জাব ২৬. ৩৫, ৮৬
পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে ১৭, ৮৫
পাণ্ডুসোপাক ২০৫-৬, ৩০৫
পাণিনি ৪১, ৫৬, ৮৫. ৯৩-৪, ১০০, ১০৩, ১০৯. ১২৮, ১৩২, ১৭০, ১৯৮, ২০০, ২৯৩
পার্জিটার, এফ. ই ২৩২, ২৪৪
পার্থিব ১৭৬, ১৮৯, ২১৯, ২৯৬
পারদ ৩০৩-৪
পারশব ১২২, ১৬২, ১৭০-১, ১৭৩, ২০৪, ৩০৫-৬
পাল ( রাজবংশ ) ২৯৯
পালাগল ৫২-৩, ৬৬
পালামৌ ৩০৪
পালি ( রচনা ) ৯৮, ১০১-২, ১০৭, ১১৮, ১২৯-৩০, ১৫০, ১৬৭, ২৩৫, ৩০২
পুক্কস/পুক্কুস/পুল্কস/পৌল্কস ৪৭, ৬৭, ৮৪, ১২৩, ১২৮, ১৩০-১. ১৩৪-৫, ১৬২, ১৭০, ২০৪-৭. ২৬৭, ৩০৫-৬
পুঞ্জিষ্ঠ ৭৭, ৩০১
পুরুকুৎস ১৪, ২২
পুরাণ ২৮, ৩০, ৩১, ৪১, ৬৬, ১৭৬, ২১১, ২১৬, ২২১, ২২৩. ২৩৬, ২৪২, ২৬৬, ২৭৫-৬, ২৮১-৪, ২৯১, ৩০৬, ৩০৯

পুরুষমেধ ৪৭, ৪৯, ৬৭, ৩০১
পুরুষসূক্ত ( ঋগ্‌বেদ ) ২২, ৩০-১, ৬৪
পুলিন্দ ৩৬, ৬৮, ১৬০, ২৬২-৩
পুষ্পধ ৩০৩-৪
পূর্ব ভারত ৩০৪
পুরু ১৬
পূষা ( দেবতা ) ৫৬, ৭৬
পুষধ্র ২৬০
পেসকার ১২৭, ১৩৫
পেস্‌স/প্রেষ্য ১০২, ১০৪, ১০৮, ১১৩
পৈজবন ৫, ৩৭, ৩৯, ২৬৯
পৈপ্পলাদ সংহিতা ৩৪
পৌণ্ড্রক ৩০৩-৪
প্রজাপতি ৪৭, ৬৯, ৭৫-৬, ২২৮
প্রতর্দন দৈবোদাসি ২২
প্রতিলোম ১২২-৩, ২২৯, ২৫০, ২৯৩, ৩০২-৩, ৩০৫
প্রবরসেন ৩০৮
প্রবাহন জৈবলি ৩৮
প্রাকৃত ২৬৭, ২৯৯
প্লেটো ২৫৬

ফ

ফা-হিয়েন ২৫১-২, ২৫৯, ২৬৩-৪
ফিক, রিচার্ড ৮৯, ১০২, ১৩০, ১৩৬
ফ্রিজীয় ৫২
ফ্লামেন ২০

ব ( বর্গীয় )

বৎস ৬৫
বপ্পমঙ্গল ৫১, ৯১
বল্‌হিক ৩৪
বলবূথ ২২, ২৫
বলি ২৭-৮, ৫০, ৬৪
বাংলা ২৯৯, ৩০১
বাংলাদেশ ৩০৮, ৩১২
বাইজেন্টাইন ৩১০
বাক্‌ট্রীয় গ্রীক ১৭৬
বাদরায়ণ ৪০
বাদরী ১২৫
বার্নেল, এ. সি. ১১৫
বাল গঙ্গাধর টিলক ৩
বালেশ্বর ৩০৮
বিহার ২৭, ৮৬, ৯০, ২৩৫, ২৯৯, ৩০১-২, ৩০৪
বিম্বিসার ১৩৭, ১৬৭
বুদ্ধ ৪১, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৬-৭ ১০০,, ১২৮, ১৩৫, ১৩৭-৮, ১৪০-২, ১৪৬, ২৭
বৃহৎসংহিতা ২২৪, ২৩৪
বৃহস্পতি ( স্মৃতি ) ১৩, ২২২, ২২৫-৮, ২৩১, ২৩৪ ৫. ২৩৮, ২৪০-২, ২৪৫-৭, ২৪৯-৫১, ২৫৮-৯, ২৬৩, ২৬৯-৭০, ২৭৫, ২৭৮, ২৯৭-৮
ব্যুহ্‌লার, গেঅর্গ ১১৯, ২৯৬
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ৭৬, ৮০, ৮৪
বেইলি, এইচ. ডবল্যু ৮, ২৪
বেগরাম ( আফগানিস্তান ) ১৮১
বৈন্দ ৪৭
বোধিসত্ত্ব/-সত্ত্ব ৯৩, ১০১, ১৩৬, ১৪০, ২০৬
বৌদ্ধ ৪১, ৫১, ৯১, ১২৮, ১৩১, ১৩৪, ১৪২-৩, ১৪৬, ১৭০, ১৭৪, ১৮২, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ২০৬, ২১৮, ২২০, ২৩৭, ২৬৪, ২৬৭, ২৭৩, ২৭৮, ২৮২, ২৯৪, ৩০৭
বৌদ্ধধর্ম ৯৭, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭-৪১, ১৫৩, ১৭৪, ১৮৫, ১৮৯, ২১২, ২২০, ২৯৪-৫
বৌধায়ন ৮৬, ১০৬-৭, ১১১, ১১৫-৭, ১১৯-২৩, ১২৫-৬, ১৩১, ১৩৪, ৩০৩, ৩০৬,
বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১২২, ১৪৬

বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ৪৪
ব্যাবিলোনিয়া ২৫
ব্রহ্ম ৫৫, ৬০, ৬১, ২০২
ব্রহ্ম পুরাণ ২৭১
ব্রহ্মর্ষিদেশ ১৭৫
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ২৯৭, ৩০৬
ব্রহ্মা ২৭, ১৭৬, ১৯৭
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ২১২, ২১৬, ২৫৫
ব্রহ্মাবর্ত ১৭৫, ৩০৪
ব্রাহ্মণ ৪, ৭, ১৯-২০, ৩০, ৩২-৩, ৩৮-৯, ৪২, ৫৪, ৬০-১, ৬৪ ; প্রাগ্ মৌর্য যুগ ৮৯-১৪৪ ; মৌর্য যুগ ১৫৯-৭৩ ; মৌর্যোত্তর যুগ ১৭৬-২১৫ ; গুপ্ত যুগ ২২২-৯২ ( প্রায়শ )
ব্রাহ্মণ ( সাহিত্য ) ৬৭, ৭৮, ৮২, ১৪৫
ব্রেজিল ১৬৭

ভ

ভটক/ভতক/ভৃতক ১০৩-৪, ১০৮, ১৭৮ ১৮৭-৯, ২২৫
ভট্টস্বামী ১৫১-২
ভরত ২২৪, 'নাট্যশাস্ত্র' দ্র.
ভরহুত/ভারহুত ৮৭, ১৮২, ৩০৭
ভলান ১৬
ভবিষ্য পুরাণ ৬৬, ২৬৬
ভাগবত পুরাণ ২৬৬
ভাগিল্ল-ভাগিক ১১৪
ভারত ( জনগোষ্ঠী ) ১৬, ৩৯
ভাস ১৭৫, ২১০
ভারহুত ৩১০
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৩
ভূমিদান প্রশংসা ( মহাভারত ) ২৯৭
ভূর্জকণ্টক ৩০৩-৪
ভৃগু ২০৪
ভৃঙ্গাকণ্ঠ ৩০৬
ভেবার, আলব্রেশ্‌ট্ ২, ২৭, ৭৭
ভেসপিয়ান ১৭৯

ম

মক খলি গোসাল ১৪৩
মগধ ৯০, ৯৭-৮, ১০৫, ১০৭, ১৩৭, ১৬৭, ২৮৬, ৩০১
মজ্ঝিম নিকায় ৮৬, ৯৬, ১১৩
মজ্ঝিমা পটিপদা ১৪৬
মৎস্য পুরাণ ২১২, ২২৩
মথুরা ১৮২-৩, ১৮৬
মদ্গু ২০৫-৬, ৩০৫
মদনপাল ৬৬, ২৭৭
মদনিকা ২৬১
মদ্রনাভ ২৬২
মধ্য এশিয়া ১৭৮, ৩১০
মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চল ৯১, ১৬৭
মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকা ১৬৭, ২৮৬
মধ্যপ্রদেশ ৯০, ২৩৫, ৩০৮
মধ্য ভারত ২৩৪, ২৫২
মধ্য রাজ্য ( মিশর ) ২৫১, ২৫৯
মধ্যান্ত বিভঙ্গ ১৪৬
মনীষী ২৯
মনু ৮৭, ৯৮, ১২৩, ১৬১, ১৭৫-৮, ১৮২, ১৮৪, ২১০, ২১৬-৮, ২২০-১, ২২৫, ২৩০-১, ২৩৩, ২৩৬, ২৪১, ২৪৫, ২৪৭-৮, ২৫১ ২৫৪, ২৫৮, ২৬০, ২৬৩, ২৬৬, ২৬৮, ২৭০, ২৭৮, ২৮৭-৯, ২৯৬-৯, ৩০১-৭
মনুস্মৃতি ১, ১০৬, ১৭৫, ১৯৭, ২০৬, ২০৮, ২১৭, ২২১, ২৬২, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৬, ৩০৯
মনু বৈবস্বত ২৬০
মন্যু ১৫
মরীচি ২৭২
মরুৎ ১৩, ৪৭, ৫৭, ৭৬
মরুত্ত আবিক্ষিত ৫৭

মস্করী ১১০, ১২৪
মহাকাব্য ৩০, ৩৪, ৫০, ৫৭, ২১১, ২৬৬-৭, ২৮৩-৪
মহাদেব ২৮০
মহাভাষ্য ( পতঞ্জলি ) ১৭৫, ২০৮-৯
মহাভারত ৭, ২৬, ৩৪, ৩৭, ৩৯-৪০, ৪৫, ৫৬-৭, ৬৬, ৭৩-৪, ৭৬, ৮১, ২০৩, ২১৫-৬, ২২১, ২২৩, ২৬৬, ২৭৯, ২৮১, ২৯১, ৩০৪
মহারাষ্ট্র ১৭৯, ২৯৮, ৩০৭-৮
মহাবস্তু ১৭৫, ১৭৮, ১৮৩, ১৯৪
মহাবীর ৩৮, ৮৮, ১৩৭
মহাবৃষ ( মানবগোষ্ঠী ) ৩৪, ৪০, ৭০
মহীদাস ৬৬
মহীধর ৫৬
মাংস ২৬২
মাংসক ২০৬
মাগধ ( জনগোষ্ঠী ) ১২২, ১৬২, ২০৫, ২০৮, ২৬৩, ৩০১, ৩০৫-৬
মাগধী ( প্রাকৃত উপভাষা ) ২৬৭
মাতঙ্গ ( চণ্ডালপুত্র ) ১৩৬, ২৬৫
মাধুক ৩০৫
মান্দাসোর ২৪০, ৩১০
মামতের ২১
মার্কণ্ডের পুরাণ ২২৩, ২৩৪, ২৬৩, ২৬৮
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৬৭
মার্গব ২০৫-৬, ৩০৫
মালব ৮৬, ২৪৪, ৩০৪, ৩১০
মালব ( জনগোষ্ঠী ) ১৯৮
মালব্য ১৯৮
মালাকার ১৮৩, ২৯৩
মাহিষ/মাহিষক ২৬২-৩
মাহিষ্য ৩০৬
মাহুত ২৫০
মিউঅর, জে. ২, ৪, ১৭-৮
মিত্তানী ২৫
মিথিলা ৩৮, ২২২, ২৭৭, ২৮২
মিল, জে. ১
মিলিন্দপঞহো ১৭৫, ১৭৭-৮, ১৮৩-৪, ১৮৯-৯০
মিশর ১৪৭, ১৭৯, ২১৩, ২৮৪
মীমাংসা-সূত্র ৯২, ২৬৭
মুজবন্ত ৩৪
মূর্ধাবষিক্ত ৩০৬
মৃচ্ছকটিক ২৫৬, ২৫৮, ২৬১, ২৬৫, ২৬৭, ২৮২
মৃত্তপ ১২৮, ২০৮
মৃধ্রবাচ্ ১৪
মেগাস্থেনেস ১৪৫-৭, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৮-৬১, ১৬৬
মেদ ২০৫-৬, ২৫০, ২৬৪, ২৯৬, ৩০৫
মেধাতিথি ৬৫, ১৭৮
মেসোপটেমিয়া ২৫
মেহেরাউলি লৌহস্তম্ভ ২৩৭
মৈত্র ২৯৬, ৩০৩-৪
মৈত্রক (বলভীর শাসক) ২৩২, ২৯৬, ৩০৪, ৩০৮
মৈত্রায়ণী সংহিতা ৭৯
মৈত্রেরক ২০৫-৬, ৩০৫
মৌষ্টিক ২০৬
মৌসিকানস ১৬৬
ম্লেচ্ছ ( জনগোষ্ঠী ও শাসক ) ২১৩, ২১৫, ২১৭, ২৪৪, ২৪৮, ২৫৫, ২৬৩

য/য়

যক্ষ ( জকখ ) ২৬৫
যজুর্বেদ সংহিতা ( শুক্ল ও কৃষ্ণ) ৫৪, ৫৬, ৬৪, ৭১, ৭৫, ৭৭, ৩০১
যদু ১৬
যমুনা ১৩, ১৭৯
যবন ৮৫, ১০৯, ১২২, ১৬৫, ২৬২, ২৯৬, ৩০৩-৪, ৩০৬

যাজ্ঞবল্ক্য ( স্মৃতি ) ২২২, ২২৬, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৪২, ২৪৪-৯, ২৫১, ২৫৫, ২৫৭-৬০, ২৬২, ২৬৭-৯, ৩৭৩-৪, ২৭৮, ২৯৭
যাদব ( জনগোষ্ঠী ) ১৩
যাস্ক ৭৩-৪
যুগ পুরাণ ১৭৭, ২১৩
যুধিষ্ঠির ৩৪, ৪৮, ৫৬, ৮১
য়ুয়ান চাং ২৩৫, ৩০৩, ৩১১
যোগ ( দর্শন ) ২৬৬
যোগক্ষেম ১৪৯

র

রজক ২০১-২, ২৫৭, ২৬১, ২৭৯
রঞ্জক ২০১
রত্নহবীংষি ৫৪, ৭৬, ৭৮
রত্নী ৫২-৪, ৮২
রথকার ২৯, ৫২, ৫৪, ৫৮, ৭১, ৭৩-৪, ৭৮, ৮০, ৮২, ১২৩, ১২৮, ১৩১-২, ১৩৪, ১৬২, ১৭০, ২৬৩
রবিকীর্তি ২৫৬
রাঘবানন্দ ১৯৪, ২০৭
রাজগহ/রাজগৃহ ৮৬, ১৮৩, ১৮৮
রাজঘাট ( বারাণসী ) ১৮০
রাজন্য ৩০, ৪২, ৪৭, ৫০, ৫৩-৪, ৫৮, ২৮০, ৩০৩
রাজশাহী ৩১২
রাজসূয় ৩৪, ৫২, ৫৪-৬, ৫৮-৬১, ৬৪
রাজস্থান ৩০৪
রাজ্জুক ১৬৮
রাম ২৭৩
রাম মার্গবের ৬১
রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ৩
রামমোহন রায় ২
রামায়ণ ২৭৩
রিস ডেভিডস, টি. ডব্লু. ৮৯, ১৩১
রিস ডেভিডস ( শ্রীমতী ) ১৪৩
রুদ্র ৩০১
রুদ্র-পশুপতি ৭৩, ৭৭-৮
রুদ্রদামন ২১৯, ৩০০
রৈক ৪০, ৫০
রোট, রুডল্ফ্ ৮
রোম/রোমান ২০, ৩৪, ৮৭, ৯৫, ১০৮, ১১০, ১৪৪, ১৫১, ১৬৭, ১৭৮-৮১, ১৮৩, ২১৯, ২৩১, ২৯১-২, ৩০৯

ল

লঙ্কাবতার সূত্র ২২৪
লাকেদেমোনীয় ১৬৬
ল্যাতিন ১৭৯
লিচ্ছবি ৩০৩
লীলাবতী ২৭৮
লোকায়ত ১৪৬

ব ( অন্তস্থ )

বজ্রসূচি ২২৪, ২৬৭, ৭৯, ২৮১-২
বনপর্ব ( মহাভারত ) ২৮২
বরাহ পুরাণ ২৭২
বরাহদাস ২৫৬
বরাহমিহির ২২৪, ২৪৩
বলভী ২৩২, ২৯৬, ৩০৮
বশিষ্ঠ ১৬, ৬৬, ৮৬, ১০৬-৭, ১১১, ১১৫, ১১৯, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১৩৩, ১৪২, ১৪৪, ১৬৯, ১৯৭, ২১০-১, ২২০, ২৩৯, ২৫৫, ২৮২, ৩০৫
বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ১১১, ১৪৬, ২৫৪
বশিষ্ঠ সংহিতা ১৪২
বসন্তসেনা ২৬১, ২৮২
বাগুবিক ১৬০, ৩১৩
বাচস্পতি মিশ্র ২৭৭
বাজপেয় ৫০, ৬০
বাজসনেয়ি সংহিতা ৫৮, ৬৮, ৭৫, ৭৯

বাটধান ৩০৩-৪
বাৎস্যায়ন ২২৪, ২৬১
বায়ু পুরাণ ২১২, ২১৫, ২৫৫, ২৬০
বারাণসী ১২৯, ১৮০, ২৭৭
বালখিল্য ২৩
বাসুদেব ২৭৯, ৩১০
বাহ্য ১৩৩, ২০৫
বিজ্জম ৩০৩-৪
বিজ্ঞানেশ্বর ২৫৮
বিদথ ১১
বিদেঘ মাথব ৯১
বিধুশেখর শাস্ত্রী ৪
বিনয় পিটক ৮৬. ১০০, ১০৩, ১২৭, ১৩১, ১৪৩, ১৪৬
বিন্ধ্য ১৭৯
বিলাল ৩১৩
বিশ্ ৯, ১৫, ১৯, ২২, ৩০, ৩৮, ৪৮, ৫০-১, ৫৪-৬, ৬০, ৭৬-৮, ১০১
বিশমত্তা ৩৮
বিশ্বন্তর সৌষদমন ৬১
বিশ্বরূপ ২৬০
বিশ্বামিত্র ১৬, ৩৮, ৬৮, ২০১, ২৮২
বিশ্বেদেব ৫৭, ৭৬
বিষ্ণু ( দেবতা ) ২১১, ২৭৯-৮০, ২৮২, ২৯৪
বিষ্ণু ( স্মৃতি ) ২২২-৩, ২৩৩, ২৩৯, ২৪১, ২৪৭-৯, ২৫১-২, ২৬১, ২৬৮, ২৯৭
বিষ্ণু পুরাণ ৭৪, ১৯০, ২১৬-৭, ২২০, ২২৩
বিষ্ণুদাস ২৫৬
বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ২২৪, ২৯৭
বিষ্ণুবর্ধকি ( ছুতোর ) ৩১২
বৃত্র ২০
বৃষল ৩৯, ৮০, ১২৮, ১৭১, ১৮৮, ২০০, ২০৮-৯, ২১৫, ২৪৫, ২৫৫
বৃষলী ২০৪, ২০৯, ২৬১
বৃষশিপ্র ১৪
বেণ ( জাতি ) ১২৮, ১৩১, ১৩৪, ১৭০, ২০১, ২০৪, ২০৬, ৩০৫-৬
বেণ ( রাজা ) ১৩২
বেদ ২০, ২৭, ৬৮, ৭১, ১১৯, ১২৩-৪, ১৩৩, ১৭২, ২০১, ২০৯-১০, ২১২, ২৪৪, ২৪৬, ২৬৬-৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮৪, ২৯৭, ৩০৩
বেদান্ত সূত্র ৪০
বৈজবাপ গৃহ্যসূত্র ২৭০-১
বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান ৭৮-৯, ১৭৩, ১৮৯, ২১০, ২৭৩
বৈদিক আর্য ৩৭, ৭০
বৈদিক দেবতা ২০, ৭৭
বৈদিক মন্ত্র ২০৩, ২১০, ২৬৮
বৈদিক ভারতীয় ১৯-২০, ৬৭, ৭০
বৈদিক যুগ ৭২, ৭৬, ৮০, ২৮৩
বৈদিক রচনা ২৭২, ৩০১
বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ৫৫, ৬১
বৈদিক সমাজ ৮৩, ২৮৫-৬, ৩০২
'বৈদিক সূচি' ১৮, ৪৮, ৬৫, ৮৩, ২৮৭
বৈদেহক ১৩১, ১৫২, ২০৫, ২০৮, ২৬৩, ৩০৫-৬
বৈরদেয় ৬৩, ১১৫, ১৯৫, ১৯৯
বৈশালী ১৬৭, ২৪৫, ২৮১
বৈশেষিক ( দর্শন ) ২৬৭
বৈশ্য ২৬, ৩১, ৪২, ৪৭, ৫০, ৫৪, ৫৭-৮, ৬০-১, ৬৪, ৬৭-৮, ৭১-২, ৭৪-৭, ৭৯, ৮১-২ ; প্রাক্-মৌর্য যুগ ৮৯-১৪৪ ; মৌর্য যুগ ১৪৯-৬৯ ; মৌর্যোত্তর যুগ ১৭৬-২২১ ; গুপ্ত যুগ ২২৯-৩৫ ; বৈশ্য-শূদ্র ২৩৬-৯১ ( প্রায়শ )
বৈশ্যবর্গ ২৩৩, ২৬৩
বৈশ্বদেব ১১৭, ২২০
বৈষ্ণব রচনা ২৭৩-৪, ২৭৯

বৈষ্ণব ধর্ম ১৮৯, ২১১, ২২৩, ২৭৮, ২৮০-২, ২৯৪-৫

ব্যাস ৬৬, ২৭২, ২৮২

ব্রত ২৭৫, ৩০১, ৩০৩

ব্রাত ৯, ৫৯

ব্রাত্য ১২, ৫৯, ৭০, ৭৭, ১৬২, ২৬২, ২৬৮, ৩০১-৪, ৩০৭

ব্রাত্য তত্ত্ব ৩০১, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৭

শ

শক ৩৪, ১৭৬, ১৮৯, ২১৩, ২১৯, ২৬২, ২৯৬, ৩০৩-৪, ৩১১

শকার ২৬৭

শংকর ( ভাষ্যকার ) ৪০, ৮০

শতদ্রু ২৬

শতপথ ব্রাহ্মণ ৪৪, ৫২-৩, ৫৭, ৬০-১, ৬৫, ৬৮, ৭৯-৮০

শম্বুক ২৭৩

শর্বিলক ২৬১

শবর ৩৬, ৬৮, ১২৮, ১৬০, ২৬৩

শাংখায়ন ব্রাহ্মণ ৪৫

শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র ৪৫, ৪৯, ৭৫

শার্ঙ্গধর ২৭৯

শান্তিপর্ব ( মহাভারত ) ৫, ৩৭, ৩৯, ২১৬, ২২১, ২২৩, ২২৫-৮, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৩-৪, ২৫২-৫, ২৫৭, ২৬৬, ২৬৮-৯, ২৭৩, ২৮৪, ২৯৭, ৩০০

শিব ( জনগোষ্ঠী ) ১৬

শিব ( দেবতা ) ২৮০

শিবি ( মানবগোষ্ঠী ) ৪০

শুক্ল যজুর্বেদ ৪৪, ৫৪ ( বাজসনেয়ি সংহিতা দ্র. )

শুঙ্গ যুগ ২৯৬

শুনঃশেপ ৬৭-৮

শূদ্র ঋত্বিক ২৯০

শূদ্রক ২২৩

শূদ্র কমলাকর ২৭৭

শূদ্রক কৃত্যতত্ত্ব ২৭৭

শূদ্র ধর্মবোধিনী ২৭৭

শূদ্র পদ্ধতি ২৭৭

শূদ্রাচার চিন্তামণি ২৭৭

শূদ্রাচার শিরোমণি ২৭৭

শৈখ ৩০৩-৪

শৈব ২৭৮, ২৯৫

শৈবধর্ম ২৮০, ২৯৫

শৌণ্ডিক ১৬৯, ২০১, ২০৬, ২৪৬, ২৬১

শৌনক ২০৪

শৌরসেনী ( প্রাকৃত ) ২৬৭

শ্যাপর্ণ ( গোত্র ) ৬১

শ্যামশাস্ত্রী, আর. ১৫২, ১৬৩-৪, ১৭১

শ্রুতি ২১২, ২৭২

শ্রৌতসূত্র ৪৪, ৪৯-৫১, ৬০, ৭১, ৮০

শ্বপাক ৬৬, ১৬১, ১৭০, ২০৪-৫, ২০৭, ২৫০, ২৫৭, ২৬২, ২৬৪,২৭৯, ৩০৫-৬

শ্বেতকেতু ৪৮, ৬৯

শ্রীশাতকর্ণি ১৮৩, ১৯৯, ২২০

স

সংযুক্ত নিকায় ৮৬

সক্রেতিস ৫১

সত্যার্থপ্রকাশ ২

সত্যাষাঢ় শ্রৌতসূত্র ৪৫

সদানা ( উপভাষা ) ২৭

সদ্দালপুত্ত ৯৩, ৯৫

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র ১৭৫, ১৯৪

সনকানীক ২৫৬

সপ্তসিন্ধু ১৫

সভা ১১

সমিতি ১১

সমুদ্রগুপ্ত ২৩১, ২৯৯, ৩১০

সরস্বতী ( দেবী ) ২৭

সরস্বতী ( নদী ) ২৬, ৩৬-৭, ১৭৫, ১৯৫

সর্বমেধ ( যজ্ঞ ) ৪৯
সভাপর্ব ( মহাভারত ) ৩৫, ৫৬
সাংখ্য ( দর্শন ) ২৬৬-৭
সাক্‌সন ৫২
সাঁচি ৮৭, ১৮২, ৩০৭
সাতবাহন ৮৭, ১৭৯, ১৮১, ১৮৫, ১৯৯, ২১৯-২০, ২৪৮, ২৮৮, ২৯৯-৩০০
সাত্বত ৩০৩-৪
সামবেদ ৭১
সামঞ্জ্ঞফল সূত্ত ১৩৭
সামবিধান ব্রাহ্মণ ১১৫
সাসারাম ৩০৪
সায়ণ ১৩-৪, ২০, ৩৩, ৫২-৩, ৬২-৩, ৬৬, ৭৮
সাবত্থি ( শ্রাবস্তী ) ৮৬
সিন্ধু ৩২, ১৬৬, ২৪৪
সিরকাপ ১৮০-১
সীতাধ্যক্ষ ১৫০-১
সুকালিন ২১১
সুদর্শন হ্রদ ২১৯
সুদাক্ষিণ ক্ষেমি ৬৬
সুদাস ১৫-৬, ৩৯
সুধন্বা ৩০৩-৪
সুত্ত ২১, ৭৭, ১৬২, ২০৫, ২০৮, ২৪৪, ২৬৩, ৩০৫-৬
সুয়গডম্‌ ১১৪
সুরসেন ৪০, ১৭৫
সেট্‌ঠি ৪, ৯১-২, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০২, ১০৮, ১১০, ১২৯
সেট্‌ঠিছত্ত ১১০
সেন ( রাজবংশ ) ২৯৯
সেনানী ৫৩
সেনার্ট, ই. ৩, ১৯, ৭২
সৈরন্ধ্র ২০৫-৬, ৩০৫
সোদ্রাই ৩২
সোভিয়েত মধ্য এশিয়া ১৭৯
সোম ১৩-৪, ৫০, ৭৪, ৭৯-৮০
সোমমিশ্র ২৭৭
সৌরাষ্ট্র ২৪৩
স্কন্দ পুরাণ ২৯৭
স্কন্দগুপ্ত ৩১০
স্ত্রাবো ১৪৭, ১৫১, ১৬০, ১৬৬
স্নাতক ৭১, ১১৬, ১৯০, ২০০-১, ২০৭, ২০৯, ২৪৪, ২৫৭
স্পার্টা/স্পার্টান ৫১, ৭০, ২৮৭
স্মৃতি ১৪৫, ২১২, ২২৬, ২৭২, ২৯৭


## হ


হপকিন্স, ই. ডবলু. ৩-৪, ৭৪, ২১৭, ২২৩, ২৬৮, ২৮৭
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র ২২৪
হর্ষবর্ধন ২৯৮
হরদত্ত ১১৬, ১১৮-৯, ১২৫-৬, ১৩৩
হরপ্পা ১০, ১৫
হরি ২৮৯
হরিয়ানা ২৬, ৪৫
হরিসেন ১৩৬
হাউগ, মার্টিন ৬২-৩
হিট্টাইট ২৫
হিমাচল প্রদেশ ৩০৮
হিমালয় ৮৬, ৩০৪
হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ১০০
হিল্লেব্রান্ট, এ ৩, ১৮
হুইট্‌নি, ডবলু. ডি. ৩২-৩
হুবিষ্ক ১৮৬
হুইতী ৭২
হূণ ৩৪, ১৭৮, ৩০৪-৯
হেমাদ্রি ২৭৬
হেলট ৫১, ১০৮, ১৬৬, ২৮৭
হেল্লেনীয় ১৪৭
হোসিওদ ৫১
হোমর ৩৬